শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক, রেজিস্ট্রার,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ থেকে
শ্রীপরেশ চন্দ্র বসু কর্তৃক মুদ্রিত



সূচীপত্র

জীবনব্রত

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

সত্য

আমাদের সংস্থার ভিত্তি সত্যের আগ্রহের উপরই প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য সত্য-ব্রত সম্বন্ধেই প্রথমে বলিব।

সত্য শব্দ 'সৎ' হইতে হইয়াছে। সৎ অর্থাৎ যাহা আছে। সত্য তাহাই যাহা থাকিতে পারে। সেইজন্য সত্য ব্যতীত আর কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। সুতরাং পরমেশ্বরের যোগ্য নাম হইতেছে 'সৎ' বা 'সত্য'। সেই হেতুই 'পরমেশ্বর সত্য' একথা বলা অপেক্ষা 'সত্যই পরমেশ্বর' একথা বলাই অধিকতর সঙ্গত। আমাদের একজন রাজা কিম্বা সর্দার ছাড়া চলে না, সেইজন্য পরমেশ্বরের নাম অধিক প্রচলিত আছে এবং থাকিবেও। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার 'সৎ' বা সত্যই খাঁটি নাম এবং উহা দ্বারাই তাঁহার পূর্ণ অর্থ সূচিত হয়।

আবার যেখানে সত্য আছে সেইখানেই জ্ঞান—শুদ্ধজ্ঞান আছেই। যেখানে সত্য নাই সেখানে শুদ্ধজ্ঞান সম্ভবেই না। সেইজন্য ঈশ্বরের নামের সহিত চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান শব্দের যোজনা করা হয়। এবং যেখানে সত্যজ্ঞান আছে সেইখানে আনন্দ আছে, শোক সেখানে নাই। কেননা সত্য যেমন শাশ্বত, তেমনি আনন্দও শাশ্বত। সেইজন্যই তো ঈশ্বরকে আমরা "সচ্চিদানন্দ" বলি।

এই সত্যের আরাধনার জন্যই আমাদের অস্তিত্ব রহিয়াছে। সেইজন্যই আমাদের প্রত্যেক প্রবৃত্তি, সেইজন্যই আমাদের প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস বহে। যদি আমরা ইহা করিতে পারি তাহা হইলে অন্য সকল প্রবৃত্তি সহজেই আমাদের বশে আসিবে, তাহা পালন করাও সহজ হইবে। সত্য ব্যতীত কোনও নিয়মেরই শুদ্ধ পালন অসম্ভব।

সাধারণতঃ সত্য মানে সত্য কথা বলাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এখানে আমরা সত্য শব্দ ব্যাপক অর্থেই দেখিতে চাই। বিচারে, বাক্যে, আচরণে সত্যই—সত্য। এই সত্য যিনি সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন, জগতে তাঁহার অন্য কিছুই জানিতে বাকি নাই। কেননা যে কথা উপরে বলা হইয়াছে তদনুসারে যে সম্পূর্ণ সত্যের আচরণ এবং পালন করিতে পারে, তাহার ভিতরে সম্পূর্ণ জ্ঞানও আছে। উহার ভিতরে যাহা নাই তাহা সত্য

নয়, তাহা জ্ঞান নয়, তাহা আনন্দই বা হইবে কেমন করিয়া? এই পরীক্ষাটা যদি আমরা প্রয়োগ করিতে শিখি তাহা হইলে তখনই বুঝিতে পারিব যে, কোন্ প্রবৃত্তিটা আচরণের যোগ্য আর কোন্‌টা ত্যাজ্য, কোন্‌টা দেখার যোগ্য কোন্‌টা নয়, কোন্‌টা শোনার যোগ্য আর কোন্‌টা নয়।

কিন্তু এই যে সত্য, যাহা পরশ-পাথরের ন্যায়, যাহা কামধেনুর ন্যায়, সে সত্যকে কি করিয়া লাভ করা যায়? ইহার জবাব ভগবান দিয়াছেন—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা। সত্যকে আঁকড়াইয়া থাকার নামই অভ্যাস, আর সত্য ব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তুর বিষয়ে উদাসীনতাই বৈরাগ্য। এবম্প্রকার হইলেও একের পক্ষে যাহা সত্য অন্যের পক্ষে আবার তাহাই অসত্য, ইহাও আমরা দেখিতে পাই। ইহাতে বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নাই। যেখানে শুদ্ধ প্রযত্ন আছে, সেইখানেই দেখা যাইবে যে, সত্য, যাহা আমরা আলাদা আলাদা বলিয়া মনে করি তাহা একই বৃক্ষের অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পাতার ন্যায়। পরমেশ্বরকে কি প্রত্যেক মানুষই আলাদা করিয়া জানে না? তাহা হইলেও তিনি যে এক তাহাও আমরা জানি। আবার সত্য এই নাম পরমেশ্বরেরই। সেইজন্য যে ব্যক্তি সত্য যেমন ভাবে দেখে সে সেই অনুরূপ আচরণ করিলে দোষ নাই, বরং ঐ প্রকার করাই কর্তব্য। যদি উহাতে ভুল থাকে তবে আপনা-আপনিই তাহার সংশোধন হইয়া যায়, কেননা সত্যের অনুসন্ধানের পশ্চাতেই তপশ্চর্যা রহিয়াছে, অর্থাৎ নিজের দুঃখ সহ্য করিতে হয়। এই দুঃখ সহনের সীমা নাই, মরণান্ত পর্যন্ত পণ থাকা চাই অর্থাৎ স্বার্থের গন্ধও ইহাতে থাকিতে পারিবে না। এই প্রকার নিঃস্বার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিয়া কেহ শেষ পর্যন্ত বিপথে যায় নাই। বিপথে গেলেও পুনরায় সে ঠিক পথেই আসিয়া দাঁড়ায়। সেই হেতু সত্যের আরাধনাই ভক্তি। ভক্তি তো মাথার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হয়।

সত্যের আরাধনা হরির মার্গ, ইহাতে ভীরুতার স্থান নাই, এ পথে কদাচ হার নাই। ইহা মরিয়া বাঁচার মন্ত্র।

এখন আমরা প্রায় অহিংসার কোঠায় আসিয়া পড়িলাম। অহিংসার আলোচনা আগামী সপ্তাহে হইবে।

এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র, প্রহ্লাদ, রামচন্দ্র, ইমাম হোসেন, হাসেন, খ্রীষ্টীয় সাধু প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আলোচনা করা দরকার। যদি আশ্রমের সকলে, ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ, খাইতে শুইতে চলিতে বসিতে সমস্ত কার্য করার সময়

আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত কেবল সত্যেরই রটনা করে, সত্যের রটনা করিতে করিতে নির্দোষ নিদ্রায় দিন শেষ করে, তবে কেমন সুন্দর হয়? এই সত্যরূপ পরমেশ্বর আমার কাছে রত্ন-চিন্তামণি স্বরূপ হইয়াছেন, তোমাদের সকলের কাছেও তিনি তাহাই হইয়া উঠুন।

য়েরোড়া মন্দির

২২. ৭. ৩০ (প্রাতঃকালীন প্রার্থনা অন্তে।)

অহিংসা

এই লেখার আরম্ভ কতকটা কৌতুকজনক এবং দুঃখদায়কও বটে। কাপড়ের তৈরি যে খামগুলি আমার কাছে আসে, সেগুলি কি করিয়া বাঁচানো যায় ও বারে বারে ব্যবহার করা যায়, সেই আলোচনা আমাদের মধ্যে হইতেছিল। কথাটা ছিল যে, সমস্ত খামটার উপরই নূতন কাগজ আঁটা হইবে, না কেবল যেখানে যেখানে লেখা আছে সেইখানে সেইখানে আঁটা হইবে। এই আলোচনা নিরর্থক। ইহাতেই প্রার্থনার পরের সুন্দর পনের মিনিট সময় কাটিয়া গেল। পরিণামে আমাদের মূর্খতাই প্রমাণিত হইল। ইহাতে সত্য অহিংসা ও বিবেকের হানি হইল। সত্যকে পীড়িত করা হইল, কেননা এই কথোপকথনের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানের তীব্রতা ছিল না। অহিংসা ম্লান হইল, কেননা যে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত বর্তমান দুঃখের দর্শন করিতে ও তাহার প্রতিকারের উপায়ের কথা চিন্তা করিতে লাগানো দরকার, সেই সময় হইতে অমূল্য পনের মিনিট নিরর্থক কথোপকথনে ব্যয় হইল। বিবেকের রক্ষা হইল না, কেননা যদি কর্তব্যাকর্তব্য বিচার করিতে হইত তবে এই কথোপকথন এক মিনিটও চলিত না। জনসাধারণের পনের মিনিট চুরি করিয়া তারপর সকলেই নিজেদের মূর্খতা টের পাইলাম এবং ভবিষ্যতে সাবধান হওয়ার জন্য ঈশ্বরের নিকট মিনতি করিলাম। এই ঘটনার কথা এখানে ইচ্ছাপূর্বকই উল্লেখ করিতেছি।

সত্যের ও অহিংসার পথ যেমন সোজা, আবার তেমনি সংকীর্ণও বটে। ইহা যেন তলোয়ারের ধারের উপর দিয়া চলা। যে খেলোয়াড় শূন্যে দড়ির উপর চলার খেলা দেখায় সে একাগ্র হইয়াই চলিয়া থাকে; কিন্তু তাহার রশি অপেক্ষাও সত্যের রশি সূক্ষ্ম। একটু অসাবধান হইলেই আর কথা

নাই, একদিকে পড়িয়া যাইতে হইবে। নিরন্তর সাধনা দ্বারা সত্য ও অহিংসার দর্শন পাওয়া যায়।

কিন্তু এই দেহ থাকিতে সত্যের সম্পূর্ণ দর্শন অসম্ভব। সত্যের কল্পনা মাত্র করা যাইতে পারে। ক্ষণিক দেহ দ্বারা শাশ্বত সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভবপর নহে। সেইজন্য শেষকালে শ্রদ্ধার আশ্রয় লইতে হয়।

এমনি করিয়াই জিজ্ঞাসু অহিংসার পথে যাত্রা করে। আমাদের পথে কষ্ট তো আছেই। প্রশ্ন এই যে, অহিংসার পথে যে কষ্ট তাহা সহ্য করিব, না যে কষ্ট দেয় তাহাকে বিনাশ করিয়া চলিব? জিজ্ঞাসু দেখিতে পাইবে যে, বিনাশ করিয়া চলিলে যেখানে সে দাঁড়াইয়া আছে সেইখানেই থাকিবে, রাস্তা বাহির হইবে না। যে সংকট সহ্য করে সে-ই অগ্রসর হয়। যে নাশ করিতে চায়, সে দেখিতে পাইবে যে, সে যে-সত্যের অনুসন্ধান করিতেছে তাহা বাহিরে পাওয়ার জিনিস নয়, অন্তরের জিনিস। সেইজন্য সে যেমন যেমন নাশ করিতে থাকিবে, তেমন তেমন পিছনে পড়িতে থাকিবে, সত্যও দূরে যাইতে থাকিবে।

ধর, আমাদের উপর চোরের উপদ্রব হইল, আমরা উহা হইতে বাঁচার জন্য তাহাকে সাজা দিলাম। তখন সে পলাইল বটে, কিন্তু অন্য জায়গায় গিয়াও সেই কর্মই করিল। কিন্তু অন্য জায়গাও তো আমাদেরই; সেইজন্য আমাদের অবস্থা কাণা গলিতে প্রবেশ করার মত হইল। চোরের উপদ্রব বাড়িতেই থাকিল, কেননা চোর তো চুরি করাকেই কর্তব্য বলিয়া মনে করে। আমরা দেখিলাম যে, ইহা অপেক্ষা চোরের উপদ্রব সহ্য করাই ভাল। উহাতে চোর বুঝিতে পারিবে। এইভাবে সহ্য করায় আমরাও দেখিতে পাইব যে চোর আমাদের পর নয়। আমাদের তো সকলেই আত্মীয়, সকলেই মিত্র, তাহাদিগকে দণ্ড দিতে নাই। কিন্তু কেবল উপদ্রব সহ্য করাই যথেষ্ট নয়। উহা হইতে ভীরুতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এখনো আরও বিশেষ কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে। চোর যদি আমাদের ভাই-ই হয়, তবে তাহার মধ্যে বিচার করার শক্তি উপস্থিত করা চাই। আমরা চোরকে আপন করিয়া লওয়ার জন্য উপায় খুঁজিতে পূরা চেষ্টা করিতে লাগিলাম—ইহাই হইল অহিংসার পথ। ইহাতে উত্তরোত্তর কেবল দুঃখ সহ্য করার কথাই আসিয়া পড়ে। ইহার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য শিক্ষা করার কথা আসিয়া পড়ে। এইরূপ যদি হয়, তবে পরিণামে চোরও সাধু হয়, আমাদেরও সত্যের দর্শন অধিকতর স্পষ্ট হয়। ইহা দ্বারাই

আমরা জগতকে মিত্র করিতে শিখি। ইহাতেই ঈশ্বরের, সত্যের মহিমা অধিক জানা যায়, সংকটের মধ্যেও শান্তির সুখ বাড়িতে থাকে। আমাদের মধ্যেও সাহস এবং দুঃসাহসিকতা বাড়িয়া চলে, আমরা শাশ্বত ও অশাশ্বতের মধ্যে ভেদ অধিক বুঝিতে পারি। কর্তব্য অকর্তব্যের বিবেক জন্মে, অভিমান নষ্ট হইয়া যায়, নম্রতা বাড়ে, সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা পরিগ্রহ ক্রমশঃই কমিতে থাকে ও দেহের মধ্যের ময়লা নিত্যই সাফ হইতে থাকে।

এই প্রকার অহিংসাই যে অহিংসার মূল বস্তু তাহাও নয়। কাহাকেও না মারা তো আছেই, উত্তেজিত হওয়াও হিংসা; মিথ্যা-ভাষণ হিংসা; দ্বেষও হিংসা। কাহারও মন্দ কামনা করা হিংসা। যাহা জগতের সকলের থাকা চাই, তাহার উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হিংসা। কিন্তু আমরা খাইয়া বাঁচিয়া থাকিলে তবে না জগতকে দেখিতে পারিব? আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি সেখানেই কত শত সূক্ষ্ম জীব পিষ্ট হইতেছে। এই জায়গায় তাহারাই ছিল! তাহা হইলে করা যায় কি, আত্মহত্যা করিব? যদি চিন্তায় আমরা দেহের প্রতি আসক্তি মাত্র ত্যাগ করি তবে দেহও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। এই মোহমুক্ত স্বরূপই সত্যনারায়ণ। অধীর হইলে ইহার দর্শন পাওয়া যায় না। দেহ আমাদের নয়, আমাদের কাছে গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। এই প্রকার বুঝিয়া দেহের যা ব্যবহার করা উচিত তাহা করিলেই আমাদের রাস্তা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আমার ইচ্ছা ছিল সহজ করিয়া লেখা, কিন্তু হইয়া গেল কঠিন। তাহা হইলেও যে অহিংসার অল্পমাত্র বিচারও করিয়াছে তাহার বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

সকলে এ কথাটা জানিয়া লও—অহিংসা ব্যতীত সত্যের জ্ঞান অসম্ভব। অহিংসা ও সত্য এমন ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে যে, উহা একটা টাকার এ-পিঠ ও-পিঠের মত। উহাকে যে দিকে উল্টাও টাকা টাকাই থাকিয়া যায়। তাহা হইলেও অহিংসাকে সাধন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং সত্যকে সাধ্য জানিবে। সাধন আমাদের হাতের জিনিস। ইহার জন্যই অহিংসা পরম ধর্ম হইয়াছে আর সত্য হইয়াছে পরমেশ্বর। সাধন যত্ন করিয়া অভ্যাস করিলে, সাধ্য কোন না কোন দিন দেখা দিবেই। এইভাবে নিশ্চিত সংকল্প করিলে জগৎকে জয় করা যায়। আমাদের পক্ষে যতই সংকট আসুক না কেন, বাহ্যদৃষ্টিতে আমাদের যতই হার দেখা যাক না কেন, আমাদের বিশ্বাস ত্যাগ না করিয়া একমাত্র মন্ত্র জপ করিয়া যাওয়া চাই—"সত্য আছে—এক সত্যই

আছে, সত্যই এক পরমেশ্বর। তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের পথও একটি মাত্রই আছে, একটি মাত্র সাধন আছে, তাহা হইতেছে অহিংসা। তাহাকে কদাপি ছাড়িব না। যে সত্যরূপ পরমেশ্বরের নামে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তিনিই ইহা পালন করার শক্তি দিন।"

য়েরোড়া মন্দির

২৯.৭.৩০

ব্রহ্মচর্য

আমরা যে সকল ব্রত লইয়াছি, তাহাদের মধ্যে তৃতীয় ব্রত হইল ব্রহ্মচর্য। বাস্তবিক দেখিতে গেলে অন্য সমস্ত ব্রত এক সত্য-ব্রত হইতেই উৎপন্ন এবং সেই ব্রত পালনের জন্যই অন্য সকল ব্রতের প্রয়োজন। যে মানুষের হৃদয় সত্যে ভরা, যে সত্যেরই উপাসনা করে, সে যদি অন্য কোনও বস্তুর আরাধনা করে তবে তো সে ব্যভিচারী বলিয়াই গণ্য হয়। এমন অবস্থায় সে বিকার বা অসংযমের আরাধনা কি করিয়া করিতে পারে? যাহার সমস্ত প্রবৃত্তিই কেবল সত্যের দর্শন করিবার জন্য উৎসর্গীকৃত, সে ব্যক্তি সন্তান উৎপাদনে বা ঘর-সংসার চালাইবার কাজে কি করিয়া লিপ্ত হইতে পারে? ভোগ-বিলাস করিয়া সত্য লাভ করিয়াছে, এমন একটা দৃষ্টান্তও আমরা আজ পর্যন্ত পাই নাই।

আবার অহিংসা ব্রত পালনের কথা ধর, তাহারও পূর্ণ পালন ব্রহ্মচর্য ছাড়া হইতে পারে না। অহিংসা মানে সর্বব্যাপী প্রেম। যেখানে পুরুষ এক স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী এক পুরুষের প্রতি প্রেম সমর্পণ করে সেখানে তাহাদের কাছে অন্যের জন্য আর কি রহিল? উহার অর্থ তো এই হয় যে, "আমরা দুইজন সর্বাগ্রে—অপর সকল পরে"। পতিব্রতা স্ত্রী নিজের স্বামীর জন্য ও পত্নীব্রত পুরুষ নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বস্ব আহুতি দিতে প্রস্তুত হয়। সেইজন্য তাহাদের দ্বারা সর্বব্যাপী প্রেমের পালন করা যে হইতে পারে না, ইহা স্পষ্ট। তাই তাহারা সমস্ত সৃষ্টিকে নিজের আত্মীয় করিয়া লইতে পারে না, কেননা তাহাদের কাছে "নিজেদের" বলিতে একটা পরিবারই বুঝাইয়া থাকে, অথবা বুঝাইবার দিকে যায়। তাহাদের এই বৃত্তি যতই বৃদ্ধি পায়, ততই সর্বব্যাপী প্রেমের বিক্ষেপ হয়। সারা জগতেই আমরা এই অবস্থা

দেখিতেছি। সেইজন্যই তো যে অহিংসাব্রত পালন করিতে চায় তাহার বিবাহ করা চলে না, বিবাহের বহির্ভূত যে বিকার তাহার আর কথা কি? তাহা হইলে, যে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে তাহার উপায় কি? সে কি কোনও দিন সত্যের দর্শন পাইবে না? সে কি কখনো সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারিবে না? আমরা তাহাদের রাস্তাও করিতে পারি। বিবাহিতেরা অবিবাহিতের ন্যায় হইয়া যাইবে। এই দিক দিয়া ইহার মত সুন্দর আর দ্বিতীয় কোনও অনুভবই নাই। এই অবস্থার রস যে পান করিয়াছে, সে-ই সাক্ষ্য দিতে পারে। এই পরীক্ষা যে সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা আজ নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ যখন একে অপরকে ভাই-ভগ্নীর মত গণ্য করে, তখন অপর সকল জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া যায়। জগতের যত স্ত্রী সকলেই ভগ্নী, সকলেই মাতা, সকলেই কন্যা—এই অনুভূতি মানুষকে একেবারে উচ্চে লইয়া যায় এবং বন্ধন হইতে মুক্তিদানের হেতু হয়। এই ভাব পালনে পতি-পত্নী কিছুই খোয়ায় না, বরঞ্চ নিজেদের পুঁজি বাড়ায়, কুটুম্ব বাড়ায়, পরস্পরের মধ্যে বিকারের মলিনতা কাটিয়া গিয়া প্রেমও বাড়িয়া যায়। উভয়ের মধ্য হইতে বিকার চলিয়া যাওয়ায় একে অপরকে অধিক সেবা করিতে পারে, উভয়ের মধ্যে কলহের হেতু কমিতে থাকে। যেখানে প্রেম একদেশদর্শী ও স্বার্থপর, সেইখানেই কলহের স্থান বেশি।

উপরে যে প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করিলাম উহা বিচার করার পর, উহাকে হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার পর, ব্রহ্মচর্য হইতে যে শারীরিক লাভ, বীর্যলাভ ইত্যাদি হয়, সে সমস্ত গৌণ হইয়া পড়ে। ইচ্ছাপূর্বক ভোগ-বিলাসের জন্য বীর্যহানি করা, শরীরকে নীচু করিয়া ফেলা, কত বড় মূর্খতার কাজ! বীর্যের ব্যবহার স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শারীরিক ও মানসিক শক্তি বাড়াইবার জন্য। বিষয় ভোগের জন্য উহার ব্যবহার করিলে অতিশয় অপব্যবহার করা হয় এবং তাহা হইতে অনেক রোগেরও সূত্রপাত হয়।

এই ব্রহ্মচর্য কায়, মন ও বাক্য দ্বারা পালন করিতে হয়। ব্রত মাত্রেরই সম্বন্ধে এ কথা খাটে। আমরা গীতাতেই একথা জানিয়াছি যে, যে ব্যক্তি শরীরকে সংযত রাখে কিন্তু মনে মনে বিকার পোষণ করে সে মূঢ়, মিথ্যাচারী। সকলেই ইহা অনুভব করিয়া থাকিবে।

মনকে বিকারের বশীভূত থাকিতে দিয়া শরীরকে দাবাইয়া রাখার চেষ্টায়

ক্ষতিই হয়। মন যেখানে পড়িয়া আছে, অবশেষে সেখানে সে শরীরকে টানিয়া লইয়া যাইবেই। এইখানে একটা প্রভেদের কথা বুঝিয়া লওয়া দরকার—মনের নিজের ইচ্ছায় বিকারের বশ হওয়া এক কথা, আর মনের অনিচ্ছায় বলপূর্বক বিকারগ্রস্ত হওয়া আর এক কথা। আমরা এই শেষোক্ত বিকারের সহায়ক হই না বলিয়া অন্তিমে আমাদের জয়ই হয়। আমরা অনুক্ষণ একথা অনুভব করি যে, শরীর হাতের মধ্যে আছে কিন্তু মন তো নাই; কাজেই শরীরকে সঙ্গে সঙ্গে বশে আনিয়া মনকে বশে আনার জন্য নিত্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাঁতেই আমাদের কর্তব্য পূর্ণ পালন করা হইবে। মনকে বশীভূত করার চেষ্টা না করিয়া শরীর দ্বারা যদি মনের বিরোধ করা হয় তাহা হইলেই মিথ্যাচার আরম্ভ হয়। মনকে দমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং যতদিন না দমে ততদিন মনের ও দেহের বিকারও থাকিবে—একথা বলা যায়।

এই ব্রহ্মচর্য পালন অত্যন্ত কঠিন প্রায় অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মচর্যের সংকীর্ণ অর্থ করা হয় বলিয়াই এইরূপ হয়। জননেন্দ্রিয়ের বিকার নিরোধ করিলেই ব্রহ্মচর্য পালন করা হইল বলিয়া ধরা হয়। আমার কাছে এই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। বিষয়-ভোগ মাত্রই নিরোধ করার নাম ব্রহ্মচর্য। যে ব্যক্তি অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতে দিয়া একটা মাত্র ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করার চেষ্টা করে, সে যে নিষ্ফল প্রযত্ন করে এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? কান দ্বারা বিকারযুক্ত কথা শুনিবে, চক্ষু দ্বারা বিকার উৎপাদনকারী বস্তু দেখিবে, জিহ্বাদ্বারা বিকারোত্তেজক বস্তুর স্বাদ লইবে, হস্তদ্বারা বিকারোত্তেজক বস্তু স্পর্শ করিবে, আবার জননেন্দ্রিয়কেও বশে রাখার আশা করিবে, এ যেন ঠিক আগুনে হাতটা ঢুকাইয়া দিয়া তারপর না পোড়াইবার চেষ্টা করা। সেইজন্য যে জননেন্দ্রিয় রুদ্ধ করার চেষ্টা করে, তাহাকে অন্য সকল ইন্দ্রিয়কেই রুদ্ধ করার চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্যের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা যে হানি হইতেছে তাহা আমি সর্বদাই দেখিতে পাইতেছি। আমার দৃঢ় অভিমত এই যে এবং আমার অভিজ্ঞতাও এই কথাই বলে যে, যদি আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয় এক সঙ্গে বশ করার অভ্যাস করি তাহা হইলেই জননেন্দ্রিয় বশে আনার চেষ্টা শীঘ্র সফল হইতে পারে, সফল হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে স্বাদের ইন্দ্রিয়। সেইজন্যই তো এই ইন্দ্রিয়ের সংযমকে আমরা একটা আলাদা জায়গাই দিয়াছি। উহার বিচার পরে করিব।

ব্রহ্মচর্যের মূলগত অর্থ যেন সকলে মনে রাখে। ব্রহ্মচর্য মানে—ব্রহ্মের অর্থাৎ সত্যের অনুসন্ধানে চর্যা অর্থাৎ তৎসঙ্গত আচরণ। এই মূল অর্থ হইতে সর্বেন্দ্রিয় সংযম—এই বিশেষ অর্থ পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য মানে কেবল জননেন্দ্রিয় সংযম, এই অসম্পূর্ণ অর্থ তোমরা ভুলিয়া যাইও।

যেরোড়া মন্দির
মঙ্গল প্রভাত।
৫.৮.৩০

অস্বাদ

এই ব্রত ব্রহ্মচর্যের সহিত খুবই নিকট সম্বন্ধযুক্ত। আমার তো এই অভিজ্ঞতা যে, ঐ ব্রত রক্ষা করিতে পারিলে জননেন্দ্রিয়-সংযম অতিশয় সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু সধারণতঃ অস্বাদ-ব্রতকে একটা ভিন্ন স্থান দেওয়া হয় না। বড় বড় মুনিরাও স্বাদকে জয় করিতে পারে নাই, সেই হেতুই ইহাকে স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া হয় নাই। অবশ্য ইহা কেবল আমার অনুমান মাত্র। তবে এইরূপ হউক আর না-ই হউক, আমরা এই ব্রতকে একটা স্বতন্ত্র স্থান দিয়াছি, সেইজন্য স্বতন্ত্রভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি।

অস্বাদ মানে স্বাদ না লওয়া। স্বাদ মানেই রস। আমরা যেমন ঔষধ খাওয়ার সময় ঔষধটা স্বাদু কিনা এ বিচার না করিয়া যতটা আবশ্যক ততটুকু মাত্র খাইয়া থাকি, অন্নাদির সম্বন্ধেও সেই প্রকার জানিবে অন্ন মানে খাদ্যপদার্থ মাত্র। অন্ন বলিতে দুধ ফলাদিও বুঝাইতেছে। যেমন, ঔষধ যদি কম মাত্রায় খাওয়া যায় তবে ফল হয় না অথবা কম ফল হয় এবং অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হানি হয়, অন্নের সম্বন্ধেও তাহাই। সেইজন্য যদি কোনও বস্তু কেবল স্বাদ লওয়ার জন্য খাওয়া হয় তাহা হইলে ব্রত ভঙ্গ হয়। স্বাদু জিনিস অধিক খাইলে ত ব্রত ভঙ্গ হয়ই। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, কোনও খাদ্য বস্তুর স্বাদ বাড়াইবার জন্য বা স্বাদ বদলাইবার জন্য অথবা বিস্বাদ দূর করার জন্য তাহাতে লবণ সংযোগ করাও ব্রত ভঙ্গ করা। কিন্তু খাদ্যে এতটা লবণের আবশ্যকতা আছে জানিয়া তাহাতে সেই পরিমাণ লবণ মিশ্রিত

করা ব্রতভঙ্গ নহে। শরীর পালনের জন্য যে দ্রব্যের প্রয়োজন নাই, মনকে ঠকাইবার জন্য উহাতে আবশ্যকতা আরোপ করিয়া কোনও বস্তুর ব্যবহার করা তো মিথ্যাচার বলিয়া ধরিতে হইবে।

এই ধরণের যুক্তি গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব অনেক বস্তু যাহা শরীর রক্ষার জন্য আবশ্যক না হইলেও আমরা আহার করিয়া থাকি, তৎসমুদয় ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা অসংখ্য খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার সহজে কমিয়া যায় এবং স্বাভাবিকভাবে আত্মসংযম অর্জিত হয়।

"পেটকে ধর বেগার
পেট বাজাবে সেতার"।

এই ধরণের প্রবাদে বড় সার কথা রহিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে যদি অল্পমাত্রও দৃষ্টি দেওয়া যায়, তাহা হইলে স্বাদের বিচারে খাদ্যের পছন্দ অপছন্দ প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। ছেলেবেলা হইতেই মাতাপিতা অন্যায় আদর দেখাইয়া নানারূপ দ্রব্যের আস্বাদ করাইয়া শিশুর শরীর বিগড়াইয়া দেয় ও জিভকে কুকুরের জিভ বানাইয়া ফেলে। বড় হইয়া বুঝিতে পারিলেও তাহাদের শরীর সাংসারিক দৃষ্টিতে দেখিলে রুগ্ন, আর স্বাদের দৃষ্টিতে দেখিলে মহাবিকারগ্রস্ত বলিয়া দেখা যায়। ইহার কুফল আমরা পদে পদে দেখিতে পাই এবং এজন্য অনেক খরচের মধ্যেও পড়িয়া যাই। বৈদ্য ও ডাক্তারের হাতে গিয়া পড়ি এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করার পরিবর্তে তাহাদেরই গোলাম হইয়া আতুরের মত থাকি। একজন অভিজ্ঞ বৈদ্য বলেন, তিনি ইহজগতে একজনও নীরোগ ব্যক্তি দেখিতে পান নাই। এতটুকু স্বাদের জন্য শরীর নিজ ধর্ম ভ্রষ্ট হয় এবং তাহার পর সেই শরীরের জন্যই উপবাসের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে।

এই সকল যুক্তি শুনিয়া কাহারও শঙ্কিত হইবার প্রয়োজন নাই। অস্বাদব্রত অত্যন্ত কঠিন বলিয়া এই ব্রত ত্যাগ করিলে চলিবে না। আমরা যখন কোনও ব্রত গ্রহণ করি তখনই যে তাহা সম্পূর্ণভাবে পালন করিতে পারিব, এমন অর্থ করা যায় না। ব্রত লওয়া মানে তাহার জন্য বাস্তবিক দৃঢ়ভাবে মৃত্যু পর্যন্ত মন, বাক্য ও কার্যদ্বারা চেষ্টা করা। অমুক ব্রতটা পালন করা কষ্টসাধ্য সেইজন্য তাহার ব্যাখ্যা খাটো করিয়া মনকে ঠকানো উচিত নহে। নিজের সুবিধার জন্য যেখানে আদর্শকে খাটো করা হয় সেখানে সত্য ত্যাগ করা হয়, নিজের পতন আনা হয়। আদর্শকে আমাদের ক্ষমতা অক্ষমতার বিচার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যতই কষ্টসাধ্য হউক না কেন, সেই আদর্শ লাভ করার

জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করাই পরম-অর্থ—পুরুষার্থ। পুরুষ মানে কেবল নর মনে না করিয়া উহার মূল অর্থ বুঝিবে। পুরে অর্থাৎ শরীরে যে বাস্ করে সে-ই পুরুষ। এই অর্থ করিলে পুরুষার্থ শব্দ নর-নারী উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি তিন কালে মহাব্রতসমূহ সম্পূর্ণ ভাবে পালন করিতে পারে তাহার এই জগতে কিছুই করার থাকে না, সে ভগবান হইয়া যায়, সে মুক্ত। আমরা তো অল্প-মুমুক্ষু, জিজ্ঞাসু, সত্যের অনুসন্ধানকারী ক্ষুদ্র প্রাণী। সেইজন্যই গীতার ভাষায় বলিতে গেলে ধীরে ধীরে কিন্তু অতন্দ্রিত থাকিয়া চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। যদি এই প্রকার করি তবে কোন না কোন দিন ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপযুক্ত হইব এবং আমাদের সমস্ত 'রসের' আকাঙ্ক্ষাই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে।

অস্বাদব্রতের মহত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাকি তবে উহা পালন করার জন্য নূতন করিয়া চেষ্টা করা দরকার। তাই বলিয়া ২৪ ঘণ্টা খাওয়ার কথাই ভাবিবার প্রয়োজন নাই, কেবল সাবধানতা, কেবল জাগৃতিরই একান্ত আবশ্যক। এইরূপ চেষ্টা করিতে থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বুঝিতে পারিব কোন্ বস্তুটা স্বাদের জন্য খাইতেছি, আর কোন্‌টা শরীরের জন্য খাইতেছি।

এই রকম বুঝিবার পর আমাদের দৃঢ়ভাবে স্বাদের আকাঙ্ক্ষা কমাইয়া যাওয়াই উচিত হইবে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে অস্বাদ-বৃত্তি হইতে পরিচালিত সাধারণ বা সংযুক্ত পাকশালা, ব্রত পালনের বড়ই সহায়ক হয়। সেখানে আমরা প্রতিদিন কি খাইব, কি রান্না করিব, তাহার খোঁজ লওয়ার দরকার হয় না। যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার মধ্যে যে সকল আমার ত্যাজ্য নহে তাহাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনে করিয়া ও মনে মনে ভালমন্দ সমালোচনা না করিয়া শরীরের আবশ্যক অনুসারে খাইয়া উঠিতে পারি। এইরূপ করায় সহজেই অস্বাদব্রত পালন করা যাইতে পারে। যাঁহারা সাধারণ পাকশালার ভার নেন তাঁহারাই আমাদের বোঝা হাল্কা করিয়া দেন। তাঁহারা আমাদের ব্রতের রক্ষক হইয়া পড়েন। স্বাদের দৃষ্টিতে তো পাক করা নয়, দশজনের শরীর যাহাতে টেঁকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া রান্না করিতে হইবে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে আদর্শ অবস্থায় অগ্নির ব্যবহারের আবশ্যকতা খুব কমই, অথবা, আদৌ আবশ্যক নাই। সূর্যরূপী মহা অগ্নি যাহা পাকাইয়াছে, তাহা হইতেই আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করা চাই এবং তাহা করিলে মানুষ যে কেবল ফলাহারী প্রাণী তাহাও প্রমাণিত হয়। কিন্তু এখানে এত গভীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে চাই না। এখানে তো আমরা অস্বাদব্রত কি, তাহাতে কি

অসুবিধা আছে বা নাই এবং ব্রহ্মচর্য পালনের সহিত তাহার সম্বন্ধ কত নিকট, কেবল তাহাই বিচার করিতেছি। এই সকল কথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সকলেই যথাশক্তি এই ব্রত পালনের জন্য যেন শুভ প্রযত্ন করে।

যেরোড়া মন্দির

১২:৮.৩০

অস্তেয়

এখন আমরা অস্তেয় ব্রতের কথা আলোচনা করিব। যদি এই বিষয়ের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করি তবে দেখিতে পাইব যে, সমস্ত ব্রতই সত্য ও অহিংসার ভিতর অথবা সত্যের গর্ভে অবস্থিত। এইভাবে উহা দেখানো যায়—

সত্য সত্য-অহিংসা

অহিংসা

ব্রহ্মচর্য অস্বাদ অস্তেয় অপরিগ্রহ অভয় ইত্যাদি যত নাম দাও

সত্যের মধ্যেই অহিংসাকে ধরা যায়, অথবা সত্যকে অহিংসার জুড়ি মনে করা যায়। দুই-ই এক কথা। তাহা হইলেও আমার মন প্রথম ভাবের দিকেই আকৃষ্ট রহিয়াছে এবং শেষ অবস্থায় দুইয়ের সংযোগ বা দ্বন্দ্বের অতীত পরম সত্য একক দাঁড়াইয়া থাকে। সত্য হইতেছে সাধ্য, অহিংসা তাহার একমাত্র সাধন। অহিংসা যে কি তাহা আমরা জানিয়াছি, উহা পালন করা কঠিন। সত্যের কেবল অংশ মাত্রই জানিতে পারা যায়। সম্পূর্ণ সত্য জানা দেহীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তেমনি সম্পূর্ণভাবে অহিংসা পালন করাও দেহধারীর পক্ষে অসম্ভব।

অস্তেয় মানে চুরি না করা। কোনও ব্যক্তি চুরি করিয়া একথা বলিতে পারে না যে, সে সত্য জানে ও প্রেমধর্ম পালন করে। তাহা হইলেও আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জ্ঞানে ও অজ্ঞানে চুরির অপরাধ করিতেছি। অন্যের জিনিস তাহার অনুমতি ছাড়া নেওয়া তো চুরি করা বটেই,

নিজের জিনিসও লোকে চুরি করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—পিতা যখন ছেলেদের না জানাইয়া বা তাহাদের না জানাইবার জন্য চুপি চুপি কোনও জিনিস খায়। আমাদের আশ্রমের ভাণ্ডার আমাদের সকলেরই—একথা বলা যায়, তথাপি সেখান হইতে লুকাইয়া যদি এক টুকরা গুড়ও কেহ নেয় তবে সে চোর হয়। একটি বালক যদি অপরের কলম নেয় তবে সে চুরি করে। যাহার জিনিস তাহার সম্মুখেও যদি না বলিয়া লওয়া হয় তাহাতেও চুরি করা হয়। এ জিনিসটা কাহারও নয় ইহা মনে করিয়া নিজে লওয়াও চুরি করা। সেইজন্যই রাস্তায় কুড়াইয়া পাওয়া জিনিসের মালিক আমরা নই। সে প্রদেশের রাজা অথবা রাজতন্ত্র উহার মালিক। আশ্রমের কাছাকাছি যদি কোনও জিনিস কুড়াইয়া পাওয়া যায় তবে আশ্রমের কর্তাকে উহা সমর্পণ করিতে হইবে। কর্তা যদি দেখেন যে তাহা আশ্রমের নয় তবে তিনি তাহা পাহারাওয়ালাকে দিয়া দিবেন।

এ পর্যন্ত বুঝা সাধারণতঃ সহজ। কিন্তু অস্তেয় ইহা অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। যে বস্তুর প্রয়োজন নাই, সে বস্তু যদি উহার মালিকের অনুমতি লইয়াও লওয়া হয়, তবে তাহা চুরি করা হয়। আবশ্যক নাই এমন একটি জিনিসও রাখিতে নাই। সংসারে এই ধরণের চুরি খাদ্য-পদার্থ সম্বন্ধেই খুব বেশি হইয়া থাকে। অমুক ফলটায় আমার প্রয়োজন নাই তবুও যদি আমি উহা খাই অথবা যতটা দরকার তাহার অপেক্ষা বেশি লই, তাহা হইলে চুরি করা হয়। সত্যকার প্রয়োজন কতখানি মানুষ তাহা সকল সময় জানেও না। বস্তুতঃ অনেক সময়ই যতটা আমাদের প্রয়োজন হওয়া উচিত তাহার অপেক্ষা আবশ্যকতা বাড়াইয়া ফেলি এবং এমনি করিয়া অজ্ঞাতসারেও আমরা চোর হইয়া যাই। বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে যে, আমাদের অনেক প্রয়োজন আমরা কমাইতে পারি। যে ব্যক্তি অস্তেয় পালন করিবে, সে উত্তরোত্তর নিজের প্রয়োজন কমাইতে থাকিবে। জগতের অনেক দারিদ্র্য অস্তেয় ভঙ্গ করার জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে।

উপরে যে সকল বিষয় বলা হইল, সে সমস্তই বাহ্য অথবা শারীরিক চুরির বিষয়। আবার এক রকম সূক্ষ্ম চুরি আছে যাহা আত্মাকে নীচে নামাইয়া আনে, পতিত করিয়া রাখে—সে চুরি মানসিক চুরি। মন দ্বারা যখন কোন বস্তু পাইতে ইচ্ছা করিয়া তাহার উপর মলিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখনই চুরি করা হয়। বড় অথবা ছোট যে কেহ যখন কোনও ভাল জিনিস দেখিয়া পাওয়ার লালসা

করে তখন সে মানসিক চুরি করে। উপবাসী ব্যক্তি খায় না কিন্তু সে যদি অপরকে খাইতে দেখিয়া মনে মনে স্বাদ নেয় তবে চুরি করে এবং উপবাস-ব্রতও ভঙ্গ করে। যে উপবাসী ব্যক্তি উপবাস অন্তে কি খাইবে সে কথা ভাবে সে অস্তেয়ও ভঙ্গ করে, উপবাসও ভঙ্গ করে—একথা বলা যায়। যে ব্যক্তি অস্তেয় পালন করিতে চায় সে ভবিষ্যতে কি পাইবে তাহা চিন্তা করিতে থাকিলে অস্তেয়ব্রত ভঙ্গ হইয়া যায়। অনেক চুরির পশ্চাতেই এইরূপ মলিন ইচ্ছা আছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আজ যাহা কেবল মনে রহিয়াছে সময় হইলে ভালমন্দ যে কোন উপায় ব্যবহার করিয়াই উহা লাভ করিতে লাগিয়া যাইব।

যেমন কোনও দ্রব্যের চুরি হয় তেমনি ভাবেরও চুরি হয়। কোনও একটা ভাল চিন্তা নিজের মনে প্রথম উদিত না হইলেও যে অহংকার বশতঃ উহা তাহারই আদি চিন্তা একথা বলে, সে ভাব চুরি করে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় অনেক বিদ্বানও এইরূপ চুরি করিয়াছেন এবং আজও করিতেছেন। মনে কর, আমি অন্ধ্র দেশে এক প্রকার নূতন খাদ্য দেখিয়া আসিলাম, তারপর আশ্রমে সেই প্রকার খাদ্য বানাইয়া বলিলাম যে, উহা আমার নিজের বুদ্ধিতেই করিয়াছি। ইহাতে আমি স্পষ্টভাবে অন্যের কৃত অনুসন্ধানের চুরি করিতেছি আর অসত্য আচরণ তো করিতেছি বটেই।

সেইজন্য অস্তেয়ব্রত পালনকারীকে অত্যন্ত নম্র, অত্যন্ত বিচারশীল, খুব সাবধান ও খুব সাদাসিধা থাকিতে হয়।

য়েরোড়া মন্দির

১৯. ৮. ৩০

অপরিগ্রহ

অপরিগ্রহ অস্তেয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। যাহা গোড়ায় চুরি করা হয় নাই তেমন দ্রব্য অনাবশ্যক হইলেও যদি সংগ্রহ করা হয় তখন তাহা চুরির মতই হইয়া পড়ে। পরিগ্রহ মানে সঞ্চয় করা বা একত্র করা। যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানী, যে অহিংস, সে পরিগ্রহ করিতে পারে না। পরমাত্মা পরিগ্রহ করেন না। তাঁহার যাহা 'আবশ্যক' তাহা তিনি প্রতিদিনই উৎপন্ন করেন। আর যদি আমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখি তবে ইহাও বুঝিব যে, আমাদের

আবশ্যক বস্তু তিনি প্রতিদিনই দিতেছেন ও দিবেন। যাঁহারা সরল, যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা এইরূপই অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা ঈশ্বরের এই নিয়ম—প্রতিদিনের আবশ্যক বস্তু প্রতিদিনই সংগ্রহ করার বিধান জানি না, অথবা জানিয়াও পালন করি না, আর সেইজন্যই জগতে এত বৈষম্য এবং তাহা হইতে উৎপন্ন দুঃখের ভারে আক্রান্ত হইয়া থাকি। ধনাঢ্য যে, সে তাহার অনাবশ্যক বস্তুদ্বারা নিজেকে ভরিয়া রাখিয়াছে, উহারই জন্য সে ঘুরিয়া মরিতেছে, নষ্ট পাইতেছে। আর এদিকে সেই বস্তুর অভাবে কোটি কোটি মানুষ হন্যা হইয়া ফিরিতেছে, ক্ষুধায় মরিতেছে, শীতে কাঁপিতেছে। সকলেই যদি নিজের আবশ্যক পরিমাণ সংগ্রহ করে, তবে কাহাকেও কষ্ট পাইতে হয় না এবং সকলেরই সন্তোষ বজায় থাকে। আজ ধনী ও দরিদ্র উভয়েই ক্লিষ্ট হইতেছে। যাহার কোটি টাকা আছে, সে শতকোটিপতি হইতে চায়—তাহাতেও সে সন্তুষ্ট হয় না। কাঙ্গালও কোটিপতি হওয়ার বাসনা রাখে।

কাঙ্গালের পেট ভরিলেই যে সন্তুষ্ট হইল, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কাঙ্গালের উদর পূরণ করিবার অধিকার আছে, আর সমাজের পক্ষে তাহাকে ততটুকু পাওয়াইয়া দেওয়াও কর্তব্য। সেইজন্য তাহার নিজের সন্তোষের জন্য ধনাঢ্যকেই প্রথমে এই কর্তব্য পালন করিতে হইবে। যদি ধনাঢ্যেরা তাহাদের সীমাহীন পরিগ্রহ বর্জন করে, তবে কাঙ্গালের পেট ভরার মত বস্তু সহজেই পাওয়া যায় এবং উভয় পক্ষই সন্তোষের পাঠ শিক্ষা করে। আদর্শ ও চরম অপরিগ্রহের অবস্থা তো মনে এবং দেহে দিগম্বর হইলে তবে লাভ করা যায়। সে তখন পক্ষীর ন্যায় গৃহহীন, বস্ত্রহীন ও অন্নহীন হইয়া বিচরণ করিতে পারে। অন্ন তাহাকে নিত্যকার আবশ্যকমত ভগবান দিয়া থাকেন। এই অবধূতের অবস্থায় কদাচিৎ কেহ পৌছিতে পারেন। আমাদের মত সাধারণ রকমের সত্যাগ্রহীকে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রতিদিনই নিজেদের পরিগ্রহের সন্ধান লইয়া যতটা পারি পরিগ্রহ কমাইয়া যাইতে হইবে। সত্যকার সংস্কৃতি, সত্যকার সভ্যতার লক্ষণ পরিগ্রহ বাড়াইয়া যাওয়া নয়, বিচার করিয়া এবং ইচ্ছা করিয়া পরিগ্রহ কমাইয়া যাওয়া। যেমন যেমন পরিগ্রহ কমিতে থাকিবে তেমন তেমন সত্যকার সুখ ও প্রকৃত সন্তোষ বাড়িতে থাকিবে, সেবা-শক্তি বাড়িবে। এইভাবে বিচার করিয়া ও আচরণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, আশ্রমে এমন অনেক জিনিস সংগৃহীত আছে যাহাকে আবশ্যক বলা যায় না এবং এই প্রকার অনাবশ্যক পরিগ্রহ দ্বারা

আমাদের প্রতিবেশীদিগকে চুরি করার প্রলোভনে ফেলি। অভ্যাসের দ্বারা মানুষ নিজের প্রয়োজন ক্রমাগত কমাইতে পারে এবং প্রয়োজন যেমন কমিবে সেই পরিমাণে সুখী, সন্তুষ্ট ও স্বাস্থ্যশীল হইবে। কেবল সত্যের, কেবল আত্মার দৃষ্টিতে যদি দেখা যায়, তবে শরীরটাও একটা পরিগ্রহ। ভোগের ইচ্ছা হইতেই এই শরীরের জন্য আচ্ছাদন সৃষ্টি করিয়াছি এবং শরীরকে টিকাইয়া রাখিতেছি। ভোগের ইচ্ছা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গেলে শরীরের আবশ্যকতাও মিটিয়া যায়, আর মানুষের নূতন শরীরও ধারণ করিতে হয় না। আত্মা সর্বব্যাপক, শরীররূপী পিঞ্জরের মধ্যে উহাকে পুরিবার আবশ্যক কি? এই পিঞ্জরকে টিকাইতে এত অনর্থই বা কেন এবং অন্যকেই বা কেন হত্যা করা? এই বিচারের শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া আমরা আত্যন্তিক ত্যাগে গিয়া পৌঁছি এবং যতদিন শরীর থাকে ততদিন কেবল সেবার জন্যই উহার ব্যবহার করিতে শিক্ষা করি। এত দূর পর্যন্ত উহা করিতে পারি যে, সেবা করাই তখন দেহের সত্যকার খোরাক হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় মানুষ যে খায়-দায়, শোয় বসে, জাগে ঘুমায় সে সকলই সেবার জন্য করে। ইহা হইতে উৎপন্ন সুখই সত্যকার সুখ, আর এই উপায়েই মানুষ অবশেষে সত্যের দর্শন করিতে পারে। এই দৃষ্টিতেই যেন আমরা সকলে আমাদের পরিগ্রহের বিচার করিয়া দেখি।

ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যেমন বস্তুর অপরিগ্রহ করিতে হইবে তেমনি বিচারসমূহেরও অপরিগ্রহ করা চাই। যে ব্যক্তি নিজের মাথার ভিতর নিরর্থক জ্ঞান প্রবেশ করাইয়া রাখে, সে পরিগ্রহী। যে সকল বিচার আমাদিগকে ঈশ্বর-বিমুখ করিয়া রাখে, অথবা আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায় না, সে সকল বিচারই পরিগ্রহের ভিতর পড়িয়া যায় এবং সেই হেতু তাহা ত্যাজ্য।

ভগবান গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উহা দেখিয়া লইতে হয়। অমানিত্ব ইত্যাদি গুণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহার বাহিরে যে সব জ্ঞান তাহা অজ্ঞান মাত্র। যদি এ'কথা সত্য হয়—আর ইহা তো সত্যই—তবে অনেক কিছু যাহা আমরা আজকাল জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহা অজ্ঞান। উহাতে লাভের বদলে হানিই হয়। মাথা ঘুরিয়া যায় ও অবশেষে মাথা খালি হইয়া যায়, অসন্তোষ বিস্তৃত হয় এবং অনর্থ বাড়িয়া চলে। কিন্তু কেহ যেন একথা হইতে উদ্যমের শিথিলতা করা চাই—এরূপ না বুঝেন। আমাদের প্রতি মুহূর্তেই কর্ম-প্রবৃত্তিময় হওয়া চাই। তবে সেই প্রবৃত্তি আবার হইবে সাত্ত্বিক এবং সত্যের অভিমুখী।

যে সেবা-ধর্ম স্বীকার করিয়াছে, সে এক মুহূর্তও কর্মহীন থাকিতে পারে না। এইজন্য অবশ্য ভাল মন্দের বিচার-বুদ্ধি লাভ করা দরকার। যে সেবাপরায়ণ সে এই বিবেক সহজেই পাইয়া থাকে।

য়েরোড়া মন্দির

২৬.৮.৩০

অভয়

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদের বর্ণনা করিতে গিয়া সর্ব প্রথমেই ভগবান অভয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। হইতে পারে যে, শ্লোক সাজাইবার জন্যই শব্দটি প্রথম স্থানে গিয়া পড়িয়াছে, অথবা অভয়কে প্রথম স্থান দেওয়ার জন্যই প্রথমে বসানো হইয়াছে। ইহা লইয়া আমার তর্ক করার প্রয়োজন নাই, আর উহা নির্ণয় করার যোগ্যতাও আমার নাই। আমার বুদ্ধি অনুসারে অভয়কে প্রথম স্থান দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অভয় লাভ না হইলে অন্য কোনও সম্পদ পাওয়া যায় না। নির্ভয় না হইলে সত্যের অনুসন্ধান কেমন করিয়া করা যায়? ঈশ্বর লাভের পথ বীরের জন্যই, ভীরুর জন্য নহে। সত্যই হরি, সত্যই রাম, সত্যই নারায়ণ, সত্যই বাসুদেব। ভীরু যে সে ভয়ে ভীত, আর বীর যে, সে ভয়মুক্ত, সে তলোয়ার আদি অস্ত্রে সজ্জিত নয়। তলোয়ার বীরত্বের ব্যঞ্জক নহে, ভীরুতারই চিহ্ন।

অভয় মানে সকল প্রকার বাহ্যিক ভয় হইতেই মুক্তি। ভয় তো মৃত্যুর ভয়, ধন-মান লুণ্ঠিত হইবার ভয়, কুটুম্ব পরিবার সম্বন্ধে ভয়, রোগের ভয়, অস্ত্রাঘাতের ভয়, ইজ্জতের ভয়, কেহ ক্ষতি করিবে বলিয়া ভয়—এমনি করিয়া ভয়ের বংশাবলী যত ইচ্ছা বাড়াইয়া যাওয়া যায়। সাধারণতঃ একথা বলা হইয়া থাকে যে, একমাত্র মৃত্যুভয় জয় করিলেই সমস্ত ভয় জয় করা যায়; কিন্তু ইহা ঠিক নয়। অনেকে মৃত্যুভয় ছাড়ে তবুও নানা প্রকার দুঃখে কষ্ট পায়। কেহ বা নিজে মরিতে প্রস্তুত কিন্তু আত্মীয় পরিজনের বিয়োগ সহ্য করিতে পারে না। কেহ আত্মীয় কুটুম্বাদি সকলই আহুতি দিতে পারে কিন্তু সঞ্চিত ধন ত্যাগ করিতে ভয় পাইয়া যায়। অনেকে নিজের গড়া আবরু ইত্যাদির মর্যাদা বজায় রাখার জন্য অনেক অকার্য কুকার্য করিতে প্রস্তুত হয় ও করে। লোক-নিন্দার ভয়ে কতজন সরল পথ জানিয়াও উহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে। যে সত্যের অনুসন্ধান করিবে, তাহার এই সর্বপ্রকার ভয়কেই বিসর্জন

দিয়া তবে মুক্তি। নিজের ভিতর হইতে হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠা চাই। হইতে পারে হরিশ্চন্দ্রের কথা কাল্পনিক ; কিন্তু ইহার যাথার্থ্য সমস্ত আত্মদর্শীই স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে অনুভব করিয়া থাকেন। সেইজন্য হরিশ্চন্দ্রের কথার মূল্য যে কোনও ঐতিহাসিক কাহিনী অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের সকলের গ্রহণ ও মনন করার যোগ্য।

এই ব্রতের সম্পূর্ণ পালন প্রায় অসম্ভব। যাহার আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে কেবল সেই তো ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে। অভয় হইতেছে মোহমুক্ত অবস্থার পরাকাষ্ঠা। সংকল্প, সতত চেষ্টা ও আত্মার উপর শ্রদ্ধা বর্ধন দ্বারা অভয়ের মাত্রা বাড়ানো যায়। আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমাদিগকে বাহিরের ভয় হইতে মুক্ত হইতে হইবে, কিন্তু অন্তরে যে শত্রু রহিয়াছে তাহাকে তো ভয় করিয়াই চলিতে হইবে। কাম ক্রোধাদির ভয় হইল সত্যকার ভয়। উহাদিগকে জয় করিতে পারিলে বাহ্য ভয় আপনা-আপনিই মিটিয়া যায়। ভয় মাত্রই দেহের জন্য। দেহের উপর হইতে অনুরাগ যদি চলিয়া যায় তবে সহজেই অভয় প্রাপ্তি ঘটে। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভয় মাত্রই আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। যদি টাকা পয়সার জন্য, আত্মীয় পরিজনের জন্য, শরীরের জন্য এই মমত্ব বা "আমার আমার" বোধ দূর করা যায়, তাহা হইলে ভয়টা আর কোথায় থাকে? "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই বাক্য অব্যর্থ। আত্মীয় পরিবার, টাকা পয়সা যেমন আছে থাকুক, কেবল উহাদের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা বদলাইতে হইবে। উহারা আমাদের নয়, উহারা আমার নয়, উহারা ঈশ্বরের, আমিও তাঁহারই। আমার বলিতে এই জগতে কিছুই নাই, তবে আর আমার কিসের ভয় থাকিতে পারে? সেইজন্যই উপনিষদকার বলিয়াছেন, "ত্যাগ করিয়াই ভোগ কর"। এই ভাবনা দ্বারা আমরা কোন কিছুর মালিক না হইয়া কেবল রক্ষক হইয়া পড়ি। যাঁহার জন্য রক্ষা করিতেছি. তিনিই উহা রক্ষা করার উপযুক্ত শক্তি ও সামগ্রী দিয়া দিবেন।

এইভাবে যখন আমরা স্বামিত্ব ত্যাগ করিয়া সেবক হইয়া যাই, শূন্যবৎ হইয়া যাই, তখন সহজেই সমস্ত ভয় জয় করি, সহজেই শান্তি প্রাপ্ত হই ও সত্য নারায়ণের দর্শন লাভ করি।

য়েরোড়া মন্দির

২.৯.৩০

অস্পৃশ্যতা নিবারণ

এই ব্রত অস্বাদ-ব্রতের মত যেমন নূতন তেমনি কতকটা বিচিত্রও বটে। যতই বিচিত্র হউক না কেন ইহার আবশ্যকতা অনেক বেশী। ... ... এই অস্পৃশ্যতা ধর্মের নাম লইয়া বা ধর্মের রূপ ধরিয়া যত্রতত্র বিঘ্ন ঘটাইতেছে ও ধর্মকে কলুষিত করিতেছে। যদি আত্মা এক হয়, ঈশ্বর এক হন, তবে কেহই তো অস্পৃশ্য হইতে পারে না। যেমন মুচি মেথরকে অস্পৃশ্য গণ্য করা হইলেও তাহারা অস্পৃশ্য নহে, সেই বিচারেই মৃতদেহও অস্পৃশ্য নহে, উহা সম্মানের ও করুণার পাত্র। মৃতদেহকে স্পর্শ করিয়া বা তেল মাখাইয়া অথবা সাফ করিয়া যে স্নান করা হয় তাহা কেবল স্বাস্থ্যের দৃষ্টি হইতে। যে ব্যক্তি মৃতদেহকে স্পর্শ করিয়া বা তেল মাখাইয়া স্নান করে না, তাহাকে অপরিচ্ছন্ন বলা যাইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া সে পাতকী নয়। মা ছেলেপিলের মলাদি সাফ করিয়া যতক্ষণ স্নান না করে বা হাত-পা না ধোয় ততক্ষণ অস্পৃশ্য থাকে, কিন্তু ছেলে যদি খেলা করিতে করিতে আসিয়া মাকে ছোঁয় তবে সে অস্পৃশ্য হয় না, অথবা তাহার আত্মা মলিন হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে মুচি মেথর ইত্যাদি গ্লানিকর নামে পরিচিত করা হয়, তাহারা তো জন্ম হইতেই অস্পৃশ্য। সে বৎসরের পর বৎসর শত শত সাবান দিয়া শরীর সাফই করুক, বৈষ্ণবের পোষাকই পরুক, মালাকণ্ঠি ধারণই করুক অথবা রোজ গীতাপাঠই করুক কিম্বা লেখকের ব্যবসাই নিক, সে অস্পৃশ্যই থাকিয়া যায়। ইহাকে যিনি ধর্ম বলিয়া মনে করেন বা আচরণ করেন তিনি ধর্ম-বিশ্বাসী নন। এইরূপ বিশ্বাস ত্যাগ করার যোগ্য। আমরা অস্পৃশ্যতা নিবারণ ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া এই কথা মানিতেছি যে, অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে, অধিকন্তু ইহা হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট পচনশীল পদার্থ, ইহা একটা ভ্রম বা পাপ এবং ইহা দূর করা প্রত্যেক হিন্দুর ধর্ম ও পরম কর্তব্য। প্রত্যেক হিন্দুরই উহা পাপ মনে করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। যে সকল হিন্দু ধর্মের মর্ম বুঝেন অন্ততঃ তাঁহাদের কর্তব্য প্রত্যেক অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য ভাই-ভগ্নীকে আপনার করিয়া লওয়া, তাহাদিগকে আদরপূর্বক সেবাভাব হইতে স্পর্শ করা, স্পর্শ করিয়া নিজে পবিত্র হইলাম মনে করা ও তাহাদের দুঃখ দূর করা। বহুকাল যাবৎ আমরা যে তাহাদিগকে আবর্জনার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছি তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে যে অজ্ঞানাদি

দোষ প্রবেশ করিয়াছে তাহা ধৈর্যের সহিত দূর করা, তাহাদিগকে সাহায্য করা এবং অন্যান্য হিন্দুদের ঐরূপ করিতে অনুরোধ করা, অনুপ্রাণিত করা।

এই দিক দিয়া দেখিলে অস্পৃশ্যদিগকে অস্পৃশ্যতামুক্ত করার যে ঐহিক বা রাজনৈতিক লাভ আছে তাহাকে ব্রতধারী তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। উক্ত প্রকার ফল লাভ হউক আর নাই হউক অস্পৃশ্যতা নিবারণকে ব্রতরূপে আচরণীয় ধর্ম মনে করিয়া অস্পৃশ্যদিগকে আপনজন করিয়া লওয়া ব্রতধারীর কাজ। সত্যাদি ব্রত যখন আমরা পালন করি তখন তাহার ঐহিক লাভ কি হয় তাহা দেখি না। সত্যাচরণ যুক্তি করিয়া করি না, উহা স্বভাব এবং দেহের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা বস্তু বলিয়াই লই, অস্পৃশ্যতা নিবারণও ব্রতধারীর কাছে তেমনি বস্তু। এই অস্পৃশ্যতার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলে দেখিব যে, এই পচন কেবল যে মুচি মেথর বলিয়া যাহারা গণ্য তাঁহাদের সম্পর্কেই প্রবেশ করিয়াছে তাহা নহে। পচনের ধর্মই হইতেছে, প্রথমে উহা সরিষার দানার মত ছোট থাকে, পরে পর্বতপ্রমাণ হয় এবং যাহার মধ্যে প্রবেশ করে তাহাকে ধ্বংস করিয়া ছাড়ে। অস্পৃশ্যতাও তেমনি। এই অস্পৃশ্যভাব বিধর্মীদের প্রতি আসে, অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি আসে, একই সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া যায়। ইহা এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, কতজন তো অস্পৃশ্যতাকে পালন করিতে করিতে পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে, নিজেকেই সম্বরণ করিয়া, সেবাযত্ন করিয়া, ধুইয়া পুছিয়া পানাহার করাইয়া, অবকাশ পায় না। ঈশ্বরের নামে ঈশ্বরকে ভুলিয়া নিজেকেই পূজা করিতে লাগিয়া যায়। সেইজন্য যাহারা অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-ব্রত পালন করিতে চায়, তাহারা কেবল মেথর ও চণ্ডালকেই আপনার করিয়া লইয়াই সন্তুষ্ট হইবে না। যে পর্যন্ত প্রাণীমাত্রকেই নিজের মধ্যে আছে বলিয়া অনুভব না করিতেছ ও নিজেকে যতক্ষণ না জীবমাত্রের মধ্যেই সমর্পণ করিয়া দিতেছ, ততক্ষণ শান্তি পাইবে না। অস্পৃশ্যতা নিবারণ করিবে—মানে, জগতের সহিত মৈত্রী রক্ষা করিবে, জগতের সেবক হইবে। এই দিক দিয়া দেখিলে অস্পৃশ্যতা নিবারণ অহিংসার সহিত অভিন্ন হইয়া যায় এবং বস্তুতঃপক্ষে উহা তাহাই বটে। অহিংসা মানে জীবমাত্রের প্রতি পরিপূর্ণ প্রেম। অস্পৃশ্যতা নিবারণেরও ইহাই অর্থ। জীবমাত্রের মধ্য হইতে ভেদ লোপ করাই অস্পৃশ্যতা নিবারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এইভাবে অস্পৃশ্যতাকে দেখিলে এই দোষ জগতের সর্বত্রই অল্পবিস্তর

ব্যাপ্ত রহিয়াছে দেখা যায়। এখানে আমরা অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুধর্মের গলদরূপেই বিচার করিয়াছি, কেননা সেখানে উহা ধর্মের স্থান কাড়িয়া লইয়াছে, ধর্মের নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের অবস্থা ক্রীতদাসের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে।

য়েরোড়া মন্দির

৯.৯.৩০

কায়িক শ্রম

আমি টলস্টয়ের একটা প্রবন্ধ পাঠ করি। উহাই প্রথম আমাকে যথার্থভাবে জানাইয়া দেয় যে, নিজ হাতে কাজ করা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য এত। স্পষ্ট করিয়া একথা জানার পূর্বেও রাস্কিনের "আনটু দিস্ লাস্ট" বইখানা পড়িয়া উহা কার্যতঃ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইংরাজীতে 'ব্রেড লেবার' শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপ গুজরাটীতে "জাত-মেহনৎ" শব্দটা ব্যবহার করিতেছি। 'ব্রেড লেবার' শব্দের আক্ষরিক তরজমা 'রুটির জন্য মজুরি'। নিজের পেটের অন্নের জন্য যে প্রত্যেক মানুষেরই মজুরি করা উচিত, শরীরকে খাটাইয়া খাটাইয়া ক্লিষ্ট করা উচিত, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম—এ কথাটা টলস্টয়ের নিজের নহে, একজন খুব অপরিচিত রাশিয়ান লেখক বুর্নোর। টলস্টয় তাঁহাকে প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং নিজের করিয়া লইয়াছেন।

আমি এই কথা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি অযজ্ঞ, তাহার উপর এই কঠিন শাপ দেওয়া হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি যজ্ঞ না করিয়া খায়, সে চুরির অন্ন খায়"। এখানে যজ্ঞের অর্থ আমি মনে করি কায়িক শ্রম, অথবা রুটির জন্য মজুরি করা। সে যাহাই হউক, আমাদের এই ব্রতের উৎপত্তি এখানেই। বুদ্ধিও আমাদিগকে এই কথা বলিয়া দেয়—মজুরি না করিয়া খাওয়ার অধিকারটা কি? বাইবেল বলে—"মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উদরান্নের সংস্থান কর"। যে কোটিপতি সে যদি শুধু খাটের উপরেই গড়াগড়ি করে, মুখে খাদ্য তুলিয়া দিলে তবে খায়, তাহা হইলে দীর্ঘ দিন আর সে খাইতে পারে না, সে তাহাতে তখন রস পায় না। সেইজন্যই সে ব্যায়ামাদি করিয়া ক্ষুধার উদ্রেক করে এবং নিজের হাত দিয়া খায়। ধনী নির্ধন সকলকেই যখন

কোনও না কোনও রকম অঙ্গচালনা করিতেই হয়, তখন নিজের খাদ্য উৎপাদনের জন্য সকলেই বা শ্রম করিবে না কেন? এই প্রশ্ন সহজেই আসিয়া পড়ে। চাষীকে তো হাওয়া খাইতে অথবা ব্যায়াম করিতে কেহ বলে না। দুনিয়ার কাজ চালাইতে শতকরা ৯০ জন লোকই তো কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে। বাকি দশজন আর জগতে কত সুখ, কত শান্তি, কত স্বাস্থ্য দিয়া থাকে? বুদ্ধিমান এই দশজন যদি কৃষকের সঙ্গেই থাকিত তাহা হইলে অনেক দুর্গতি সহজেই দূর হইয়া যাইত।

কায়িক শ্রমের এই সন্দেহাতীত নিয়ম যদি সকলেই মানিয়া চলে, তবে উচ্চনীচ ভেদ উঠিয়া যায়। যেখানে উচ্চনীচের কোন গন্ধও নাই, আজকাল সেখানেও উহা বর্ণ-বৈষম্যরূপে দেখা দিতেছে। মালিক-মজুরের ভেদ সর্বব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে এবং মজুর মালিককে ঈর্ষা করিতেছে। যদি সকলেই নিজের উদরান্নের জন্য পরিশ্রম করে তবে উচ্চনীচ ভেদ উঠিয়া যায়। তারপর যে ধনিকবর্গ থাকিবে তাহারা নিজেদের মালিক মনে করিবে না, নিজেদিগকে কেবল ধনের রক্ষক অথবা ট্রাস্টি মনে করিবে এবং প্রধানতঃ লোক-সেবার জন্যই তাহা ব্যবহার করিবে।

যে ব্যক্তিকে অহিংসা পালন করিতে হইবে, সত্যের আরাধনা করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্যকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার কাছে তো কায়িক শ্রম অমোঘ অস্ত্র। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, কৃষিকার্যের জন্য শ্রমই হইল উদরান্নের জন্য কায়িক শ্রম। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি এই যে, সকলেই তাহা করিতে পারে না। সেইজন্য কৃষিকার্যকে মনে মনে আদর্শ স্থির রাখিয়া লোকে তাহার পরিবর্তে অন্য কোনও উৎপাদক শ্রম করিবে, যেমন—সূতা কাটা, তাঁত বুনা, ছুতারের কাজ, কামারের কাজ ইত্যাদি। সকলকেই নিজ নিজ মেথর তো হইতেই হয়। খাইলে তো মলত্যাগ করিতেই হয়। যদি মলত্যাগ করিতেই হয় তবে নিজের মল নিজেই সাফ করা—ইহাই তো উত্তম রীতি। যেখানে ইহা সম্ভব হয় না সেখানে এক পরিবার মিলিয়া নিজেদের এই কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে। যেখানেই মেথর বলিয়া একটা ভিন্ন বৃত্তির কল্পনা করা হইয়াছে সেইখানেই কতকগুলি মহাদোষ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া কয়েক বৎসর যাবৎ আমার মনে হইতেছে। এই আবশ্যক স্বাস্থ্য-রক্ষার কার্যকে কে প্রথম সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ স্থান দিয়াছিল তাহার ইতিহাস আমাদের জানা নাই। যে করিয়াছিল সে আমাদের উপকার করিয়া যায় নাই।

বাল্যকাল হইতেই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এই ভাবনা দৃঢ় করা চাই যে, আমরা সকলেই মেথর। আর এই ভাবনা দৃঢ় করার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে এই, যে-ব্যক্তি ইহা বুঝিয়াছে, সে পায়খানা সাফ করা দ্বারাই কায়িক শ্রমের কার্য আরম্ভ করিবে। যদি জ্ঞানতঃ ইহা করা যায় তবে সে তৎক্ষণাৎ ধর্মকে ভিন্নভাবে ও ঠিকভাবে বুঝিতে পারিবে। বালক বৃদ্ধ অথবা রোগে যাহারা আতুর তাহারা যদি কায়িক শ্রম না করে তবে তাহা দূষণীয় নয়। বালক তো তাহার মায়ের সামিল হইয়া থাকে। আর যদি নিয়ম ভঙ্গ না করা হয়, তবে বৃদ্ধ ও আতুর তো থাকতেই পারে না, রোগীই বা তবে থাকে কোথা হইতে?

য়েরোড়া মন্দির

১৬. ৯. ৩০

সর্বধর্ম সমভাব—১

আমাদের ব্রতগুলির মধ্যে যাহার নাম সহিষ্ণুতা ছিল তাহারই এই নূতন নাম দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজী 'টলারেশন' শব্দের অনুবাদ হইল সহিষ্ণুতা। উহা আমার পছন্দ নয়, কিন্তু অন্য প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাই নাই। কাকা সাহেবেরও* ঐ নামটা পছন্দ হয় নাই; তিনি 'সর্বধর্ম আদর' নামটা প্রস্তাব করেন। ইহাও ভাল লাগে না। অন্য ধর্ম সহ্য করার মধ্যে উহার দ্বারা একটা লঘুত্ব যেন মানিয়া লওয়া হয়। 'আদরের' মধ্যে অনুগ্রহের ভাব থাকে। অহিংসা আমাদিগকে অন্যের ধর্মের প্রতি সমভাব দেখাইতে শিক্ষা দেয়। 'আদর' অথবা 'সহিষ্ণুতা' শব্দ অহিংসার দৃষ্টিতে উপযুক্ত হয় না। অপর ধর্মের প্রতি সমভাব রক্ষার মধ্যে নিজ ধর্মের অপূর্ণতার স্বীকৃতি রহিয়াছে। ইহাতেই সত্যের আরাধনা। অহিংসার কষ্টিপাথরও এই শিক্ষা দেয়। যদি সম্পূর্ণ সত্যই আমরা দেখিতে পাই তবে আর তাহার পর সত্যের আগ্রহ বলিয়া কি থাকে, নিজেই তো পরমেশ্বর হইয়া যাইব; কেননা আমরা জানিয়াছি যে, সত্যই পরমেশ্বর। আমরা পূর্ণ সত্য দেখিতে পাই না বলিয়াই সত্যের আগ্রহ রাখি, আর সেইজন্যই পুরুষার্থের অবকাশ থাকিয়া যায়। ইহাতে আমাদের অপূর্ণতার স্বীকৃতি রহিয়াছে। যদি আমরা অপূর্ণ হই তবে আমাদের কল্পিত ধর্মও অপূর্ণ। ধর্ম নিজে নিজে পূর্ণ কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পারি না—যেমন আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না।

*গান্ধীজীর সহকর্মী কাকাসাহেব কালেলকর।

আমরা যে ধর্ম মানি তাহা অপূর্ণ এবং তাহাতে নিত্যই পরিবর্তন হইতেছে, হওয়ার প্রয়োজনও আছে। এই অবস্থায় আমরা উত্তরোত্তর উপরে উঠিতে পারি; সত্যের দিকে, ঈশ্বরের দিকে প্রতিদিনই অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি। আবার যদি আমরা মনুষ্য-কল্পিত সকল ধর্মই অপূর্ণ বলিয়া মানি তবে তাহার মধ্যে উচ্চনীচ মানিবার হেতু থাকে না। সকলই সত্য কিন্তু সকলই অপূর্ণ, সেইজন্য দোষের পাত্র। সমভাব থাকিলেও আমরা তাহার মধ্যে দোষ দেখিতে পারি, নিজের ধর্মেও দোষ দেখিয়া থাকি। এই দোষের জন্য তাহা ত্যাগ করি না, দোষ দূর করি। এইভাবে সমভাব বজায় রাখিয়া যদি অপর ধর্মের কিছু গ্রহণযোগ্য থাকে তবে নিজ ধর্মে তাহার স্থান দিতে সংকোচ আসে না, উপরন্তু তাহাতেই ধর্ম লাভ করা যায়।

তখন প্রশ্ন এই আসে যে, অনেক ধর্মের প্রয়োজন কোথায়? অনেক ধর্ম আছে, তাহা আমরা জানি। আত্মা এক, কিন্তু মনুষ্য দেহ বহু। দেহের অসংখ্যতা দূর করা যায় না। তাহা হইলেও আত্মার একত্বের পরিচয় আমরা পাই। ধর্মের মূল এক—যেমন বৃক্ষের মূল এক, কিন্তু পাতা অসংখ্য। সকল ধর্মই ঈশ্বর প্রদত্ত; কিন্তু তাহা মনুষ্য-কল্পিত ও মনুষ্য-প্রচারিত বলিয়া অপূর্ণ। ঈশ্বরদত্ত ধর্ম মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। ভাষায় মানুষ সেই কথা প্রকাশ করে, তাহার অর্থও মানুষ করে, কিন্তু কোন্ অর্থ সত্য? সকলই নিজ নিজ দৃষ্টিতে। দৃষ্টি যতদূর পৌঁছে সেই পর্যন্ত খাঁটি। সেইজন্যই আমরা সকল ধর্মের প্রতিই সমভাব রাখিব। ইহাতে নিজের ধর্মের প্রতি উদাসীনতা নাই, বরঞ্চ নিজের ধর্মের প্রতি আকর্ষণটা অন্ধ আকর্ষণ না হইয়া জ্ঞানময় হয় এবং সেইহেতু অধিক সাত্ত্বিক ও নির্মল হয়। যদি সকল ধর্মের প্রতি সমভাব আসে তবে আমাদের দিব্যচক্ষু খুলিয়া যাইবে। ধর্মান্ধতা ও দিব্য-দর্শন এই দুইয়ের মধ্যে উত্তর দক্ষিণের ন্যায় ব্যবধান রহিয়াছে। ধর্মজ্ঞানে অন্তরায় দূর হয় ও সমভাব উপস্থিত হয়। এই সমভাব শিক্ষার দ্বারা আমরা আমাদের নিজ ধর্মের অধিকতর পরিচয় পাই।

ইহাতে ধর্ম ও অধর্মের ভেদ উঠাইয়া দেওয়া হইল না। এখানে ধর্ম বলিয়া আমরা যাহা জানি তাহারই কথা হইতেছে। এই সকল ধর্মের মধ্যে মূল সিদ্ধান্ত একই রহিয়াছে। সকল ধর্মেই সাধু স্ত্রীপুরুষের উদ্ভব হইয়াছে, আজও হইতেছে। আবার ধর্মের প্রতি সমভাবে এবং ধর্মীর প্রতি সমভাবে প্রভেদ আছে। মনুষ্যমাত্রের প্রতি—দুষ্ট মনুষ্য ও শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের

প্রতি সমভাব রাখিতে হইবে, কিন্তু দুষ্ট ধর্ম ও অধর্মের প্রতি কদাচ নহে। এ বিষয়ে বিচার হয়ত আরও করিতে হইবে, যদি সহজে না বুঝিতে পার তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও।

যেরোড়া মন্দির

২৩.৯.৩০

সর্বধর্ম সমভাব—২

বিষয়টা প্রয়োজনীয় বলিয়া এখানে একটু বেশী করিয়াই বলিব। আমার কতকগুলি অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি তবে 'সমভাবের' অর্থ আরও স্পষ্ট হইবে। এখানকার মত ফিনিক্স-এও প্রতিদিন প্রার্থনা হইত। সেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান প্রভৃতি ছিল। স্বর্গত রোস্তমজী শেঠ, অথবা তাঁহার ছেলে অনেক সময় উপস্থিত থাকিতেন। "মনে ওহালু ওহালু দাদা রামজীনু নাম" এই গানটা শেঠ রোস্তমজীর বড়ই ভাল লাগিত। আমার স্মরণ হয় একসময় ইহাতে মগনলাল, কি কাশী, কি অন্য সকলে শঙ্কিত হইয়া পড়ে। রোস্তমজী শেঠ উল্লাসে বলিয়া উঠেন—" 'দাদা রামজীনের' বদলে 'দাদা হোরমজ্‌দজী' গাও না।" যাহারা শঙ্কিত ছিল আর যাহারা গাহিতেছিল, তাহারা এই কথা খুব স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করিল। তারপর হইতেই শেঠ রোস্তমজী উপস্থিত হইলে কয়েকবার করিয়া 'দাদা হোরমজ্‌দজীর' নাম অবশ্যই গাওয়া হইত। স্বর্গত দাউদ শেঠের ছেলে স্বর্গত হুসেনও অনেক সময় আশ্রমে থাকিত ও উৎসাহের সহিত প্রার্থনায় যোগ দিত। সে নিজে বড় মিষ্ট স্বরে অর্গ্যান সহযোগে "য়ে বহারে বাগ দুনিয়া চন্দ রোজ" গাহিত। আমাদের সকলকে সে এই ভজন শিখাইয়া দিয়াছিল ও প্রার্থনায় ইহা অনেকবার গান করা হইত। আমাদের এখানকার প্রার্থনামালায় ইহার স্থান রহিয়া গিয়াছে। উহা সত্যপ্রিয় হুসেনের স্মৃতি। হুসেন অপেক্ষা অধিক সত্য-আচরণকারী যুবক আমি দেখি নাই। জোসেফ রায়পণ প্রায়ই আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। তিনি খ্রীস্টান ছিলেন। তাঁহার কাছে বৈষ্ণব ভজন খুব ভাল লাগিত। তিনি ভাল সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। তিনি 'বৈষ্ণব জন'-এর স্থানে জন তো তেনে কহিয়ে" এই প্রকার বদলাইয়া লইলেন। সকলে

তখনই উহা গ্রহণ করিল। আমি দেখিতে পাইলাম জোসেফের অপার আনন্দ হইয়াছে।

আত্ম-সন্তোষের জন্য যখন আমি বিভিন্ন ধর্মপুস্তকগুলি পড়িয়া দেখিতেছিলাম, তখন খ্রীষ্ট, ইসলাম, জোরস্ত্রী, ইহুদী ও হিন্দু ধর্মের পুস্তকের সহিত আমার সন্তোষজনক পরিচয় হয়। উহাতে আমার এই সকল ধর্মের প্রতি সমভাব উপস্থিত হয়, একথা বলিতে পারি। আমি ইহা বলিতেছি না যে, ঐ সময় আমার এই জ্ঞান ছিল। তখন সমভাব শব্দের সহিত আমার পুরা পরিচয়ও হয় নাই। কিন্তু তখনকার স্মৃতি যদি এখন আবার নূতন করিয়া ভাবি তাহা হইলে মনে হয় ঐ সকল ধর্মের সমালোচনা করার ইচ্ছা ছিল বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। বরঞ্চ ঐ সকল গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থ বলিয়া সবই শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়িতাম এবং উহাদের সকলের ভিতরেই মূল নৈতিক সিদ্ধান্ত একই প্রকারের দেখিতে পাইতাম। কোন কোন জিনিস আমি বুঝিতে পারিতাম না। আজও কতক বুঝিতে পারি না। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে আমি একথা জানিয়াছি যে, আমরা যাহা বুঝিতে পারি না তাহাই যে খারাপ এ ধারণা করা ভুল। যাহা পূর্বে বুঝিতে পারি নাই এমন কোন কোন জিনিস আজ দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হইয়াছে। সমভাব শিক্ষা করার ফলে অনেক রহস্য নিজে নিজেই সাফ হইয়া গিয়াছে। যেখানে নিজেদের দোষ ধরা পড়িয়াছে সেখানে সেগুলি দেখাইতে যে নম্রতা ও বিবেকের প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাতে কাহারও দুঃখ হয় না।

একটা অস্বস্তি হয়ত রহিয়া গিয়াছে। গতবারে আমি জানাইয়াছি যে, ধর্মে ও অধর্মে ভেদ আছে এবং অধর্মের প্রতি সমভাব রক্ষার শিক্ষা দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নহে। তাহাই যদি হয় তবে ধর্মাধর্ম নির্ণয় করিতে গিয়া কি সমভাবের শিকল ছিঁড়িয়া যাইবে না? এই প্রকার প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং উহা নির্ণয় করিতে ভুলও হইতে পারে। কিন্তু যদি আমাদের ভিতর অহিংসা বর্তমান থাকে তবে আমরা বৈরভাব হইতে বাঁচিয়া যাইব। কেননা অধর্ম জানিলেও যাহারা সে অধর্ম আচরণ করিবে তাহাদের প্রতি আমাদের প্রেমভাবই থাকিয়া যাইবে। আর তাহা হইলে কিছুই আসিয়া যাইবে না। যদি সে আমাদের দৃষ্টিকোণ স্বীকার করে অথবা আমাদের ভুল আমাদিগকে দেখাইয়া দেয় অথবা উভয়ের মতভেদ হয় তবে তাহা সহ্য করিবে। শেষকালে যদি প্রতিপক্ষ অহিংস না হয় তবে কঠোরতর ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু আমরা

যদি অহিংসার পূজারী হই তবে আমাদের সহনশীলতা কঠোরতাকে জয় করিবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অপরের ভুলের জন্য তাহাদিগকে আমাদের পীড়া দেওয়া উচিত নয়। নিজেদেরই পীড়িত করিতে হয়—ইহাই স্বর্ণ নিয়ম এবং ইহার দ্বারাই সমস্ত সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

যেরোড়া মন্দির।

৩০.৯.৩০

নম্রতা

ব্রতের মধ্যে ইহার পৃথক স্থান নাই, থাকিতেও পারে না। ইহা অহিংসার সমার্থক অথবা বলিতে পার ইহা অহিংসার মধ্যেই রহিয়াছে। নম্রতা শিক্ষা দ্বারা লভ্য নহে। উহা স্বভাবগত হওয়া চাই। যখন আশ্রমের নিয়মাবলীর মুসাবিদা করিয়া প্রথম মিত্রবর্গের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নম্রতাকে ব্রতের মধ্যে স্থান দেওয়ার জন্য জানাইয়াছিলেন। তখন, ইহাকে ব্রত বলিয়া গণ্য না করার যে কারণ তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম এখানে তাহাই লিখিব। কিন্তু উহা ব্রত না হইলেও ব্রত অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, ব্রতের সমান প্রয়োজনীয় তো বটেই। আবার নম্রতা অভ্যাস দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ার বস্তু নহে। সত্য শিক্ষণীয়, দয়া শিক্ষণীয়। কিন্তু নম্রতা শিক্ষা করা মানে, দম্ভ শিক্ষা করা—একথা বলা যায়।

এখানে নম্রতা বলিতে বড়রা একে অন্যের সম্মানের জন্য যাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা বুঝাইতেছে না। কেহ হয়ত কাহাকেও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াও তাহার প্রতি তিরস্কারের ভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইহা নম্রতা নয়, অসচ্চরিত্রতা। যে রামনাম নেয়, জপ করে, মালা টপকায়, মুনির মত গিয়া সমাজে বসে অথচ মাথায় স্বার্থ ভরিয়া রাখে সে ব্যক্তি নম্র নহে, ভণ্ড। যে নম্র সে জানেও না যে, সে কখনও নম্র। আমরা সত্যাদির পরিমাপ করিতে পারি কিন্তু নম্রতার বাহ্যিক হিসাব হইতে পারে না। স্বাভাবিক নম্রতা গুপ্ত থাকে না। কিন্তু মানুষ নিজে তাহা দেখিতে পায় না। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের ঘটনা তো আমরা আশ্রমে অনেকবার বুঝিয়া লইয়াছি। আমরা নম্রতাকে শূন্যতার মতোও দেখিতে পারি।

'আমি একটা কিছু' এই যে ভূত, ইহা মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিলে আমাদের সমস্ত ব্রতই ধূলিসাৎ হইয়া যায়। যাহারা ব্রত পালন করে তাহারা যদি পালনের গর্ব মনে রাখে তবে ব্রতের মূল্য খোয়াইয়া ফেলে, উপরন্তু সমাজে তাহা বিষের ন্যায় হইয়া পড়ে। সমাজে তাহাদের ব্রতের কোনও মূল্য দেয় না এবং তাহারা নিজেরাও সে ব্রতের ফল ভোগ করিতে পারে না। নম্রতা মানে অহং ভাবের একেবারে ক্ষয়। বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই জগতে জীবমাত্রই এক রজঃকণা অপেক্ষা অধিক কিছু নয়। শরীর ক্ষীণজীবী। অনন্ত কালচক্রে শত বৎসরের পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু যে এই চক্রনেমী হইতে বাহির হইয়া যায় অর্থাৎ 'কিছুই না' হইয়া যায়, সে-ই সম্পূর্ণ-রূপে থাকিয়া যায়। 'কিছু হওয়া' মানে, ঈশ্বর হইতে, পরমাত্মা হইতে, সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়া। 'কিছু-পনা' শেষ করিয়া দেওয়া মানে পরমাত্মায় মিশিয়া যাওয়া।

সমুদ্রের মধ্যে যে জল-বিন্দু রহিয়াছে উহা সমুদ্রেরই অঙ্গীভূত হইয়া সাগরের গৌরব অর্জন করে; কিন্তু উহার সে বোধ নাই। বিন্দু যখন সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও নিজত্ব দাবি করে তদ্দণ্ডেই উহা শুকাইয়া যায়। এই জীবনের সহিত আমি যে জল-বিন্দুর উপমা দিতেছি তাহাতে আদৌ অতিশয়োক্তি নাই। এই প্রকার নম্রতা চেষ্টা দ্বারা কোথা হইতে আসিবে? জীবনের ব্রতগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা যায়, তবে নম্রতা আপনা-আপনি আসিতে থাকে।

যে সত্য পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে অহংকারী কি করিয়া হইতে পারে? যে অপরের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিবে সে নিজের জন্য কোন স্থান আটকাইয়া রাখিতে পারে কি? যখন প্রাণ সমর্পণ করা স্থির করিয়াছে তখনই সে তো দেহটাকে ফেলিয়া দিয়াছে। এই নম্রতা আবার যেন পুরুষার্থশূন্য না হয়। এমন অর্থ হিন্দুধর্ম করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাতে আলস্য, ভণ্ডামি প্রভৃতি অনেক জায়গায় স্থান পাইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে নম্রতা তীব্রতম পুরুষার্থ। কিন্তু সে পুরুষার্থ সম্পূর্ণই পরমার্থ লাভের জন্য হয়। ঈশ্বর নিজে ২৪ ঘণ্টা এক নিঃশ্বাসে কর্ম করিতেছেন, একটু আড়মোড়া ভাঙ্গার অবকাশও তাঁহার নাই। তাঁহাতেই মিশিয়া যাওয়া, তাঁহাতেই মিলিয়া যাওয়া মানে নিজের কর্মপ্রচেষ্টা তাঁহারই ন্যায় অতন্দ্রিত করা। তাহাই করিয়া ফেলা চাই।

সমুদ্র হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে যে বিন্দু তাহার আরামের কল্পনা করিতে

পার কিন্তু যে বিন্দু সমুদ্রে রহিয়া গিয়াছে তাহার আরাম কোথায়? সমুদ্রের কি এক মুহূর্তও আরাম আছে? আমরাও ঠিক তেমনি ধারার। ঈশ্বররূপী সমুদ্রে যদি মিলিয়া যাই তবে আমাদের আরাম গেল, আরামের আবশ্যকতাও গেল। ইহাই বাস্তবিক আরাম, ইহাই মহা অশান্তিতে শান্তি। সেইজন্য শুদ্ধ নম্রতা কেবল জীবমাত্রের সেবার জন্য সর্বার্পণের আশা রাখে। যাহার সব দিনই ছুটি, তাহার কাছে না আছে রবিবার, কি শুক্রবার, কি সোমবার। এই অবস্থার বর্ণনা করা মুশকিল, ইহা অনুভব করার বিষয়। যে সর্বার্পণ করিয়াছে সে-ই এই অনুভূতি পরায়ণ। আমরা সকলেই এই অনুভব লাভ করিতে পারি, সেই অনুভব লাভের ইচ্ছাতেই আশ্রমে মিলিত হইয়াছি। সকল ব্রত, সকল প্রবৃত্তি সেই এক অনুভবের জন্য। এক দুই তিন—এমনি গণিতে গণিতে এক দিন উহা আমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। ইহা খুঁজিয়া পাওয়ার জিনিস নয়।

ব্রতের আবশ্যকতা

ব্রতের মহত্ত্ব সম্বন্ধে এক আধটুকু এই লেখা-মালায় লিখিয়াছি কিন্তু জীবনকে সুগঠিত করার জন্য ব্রতের আবশ্যকতা কতটা তাহা বিচার করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। স্বদেশী ব্যতীত আমাদের অন্য ব্রতগুলি সম্বন্ধে লেখা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ব্রতের আবশ্যকতা বিষয়ে বিচার করিব। এমন এক সম্প্রদায় আছেন, আর সে সম্প্রদায় বেশ প্রবল, যাঁহারা বলেন, "অমুক নিয়ম পালন করা উচিত, কিন্তু সে সম্বন্ধে ব্রত লওয়ার আবশ্যকতা নাই, বরঞ্চ উহাতে মনের দুর্বলতাই সূচিত করে এবং ক্ষতি হয়। ব্রত লওয়ার পর নিয়ম পালনে যদি অসুবিধা হয়, অথবা নিয়ম পালন করা পাপ বলিয়া মনে হয়, তখনও যে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে ইহা অসহ্য।" তাঁহারা বলেন—"উদাহরণ হিসাবে মদ না খাওয়া ভাল, কিন্তু যদি দুই একবার খাওয়া যায় তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? ঔষধ বলিয়া প্রয়োজন হইলে তো খাওয়াই দরকার। সুতরাং এই যে মদ না খাওয়ার ব্রত, ইহা তো গলায় একটা শিকল পরার সমান। মদের বেলায় যেমন অন্য বিষয়েও ঠিক তেমনি, আর ভালোর জন্য অসত্যই বা কেন না বলিব?"

কিন্তু এই সকল যুক্তির কোন ভিত্তি নাই। ব্রত মানে অটল সংকল্প। অসুবিধা উল্লঙ্ঘন করার জন্যই ব্রতসমূহের আবশ্যকতা। অসুবিধা হইলেও যাহা ভাঙ্গা যায় না তাহাই অটল সংকল্প। সারা জগত এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, এই প্রকার সংকল্প ব্যতীত মানুষ কিছুতেই উন্নত হইতে পারে না। যাহা অন্যায় যাহা পাপময় তাহা করার দৃঢ় সংকল্পকে ব্রত বলা যায় না। উহা রাক্ষসী বৃত্তি। যদি কোনও সংকল্প পাপময় বলিয়া জানা যায়, পাপময় বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে উহা ত্যাগ করাই ধর্ম। ঐ প্রকার বিষয়ে কেহ ব্রত গ্রহণ করে না, গ্রহণ করা উচিতও নয়। যাহা সর্বমান্য ধর্ম বলিয়া গণ্য অথচ যাহা আচরণ করার অভ্যাস আমাদের গড়িয়া উঠে নাই, সে বিষয়েই ব্রত লওয়া চলে। উপরের দৃষ্টান্তে পাপের আভাস রহিয়াছে। "সত্য বলিলে কাহারও হানি হইতে পারে"—সত্যবাদী এ প্রকার চিন্তা করিতে বসে না। সত্যবাদী বিশ্বাস করে যে, সত্য দ্বারা কাহারও ক্ষতি হয় না, হইতে পারে না। তেমনি মদ্যপান সম্বন্ধেও বলা যায়—ঔষধ হিসাবে ইহার ব্যবহারে বাধা দেওয়া হউক আর নাই হউক, এই ব্রতের সংকল্প শরীরকে বিপন্মুক্ত রাখার ইচ্ছার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ঔষধ হিসাবেও যদি মদ না খাওয়ায় দেহ নষ্ট হয়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? মদ খাইলেই যে দেহ থাকিবে এমন পাট্টা কে লিখিয়া দিতে পারে? তখন যদি দেহ টিকিয়া পরক্ষণেই অন্য কারণে নষ্ট হয় তবে তাহার দায়িত্বই বা কে লইতে পারে? আবার বিপরীত দিকে, যাহারা মদ খাওয়ার বদ অভ্যাসে পড়িয়া গিয়াছে তাহাদের উপরে মরিয়া গেলেও মদ না খাওয়ার দৃষ্টান্তের চমৎকার প্রভাব দেখা যায়। উহাতে জগতেরই না কত উপকার হয়! দেহ যাক বা থাক, আমার ধর্ম পালন করিতেই হইবে—এই প্রকারের সাধু সংকল্প যে রাখে, সে কোন না কোন দিন ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারে।

ব্রত লওয়া দুর্বলতার পরিচয় নহে, উহা বলেরই সূচনা করে। কোন একটা কাজ করা যদি উচিত মনে হয় তবে তাহা করাই চাই, ইহারই নাম ব্রত, আর ইহাতেই শক্তি আছে। ইহাকে ব্রত নাম না দিয়া অন্য কোন নাম দিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু 'যতটা পারি করিব' একথা যে বলে, সে নিজের দুর্বলতার অথবা অহঙ্কারের পরিচয় দেয়। সে ইহাকে যদি নম্রতার নামে চালাইতে চায় তো চালাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে নম্রতার গন্ধ পর্যন্ত নাই। শুভ সংকল্প সম্বন্ধে—'যতটা পারি করিব' এই রকম বাক্য বিষবৎ, ইহা আমি নিজের জীবনে

ও অনেকের জীবনে দেখিয়াছি। 'যতটা পারি সত্য পালন করিব' এমন বাক্যের কোন মানে হয় না। ব্যবসার ভিতর কখনও এমন হুণ্ডি চলে না যে, 'যদি পারি তবে অমুক তারিখে এত টাকা দিব'। তেমনি 'যতটা সম্ভব সত্য পালন করিব' এই প্রকার হুণ্ডি ঈশ্বরের দোকানে ভাঙ্গানো যায় না।

ঈশ্বর নিজেই নিশ্চয় সংকল্প-স্বরূপ এবং মূর্তিমান ব্রত। তাঁহার নিয়মের যদি একচুলও পরিবর্তন হয়, তবে ঈশ্বরত্ব শেষ হইয়া যাইবে। সূর্য মহাব্রতধারী সেইজন্য জগতে কাল সৃষ্টি হইয়াছে ও শুদ্ধ পঞ্জিকা তৈয়ারী হইতে পারিতেছে। সূর্য প্রতিদিন উঠিতেছে। সে প্রতিজ্ঞা লইয়া রাখিয়াছে যে প্রতিদিন উঠিবে। এবং সেইজন্যই আমরা নিজেদিগকে সুরক্ষিত মনে করি।

ব্যবসা মাত্রই সংকল্প স্থির রাখার আশ্রয় অবলম্বনে চলিতেছে। ব্যবসায়ীরা যদি একে অপরের সহিত কথা ঠিক না রাখে তবে ব্যবসা চলে না। এই ভাবে ব্রত যে সর্বব্যাপক জিনিস তাহা আমরা দেখিতে পাই। অতএব যখন আমাদের নিজেদের জীবন নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার প্রশ্ন উঠে, ঈশ্বর দর্শন করার প্রশ্ন উঠে তখন ব্রত না লইলে চলিবে কি করিয়া? ব্রতের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা যেন কখনও মনে সন্দেহ না রাখি।

স্বদেশী

এই প্রকরণে স্বদেশী সম্বন্ধে লেখা বর্জন করিলাম। রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু না লেখার সংকল্প আছে, ইহাতে সে সংকল্পে আঘাত লাগিতে পারে বলিয়া বোধ হয়। স্বদেশীর কেবল ধার্মিক দিকটা লিখিতে গেলেও এমন কিছু লিখিতে হয়, যাহা রাজনীতির সহিত নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত।*

আশ্রম বিধি-পালনে স্বদেশী

আশ্রমে আমরা মনে করি যে, স্বদেশী সর্বদেশের ও সর্বকালের নিয়ম। মানুষের প্রথম কর্তব্য হইল তাহার প্রতিবেশীর সম্বন্ধে। ইহাতে বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ বা স্বদেশবাসীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বুঝায় না। আমাদের সেবা করার শক্তির

* জেলের বাহিরে আসিয়া গান্ধীজী পরবর্তী সময়ে আশ্রমবাসীদের নিকট "স্বদেশী ব্রত" সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যাহা আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার কতকাংশ সংক্ষেপে এখানে সন্নিবেশিত হইল। স্বদেশী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা তাঁহার "স্বদেশী" নামক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। গান্ধী-রচনাসম্ভার ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

স্বভাবতঃই একটা সীমা আছে। প্রতিবেশীর সেবা করিতেও আমাদের কিছু প্রয়াস করিতে হয়। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি প্রতিবেশীর প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করিত তবে পৃথিবীতে যাহাদের সাহায্য পাওয়া দরকার, তাহারা কেহই সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইত না। সেইজন্য প্রতিবেশীর সেবা করিলে বিশ্বেরও সেবা করা হয়। বস্তুত স্বদেশীতে আত্ম-পর বলিয়া ভেদ করিবার উপায় নাই। প্রতিবেশীর সেবা করা মানেই বিশ্বের সেবা করা। বস্তুত বিশ্ব-সেবার এই একমাত্র পথই আমাদের সামনে খোলা রহিয়াছে। যিনি 'বসুধৈবকুটুম্বকম্', নীতিতে বিশ্বাসী তিনিও নিজের জায়গা হইতে না নড়িয়াই বিশ্বের সেবা করিতে পারেন। কেবলমাত্র প্রতিবেশীর সেবা করিয়াই তিনি এই শক্তির পরিচালনা করিতে পারেন। টলস্টয় আরও বেশী দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে আমরা পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে চাপিয়া আছি। ঘাড় হইতে নামিয়া গেলেই অনেক উপকার করা হয়। ইহাতেও ঐ একই কথা ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে। অন্যের সেবা করিলে নিজের হিত না হইয়া যায় না। যে অন্যের সেবা না করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধন করিতে চায় সে নিজেরও ক্ষতি করে, বিশ্বেরও ক্ষতি করে। কারণটি খুব স্পষ্ট। প্রাণী মাত্রেরই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান। কাজেই যে-কোন লোকের যে-কোন কাজই বিশ্বের পক্ষে হয় হিতকর আর না হয় অহিতকর হইবে। আমাদের দৃষ্টি বেশী দূর যায় না তাই ইহা আমরা দেখিতে পাই না। পৃথিবীর উপরে কোন লোকের কোন একটি কাজের ফল নগণ্য হইতে পারে কিন্তু নগণ্য হইলেও সে ফল নিষ্ক্রিয় নয়। এই সত্যটি উপলব্ধি করিলে আমরা দায়িত্বশীল হইয়া উঠিব।

কাজেই স্বদেশীর মধ্যে বিদেশীর কোন অমঙ্গল নিহিত নাই। তবুও স্বভাবের নিয়মেই স্বদেশী সর্বব্যাপী হইতে পারে না। বিশ্বের সেবা করিতে গিয়া মানুষ বিশ্বেরও সেবা করিতে পারে না, এমন কি প্রতিবেশীরও সেবা করিতে পারে না। প্রতিবেশীর সেবা করিলে কার্যত বিশ্বেরই সেবা করা হয়। যে প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন করিয়াছে, কেবলমাত্র সে-ই বলিতে পারে— "সকলেই আমার আত্মীয়বৎ"। কিন্তু যদি কোন লোক বলে, "সকলেই আমার আত্মীয়ের মত" অথচ প্রতিবেশীকে অবহেলা করিয়া সে কেবল মাত্র আত্মতৃপ্তি-সাধন করে তবে তার জীবনধারণ তো কেবল নিজের সুখের জন্যই হইয়া থাকে।

কিছু কিছু ভাল লোক আমরা দেখি, যাঁহারা নিজের দেশ ছাড়িয়া

নানাদেশের লোকের সেবা করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহারা দোষের কিছু করেন না এবং তাঁহাদের কাজ স্বদেশীধর্মের ব্যতিক্রমও নয়। তাঁহাদের সেবা করার শক্তি যে বেশী ইহাতে কেবলমাত্র তাহাই বুঝা যায়। একজনের কাছে পাশের বাড়ির লোকই প্রতিবেশী আর একজনের কাছে তার গ্রামটাই প্রতিবেশীত্বের সীমানা। অন্য একজনের পক্ষে হয়ত এই সীমানা দশখানি গ্রাম লইয়া বিস্তৃত। প্রত্যেকেই তার শক্তি অনুযায়ী সেবা করে। সাধারণ লোক অসাধারণ কাজ করিতে পারে না। কেবলমাত্র সাধারণ লোকের কথা বিবেচনা করিয়াই সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়। মৌলিক অর্থের বিরোধী নয় এমন সকল জিনিসই এই সংজ্ঞায় পড়ে। স্বদেশীধর্ম পালন করার সময় সাধারণ লোকে মনে করে না যে, সে কাহারও সেবা করিতেছে। সে তখন কেবল প্রতিবেশী-উৎপাদকের সহিত আদান-প্রদান করেন, কেননা তাহাই তাহার পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু কখন কখন ইহা অসুবিধাজনকও হইয়া পড়িতে পারে। যে ব্যক্তি স্বদেশীকে জীবনের ধর্ম বলিয়া মনে করে, অসুবিধাজনক হইলেও সে উহা পালন করিবে। আমরা অনেকেই এখন 'ভারতে প্রস্তুত জিনিসপত্র' ভাল হয় নাই বলিয়া মনে করি এবং বিদেশী জিনিস কিনিতে প্রলুব্ধ হই। সেইজন্য একথা উল্লেখ করা দরকার যে, স্বদেশী কেবলমাত্র আমাদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপার নয়; ইহা জীবনের ধর্ম। বিদেশীকে বিদ্বেষ করিবার কোন কথা ইহাতে নাই। অন্যের অহিতের ইচ্ছা করা বা অহিত করা কখনও কাহারও কর্তব্য হইতে পারে না।

* * *

দূরের চাইতে কাছের সেবা করা ও তাহাকে কাজে লাগানোর মনোভাবের নাম স্বদেশী। এই সংজ্ঞা মানিয়া লইলে ধর্মের ক্ষেত্রে পূর্ব-পুরুষদের ধর্মেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের অতি নিকটে ধর্মের যে পরিবেশ আছে এই ভাবে তাহা আমরা কাজে লাগাইতে পারি। যদি নিজের ধর্মে কোন ত্রুটি দেখিতে পাই তাহা হইলে সেই ত্রুটি দূর করিয়া তাহার সেবা করিতে হইবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বদেশী মানে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় দোষ থাকিলেও তাহাকে মানিয়া লওয়া এবং সেই দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা করা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বদেশী মানে আমাদের কাছের প্রতিবেশীদের তৈরী জিনিসই আমরা ব্যবহার করিব এবং তাহাতে কোন খুঁৎ থাকিলে তাহা দূর করিতে সচেষ্ট হইব।

প্রধানতঃ অর্থনীতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে স্বদেশী না মানার ফলেই ভারতের জনসাধারণের এই সর্বনাশা দারিদ্র্য দেখা দিয়েছে। যদি বাহির হইতে একটিও বাণিজ্যদ্রব্য ভারতে না আনা হইত তবে এখন দেশের সর্বত্র স্বচ্ছলতা উপচাইয়া পড়িত। স্বদেশীকে আমি একটা ধার্মিক কর্তব্য বলিয়া মনে করি। সকলেরই সেই কর্তব্য পালন করা উচিত।

নীতিধর্ম

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

মূল প্রস্তাবনা

আজকাল দুনিয়ায় ভণ্ডামি বাড়িয়া গিয়াছে। যে ধর্মেরই লোক হোক না কেন, ধর্মের বাহ্যিক রূপ মাত্র বিচার করে। নিজের যথার্থ কর্তব্য ভুলিয়া যায়। অর্থ উপার্জনের প্রতি অত্যধিক আগ্রহের ফলে অপরের কি দুঃখ হইতে পারে তাহা দেখে না, অথবা দেখিয়াও তাহা গ্রাহ্য করে না। অত্যন্ত কোমল ছোট ছোট প্রাণী বধ করিয়া যে নরম মোজা প্রস্তুত হয়, তাহা ব্যবহার করিতে ইউরোপের অবলারা একটুকুও দ্বিধা করেন না। মিঃ রকফেলার পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধনী। তিনি অর্থ উপার্জন করিতে নীতির অনেক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকেন—একথা জগৎ-প্রসিদ্ধ। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকে ধর্মের বিরোধী হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, পৃথিবীতে যদি কোন ধর্ম থাকিত, তবে যে অন্যায় আচরণ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা বাড়িত না। কিন্তু এই যুক্তি ভ্রান্ত। মানুষ সর্বদাই অভ্যাস বশতঃ নিজের দোষ না দেখিয়া হাতিয়ারের দোষ দিয়া থাকে। তাহারা নিজের দোষের বিচার না করিয়া ধর্মটাই খারাপ এই প্রকার বিচার করে বলিয়া স্বচ্ছন্দে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে ও বলে। ইহা দেখিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় আজকাল অনেকে মনে করিতেছেন যে, এইভাবে সমস্ত ধর্মের নাশ হইলে পৃথিবীর মহা অকল্যাণ হইবে এবং মানুষ সৎপথ পরিত্যাগ করিবে। তাঁহারা এই ভাবনা হইতে লোককে নীতির বশে আনিবার জন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল ধর্মই যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকল ধর্মই যে নীতিশিক্ষা দিয়া থাকে, তাহাই ঐ সমিতি দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, লোকে কোনও বিশেষ ধর্ম মানুক আর নাই মানুক যদি নীতির নিয়ম পালন না করে তবে ইহলোকে অথবা পরলোকে নিজের বা অপরের কাহারও মঙ্গল করিতে পারিবে না। যাহারা ধর্ম-বিরুদ্ধ মত গ্রহণ করিয়া সকল ধর্মকেই মন্দ বলিয়া মনে করে, তাহাদের যুক্তির উত্তর দেওয়ার জন্যই এই মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা। তাঁহারা সকল ধর্মের সার বাহির করিয়া উহা হইতে কেবল নীতিরই চর্চা করিয়া থাকেন। এই মতকে তাঁহারা নীতিধর্ম অথবা 'এথিক্যাল রিলিজিয়ন' নাম দিয়াছেন। কোন ধর্মমত খণ্ডন করা এই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য নয়। যে কোন ধর্মের লোক এই সমিতিভুক্ত

হইতে পারেন ও হইয়া থাকেন। এই সমিতি হইতে এই লাভ হয় যে, যিনি ইহাতে প্রবেশ করেন তিনি নিজের ধর্মে বেশী করিয়া দৃঢ় থাকিতে পারেন এবং উহাতে যে নীতির-শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে অধিক মনোযোগ দিতে পারেন। তাঁহারা ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সকলেরই নীতির নিয়ম পালন করা উচিত। যদি তাহা না হয়, তবে পৃথিবীতে সমাজ-বন্ধন থাকিতে পারে না এবং পৃথিবীর পরম অনিষ্ট হয়। মিঃ সলটার নামে আমেরিকার একজন বিদ্বান-ভদ্রলোক একখানা সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে আদৌ ধর্ম-চর্চা নাই। সকলেই উহা পড়িতে ও বুঝিতে পারে।

বর্তমান পুস্তকের লেখকের সম্বন্ধে এই কথা বলা আবশ্যক যে, যাহা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইতেছে তাহা তিনি নিজে আচরণ করিয়া থাকেন। আমি পাঠকের নিকট এই নিবেদন করি যে, যদি ইহার কোনও নীতিবাক্য তাহাদের ভাল লাগে তাহা হইলে তদনুযায়ী আচরণ করার যতটা চেষ্টা করিবেন আমার প্রযত্ন সেই পরিমাণে সার্থক জ্ঞান করিব।

আরম্ভ

আমরা যে সৎ বিচার করিতে পারি তাহা আমাদের নীতি পালন করার ফল বলিয়া জানিতে হইবে। পৃথিবী কেমন এই কথাই পৃথিবীর সাধারণ শাস্ত্র বলে, আর নীতিশাস্ত্র বলে—পৃথিবী কেমন হওয়া উচিত। নীতিমার্গ দ্বারা কেমন আচরণ করা উচিত তাহা লোকে জানিতে পারে। মানুষের মনের ভিতর দুইটি দৃষ্টিকোণ আছে। একটির দ্বারা সে নিজে কেমন তাহা দেখিতে পারে, আর দ্বিতীয়টির দ্বারা তাহার কি হওয়া উচিত সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। শরীর, বুদ্ধি ও মন এই সকল আলাদা আলাদা করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা আমাদের কাজ কিন্তু যদি সেখানেই থামিয়া যাই তবে ঐ প্রকার জ্ঞান পাইয়াও কোন লাভ হইবে না। আমরা অন্যায়, হীনতা ও অহঙ্কার ইত্যাদির হাত হইতে রেহাই পাইব না। যেখানে এই তিন বস্তু আছে, সেখানে যে কি ক্ষতি হয় তাহা জানা প্রয়োজন। কেবল জানাই যথেষ্ট নয়, জানিয়া উহার প্রতিকার করা উচিত। নীতির বিচার গৃহনির্মাণে শিল্পীর নক্সার মত।

সে নক্সা ঘর কিরূপ তৈয়ারী করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দেয়। যেমন ঘর না গাঁথিলে নক্সা কোনও কাজে আসে না, তেমনি নীতি বিচার অনুযায়ী আচরণ না করিলে সে বিচারও নিরর্থক হয়। অনেক লোক নীতির বিচার স্মরণ করিয়া সে বিষয়ে বক্তৃতাও করিয়া থাকে কিন্তু তদনুযায়ী চলে না, চলিতে চায় না। কেহ কেহ আবার এই প্রকার ভাবেন যে, নীতির বিচার মান্য করিয়া চলা ইহ সংসারে সম্ভবপর নয়, পরলোকে হইতে পারে। এই প্রকারের যুক্তি হতাশাব্যঞ্জক। একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, যদি খাঁটি মানুষ হইতে হয়, তবে আজ হইতেই, যত দুঃখ হউক তাহা সহ্য করিয়াও নীতি অনুযায়ী আচরণ করিতে হইবে। এই প্রকার বিচারে যেন আমরা ভয় না পাই। আমাদের দায়িত্ব বুঝিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। বড় যোদ্ধা প্রেমব্রোক যখন ওবেকির যুদ্ধকালে যুদ্ধের সম্পর্কে আর্ল ডারবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন আর্ল ডারবী তাঁহাকে জানান যে, যুদ্ধে তাহাদের জয়লাভ হইয়াছে। এই খবর পাইয়া প্রেমব্রোক বলিয়া উঠেন—"আপনি আমার প্রতি নীতিসম্মত ব্যবহার করেন নাই। কর্তব্য পালন করিয়া আমি যে সম্মান পাইতাম তাহা আপনি আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। আপনি আমাকে ডাকিলেন, আবার আমার আসার পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল—এই সংবাদ জানাইলেন।"

এই প্রকার দায়িত্ব লওয়ার আকাঙ্ক্ষা যখন মানুষ নীতিমার্গে থাকার জন্য করে তখন সে নীতি-পথেই চলে।

খোদা অথবা ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁহার দয়া, তাঁহার ন্যায় অসীম। যদি তাহাই হয় তবে আমরা তাঁহার দাস হইয়া নীতিমার্গ কেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি? নীতি অনুযায়ী আচরণকারীকে যে কখন কখন বিফল হইতে দেখা যায় তাহাতে নীতির কোন দোষ নাই। যাহারা নীতি ভঙ্গ করে তাহারাই নীতির উপর দোষারোপ করে।

নীতিমার্গে থাকিয়া নীতি-পথ অবলম্বন করিয়া প্রতিদান পাওয়ার কথা আসেই না। লোকে যে ভাল কাজ করে তাহা বাহাদুরি পাওয়ার জন্য নয়, ভাল কাজ না করিয়া সে থাকিতে পারে না সেইজন্য করে। খাদ্য ও সদ্ব্যবহার এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা করিলে সদ্ব্যবহারকেই উচ্চ শ্রেণীর খোরাক বলা যায়। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করিতে চায় তাহার যখন কোন ভাল কাজ করার অবকাশ উপস্থিত হয় তখন সে অবকাশদাতাকে ধন্যবাদ দেয়; ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য দিলে যেমন সে ধন্যবাদ দেয়—এও ঠিক তেমনি।

যাহারা উপরে উপরে দেখিবে এই প্রকার নীতিমার্গের সার তাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই নীতি-পথ অবলম্বন করিতে আমাদের অধিক শ্রম-পরায়ণ হইতে হইবে, অধিক শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, অধিক পবিত্র হইতে হইবে।

উত্তম নীতি

নীতি-বিষয়ে প্রচলিত ধারণা খুব উচ্চ নয় বলা যায়। কেহ কেহ এ প্রকার মনে করেন যে, নীতির বিশেষ প্রয়োজন নাই। আবার কেহ কেহ ইহাও মনে করেন যে, ধর্ম এবং নীতির মধ্যে সম্বন্ধ নাই। কিন্তু পৃথিবীর ধর্মগুলি অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, নীতি ব্যতীত ধর্ম থাকিতেই পারে না। যথার্থ নীতির মধ্যে অনেক সময়ই ধর্মের সমাবেশ হয়। যাহারা নীতির জন্যই নীতির নিয়ম পালন করে, স্বার্থবশে নয়, তাহাদিগকে ধার্মিক বলা হয়। রাশিয়াতে এমন লোক আছেন যাঁহারা দেশের ভালোর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এই প্রকার লোককে নীতি-পরায়ণ বলা যায়। জেরেমী বেথাম একজন ইংরেজ। তিনি ইংলণ্ডের জন্য ভাল আইন গঠন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরেজদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য খুব চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তিনি কয়েদীদের অবস্থা ভাল করার জন্য খুব কাজ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাকে নীতি-পরায়ণ বলা যায়।

যথার্থ নীতির নিয়ম তো এই যে, আমরা জানিয়া শুনিয়া যে নীতি-পালন করিব তাহাই যথেষ্ট নহে। জানিয়া, না জানিয়া, যাহা নীতি-পথ তাহা অবলম্বন করাই নীতি-পথে চলা। অর্থাৎ যখন আমরা জানি যে অমুকটা নীতি-পথ, তখন নির্ভয় হইয়া তাহা গ্রহণ করাই নীতি-রক্ষা করা এবং তাহা হইলে আমরা এই পথে উন্নতি করিতে পারি। এইভাবেই নীতির সহিত প্রকৃত সভ্যতা ও যথার্থ মহত্ব একত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আমরা নিজেদের অন্তরে যদি অনুসন্ধান করি তবে দেখিতে পাইব যে, যে দ্রব্য আমাদের কাছে আছে তাহা পাওয়ার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যাহা নাই তাহাই সর্বদা অধিক মূল্যবান মনে হইয়া থাকে। কিন্তু ইচ্ছা তো দুই প্রকারের—এক, নিজের স্বার্থসাধনের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা মিটাইবার চেষ্টার নাম অনীতি বা দুর্নীতি। অন্য প্রকারের যে ইচ্ছা, তাহাতে

নিজেরও কল্যাণ হয় এবং অপরেরও কল্যাণ করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। আমরা যে ভাল কাজ করি তাহা লইয়া কখন অহংকৃত হইতে নাই, উহার মূল্য আমাদের নিজেদের ধরিতে নাই। কেবল অধিকতর ভাল হওয়া এবং ভাল কাজ করার ইচ্ছা নিরন্তর করিয়া যাইতে হইবে। এই ইচ্ছা পূরণের প্রচেষ্টাই যথার্থ নীতি। আমাদের কাছে যদি কোনও সম্পত্তি না থাকে তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু যদি আমাদের কোন সম্পদ থাকে এবং তাহার অপব্যবহার করি, তাহা অসৎ কাজে ব্যয় করি তবে নীতিমার্গ ত্যাগ করা হয়। কর্তব্যপালনের মধ্যেই নীতির পালন রহিয়া গিয়াছে। এই প্রকার নীতির আবশ্যকতা কতকগুলি উদাহরণ দ্বারা আমরা প্রমাণ করিতে পারি। যে সমাজ অথবা পরিবারের মধ্যে অনীতির বীজ প্রবেশ করিয়াছে, যেখানে অন্যায় ও অসত্য দেখা দিয়াছে, সে পরিবার নষ্ট হইয়া যায়। যদি ব্যবসা ও রোজগারের উপায়ের কথা ধরা যায় তবে আমরা দেখিব যে, এমন একজন লোকও দেখা যায় না যে বলে—সত্য পালন করিবে না। ন্যায় ও সততার প্রভাব বাহিরের জিনিস নহে, উহা অন্তরের জিনিস। চারিশত বৎসর পূর্বে ইউরোপে অন্যায় ও অসত্য প্রবল ছিল। তখন অবস্থা এমন ছিল যে, লোকে এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকিতে পারিত না। ইহা হওয়ার কারণ এই যে, লোকের জীবনে নীতি ছিল না। সর্বপ্রকার নীতির নিয়ম যদি দোহন করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, লোকের যাহাতে ভাল হয় তাহা করাই সর্বোত্তম নীতি। এই চাবিদ্বারা নীতির তোরঙ্গ যদি খুলিয়া ফেলা যায় তবে তাহার মধ্যে নীতির অন্য সমস্ত নিয়মই পাওয়া যাইবে।

নীতি-অনুমোদিত কার্য কি

কোন্ কাজকে নীতি-অনুমোদিত বলা যায়? এই প্রশ্ন তুলিয়া নীতি ও অনীতিপূর্ণ কার্যের তুলনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি না। কিন্তু কেমন করিয়া নীতি-পরায়ণ হওয়া যায় তাহাই আলোচনা করিতে চাই। অনেক সময়ই আমরা সাধারণ রীতি-রেওয়াজ অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকি। এইরূপ গতানুগতিক ভাবে চলা অনেক সময় আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া গতানুগতিক-ভাবে চলাই নীতিপালন করা—একথা ঠিক নয়।

নীতি-অনুমোদিত কার্য সজ্ঞানে করা চাই, নিজের ইচ্ছায় করা চাই। যে পর্যন্ত যন্ত্রবৎ কার্য করা হয় সে পর্যন্ত আমাদের কার্যের ভিতর নীতি ফুটিয়া উঠে না। আমরা যন্ত্রবৎ কার্য করিয়া থাকি, করিতে হয়। ইহাতে আমাদের বিবেক বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে হয় না। এই যন্ত্রবৎ কার্য করা এবং বিচার-বিবেচনা পূর্বক কার্য করার মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা বুঝা প্রয়োজন। রাজা যদি কাহারও অপরাধ মাফ করেন তবে তাহা নীতি-সম্মত হইতে পারে। মাফ করার আজ্ঞা-পত্র লইয়া যে চাপরাসী যায় সে তো রাজার কার্যে যন্ত্রবৎ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু চাপরাসীর পক্ষে চিঠি লইয়া যাওয়াই তাহার কর্তব্য—এই জ্ঞানে যদি সে চিঠি লইয়া যায় তবে তাহার এই কার্য নীতি-সম্মত বলা যায়। যে ব্যক্তি বুদ্ধি বা মস্তিষ্ক খাটায় না, কাঠের মত কুঁদের উপর ঘুরিতে থাকে, সে নীতির কথা কি বুঝিবে? কোন কোন সময় মানুষ গতানুগতিকতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিবেকের প্রেরণায় কাজ করে। সেই রকম একজন ছিলেন মহাবীর ওয়েণ্ডল ফিলিপ্স। তিনি বক্তৃতাকালে একবার বলেন—"যে পর্যন্ত তোমরা নিজের সম্বন্ধে বিচার করিতে ও জানিতে না শিখিবে সে পর্যন্ত আমার সম্বন্ধে কি মনে কর সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই।"

এইভাবে আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের অন্তর কি বলে তাহাই জানা দরকার, আর তাহা হইলেই আমরা নীতি-পথে চলিতে আরম্ভ করিব। যে পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরকে অন্তর্যামী এবং আমাদের সকল কার্যের সাক্ষী বলিয়া মনে না করিব, সে পর্যন্ত আমাদের এই অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর হইবে না।

কোনও কর্ম নীতি-সম্মত কি-না তাহা নির্ভর করে যে কর্তা তাহার ইচ্ছার উপর। একই কার্য যদি দুইজনে করে, তবুও তাহার মধ্যে একজনের কার্য নীতি-সম্মত ও অপরের কার্য নীতি-বিগর্হিত হইতে পারে। যেমন ধরুন, একজন লোক দয়ার বশবর্তী হইয়া গরীবদিগকে খাওয়াইতেছে, আর অন্য একজন সম্মান পাওয়ার

জন্য অথবা অমনি স্বার্থ-যুক্ত কোনও ইচ্ছা হইতে ঐ কার্যই করিতেছে। উভয়ের কার্য এক হইলেও প্রথম ব্যক্তির কার্য নীতি-সম্মত ও দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য নীতি-বিগর্হিত বলা যায়। এইভাবেই নীতি-সম্মত ও নীতি-বিগর্হিত কার্যের ভিতর যে প্রভেদ আছে তাহা বুঝিতে হইবে। এমনও হইতে পারে যে, নীতি-সম্মত কার্যের প্রভাব সকল সময় ভাল হইল না। নীতি-সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া আমাদের দেখিতে হইবে যে, আরব্ধ কার্য শুভ কি-না ও শুদ্ধ ইচ্ছা হইতে হইয়াছে কি-না; উহার ফল কি হইবে তাহা আমাদের জানা নাই। ফলদাতা একমাত্র ঈশ্বর। সম্রাট আলেকজেণ্ডারকে ঐতিহাসিকরা মহান বলিয়া গণ্য করেন। তিনি যেসব স্থানে গিয়াছেন সেই সব স্থানেই গ্রীক্ দেশের শিক্ষা, শিল্প ও রীতির প্রচলন করিয়াছেন। তাহার ফল আমরা ভালই হইয়াছে দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এ সকল করার হেতু—নিজে বড় হওয়া না নীতি-সম্মত—সেকথা কে বলিতে পারে? তাঁহাকে বড় বলা যায় কিন্তু নীতি-পরায়ণ বলা যায় না।

উল্লিখিত যুক্তি অনুযায়ী একথা সিদ্ধ হইল যে, নীতি-সম্মত প্রত্যেক কার্য যে কেবল শুদ্ধ ইচ্ছা হইতে করা হইবে তাহাই নহে, উহা কাহারও চাপে করা হইবে না। আমি যদি অফিসে যাইতে বিলম্ব করি তবে আমার চাকরি যাইবে—এই বিশ্বাসে শীঘ্র যাওয়ায় কোন নীতি নাই। আবার আমার অর্থ নাই বলিয়া আমি সাদাসিধা গরীবের মত থাকি—ইহাতেও নীতি বা গৌরবের কিছু নাই। কিন্তু আমি যদি সমর্থ হইয়াও এইরূপ ভাবি যে, আমার চারিদিকে এত দারিদ্র্য, এত দুঃখ রহিয়াছে, এই সময় আমি আরাম আয়াস কি করিয়া ভোগ করিব? আমাকে গরীবের মতই সাদাসিধা ভাবে থাকিতে হইবে। এই ভাবে যে সরল জীবন-যাপনের উদ্ভব হয় তাহা নীতি-সম্মত বলা যায়। তেমনি চাকরেরা চলিয়া যাইবে আশঙ্কায় তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, অথবা তাহাদিগকে ভাল অথবা অধিক বেতন দেওয়া—ইহাতে নীতির কিছু নাই; ইহা স্বার্থ-বুদ্ধি মাত্র। আমি তাহাদের ভাল ইচ্ছা করি, আমার সমৃদ্ধিতে তাহাদেরও অংশ আছে—এইরূপ ভাবিয়া যদি তাহাদিগকে রাখা যায় তবে তাহাতে নীতি থাকিতে পারে। অর্থাৎ নীতি-সম্মত কার্য জবরদস্তি বা ভয় ব্যতীতই হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের নিকট যখন কৃষকেরা চোখ রাঙ্গাইয়া কতকগুলি অধিকার চাহিতে আসে, তখন তিনি নিজে হাতেই তাহাদিগকে অধিকার-পত্র লিখিয়া দেন।

কিন্তু যখন কৃষকদের ভয় আর তাঁহার রহিল না তখন তাহাদের নিকট হইতে সেই অধিকারপত্র তিনি ফেরৎ আদায় করিয়া লইলেন।

এই দুই কার্য সম্বন্ধে যদি কেহ বলেন যে, প্রথম কার্যটি নীতি-সম্মত হইয়াছিল আর দ্বিতীয়টি নীতি-বিগর্হিত হইয়াছিল তবে সে কথা ভুল হইবে। রিচার্ডের প্রথম কার্যটি নিছক ভয় হইতেই সম্পন্ন হইয়াছিল সেইজন্য উহার সহিত নীতির কোনও সম্পর্ক নাই।

নীতি-সম্মত কার্যে যেমন ভয় বা জোর-জবরদস্তি থাকিবে না তেমনি উহাতে স্বার্থের লেশও থাকিতে পারিবে না। এই কথা বলার হেতু ইহা নয় যে, যে কার্যেই স্বার্থ আছে তাহা অকাজ; কিন্তু সে কার্য নীতি-সম্মত একথা বলিলে নীতিকে খাটো করিয়া দেখানো হয়। কার্যোদ্ধারের উপায় বা পথ—এই প্রকার ধারণার উপর স্থাপিত বিশ্বস্ততা দীর্ঘ দিন টিকিতে পারে না। সেকস্‌পীয়র বলেন—'যাহা প্রীতিলাভ করার ইচ্ছা হইতে করা হয় তাহাতে প্রীতি নাই।'

যেমন ইহলোকে লাভের ইচ্ছায় কৃত কার্যকে নীতি-সম্মত বলা যায় না তেমনি পরলোকে সুখ হইবে এই আশায় কৃত কার্যকে নীতি-রহিত বলা হইয়া থাকে। ভালর জন্যই ভাল করাতে নীতি বিদ্যমান থাকে। মহামতি জেভিয়ার এমন ভক্ত ছিলেন যে, তাঁহার মন সর্বদাই স্বচ্ছ থাকিত। মৃত্যুর পর ভাল অবস্থা পাওয়ার জন্য তিনি ঈশ্বরে ভক্তি করিতেন না; ঐ প্রকার ভক্তি করিয়াই মানুষের কর্তব্য এই জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। ভক্তিমতী থেরিসা তাঁহার দক্ষিণ হাতে মশাল ও বাম হাতে জলের পাত্র রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। মশালের আগুনে স্বর্গ-সুখ জ্বালাইয়া দিয়া জল দ্বারা নরকের আগুন নিভাইতে ইচ্ছা রাখিতেন, যেন মানুষ নরকের ভয় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-ভক্ত হয়। এই ভাবে নীতি পালন করা মরণব্রতীদেরই কাজ। মিত্রদের সহিত সত্য ব্যবহার করা ও শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার নাম ভীরুতা। যাহারা ভয়ে ভয়ে ভাল কাজ করে তাহাদিগকে নীতি-হীনই বলিতে হইবে। হেনরী কেলবক দয়ার্দ্র হৃদয় ছিলেন বলা হয়। কিন্তু তিনি প্রলোভনের নিকট নীতিকে বিসর্জন দিয়াছিলেন। ড্যানিয়েল ওয়েস্টর সাহসী লোক ছিলেন। তাঁহার বিচার-শক্তি উচ্চ ছিল, কিন্তু অর্থের জন্য তিনি একবার হীন হইয়া পড়েন। একটা নীচ কার্য দ্বারা নিজের সমস্ত সৎকার্য ধুইয়া ফেলেন। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কে নীতিমান আর কে নীতিহীন তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

উত্তম নিয়ম কি

কোন কাজ ভাল কি মন্দ, এ বিষয়ে আমরা প্রায়ই অভিমত দিয়া থাকি। কিছু কাজ আমরা সমর্থন করি, আর কতকগুলি কাজে আমাদের অসন্তোষ হয়। কোন একটা কাজ ভাল কি মন্দ তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে উহার দ্বারা আমাদের কি ভাল হইবে অথবা কি লোকসান হইবে, তাহা দেখিতে গেলে চলে না। উহা তুলনা করার রীতি অন্য প্রকার। আমাদের মনে কতকগুলি বিচার পছন্দ হয় এবং তাহার উপর আমরা অপরের কার্যের পরীক্ষা করিয়া থাকি। একজন লোক যদি অপরের ক্ষতি করে তবে সে ক্ষতিতে আমাদের কিছু আসিয়া না গেলেও সে লোককে আমরা মন্দ বলি। কখন কখন যে ক্ষতি করে তাহার প্রতি মনে মনে আমাদের সহানুভূতি থাকিলেও কাজটা যে খারাপ তাহা বলিতে এতটুকুও বাধে না। এমনও হয় যে, আমাদের উদ্দেশ্য কখন কখন খারাপ থাকে। লোকের কর্মের হেতু আমরা সকল সময় বুঝিতে পারি না, সেইজন্য অভিমতও সঠিক হয় না। তাহা হইলেও, কি উদ্দেশ্যে কার্য করিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে কোন অসুবিধা হয় না। কোন কোন অন্যায় কার্যদ্বারা আমাদের সাময়িক লাভ হইয়া থাকে কিন্তু তবুও কাজটা যে অন্যায় মনে মনে তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি।

ইহাতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, ভাল মন্দের অনুভূতি আমাদের স্বার্থ বোধের উপর নির্ভর করে না। লোকের ইচ্ছার উপরও উহার নির্ধারণ অপেক্ষা করে না। ছোটদের উপর টান আছে বলিয়া কোন কোন জিনিস আমরা তাহাদিগকে দিতে চাই কিন্তু তাহাতে যদি ক্ষতি হয় তবে উহা দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য করি। টান রাখা অবশ্যই ভাল কিন্তু নীতির বিচার করিয়া ঐ আকর্ষণের সীমা যদি বাঁধিয়া না ফেলি তবে তাহা মহা অনিষ্টের কারণ হইবে।

আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, নীতির নিয়ম অপরিবর্তনীয়। মত বদলায় কিন্তু নীতি বদলায় না। আমরা চোখ খুলিলে সূর্য দেখিতে পাই, বন্ধ করিলে দেখিতে পাই না। এইভাবে আমাদের দৃষ্টির পরিবর্তন হয়। সূর্য যে নাই এমন ত নয়! নীতির নিয়ম সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অজ্ঞান অবস্থায় আমরা নীতি কি তাহা বুঝিতে পারি না। আর এই প্রকার ঘটাই সম্ভব। যখন আমাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া যায় তখন বুঝিতে মুশকিল হয় না। লোকে সব সময় ভালোর দিকে দৃষ্টি রাখে না সেইজন্য অনেক সময়ই স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখিয়া অনীতিকে নীতি বলিয়া মনে করে। এমন একটা সময়

শীঘ্রই আসিবে যখন লোকে স্বার্থের বিচার না করিয়া নীতি-বিচারের দিকে অধিক দৃষ্টি দিবে। নীতির স্থিতি এখনও বাল্যাবস্থায় রহিয়াছে। জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনেই মানুষ ব্যস্ত হয় তাই নীতি-বিষয়ে অনুসন্ধান না করিয়া প্রকৃতির সত্য সন্ধানে লাগিয়া যায়। এমন বিদ্বান কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় যিনি অপরিসীম কষ্ট সহ্য করিয়া দৃঢ়ভাবে প্রচলিত কুসংস্কার দূর করিয়া নীতি পালন করিতেই জীবন কাটাইয়া থাকেন। লোকে যেমন আজকাল প্রকৃতির তথ্য অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত তেমনি যখন নীতি বিষয়ে অনুসন্ধানে লাগিয়া যাইবে তখনই নীতি সম্বন্ধে বহু অজানা তত্ত্বের আবিষ্কার হইবে। প্রাকৃতিক শাস্ত্র সম্বন্ধে লোকের যত মতভেদ আছে নীতি সম্বন্ধে তত মতভেদ হইতে পারে না। তাহা হইলেও কিছুকাল পর্যন্ত আমাদের নীতি-বিষয়ে একমত না হওয়াই সম্ভব। ইহার মানে এ নয় যে, ভাল মন্দের ভেদ বুঝিতে পারা যায় না।

আমরা দেখিলাম যে, আমাদের ইচ্ছা অথবা রীতি হইতে প্রচলিত নীতির নিয়ম পৃথক। উহাদিগকে আমরা আইন বলিতে পারি। রাজতন্ত্রে আইন কি তাহা আমরা জানি। নীতির আইনই বা থাকিবে না কেন? এই সকল আইন মানুষের সৃষ্ট নহে। মানুষের দ্বারা তৈরি হওয়াও সম্ভব নয়। যদি নীতির আইন আমরা স্বীকার করিয়া লই তবে সরকারী আইনের বশে যেমন আমাদের থাকিতে হয় তেমনি নীতির নিয়মের বশে থাকাও আমাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে। নীতির আইন রাজ-কার্যের বা ব্যবসার আইন হইতে স্বতন্ত্র ও উত্তম।

নীতির নিয়ম ও সাংসারিক নিয়মের মধ্যে খুব পার্থক্য আছে। নীতির বাসস্থান আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে। মানুষ যখন নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ করে, তখনও তাহা যে নীতি-বিরুদ্ধ তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। লুট করা কখনও ভাল কাজ নয়। যেখানে জন-সাধারণ নীতির নিয়ম পালন করে না, যেখানে লোক খুবই দুষ্ট প্রকৃতির সেখানেও লোকে নীতি-পালন যে ভাল তাহা স্বীকার করিয়া থাকে; নীতির মহিমা এমনি। এই প্রকার নীতি রীতি-রেওয়াজ বা জন-মতের অপেক্ষা রাখে না। নীতিবান পুরুষ নীতি-সম্মত নিয়ম দ্বারাই বদ্ধ হন।

এমন নীতির আইন কোথা হইতে আসিল? ইহা তো কোন রাজার প্রচারিত আইন নয়। কেননা ভিন্ন ভিন্ন রাজা ভিন্ন ভিন্ন আইন পাশ করেন—ইহা

দেখা যায়। সক্রেটিসের সময় যে নীতি তিনি পালন করিতেন, অনেক লোক সেই নীতির বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন তবুও তখন তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই আজও রহিয়া গিয়াছে—ভবিষ্যতেও থাকিবে। সারা জগৎ এই কথাই স্বীকার করিতেছে। ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি কখন কোন শয়তান পৃথিবীতে দ্বেষ ও মিথ্যার প্রবাহ চালায় তাহা হইলেও ন্যায়, সততা এবং সত্যরূপে ঈশ্বরই বর্তমান থাকিবেন। ইহা হইতে একথা বলা যায় যে, নীতির নিয়মের স্থান সর্বোপরি ও উহা ঐশ্বরিক।

এই প্রকার আইন ভঙ্গ করিয়া শেষ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা সমাজ টিকিয়া থাকিতে পারে না। যেমন প্রবল ঘূর্ণিবায়ুও অবশেষে মিলাইয়া যায়, তেমনি অনীতি-পরায়ণ লোক নাশ পাইয়া থাকে। য়্যাসেরিয়া ও ব্যাবিলনে যখন দুর্নীতির ঘড়া পূর্ণ হয়, তখনই উহা ভাঙ্গিয়া যায়। রোম যখন দুর্নীতি গ্রহণ করে তখন তাহার মহাপুরুষগণও তাহাকে বাঁচাইতে পারেন নাই। গ্রীসের জন-সাধারণ বুদ্ধিমান হইলেও তাহাদের বুদ্ধি দুর্নীতি টিকাইয়া রাখিতে পারে নাই। ফ্রান্সে যে বিদ্রোহ হয় তাহা দুর্নীতি দূর করিবার জন্য। আমেরিকার ওয়েণ্ডল ফিলিপ্স বলেন যে, দুর্নীতি যদি রাজাসনেও বসে তবু সে টিকিতে পারে না। ইহাই নীতির ধর্ম। নীতির এই অপূর্ব নিয়ম যে ব্যক্তি পালন করে, সে উন্নত হয়। যে পরিবার পালন করে, তাহারা ঠিকমত চলিতে থাকে। যে সমাজে প্রতিপালিত হয়, সে সমাজ বিস্তার লাভ করে। যে জন-সাধারণ এই উত্তম নিয়ম পালন করে, তাহারা সুখ, স্বাধীনতা ও শান্তি লাভ করে।

নীতির সহিত ধর্মের সমাবেশ হয়

এই অধ্যায়ের বিষয় কিছু বিচিত্র বলিয়া গণ্য হইবে। সাধারণতঃ এই রকম ধরা হয় যে, নীতি ও ধর্ম আলাদা জিনিস। কিন্তু এই অধ্যায়ে নীতিকে ধর্ম বলিয়াই গণ্য করা হইতেছে। কোনও পাঠক মনে করিতে পারেন যে, গ্রন্থকার গোলমালে পড়িয়া গিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন যে, নীতির মধ্যে ধর্ম সমাবিষ্ট নয় আর যাঁহারা মনে করেন যে, নীতি হইলে আর ধর্মের আবশ্যকতা নাই—এই দুই পক্ষই ঐ প্রকার দোষারোপ করিবেন। কিন্তু তাহা হইলেও নীতির সহিত ধর্মের নিকটসম্বন্ধ রহিয়াছে ইহাই গ্রন্থকারের স্থির

সিদ্ধান্ত। নীতি-ধর্ম অথবা ধর্ম-নীতি পালনকারী মণ্ডলী নীতির দ্বারাই ধর্ম পালন করিয়া থাকেন।

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধারণভাবে দেখিতে গেলে নীতি ছাড়াও ধর্ম হইতে পারে। এমন অনেক দুরাচারী পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ঘোর দুষ্কার্য করিয়াও নিজেদের ধার্মিক মনে করিয়া ফাঁকিতে পড়েন। আবার ইহার বিপরীত ফাঁকিতে স্বর্গত ব্রাডলোর মত নীতিপরায়ণ ব্যক্তিও পড়িয়াছেন। ইঁহারা নিজেদিগকে নাস্তিক বলিয়া গৌরব বোধ করেন ও ধর্মের নাম সহ্য করিতে পারেন না। এই উভয় নীতি অবলম্বনকারী লোকই ভুল করে এবং প্রথমোক্ত মতাবলম্বীরা কেবল ভুলই করেন না উপরন্তু ধর্মের নামে দুর্নীতির আচরণ করিয়া ভয়ংকর হইয়া উঠেন। সেই জন্য এই অধ্যায়ে ইহাই দেখান হইতেছে যে, বুদ্ধির সাহায্যে অথবা শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে দেখিলে দেখা যাইবে যে, নীতি ও ধর্ম একই এবং এক হওয়াই উচিত।

পূর্বে নীতি বলিতে কেবল সাংসারিক রীতি বুঝা যাইত অর্থাৎ লোকে ভাল থাকিয়া কি ভাবে আচরণ করিবে, তাহা স্থির করাই নীতির কার্য মনে করিত। ইহাতে ভাল যে সে-ই টিকিয়া যায় ও মন্দ বিনষ্ট হয়। কেননা মন্দ নীতির নাশ না হইলেও যাহারা মন্দ রীতি অবলম্বন করিয়া চলে তাহারা অবশ্যই নষ্ট পায়। আমরা আজও দেখিতেছি যে, এই প্রকারই চলিতেছে। জানিয়া বা না জানিয়া লোকে যে ভাল রীতি অবলম্বন করিয়া থাকে, উহাকে নীতিও বলা যায় না, ধর্মও বলা যায় না। তাহা হইলেও দেখা যায়, যে সকল কার্য নীতি-সম্মত অধিকাংশ স্থলে তাহাই ভাল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অনেক সময়ই ভাসা ভাসা হইয়া থাকে। কখন কখন আমাদের উপর যে সকল আঘাত আসে তাহা দূর করাই আমরা কতকটা ধর্ম বলিয়া মানি। কিন্তু এই প্রকার ভয় হইতে উৎপন্ন বিশ্বাসে যে সমস্ত কার্য করা হয়, সে সকলকে ধর্ম মনে করা ভুল।

এমন এক সময় আসে, যখন মানুষ ইচ্ছাপূর্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া, লাভ হউক অথবা ক্ষতি হউক, বাঁচুক বা মরুক, সংকল্প স্থির করিয়া, নিজেকে নীতির বেদীতে উৎসর্গ করিয়া, অবিলম্বে নীতির পথে চলিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের মনে নীতির রং লাগিয়াছে বলা যায়।

এই প্রকার নীতি ধর্মকে আশ্রয় না করিলে চলিবে কি করিয়া? যদি

অন্য লোকের সামান্য ক্ষতি করিয়াও আমি লাভ করিতে পারি, তবে সে ক্ষতিটা কেন করিব না? অপরের ক্ষতি করিয়া যে লাভ হয় তাহা ক্ষতি—এ বিশ্বাস আমার কেন হইবে? যাহা বাহির হইতে দেখিতে লাভ বলিয়া মনে হয়, এমন কার্য করার জন্য বিসমার্ক জার্মাণীতে পাপের অনুষ্ঠান করেন। উহাতে দেশের কি শিক্ষা হইল? সাধারণতঃ বালকদিগকে যে নীতি-কথা শোনানো হইয়া থাকে, তাহা কোথায় ফেলিয়া দেওয়া হইল? সে কথা স্মরণ করিয়া তিনি কেন নীতি-সম্মত আচরণ করিলেন না? ইহার স্পষ্ট উত্তর এই যে, ঐ সকল ঘটনায় নীতি রক্ষা করা হয় নাই ও যে অন্যায় হইয়াছে তাহার কারণ ঐ সকল স্থানে নীতির সহিত ধর্মের সমাবেশ ছিল না। যে পর্যন্ত নীতির বীজে ধর্মের জল সেচন করা না যায়, সে পর্যন্ত অঙ্কুর বাহির হয় না। জল বিনা বীজ শুষ্কই থাকিয়া যায়। আর দীর্ঘ দিন জল না পাইলে নষ্টও হইতে পারে। আমরা ইহা দেখিতেছি যে, সত্য নীতিতে সত্য ধর্মের সমাবেশ হওয়া চাই। এই বিচারই অন্য কথায় প্রকাশ করিতে গেলে বলা যায় যে, ধর্ম ব্যতীত নীতি রক্ষিত হয় না, অর্থাৎ ধর্মরূপেই নীতি পালন করা চাই।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলিতে যে সকল নীতির নিয়ম বর্ণনা করা আছে, তাহা অনেকটা একই রকমের। ধর্মপ্রচারকেরা একথাও বুঝাইয়া থাকেন যে ধর্মের আরম্ভ নীতির ভিত্তিতেই। যদি আমরা ভিত্তি খুঁড়িয়া ফেলি তাহা হইলে ভিত্তির উপরকার ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে। তেমনি যদি নীতিরূপ ভিত্তি না থাকে তবে ধর্মরূপ গাঁথনিও মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হয়।

আমি একথাও বলিতেছি যে, নীতিই ধর্ম একথা বলায় দোষ নাই। ডাক্তার কোইট একথা প্রার্থনাকালে বলিয়াছেন—"হে ঈশ্বর, নীতি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর আমি চাই না।" ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিব যে, যদি মুখে মুখে ঈশ্বরের নাম বলি আর বগলে ছোরা লুকাইয়া রাখি তবে ঈশ্বর আমাদিগকে কি দিবেন? কেহ ঈশ্বর আছেন একথা মানিয়াও তাঁহার সমস্ত আদেশ ভঙ্গ করে আবার কেহ বা ঈশ্বর নাম দিয়া ঈশ্বরের পরিচয় লয় না। নিজের কার্যের ভিতরই তাঁহাকে পায় ও ঈশ্বরের নিয়মের মধ্যেই নিয়মের যে স্রষ্টা তাঁহার পরিচয় লাভ করে। এই দুইজনের ভিতর কে যে নীতি-পরায়ণ ও ধর্ম-পরায়ণ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিয়া দেওয়া যায় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তিই নীতি ও ধর্ম-পরায়ণ।

জন্ম যে গেল প্রভুরে ডাকিয়া পেলাম না তবু তাঁরে,
বিপুল জগৎ খুঁজিয়া ফিরিনু, তাঁহারে মিলিল নারে।
হাজার নামের পঞ্জী রচেছি, জবাব পাইনি হায়,
জপ-তপ এত করিয়াছি—যার হিসাব করা না যায়।
সাধু সন্তের সঙ্গে ঘুরেছি, পড়েছি পুরাণ বেদ,
দেশ দেশ ঘুরি তবু দেখা নাই—একি দুঃসহ খেদ!
জন্ম আমার ব্যর্থ যে যায়, তবু তব দেখা নাই,
তুমিই আমারে ব'লে দাও প্রভু, তোমারে কেমনে পাই!
অন্তর্যামী হাসিয়া বলেন—কেমনে সফল হ'বি,
আমারে খোঁজার নাম ক'রে যদি স্বার্থে মজিয়া র'বি!
নামের ঝরণা ঝরিয়াছে মুখে—হৃদয়ে অহংকার,
ওরে ও দম্ভী, প্রভু তোর সে কি দম্ভের 'অবতার'!
ছলনার পাঠে হয়েছ নিপুণ—ঠকায়েছ বাপ মা'য়ে,
জগতে ছলিয়া অবশেষে হায় ছলেছিস আপনারে।
সহজ পথের পাণ্টা চলিলে নিজেরি যে হয় হানি,
আনো অনুতাপ, শুভবুদ্ধিতে ঘুচে যাবে সব গ্লানি!

বহেরামজী মলবারী

নীতি সম্বন্ধে ডারুইনের যুক্তি

প্রস্তাবনা

এই অধ্যায়ের বক্তব্য সম্বন্ধে বলার পূর্বে ডারুইন কে ছিলেন তাহা জানা দরকার। তিনি গত শতাব্দীতে ইংলণ্ডের একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণ শক্তি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি অত্যন্ত তীব্র ছিল। তিনি অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করা ও ভাবার যোগ্য। মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি নানা প্রকারের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক জাতীয় বানরই মানুষের পূর্ব-পুরুষ ছিল। অনেক পরীক্ষা করিয়া ও অনেক অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, মানুষের ও বানরের আকৃতির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ

নাই। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ঠিক কি-না তাহার সহিত নীতির বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ডারুইন তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে গিয়া লোকের উপর নীতির যে কি প্রভাব হয় তাহা জানাইয়াছেন। ডারুইনের লেখার প্রতি অনেক বিদ্বানের শ্রদ্ধা রহিয়াছে, সেইজন্য লেখক ডারুইনের মত এখানে উদ্ধৃত করিতেছেন।

ডারুইনের নীতি সম্বন্ধে মত

নিজের অন্তরের ইচ্ছায় যাহা করা যায় তাহার মধ্যেই নৈতিকতা রহিয়াছে—একথা সত্য। নীতিপরায়ণ লোকের প্রকৃত পরিচয় এই যে, উহা চঞ্চল মেঘের মত দিক পরিবর্তন না করিয়া যে কাজ ভাল বোধ হয় সেই কাজ করার সংকল্পে দৃঢ় হইয়া থাকে।

তাহা হইতেই আমাদের প্রবৃত্তির গতি কোন দিকে তাহা জানা যায়। আমাদের কতকগুলি বাহ্য স্থিতি আছে তাহা অনুসরণ করিয়া চলা চাই। যেমন ধরুন, হিমালয়ের মত যে স্থান ঠাণ্ডা সেখানে ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক শরীর রক্ষার জন্য বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেই হয় অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিমানের ন্যায় চলিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া আমাদের নীতি অনুযায়ী ব্যবহার করিতে হইবে অথবা নীতি অনীতি কিছু আছে কিনা তাহা ধর্তব্যের মধ্যে না আনিয়াই চলিতে হইবে।

এই প্রশ্নের সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া ডারুইনের অভিমত অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ডারুইন যদিও নীতি বিষয়ের লেখক ছিলেন না তথাপি বাহ্য বস্তুর সহিত নীতির যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। কেহ কেহ এই প্রকার মনে করেন যে, নীতি অনীতির দিকে দেখার দরকার নাই। এই দল এবং যাঁহারা মনে করেন যে, দুনিয়াতে কেবল শারীরিক ও মানসিক বলই কাজ করিয়া থাকে, তাঁহারা ডারুইনের লেখা পড়িতে পারেন। ডারুইন বলেন যে, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বাঁচিয়া থাকার জন্য একটা আগ্রহ আছে। তিনি একথাও বলেন যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সে-ই বিজয়ী বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে অযোগ্য সে সমূলে বিনষ্ট হইবে। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু শরীরের বল দ্বারাই চালানো যাইবে না।

মানুষের সঙ্গে ভালুক বা মহিষের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, শরীরের বল দ্বারা মাপিলে ভালুক বা মহিষ মানুষের অপেক্ষা বলবান। উহাদের যে কোন একটার সহিত কুস্তি করিতে গেলে লোকে হারিয়া যাইবে, কিন্তু বুদ্ধিবলে মানুষ উহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কার্যের মধ্যেই আমরা ঐ প্রকার পার্থক্য দেখিতে পাই। যুদ্ধের সময় যাহার কাছে অনেক যোদ্ধা থাকে তাহারই যে জয় হয় তাহা তো দেখা যায় না। কিন্তু যে পক্ষে কুশলতা ও উত্তম নেতৃত্ব আছে সে পক্ষ অল্প লোক লইয়া অথবা দুর্বল লোক লইয়াও জয়লাভ করিতে পারে। এই উদাহরণে আমরা বুদ্ধির বল দেখিতে পাই।

ডারুইন একথা বলেন যে, বুদ্ধি-বল ও দৈহিক বল অপেক্ষা নীতি-বল শ্রেষ্ঠ। আর নীতি-পরায়ণ লোক অনীতি-পরায়ণ লোক অপেক্ষা অধিক দিন টিকিয়া থাকে। ইহা নানা রকমেই দেখা যায়। কোন কোন লোক মনে করে যে, ডারুইন ইহাই শিখাইয়াছেন যে, "জোর যার মুলুক তার"; অর্থাৎ যাহার শারীরিক বল বেশী সেই শেষটায় জয়ী হয়। আর এই কথার উপর নির্ভর করিয়া লোকে একথা মানিয়া লয় যে, নীতির কোনও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ডারুইন মোটেই একথা বলেন নাই। আবার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হইতেও ইহাই দেখা যায়, যে সকল সম্প্রদায় নীতি-বিহীন তাহারা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া গিয়াছে। সোডম ও গমোরার লোকেরা অত্যন্ত দুর্নীতি-পরায়ণ ছিলেন বলিয়া ঐ রাজ্যগুলি ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আজও আমরা দেখিতেছি যে, যে সকল সম্প্রদায় দুর্নীতি-পরায়ণ তাহারা বিনষ্ট হইতেছে।

এক্ষণে আমরা কতকগুলি সাধারণ উদাহরণ লইয়া দেখিব যে, সাধারণ নীতি পালন করাও লোকের পক্ষে কত আবশ্যক। শান্ত-স্বভাব হওয়া নীতি-পরায়ণতার একটা অঙ্গ। উপরে উপরে দেখিলে সাধারণতঃ হয়ত ইহাই মনে হইবে যে, উদ্ধত লোক অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মেজাজরূপী তলোয়ার শেষকালে নিজের ঘাড়েই আসিয়া পড়ে। ব্যসনে আসক্ত হইতে নাই—ইহা নীতির আর একটা নিয়ম বেশ ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যাহারা ত্রিশ বৎসর বয়সে পানাসক্ত হয় তাহারা আর তের চৌদ্দ বৎসরের বেশি বাঁচে না। আর যাহারা ব্যসনে আসক্ত নয় তাহারা ৭০ বৎসর পর্যন্তও বাঁচিয়া থাকে। ব্যভিচার না করা নীতির তৃতীয় নিয়ম। ডারুইন দেখাইয়াছেন যে, ব্যভিচারী লোক

খুব দ্রুত মারা যায়। তাহাদের সন্তান হয় না, আর যদি হয় তবে খুব দুর্বল হয়। ব্যভিচারী লোকের মন হীন হইয়া যায় এবং যতই দিন যায় এবং বয়স বাড়ে ততই নির্বোধের মত হয়—এইরূপ দেখা যায়।

আমরা যদি সম্প্রদায়ের নীতি লইয়া আলোচনা করি তাহা হইলেও ইহাই দেখা যাইবে। আন্দামানের লোকেরা উহাদের স্ত্রীর কোলের ছেলে একটু বড় হইলেই তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের পরমার্থ বুদ্ধির পরিবর্তে অত্যন্ত স্বার্থ বুদ্ধিই দেখা যায়। ফলে এই হইয়াছে যে, সেখানকার লোক ধীরে ধীরে ধ্বংস পাইতেছে। ডারুইন বলেন, পশুদের মধ্যেও কতকটা পরমার্থ বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বভাবতঃ ভীরু পাখীরাও নিজেদের সন্তান রক্ষা করার বেলায় সাহসী হইয়া পড়ে, ইহাতে একথা বুঝা যায় যে, প্রাণীমাত্রের মধ্যেই পরমার্থ বুদ্ধি যদি কতকটা পরিমাণ না থাকিত, তাহা হইলে সংসারে কাঠ, খড় ও বিষবৃক্ষ ছাড়া কোন জীবই থাকিত না। মানুষ ও অন্য প্রাণীর মধ্যে মুখ্য প্রভেদ এই যে, মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক পরার্থপর। অপরের জন্য, নৈতিকবুদ্ধি অনুযায়ী আপন সন্তানের জন্য, দেশের জন্য—মানুষ জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে।

ডারুইন একথা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, নীতি-বল সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। গ্রীস দেশের লোক এখানকার ইউরোপবাসী লোক অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান ছিলেন। যখন তাঁহারা নীতিমার্গ পরিত্যাগ করেন তখন তাহাদের বুদ্ধিই তাহাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, আর আজ তাহাদের কেহই অবশিষ্ট নাই। পয়সার জোরে, সৈন্যের জোরে জাতি টিকিয়া থাকিতে পারে না। একমাত্র নীতির উপরই মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া পরমার্থরূপী পরম আচরণ করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

কখন কখন একথা বলা হয় যে, নীতির ভিতরেই সার্বজনীন কল্যাণ রহিয়াছে। এ কথা ঠিক, যে-বিচারকের ন্যায়-বুদ্ধি আছে তাহার আদালতে ন্যায়ের জন্য গেলে লোকে ন্যায়বিচার পাইবে। সত্যভাবে দেখিতে গেলে এ কথা বুঝা যাইবে যে, এমন কোনও নীতি নাই যাহার ফল নীতি-পালনকারী পায় না। কখন কখন এ কথা বলা হইয়া থাকে যে, সততা ইত্যাদি গুণের সহিত মানুষের স্বার্থের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু মিথ্যা বলিলে কাহাকেও ঠকাইলে তাহার ক্ষতি হয় একথা যদি মানি তাহা হইলে সত্য বলার বিরুদ্ধ পক্ষ ক্ষতি হইতে রক্ষা পায় একথা তো স্বীকার করিতেই হইবে।

তেমনি আবার যখন কোন প্রচলিত নিয়ম অথবা রীতি অপছন্দ করিয়া কেহ উহা পরিত্যাগ করে তখন জন-সমাজের উপর তাহার প্রভাব পড়ে। এই ধরণের লোক আদর্শ-রাজ্যে বাস করে। এইরূপ জগৎ এখনও সৃষ্ট হয় নাই। এই প্রকার লোকের পক্ষে, প্রচলিত যে রীতি ভাল নয়, সেই রীতির অনাদর করাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপে নিজের মনের মত পথে অপরকে আনার জন্য তাঁহারা সর্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন। এইভাবেই মহাপুরুষগণ পৃথিবীর গতি পরিবর্তন করেন।

যতদিন মানুষ স্বার্থপর থাকিবে, অপরের সুখের দিকে দৃষ্টি না দিবে, ততদিন তাহারা তো পশুর মত অথবা তাহা হইতেও নিকৃষ্ট জীবন যাপন করিতে থাকিবে। মানুষকে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তখনই আমরা দেখিয়া থাকি যখন সে নিজের পরিবার প্রতিপালনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি যখন নিজের দেশকে অথবা নিজের সম্প্রদায়কে সেই পরিবার ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। যখন সমগ্র মনুষ্য জাতিকেই সে কুটুম্বের মধ্যে গণ্য করে তখন সে পূর্বাপেক্ষাও ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়। আর মানুষ যে পরিমাণে এই ধারণা নিজস্ব করিয়া লইতে না পারে সেই পরিমাণে সে হীন অথবা অপূর্ণ হইয়া থাকে। আমার সম্প্রদায়ের অথবা আমার স্ত্রীর জন্য আমার কষ্ট হয়। কিন্তু অপর লোকের জন্য কোনও আকর্ষণ যদি না থাকে তবে বুঝিব যে, আমার কাছে মনুষ্য জাতির দুঃখের কোনও মূল্য নাই—স্ত্রী পুত্র বা সম্প্রদায় যাহাদিগকে আমার বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি, তাহাদের জন্য কেবল বুদ্ধি বা স্বার্থ-বুদ্ধি হেতুই কতকটা আকর্ষণ আছে মাত্র।

এইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধে দয়া-ভাব উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নীতি-ধর্ম কি তাহা জানা যায় না, তাহা পালন করাও সম্ভবপর হয় না। ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, উচ্চাঙ্গের নীতি সার্বজনীন হওয়া চাই। আমাদের উপর প্রত্যেক লোকেরই এই প্রকার দাবি রহিয়া গিয়াছে যে, সর্বদা তাহাদের সেবা করাই আমাদের কর্তব্য আর আমাদের কাহারও উপর দাবি নাই এই প্রকার ব্যবহার করা চাই। কেহ একথা হয়ত বলিবেন যে, এই প্রকারের লোক পৃথিবীতে তৎক্ষণাৎ নিষ্পেষিত হইবে। কিন্তু এইরূপ কথা কেবল অজ্ঞানীরাই বলিতে পারে, কেননা এই প্রকার একনিষ্ঠার সহিত সেবা-পরায়ণ লোককে ঈশ্বর বাঁচাইয়া থাকেন—ইহাই পৃথিবীব্যাপী অনুভূতি।

এই নীতি অনুযায়ী সমস্ত লোকই এক প্রকার। উহার অর্থ কেহ যেন

এমন না করেন যে, সকল লোকেরই সীমা এক প্রকার অথবা সকলেই এক রকমের কার্য করিতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের সীমা যেন আমরা বাড়াইয়া না ফেলি এবং সেই সীমার মধ্যে থাকিয়া দায়িত্ব পালন করি। ইহাতে অহংকৃত হওয়ার অথবা যাহারা আমাদের অপেক্ষা কম দায়িত্ব লয় তাহারা কোনও রকমে ছোট এরূপ মনে করার কিছুই নাই।

এই নিয়ম অনুসারে কোন এক জাতির লোক নিজের স্বার্থের জন্য অপর এক জাতির লোকের উপর রাজত্ব করিতে পারে না। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে তুচ্ছ করিয়া ইউরোপের লোকেরা যে রাজত্ব করে তাহা নীতি-বিগর্হিত। যদি সুসভ্য প্রজা অল্পসভ্য প্রজার সংস্পর্শে আসে, তবে অল্প সভ্যদিগকে নিজের মত করিয়া তোলাই তাহাদের কর্তব্য। এই দৃষ্টিতে রাজা প্রজার উপরে নয়, বরঞ্চ ভৃত্য মাত্র। আমলারা চাঁকরি ভোগ করার জন্য নাই, প্রজাকে সুখী করার জন্যই রহিয়াছেন। প্রজাতন্ত্র রাজ্যে যদি লোক স্বার্থপর হয় তবে সে রাজ্য কোনও কাজের নয়।

এক রাজ্যের অধিবাসী অথবা এই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সবলেরই দুর্বলকে রক্ষা করিতে হয়। সে যদি তাহা না করে তবে লোকের কষ্ট হইবেই। এই প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে কেহ অনাহারেও থাকে না, আবার অত্যন্ত ধনীও হইতে পারে না। আমাদের প্রতিবেশীদিগকে দুঃখী দেখিয়া আমাদের তো সুখে থাকা চলে না। এই পরম নীতি যাহারা পালন করেন তাহাদের অর্থ সঞ্চয় করাও চলে না। এই প্রকারের নীতি পৃথিবীতে প্রতিপালিত হইতে অল্পই দেখা যায় বলিয়া নীতিপরায়ণদের শঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। কেননা লোকে নীতি অনুযায়ী আচরণই করিতে পারে, ফলাফল বা পরিণাম তো তাহাদের হাতে নাই। নীতি অনুযায়ী আচরণ না করিলে দোষ হয়, কিন্তু সে নীতি পালনের পরিণাম ফল জনসাধারণের উপর যদি না পড়ে তবে তাহাতে দোষের কিছুই নাই।

সমর্পণ

"ইহা আমি জানিয়াছি", "উহা আমাদের কর্তব্য" ইত্যাদি বোধ মানুষকে বিচলিত করিয়া ফেলে। একটা গোপন শব্দ কানে কানে এই কথাই বলিতে থাকে যে, "ওরে মানুষ একাজ তোমার, তোমাকেই ইহা করিতে হইবে। তোমাকেই পরাজয় অথবা জয়লাভ করিতে হইবে। তুমিই তোমার প্রকৃতির অনুরূপ। প্রকৃতি দুইটি জিনিস এক রকম করিয়া তৈরি করে না। তোমার যাহা করা কর্তব্য তাহা যদি না কর, তবে পৃথিবীতে সব দিক দিয়াই তাহা দোষের হইবে।"

আমার এই প্রকার করার অধিকার আছে? কেহ বলেন—"আদমকে খোদা বলিও না। আদম খোদা নহে, কিন্তু খোদার প্রভা হইতে আদম ভিন্নও নহে।" এই প্রকার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কেহ হয়ত ধরিয়া লইবে যে, সে নিজেই খোদার প্রভা। আবার কেহ বা বলিবে যে, আমাকে আমার আশপাশের লোকের প্রতি প্রীতি দেখাইতে হইবে, ভ্রাতৃভাব রাখিতে হইবে। তৃতীয় আর কেহ বলিবে, মাতাপিতার সেবা করিবে, ছেলেপিলেকে দেখাশুনা করিবে, ভাই-বোন ও মিত্রের প্রতি যথাযথ ব্যবহার করিবে। কিন্তু এই সমস্ত কর্তব্যের মধ্যে আমাকে আমার নিজের প্রতি সেই ঠিক ব্যবহারই করিতে হইবে, ইহাও তো আমার কর্তব্য। যতদিন পর্যন্ত আমি নিজেকে না চিনিতে পারিতেছি ততদিন কি করিয়া অপরকে চিনিব? অনেকে এ রকমও মনে করে যে, অপরের সহিত ন্যায় অনুযায়ী ব্যবহার করিতে হইবে, কিন্তু যে পর্যন্ত আমরা অপরের সম্পর্কে না আসিতেছি ততদিন নিজেদের ইচ্ছামত যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করিতে পারি। এ প্রকার যে মনে করে সে নীতির নিয়ম বুঝে নাই। পৃথিবীতে থাকিয়া ক্ষতি না করিয়া কেহ নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারে না।

নিজের প্রতি আমাদের কি কর্তব্য সে বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ নিজের প্রতি ব্যবহারের খবর আমরা নিজেরাই রাখি আর কেহ রাখে না। এই ব্যবহারের প্রভাব নিজের উপর হয়, কাজেই উহার জন্য আমরাই দায়ী। এইরূপ মনে করাই যথেষ্ট নয়, এই কার্য দ্বারা অপরের উপর যে প্রভাব হয় তাহার জন্যও আমরা দায়ী। প্রত্যেককেই নিজের উত্তেজনা সংযত করিতে হইবে। একজন মহাপুরুষ বলেন যে, যে

কোন লোক নিজের চালচলন আমাকে জানাইলে, সে ব্যক্তি কেমন তাহা আমি তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারি। এই কারণেই আমাদের ইচ্ছাকে সংযত রাখিতে হয়। মদ খাইতে নাই, অতি আহার করিতে নাই, যদি করি তবে শক্তিহীন হইয়া সম্মান খোয়াইব। যে ব্যক্তি বিষয়-আসক্তি ত্যাগ করিয়া শরীর মন বুদ্ধি ও প্রাণের দিকে তাকায় না, সে ব্যক্তির বাহ্যিক কাজ কাহারও ভাল লাগিবে না।

এই ভাবনা হইতে, নিজের অন্তর-বৃত্তি পবিত্র রাখিয়া, কিভাবে উহা ব্যবহার করা যায় এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। জীবনে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া চলা চাই। জীবনের কর্তব্য স্থির করিয়া সেই দিকে যদি ঝুঁকিয়া না থাকা যায়, তবে কর্ণধার বিহীন নৌকার ন্যায় আমরা বিপথে ডুবিয়া যাইব। সর্বাপেক্ষা উচ্চ কর্তব্য হইতেছে জন-সেবা ও জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। ইহাই সত্য ঈশ্বর-স্তুতি, ইহাই সত্য ঈশ্বর বন্দনা। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাজ করে সে ঈশ্বরীয় পুরুষ হয়। অনেক প্রবঞ্চক ও ধূর্ত ঈশ্বরের নাম লইয়া কাজ করিয়া থাকে। তোতা পাখী যখন ঈশ্বরের নাম লয় তখন তাহার ভিতর ঈশ্বর-চিন্তা কিছু থাকে না। যে যে-অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকিয়াও নীতির নিয়ম পালন করিতে পারে। উকিলও ঈশ্বর সেবার ধারণা লইয়া ওকালতি করিতে পারে। ব্যাপারী এই ধারণা লইয়া ব্যবসা করিতে পারে, আর এই নিয়ম পালন করিলে নীতি-ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয় না। ঐ ভাবে চলিতে গেলে মানুষকে আর্থিক উন্নতি করার ইচ্ছা হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

আরও চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের সর্বদাই খোঁজ রাখা উচিত যে, আমাদের জীবন-যাত্রা ভাল কিম্বা মন্দের দিকে চলিয়াছে। যে ব্যবসায়ী, সে ব্যবসা করার সময় প্রত্যেক বেচাকেনাতেই বিচার করিবে যে, সে অপরকে ঠকাইতেছে কিনা। উকিল বা ডাক্তার মক্কেল ও রোগীর সম্বন্ধে এই ভাবে চিন্তা করিবে। ছেলেপিলে মানুষ করিতে গিয়া সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে যে, নিজের মিথ্যা ভালবাসার জন্য অথবা নিজের স্বার্থপর স্বভাবের জন্য উহাদিগকে যেন বিগড়াইয়া না দেওয়া হয়। মজুর মজুরি করিতে গিয়াও নিজের এই কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। মোটকথা এই যে, মজুর যদি মজুরি করিতে গিয়া নীতি-সম্মত ভাবে কার্য করে তবে সে স্বার্থপর ব্যাপারী ডাক্তার বা উকিল হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। মজুর তো খাঁটি টাকার মত—আর অধিকতর বুদ্ধিমান, ধনবান, স্বার্থপর উকিল বা

ডাক্তার মেকী টাকার মত। উপরের উদাহরণগুলির দ্বারা এই কথাই বুঝা যায় নীতির নিয়ম পালন যে কোন লোক যে কোন অবস্থায় থাকিয়া করিতে পারে। মূল্য তাহার জীবন-যাত্রার ধরণের উপর নির্ভর করে, কি কাজ করিতেছে তাহার উপর নয়। এই জীবন-যাত্রার ধরণ কাহারও বাহ্যিক কর্মদ্বারা পরীক্ষা করা যায় না, তাহার হৃদয়-বৃত্তি দ্বারাই পরীক্ষিত হয়। কেহ গরীবকে নিকট হইতে দূরে সরাইবার জন্য যদি একটা টাকা ফেলিয়া দেয়, আর একজন যদি দয়াপরবশ হইয়া একটা আনি দেয়, তবে যে আনি দিয়াছে সে-ই নীতি-পরায়ণ, যে টাকাটা দিয়াছে সে নয়।

এই সকল কথার সার এই দাঁড়াইতেছে যে, যে ব্যক্তি নিজে শুদ্ধ, কাহাকেও দ্বেষ করে না, কাহারও উপর অন্যায় সুবিধা করিয়া লয় না, সর্বদা মন পবিত্র রাখিয়া তদ্রূপ আচরণ করে, সে-ই ধার্মিক, সে-ই ধনবান। তাহার দ্বারাই মনুষ্য জাতির সেবা হইতে পারে। যদি দিয়াশলাইয়ের কাঠিতেই আগুন না থাকে, তবে অন্য কাঠ জ্বালাইবে কি দিয়া? যে ব্যক্তি নিজে নীতি পালন করে না, সে অপরকে কি শিখাইবে? যে নিজে ডুবিয়া যাইতেছে সে কাহাকে উদ্ধার করিবে? নীতি পালন করিতে গেলে পৃথিবীর সেবা কম করা যায় এ প্রকার প্রশ্ন তুলিবার দরকার নাই। কেননা এ প্রশ্ন আসে না। ম্যাথু আরনল্ড বলেন যে—"এক সময় আমি আমার বন্ধুদের জন্য স্বাস্থ্য, জয় ও কীর্তি ইচ্ছা করিতাম। এখন আর সে প্রকারের ইচ্ছা করি না। উহা হউক বা না হউক, উহার উপর আমার বন্ধুদের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে না। সেইজন্য এখন আমি ইচ্ছা করি যে, তাঁহাদের নীতি যেন সর্বদা অবিচল থাকে।" ইমার্সন বলিয়াছেন—"ভাল লোকের দুঃখও তাহার সুখই বটে, আর মন্দ লোকের অর্থ ও কীর্তি তাহার এবং দুনিয়ার দুঃখের কারণ।"

গীতা-বোধ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক
শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

প্রস্তাবনা

আশ্রমে যে সকল ব্রত প্রতিপালিত হয়, সে সকল সম্বন্ধে, যজ্ঞ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখানে যে গ্রন্থ হইতে প্রতিদিন কতকটা করিয়া পড়িয়া ও মনন করিয়া এক পক্ষে এক বার শেষ করি, যাহাকে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছি সেই গ্রন্থখানা আমি যেমন বুঝিয়াছি সেই প্রকার আলোচনা করার ইচ্ছা করিয়াছি। এই রূপ আলোচনার আবশ্যকতা একখানা পত্র পাইয়া পূর্বেই বোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত সপ্তাহে এক বন্ধুর পত্র পাইয়া এ বিষয়ে স্থির করিয়া ফেলিলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, অনাসক্তি যোগ পড়িতেছেন কিন্তু বুঝিতে বড় অসুবিধা হইতেছে। সকলে বুঝিতে পারে এমন ভাষায় গীতার অর্থ করার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দশঃ অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তবুও বুঝার অসুবিধা দূর হইতেছে না। যেখানে বিষয়টাই কঠিন সেখানে সহজ ভাষা আর কি করিতে পারে? এখন মনে করিতেছি, বিষয়টাই সহজ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যে জিনিসের ব্যবহার আমরা প্রতিক্ষণ করিতে চাই, যাহার সাহায্যে আমাদের মনের সমস্ত রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করি, সে গ্রন্থ যত রকমে ও যত ভাবে বুঝা যায় ততই ভাল। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজে তো আমার সমস্ত সংকটে গীতামাতার নিকট দৌড়াইয়া যাই এবং এখন পর্যন্ত কোন ব্যাপারেই বিফল হই নাই। সুতরাং যাঁহারা গীতা হইতে আশ্বাস পাইতে চান তাঁহাদের পক্ষে আমি যেভাবে প্রতিদিন গীতা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা জানিয়া লইলে কিছু অধিক সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহা হইতে নূতন কিছু পাওয়াও অসম্ভব নয়।

গীতা মহাভারতের মধ্যে একটি ছোট অংশ। মহাভারতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু আমার কাছে মহাভারত ও রামায়ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়। ইহারা ধর্মগ্রন্থ। আর যদি ইতিহাস বল তবে উহা আত্মার ইতিহাস। হাজার বৎসর পূর্বে কি হইয়াছিল তাহার বর্ণনা উহাতে নাই পরন্তু আজ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যাহা চলিতেছে তাহারই উহা প্রতিচ্ছবি। মহাভারত ও রামায়ণে দেবতা ও অসুরের, রাম ও রাবণের মধ্যে যে যুদ্ধ রোজ চলিতেছে তাহারই বর্ণনা আছে। এইরূপ বর্ণনার মধ্যে গীতা হইতেছে

কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে কথোপকথন। এই কথোপকথনের বর্ণনা সঞ্জয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট করিতেছেন। গীতা মানে যাহা গান করা হইয়াছে। ইহাতে উপনিষদের মধ্যে যাহা অভাব আছে তাহা পূরণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার সমস্তটার অর্থ গীতার আকারে একখানা উপনিষদ—এইরূপ বলা যায়। উপনিষদ মানে জ্ঞান বা বোধ। গীতার অর্থও এই কৃষ্ণ অর্জুনকে যে জ্ঞান দিয়াছিলেন তাহাই। আমাদের এই বুঝিয়া গীতা পড়া চাই যে, আমাদের দেহে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ সকল সময় বাস করিতেছেন। আর জিজ্ঞাসু অর্জুনরূপে আমরা ধর্ম সঙ্কটকালে অন্তর্যামী ভগবানকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার শরণ লই ও তখন সেই জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দিতে প্রস্তুত হন। আমরা ঘুমাইয়া আছি। অন্তর্যামী নিত্য জাগ্রত আছেন। আমাদের মধ্যে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে তিনি সমাধান করিয়া দেন।

কিন্তু আমরা তো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেই জানি না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগ্রহ পর্যন্ত হয় না। সেইজন্য গীতার মত গ্রন্থের অনুশীলন রোজ করিয়া থাকি। উহা মনন করিতে করিতে আমাদের মধ্যে ধর্মজিজ্ঞাসা বা ধর্মকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করি। প্রশ্ন করা শিখিতে চাই। আর যখনই ভয় পাই তখনই ভয় মোচন করার জন্য গীতার নিকট আশ্বাসবাণী লইতে যাই। এই দৃষ্টিতেই গীতা পড়িতে হইবে। আমাদের সদ্‌গুরুর মত, মাতার মত বলিয়া উহার উপর বিশ্বাস রাখা চাই, যেন গীতার কোলে মাথা রাখিয়া আমরা নিরাপদে থাকিতে পারি। গীতার নিকট হইতে আমরা জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া লইব। এমনি করিয়া যদি প্রতিদিন গীতা মনন করি তবে তাহা হইতে নিত্য নূতন আনন্দ পাওয়া যাইবে, নিত্য নূতন অর্থ পাওয়া যাইবে। ধর্ম ও জীবন সম্বন্ধে এমন কোনও জটিল প্রশ্ন নাই যাহার সমাধান গীতা করিতে পারে না। আমাদের শ্রদ্ধার অভাবের জন্য যদি গীতা হইতে সে সমাধান না পাই তবে তাহা পৃথক কথা। কিন্তু যাহাতে আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িতে থাকে সেই জন্যই গভীরভাবে গীতার প্রতি অনুরক্ত থাকিতে হয়। এইভাবে মনন করিতে করিতে গীতা হইতে আমি যে অর্থ পাইয়াছি এবং আজও পাইতেছি তাহাই আশ্রমবাসীদের জন্য এখানে বর্ণনা করিলাম।

১১. ১১. ১৯৩০

প্রথম অধ্যায়

অর্জুন-বিষাদ-যোগ

মঙ্গল-প্রভাত : ১১. ১১. ৩০

পাণ্ডব এবং কৌরবেরা যখন আপন আপন বাহিনী লইয়া লড়াইয়ের ময়দানে আসিয়া দাঁড়াইল তখন রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট উভয় সৈন্যের প্রধান যোদ্ধাদের বর্ণনা করিলেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে দুই পক্ষের শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জুনের সারথি হইয়াছিলেন বলিয়া রথখানা দুই সৈন্যের মাঝখানে আনিলেন। উহাদিগকে দেখিয়া অর্জুনের ভয় হইল, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, আমি কেমন করিয়া উহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব? যদি অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইত তবে আমি এখনই লাগিয়া যাইতাম, কিন্তু ইহারা তো স্বজন, আমার আপন লোক। কৌরবই বা কে আর পাণ্ডবই বা কে? সকলেই তো আত্মীয় কুটুম্ব। আমরা এক সঙ্গেই বড় হইয়াছি। দ্রোণ কেবল কি কৌরবদেরই আচার্য? আমরাও তো তাঁহার নিকট হইতেই সমস্ত বিদ্যা শিখিয়াছি। ভীষ্ম আমাদের সকলেরই জ্যেষ্ঠ ও পূজ্য। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করাটা কি প্রকারে সম্ভব? কৌরবেরা যে শত্রু, অনিষ্টকারী এ কথা ঠিক। তাহারা অনেক দুষ্কার্য করিয়াছে, অনেক অন্যায় করিয়াছে। পাণ্ডবদের রাজ্য ছিনাইয়া লইয়াছে। দ্রৌপদীর মত মহাসতীর অপমান করিয়াছে। এ সকলই উহাদের দোষ তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু উহাদিগকে মারিয়া আমাদের কি হইবে? উহারা মূর্খ বলিয়া আমরাও কি উহাদের মত হইব? আমাদের তো কিছু জ্ঞান আছে, ভাল-মন্দ বিচারবুদ্ধি আছে, আমাদের এই কথা বুঝা উচিত যে, স্বজনের সাথে লড়াই করা অন্যায়। তাহারা না হয় পাণ্ডবের ভাগ লইয়াই বসিয়াছে, তাহারা যদি আমাদিগকে মারিয়াই ফেলে তবুও আমরা তাহাদের উপর কি করিয়া হাত উঠাইব? হে কৃষ্ণ! আমি এই আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে পারিব না। এই কথা বলিয়া বিষন্ন হইয়া অর্জুন নিজের রথে বসিয়া পড়িলেন।

এইভাবে প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার নাম "অর্জুন-বিষাদ-যোগ।" বিষাদ অর্থাৎ দুঃখ। যেরূপ দুঃখ অর্জুনের হইয়াছিল আমাদের সকলেরও তেমনি হওয়া চাই। ধর্ম-বেদনা ও ধর্ম-জিজ্ঞাসা ছাড়া জ্ঞান হয় না। যাহার

ধর্ম কি আর অধর্ম কি একথা জানার ইচ্ছা পর্যন্ত হয় না তাহার নিকট ধর্ম কথার আর কি মূল্য আছে? কুরুক্ষেত্রের লড়াইটা একটা নিমিত্ত মাত্র। এই কুরুক্ষেত্রকে আমাদের দেহও বলা যায়। ইহা কুরুক্ষেত্রও বটে আবার ধর্মক্ষেত্রও বটে। যদি এই দেহকে ঈশ্বরের বাসস্থান মনে করি, ইহাকে ঈশ্বরের বাসস্থান রূপে গড়িয়া তুলি তাহা হইলে ইহাকে ধর্মক্ষেত্র বলা যায়। এই ক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধে কোন না কোন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর এই যুদ্ধ অনেক সময়েই 'এটা আমার', 'ওটা তোমার' এই লইয়া হয়। স্বজন পরজনের ভেদ হইতে এই লড়াই হয়। এই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন অধর্ম মাত্রের মূল রাগদ্বেষের মধ্যে রহিয়াছে। 'আমার' মনে করিলে অনুরাগ হয়, 'পরের' মনে করিলে দ্বেষ হয়, বৈরভাব আসে। এই জন্য 'আমার' 'তোমার' এই ভেদভাব ভুলিতে হইবে। রাগ-দ্বেষ ছাড়িতে হইবে। এই কথা গীতা ও ধর্ম-গ্রন্থসমূহ জোর করিয়া বলিতেছে। এ কথা বলা এক আর নিজে তদ্রূপ আচরণ করা অন্য জিনিস। গীতা আমাদিগকে সেই অনুসারে আচরণ করিতে শিখায়। উহা কিরূপ তাহা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য-যোগ

মঙ্গল-প্রভাত: ১৭. ১১. ৩০

অর্জুন কতকটা সামলাইয়া লইলে ভগবান তাহাকে দোষ দিয়া বলিলেন—এমন মোহ তোমার কোথা হইতে আসিল? ইহা তোমার মত বীর পুরুষের শোভা পায় না। কিন্তু এইটুকুতেই অর্জুনের মোহ যাইবার নয়। অর্জুন লড়াই করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, এই সমস্ত আত্মীয় স্বজন ও গুরুজনকে মারিয়া আমার রাজ্য পাওয়া তো দূরের কথা স্বর্গ সুখেও দরকার নাই। আমি দ্বিধায় পড়িয়াছি, এই অবস্থায় ধর্ম কি আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার শরণ লইলাম, আমাকে ধর্মশিক্ষা দাও।

অর্জুনকে খুব বিচলিত দেখিয়া ও জিজ্ঞাসু জানিয়া ভগবানের দয়া হইল। তিনি তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন—তুমি মিথ্যা দুঃখ করিতেছ, আবার না বুঝিয়া জ্ঞানীর মত কথা বলিতেছ। দেখা যাইতেছে যে তুমি দেহ ও

দেহস্থ আত্মার ভেদই ভুলিয়া গিয়াছ। দেহই মরে, আত্মা মরে না। দেহ জন্ম হইতেই নাশবান, দেহে যৌবন ও বার্দ্ধক্য আসে। দেহের নাশও হয়। দেহের নাশ হইলেও দেহীর নাশ কখনও হয় না। দেহের জন্ম হয়, আত্মার জন্ম হয় না। আত্মা তো অজন্মা, হ্রাস-বৃদ্ধি হীন, নিত্য বর্তমান। আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। তবে তুমি কেন শোক করিতেছ? তোমার শোক তোমার মোহ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। এই কৌরবদিগকে তুমি তোমার নিজের মনে করিতেছ। এই জন্য তোমার মমতা হইয়াছে। কিন্তু এ কথা তুমি বুঝিও যে, যে-দেহের সম্বন্ধে তোমার মমত্ববোধ আছে উহার নাশও তো আছে। আর এই দেহবাসী জীবের কথা যদি ধর, তবে তখনই বুঝিবে যে, উহাকে কেহ নাশ করিতে পারে না। আগুন উহা পোড়াইয়া ফেলিতে পারে না। জলে উহা ডুবানো যায় না, বায়ু উহাকে শুকাইতে পারে না। আবার তুমি তোমার ধর্মের কথা বিচার করিয়া দেখ, তুমি তো ক্ষত্রিয়—তোমারই পিছনে এই সব সৈন্য একত্র হইয়াছে। এখন যদি কাপুরুষ হও তবে যে পরিণাম-ফল পাইতে ইচ্ছা কর তাহার বিপরীত হইবে এবং তুমি উপহসিত হইবে। আজ পর্যন্ত তোমাকে বীর বলিয়া গণনা করা হয়। এখন যদি তুমি অর্ধেক পথে লড়াই ছাড়িয়া দাও তবে তুমি কাপুরুষের মত পলাইয়া গিয়াছ একথা লোকে বলিবে। এতক্ষণ আমি তোমার কুলধর্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। এখন তোমাকে কর্মযোগের কথা বুঝাইব। কর্মযোগ যে আচরণ করে কখনই তাহার ক্ষতি হয় না। বর্তমান ক্ষেত্রে তোমার পলাইয়া যাওয়া অধর্ম হইবে এবং তোমার বিরুদ্ধে লোকনিন্দা উচিতই হবে। ইহাতে তোমার দোষ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। এসব যুক্তি দ্বারা আমি তোমাকে আত্মা ও দেহের ভেদের কথা বুঝাইয়া দিলাম। তোমার পলাইয়া যাওয়া যদি ধর্ম হয় তবে লোকে নিন্দা করিলে কিছু আসিয়া যাইত না। ইহাতে তর্কের কথা কিছুই নাই। কেবল আচরণ করিয়া অনুভব লওয়ার কথাই রহিয়াছে। আর ইহাও জানা কথা যে, হাজার মণ তর্ক অপেক্ষা এক রতি আচরণের মূল্য অনেক বেশী। এই আচরণের সহিত উহার ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে এ প্রশ্ন আনিয়া ফেলিলে আচরণ দূষিত হয়। পরিণামে কি হইবে এ বিচার করিলে বুদ্ধি মলিন হয়। বৈদিক লোকেরা অনেক প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া অনেক প্রকার ফল পাওয়ার জন্য ক্রিয়াকেই আদর করিয়া বসে। একটায় ফল না হয় তো আর একটার জন্য দৌড়ায়। আবার তৃতীয় একটার কথা যদি কেহ বলে তবে তাহাই করিতে

চেষ্টা করে। এমনি করিয়া তাহাদের বুদ্ধি দুলিয়া বেড়ায়। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের ধর্ম হইতেছে এই যে, ফলাফলের কথা চিন্তা না করিয়া কর্তব্য কর্ম করিতে থাকা। এক্ষণে যুদ্ধ তোমার কর্তব্য ও এই কর্তব্য পূর্ণ করাই তোমার ধর্ম। লাভ-ক্ষতি হার-জিৎ তোমার হাতে নাই। তুমি ভারবাহী কুকুরের মত এই ফলাফলের ভার কেন লইতেছ? হার-জিৎ, ঠাণ্ডা-গরম, সুখ-দুঃখ দেহের সহিত লাগিয়াই আছে। মানুষের উহা সহ্য করিতে হয়। যে পরিণামই হউক না কেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া, সমত্ব রক্ষা করিয়া মানুষের নিজ কর্মে তন্ময় হইয়া থাকা চাই। ইহারই নাম যোগ। ইহাতেই রহিয়াছে কর্ম-কুশলতা। অর্থাৎ কার্যের সিদ্ধি কার্য করাতেই রহিয়াছে তাহার পরিণামে নাই। তুমি আত্মস্থ হও। ফলের অভিলাষ ত্যাগ করিয়া কর্তব্য পালন কর।

এ কথা শুনিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা তো আমার শক্তির অতীত বলিয়া মনে হয়। হার-জিতের কথা ছাড়িয়া দিব, পরিণামের কথা চিন্তাই করিব না—এমন সমবুদ্ধি বা স্থিরবুদ্ধি কি করিয়া আসিবে? এমন স্থিরবুদ্ধিযুক্ত কেমন করিয়া হওয়া যায়? উহার লক্ষণ কি? আমাকে দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান তাহাকে জবাব দিলেন: হে অর্জুন, যে মানুষ নিজের কামনামাত্র ত্যাগ করিয়াছে ও যে নিজের অন্তর হইতেই সন্তোষ লাভ করে তাহাকে স্থিরচিত্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিরবুদ্ধি বলা যায়। সে দুঃখে দুঃখিত হয় না, সুখে উৎফুল্ল হয় না। সুখ-দুঃখাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয়। সেইজন্য ঐরূপ জ্ঞানী পুরুষ কচ্ছপের মত নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে গুটাইয়া লয়। কচ্ছপ শত্রু দেখিলেই হাত পা গুটাইয়া নিজের খোলের মধ্যে আনে। আর ইন্দ্রিয়ের উপর বিষয়সমূহ তো প্রতিক্ষণই আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হইয়া আছে, সেইজন্য মানুষের উচিত ইন্দ্রিয়গুলি গুটাইয়া লইয়া নিজে তাহার আবরণ বা খোলার মত হইয়া বিষয়ের সহিত লড়াই করিতে থাকা। ইহাই প্রকৃত যুদ্ধ। কেহ বা বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য দেহ দমন করে, উপবাস করে। উপবাস করিলে উপবাসের সময় ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের পেছনে ছোটে না। কিন্তু কেবল উপবাসে রস মরে না। উপবাস ত্যাগ করিলে আবার বেশী করিয়া বাড়ে। রস ত্যাগ করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই। ইন্দ্রিয়গুলি এতই বলবান যে, মানুষ সাবধান না থাকিলে বলপূর্বক তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। সেই জন্য মানুষকে সর্বদাই ইন্দ্রিয়গুলি দাবাইয়া রাখিতে হয়। যখন লোকে ঈশ্বরের ধ্যান করে, অন্তর্মুখ হয়, হৃদয়স্থিত অন্তর্যামীকে

দেখে, তাহাকে ভক্তি করে, তখনই তাহা সম্ভব হয়। এইরূপ যে করে না তাহার অবস্থা কেমন হয় তাহাও বলি। যাহার ইন্দ্রিয় স্বাধীন ভাবে চলে সে রোজ বিষয়ের ধ্যান করে। তাহার পর সে সম্বন্ধে তাহার আসক্তি হয়। ইহা না হইলেই চলে না। এই প্রকার আকর্ষণ হইতে কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা পূর্ণ হয় না বলিয়া ক্রোধ হয়। ক্রোধাতুর তো অর্ধেক পাগলের মত হইয়া থাকে। তাহার বিবেকবুদ্ধি লোপ পায় এবং সে যেমন তেমন ভাবে চলে ও বলে।

এইরূপ লোকের পরিণামে বিনাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যাহার ইন্দ্রিয় এমনি চঞ্চল হইয়া ফিরে তাহার অবস্থা কর্ণধারহীন নৌকার মত হয়। সে নৌকাকে বাতাস যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে লইয়া যায়, অবশেষে কোন চড়ায় ঠেকাইয়া চুরমার করিয়া ফেলে। যাহার ইন্দ্রিয়গুলি ইচ্ছামত চলিয়া বেড়ায় তাহার অবস্থা ঐরূপই হয়। সেইজন্য লোকের কামনা ত্যাগ করিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের উপর শাসন রাখিতে হয়। অর্থাৎ যাহা করার নয় ইন্দ্রিয়গুলি যেন তাহা না করে। দৃষ্টি সরল থাকিবে, পবিত্র বস্তুই দেখিবে। কান ভগবৎ ভজন শুনিবে অথবা দুঃখীর ডাক শুনিবে। হাত-পা সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকিবে—সকল ইন্দ্রিয়ই ঈশ্বর-কার্যে নিযুক্ত থাকিবে ও তাহার ফলে ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ হইবে। যখন সেই অনুগ্রহ লাভ হইবে তখনই সকল দুঃখের অবসান হইবে নিশ্চয় জানিও। সূর্যের কিরণে যেমন বরফ গলিয়া যায় ঈশ্বর কৃপায় তেমনি দুঃখমাত্র দূর হইয়া যায়।

যিনি ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন তাহাকে স্থিরবুদ্ধি বলা হয়। যাহার বুদ্ধি স্থির হয় নাই তাহার উত্তম ভাবনা কোথা হইতে আসিবে? যাহার উত্তম ভাবনা নাই তাহার শান্তি কি প্রকারে আসিবে? আর যেখানে শান্তি নাই সেখানে সুখ কোথায়? যেখানে স্থিরবুদ্ধি লোক দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার দেখে সেখানে অস্থির-চিত্ত লোক দুনিয়ার ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া দেখিতেই পায় না। এই ঝঞ্ঝাট অস্থির-চিত্ত লোকের নিকট পরিষ্কার বোধ হইলেও স্থিরবুদ্ধি লোক উহাতে ময়লা দেখিতে পায় এবং সেদিকে নজর পর্যন্ত দেয় না। এই প্রকার যোগীর অবস্থা এমন হয় যে, নদী-নালার জল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া শান্ত হইয়া যায় তেমনি এই সমুদ্ররূপী যোগীর মধ্যে বিষয় প্রবেশ করিয়া শান্ত হইয়া যায়। আর এই প্রকার মানুষ সমুদ্রের মতই সর্বদা শান্ত থাকে। সেইজন্য যে সর্বপ্রকার কামনা ত্যাগ করিয়া, নিরহঙ্কার হইয়া, মমতা ছাড়িয়া, উদাসীন হইয়া থাকে, সে শান্তি পায়। ইহাই ঈশ্বর-প্রাপ্তির স্থিতি। আর এই স্থিতি যাহার মরণ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে, সে-ই মোক্ষ লাভ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম যোগ

সোম-প্রভাত : ২৪. ১১. ৩০

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শুনিয়া অর্জুনের এইরূপ বোধ হইল যে, লোকের শান্ত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের মধ্যে কর্মের নাম পর্যন্তও তিনি শুনিতে পান নাই। সেইজন্য ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন: কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার কথা হইতে বুঝিতেছি। সেইজন্য আমার বুদ্ধি গুলাইয়া যাইতেছে। যদি জ্ঞানই ভাল হয় তবে আমাকে ঘোর কর্মে কেন নামাইতেছ? আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল যে কিসে আমার ভাল হইবে।

ভগবান উত্তর দিলেন—

হে নিষ্পাপ অর্জুন, প্রথম হইতেই এই জগতে দুইটি পথ চলিয়া আসিতেছে। একটিতে জ্ঞানকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়, অপরটিতে কর্মকে। কিন্তু তুমি দেখিবে যে, লোকে কর্ম বিনা থাকিতেই পারে না। কর্ম ছাড়া জ্ঞান আসে না। সকল কর্ম ছাড়িয়া যদি কেহ বসিয়া যায় তবে সে সিদ্ধ-পুরুষ হইল—একথা বলা যায় না। তুমি দেখিতেছ প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন কর্ম করে।

লোকের স্বভাবই তাহাকে দিয়া কিছু না কিছু করাইয়া লয়। জগতের এই নিয়ম হওয়া সত্ত্বেও যে লোক হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে আর মনে মনে অনেক প্রকার জল্পনা কল্পনা করে তাহাকে মূর্খ ও মিথ্যাচারী বলিয়া ধরা যায়। তাহা অপেক্ষা ইহা কি ভাল নয় যে, ইন্দ্রিয়গুলি বশে রাখিয়া, রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া, ক্রোধ ও আসক্তি ছাড়িয়া অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া হাত পা দিয়া কোন কাজ করা, কর্মযোগের আচরণ করা?

নিয়তকর্ম অর্থাৎ তোমার ভাগে যে সেবা কর্ম আসিয়া পড়িয়াছে তাহা তুমি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখিয়া করিয়া যাও। অলসের মত বসিয়া থাকা অপেক্ষা ইহা অনেক শ্রেষ্ঠ। অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে অবশেষে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু কাজ করিবার সময় এ কথা স্মরণ রাখিবে যে, যজ্ঞার্থে ছাড়া অন্য সকল কার্যই বন্ধনে ফেলে। যজ্ঞ মানে নিজের জন্য নয়, পরের জন্য ও পরোপকারের জন্য কৃত শ্রম। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিলে যজ্ঞ মানে সেবা। যেখানে সেবার জন্যই সেবা করা হয় সেখানে আসক্তি বা রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন

হয় না। এইপ্রকার যজ্ঞ, এইপ্রকার সেবা তুমি করিয়া যাও। ব্রহ্মা এই জগৎ বানাইয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞও সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের কানে কানে যেন এই মন্ত্র দিয়াছেন: পৃথিবীতে যাও, একে অপরের সেবা কর এবং বৃদ্ধি লাভ কর। জীব-মাত্রকেই দেবতা বলিয়া জানিও। এই দেবতাদের সেবা করিয়া তুমি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন রাখ, তাঁহারাও তোমাকে প্রসন্ন রাখিবেন। দেবতারা প্রসন্ন হইয়া না চাহিতেই তোমাকে মনোবাঞ্ছিত ফল দিবেন। অর্থাৎ এই প্রকার বুঝা চাই যে, সেবা না করিয়া জীবমাত্রের প্রাপ্য ভাগ তাহাদিগকে প্রথমে না দিয়া যে খায়, সে চোর হয়। যে জীবমাত্রকে তাহাদের ভাগ দিয়া তাহার পর খায় বা কিছু ভোগ করে তাহার সে ভোগের অধিকার হয়, অর্থাৎ সে পাপমুক্ত হয়। আবার ইহার উল্টা—যে কেবল নিজের জন্য রোজগার করে, পরিশ্রম করে, সে পাপী, পাপের অন্ন খায়। সৃষ্টির নিয়মই এই যে, অন্ন হইতে এবং অন্ন দ্বারাই জীবের চলে, অন্ন বর্ষা হইতে উৎপন্ন হয় ও বর্ষা যজ্ঞ হইতে অর্থাৎ জীবমাত্রের শ্রম হইতে উৎপন্ন হয়। দেখা যায় যেখানে জীব নাই, সেখানে বর্ষাও নাই। যেখানে জীব আছে সেখানে বর্ষাও আছে। জীবমাত্রই শ্রমজীবী, কেহ শুইয়া থাকিয়া খাইতে পায় না। মূঢ় জীব সম্বন্ধে যদি এই কথা সত্য হয় তবে মানুষের পক্ষে উহা আরও কত বেশী সত্য! সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা কর্ম উৎপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মার উৎপত্তি অক্ষর ব্রহ্ম হইতে। অতএব এইপ্রকার জানিবে যে, যজ্ঞ মাত্রেই বা সেবা মাত্রেই অক্ষর ব্রহ্ম, পরমেশ্বর বিরাজিত। এইপ্রকার যজ্ঞ-চক্র যে অনুসরণ করে না, সে পাপী ও বৃথাই জীবন ধারণ করে।

মঙ্গল-প্রভাত: ২৫. ১১. ৩০

যে মানুষ অন্তরে শান্তি ভোগ করে ও সন্তুষ্ট থাকে তাহার কিছুই করার নাই, একথা বলা যায়। তাহার কর্ম করিয়া কোন লাভ নাই, না করিয়াও নাই। কোনও বিষয়েই তাহার কোন স্বার্থ নাই। তাহা হইলেও সে যজ্ঞকার্য ছাড়িতে পারে না। সেই হেতু তুমি প্রতিদিন কর্তব্য কর্ম করিয়া যাও, কিন্তু তাহাতে যেন রাগ-দ্বেষ না থাকে। তাহাতে আসক্তি রাখিও না। যে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করে সে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে। আবার দেখ, জনকের মত নিস্পৃহ রাজা কর্ম করিতে করিতেই সিদ্ধি পাইয়াছেন। কেননা তিনি লোকহিতের জন্য কর্ম করিতেন। তবে তুমিই বা কেন তাহার বিপরীত

আচরণ করিবে? জগতের নিয়মই এই যে, ভাল ও বড় মানুষেরা যেরূপ আচরণ করে সাধারণ লোকেরা তাহারই অনুকরণ করে। আমার দিকে দেখ, আমার কার্য করার ভিতর কি কোন স্বার্থসাধন আছে? কিন্তু আমি ২৪ ঘণ্টাই ক্লান্ত না হইয়া কর্মেই পড়িয়া আছি, আর সেই হেতু মানুষও কম বেশী পরিমাণে সেইপ্রকার করিতেছে। কিন্তু আমি যদি আলস্য করি তবে জগতের কি অবস্থা হয়? সূর্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি যদি স্থির হইয়া যায় তবে জগতের বিনাশ হয়, এ কথা তুমি বুঝিতে পার। আর এই সকলের গতিদানকারী, নিয়ন্ত্রণকারী কি আমিই নই? তবে লোকের ও আমার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে—আমার আসক্তি নাই, লোকের আসক্তি আছে। তাহারা স্বার্থের বশে মজুরী করে। তোমার মত জ্ঞানী পণ্ডিত যদি কর্মত্যাগ করে তবে লোকেও তেমনি করিবে ও ধর্মভ্রষ্ট হইবে। যাহাতে লোকে ধর্মভ্রষ্ট না হয়, যাহাতে ধীরে ধীরে অনাসক্ত হইতে শিখে সেজন্য তোমারও আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করা উচিত। মানুষের ভিতর যে গুণ রহিয়াছে তাহার বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে কাজ করিতেই হয়। যে মূর্খ সে-ই মনে করে "আমি করিতেছি"। শ্বাস লওয়া জীবমাত্রেরই প্রকৃতি বা স্বভাব। চোখে কিছু পড়িলে স্বভাবতঃই মানুষ চোখের পাতা ফেলে। তখন সে এ কথা বলে না, "আমি শ্বাস লইতেছি, আমি চোখের পাতা ফেলিতেছি"। এমনই ভাবে যত কর্মই করা হউক না কেন তাহা স্বভাবের গুণ অনুসারে হওয়া চাই। ইহাদের সম্বন্ধে অহঙ্কার কেন? মমত্ব ছাড়িয়া সহজভাবে কর্ম করিবার উত্তম উপায় হইতেছে সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করা ও আমার নিমিত্ত নির্ভয় হইয়া করা। ইহা করিতে করিতে যখন মানুষের অন্তরের অহং প্রবৃত্তি ও স্বার্থবোধ নাশ হয় তখন তাহার কর্মমাত্র স্বাভাবিক ও নির্দোষ হইয়া যায়। সে অনেক ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তি পায়। তাহার জন্য আর কর্মবন্ধন বলিয়া কিছু থাকে না। যেখানে স্বভাবই হইতেছে কর্ম করা সেখানে জোর করিয়া কর্ম না করার আগ্রহের মধ্যে অহঙ্কার রহিয়াছে। এই প্রকারে জোর করিয়া যে কর্মত্যাগ করে সে বাহ্যিক কর্ম না করিলেও মনে মনে কর্মের মায়াজাল রচনা করে-ই করে। বাহ্যকর্ম অপেক্ষা ইহা দোষের ও বেশী বন্ধনকারক।

একথা ঠিক যে, ইন্দ্রিয়গুলির নিজ নিজ বিষয়ে রাগ-দ্বেষ আছেই। কানে কোনও শব্দ ভাল লাগে আর কোনটা বা ভাল লাগে না। নাকে গোলাপের

সুগন্ধ ভাল লাগে, মলাদির দুর্গন্ধ ভাল লাগে না। সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। মানুষের কর্তব্য হইতেছে রাগ-দ্বেষরূপী ডাকাতদের বশীভূত না হওয়া। রাগ-দ্বেষ যদি বশীভূত করিতে হয় তবে নিত্য নূতন কর্মের পিছনে ছুটিবে না। আজ এটা, কাল সেটা, পরশু আর একটা লইয়া ঘুরিয়া ফিরিবে না। ইহা না করিয়া নিজের হাতে যে সেবা কার্য আসিয়া পড়ে তাহাই ঈশ্বরের প্রীতির জন্য নিবিষ্ট চিত্তে সম্পন্ন করিবে। এইরূপ করিতে থাকিলে যাহা করিতেছ তাহা ঈশ্বরই করাইতেছেন এই প্রকার ভাবনা উৎপন্ন হয়, এই প্রকার জ্ঞান লাভ হয় এবং অহংভাব চলিয়া যায়। ইহারই নাম স্বধর্ম। স্বধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকাই সকলের পক্ষে ভাল। পরধর্ম যদি ভালও হয় তবুও উহা ক্ষতিকর বলিয়া জানিও। স্বধর্ম অনুসারে আচরণ করিতে গিয়া মৃত্যুবরণ করাতে মোক্ষ রহিয়াছে।

ভগবান যখন বলিলেন যে, রাগ-দ্বেষ রহিত হইয়া কর্ম করিতে হয় ও উহাই যজ্ঞ, তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষ কাহার প্রেরণায় পাপকর্ম করে? অনেক সময় তো এমনও মনে হয় যে, মানুষকে জোর করিয়া কেহ পাপ কর্মের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।"

ভগবান বলিলেন—

কাম ও ক্রোধই মানুষকে পাপের দিকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যায়। কাম-ক্রোধ যেন দুই সহোদর। কামনা পূর্ণ না হইলে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাদের মধ্যে কাম ক্রোধ রহিয়াছে তাহাদিগকে আমরা রজোগুণী বলি। কাম ক্রোধই মানুষের প্রধান শত্রু। উহাদের বিরুদ্ধে রোজ যুদ্ধ করিতে হয়। আয়নায় ময়লা পড়িলে যেমন তাহা ঝাপ্সা হইয়া যায়, আগুনে ধোঁয়া থাকিলে যেমন তাহা ভালো জ্বলে না, গর্ভ যতক্ষণ গর্ভাবরণে থাকে ততক্ষণ যেমন শ্বাস বন্ধ হইয়া থাকে, কাম ক্রোধ তেমনি জ্ঞানীদের জ্ঞান প্রকাশ করিতে দেয় না, ঝাপ্সা করিয়া রাখে বা শ্বাসরোধ করিয়া রাখে। উহারা অগ্নির ন্যায় ভয়ানক আর উহারাই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিজের বশে আনিয়া মানুষকে অধঃপতিত করে। সেইজন্য তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয়-সমূহ বশে আন, তারপর মনকে জয় কর। এমনি করিতে করিতে বুদ্ধিও তোমার বশে আসিবে। দেখ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এক হইতে অপরটি শ্রেষ্ঠ। তাহা হইলেও উহাদের সকলের অপেক্ষা আত্মা অনেক শ্রেষ্ঠ। মানুষের আত্মার অর্থাৎ নিজের শক্তির জ্ঞান নাই, সেইজন্যই সে মনে করে—ইন্দ্রিয় বশে থাকে

না, মন বশে থাকে না ও বুদ্ধি কাজ করে না। আত্মার শক্তিতে যদি বিশ্বাস হয় তবে অন্য সমস্ত সহজ হইয়া যায়। যে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বশে আনিয়াছে তাহাকে কাম ক্রোধ বা তাহাদের অসংখ্য সৈন্য কিছুই করিতে পারে না।

এই অধ্যায়কে আমি গীতা বুঝিবার চাবি বলিয়া থাকি। আর তাহার মধ্যে এক-কথায় সার এই দেখিতে পাই যে,—"জীবন সেবার জন্য, ভোগের জন্য নয়।" সেইজন্য আমাদের জীবন যজ্ঞময় করিয়া ফেলা চাই। এই প্রকার জানিলেও আমরা উহা করিতে পারি না। ঐ প্রকার চেষ্টা করিতে করিতে আমরা উত্তরোত্তর শুদ্ধ হইয়া থাকি। কিন্তু সত্য সেবা কাহাকে বলা যায়? ইহা জানার জন্যও ইন্দ্রিয় দমনের আবশ্যকতা আছে। এই প্রকার করিতে করিতেই আমরা সত্যরূপী পরমেশ্বরের নিকটতর হইতে থাকি। যুগে যুগে আমাদের সত্যের দৃষ্টি অধিকতর স্পষ্ট হয়। কিন্তু সেবাকার্য যদি স্বার্থের দৃষ্টিতে হয় তবে যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্যই অনাসক্তির পরম আবশ্যকতা রহিয়াছে। একথা জানিলে আমাদিগকে আর অন্যান্য বাদ-বিবাদে নামিতে হয় না। অর্জুনকে কি সত্যই স্বজন মারার বুদ্ধি দেওয়া হইয়াছিল? উহাতেই কি ধর্ম? এই প্রকার প্রশ্ন শান্ত হইয়া যায়। অনাসক্তি যদি আসে তবে আমাদের হাতে কাহাকেও মারার ছুরি থাকিলেও তাহা খসিয়া পড়ে। কিন্তু অনাসক্তির ভাণ করিলেই উহা আসে না। আমরা কেবল প্রযত্ন করিয়া যাইতে পারি, তাহাতে আজই আসুক, আর হাজার বছরের চেষ্টাতেও নাই আসুক সে চিন্তাও ছাড়িতে হইবে। চেষ্টার মধ্যেই সফলতা রহিয়াছে। চেষ্টা সত্যই করিতেছি কি-না ইহা সূক্ষ্মভাবে আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার। উহাতে নিজেকে যেন না ঠকাই—এ কথা মনে রাখা সকলের পক্ষেই সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞান-কর্ম-যোগ

মঙ্গল-প্রভাত : ১. ১২. ৩০.

ভগবান অর্জুনকে বলিলেন—আমি যে নিষ্কাম যোগের কথা তোমাকে বলিলাম উহা খুব প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উহা নূতন কথা নয়। তুমি আমার প্রিয় ভক্ত, এখন তুমি ধর্ম-সঙ্কটে পড়িয়াছে বলিয়া তাহা হইতে মুক্ত করার জন্যই আমি তোমাকে ইহা শিক্ষা দিতেছি।

যখন ধর্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম বিস্তারলাভ করে তখনই আমি অবতার-রূপে জন্মগ্রহণ করি এবং ভক্তদিগকে রক্ষা করি ও পাপীদের সংহার করি। আমার এই মায়ার কথা যে জানে সে বিশ্বাস রাখে যে, অধর্মের নাশ হইবেই এবং ঈশ্বরই সাধু পুরুষের সহায়। সে ধর্মত্যাগ করে না ও অবশেষে আমাকেই পায়। কারণ তাহারা আমার জন্য ধ্যানে রত থাকে বলিয়া ও আমারই আশ্রয় লয় বলিয়া কাম ক্রোধাদি হইতে মুক্ত থাকে, তপ ও জ্ঞানের প্রভাবে শুদ্ধ থাকে। আমার নিয়মের বাহিরে গিয়া অর্থাৎ অমান্য করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। গুণ ও কর্মের ভেদ অনুসারে আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু তবুও আমি তাহাদের কর্তা একথা মনে করিও না, কেননা আমার এই কার্য হইতে আমি কোন ফল চাই না। সেইজন্য কর্মের পাপ-পুণ্য আমাকে স্পর্শ করে না। এই ঐশ্বরিক মায়া বুঝার যোগ্য। জগতে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড চলিতেছে সে সকলই ঈশ্বরের নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর অলিপ্ত, সেই জন্য তিনি এই সকলের কর্তা এবং অকর্তা। এইরূপ অলিপ্ত থাকিয়া, ফলের ইচ্ছা না রাখিয়া যেমন ঈশ্বর আচরণ করেন মানুষও যদি তেমনি নিষ্কামভাবে আচরণ করে তবে সে অবশ্যই মোক্ষ লাভ করে। সেই কর্মের ফল শ্রমের মূল্য আকারে না হোক কর্মের আকারে সে পাইয়া থাকেই। ফল তো অনন্ত, কিন্তু কর্মের মধ্যে লীন হইয়া যাওয়া চাই। এই সময়ে কোন প্রকারেরই কামনা মনে আনিতে নাই।

এই প্রকারের লোক কর্মের মধ্যেই অকর্ম দেখে ও যে-কর্ম করিতে নাই তাহাও সে তখন বুঝিতে পারে। যে-কর্মে কামনা আছে, কামনা ছাড়া যাহা হওয়াই সম্ভব নয়, সে সকলই অকরণীয় কর্ম। দৃষ্টান্তস্বরূপ চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদির কথা বলা যায়। এই প্রকার কাজ কেহই অলিপ্ত থাকিয়া

করিতে পারে না। যাহারা কামনা ও সংকল্প ত্যাগ করিয়া কর্তব্য কর্ম করিয়া যায় তাহারা নিজেদের জ্ঞানরূপ অগ্নিতে কর্মকে পুড়াইয়া ছাই করিয়াছে একথা বলা যায়। এইভাবে যিনি কর্মফলের আসক্তি ছাড়িয়াছেন তিনি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, সর্বদা স্বাধীন থাকেন। তাঁহার মন স্থির থাকে, তিনি কোনও সংগ্রহ বা সঞ্চয়ের মধ্যে পড়েন না। যেমন নীরোগ লোকের শারীরিক ক্রিয়া সহজে স্বাভাবিক ভাবে চলে তেমনি এই প্রকার লোকের সকল প্রবৃত্তিই স্বাভাবিক হয়। তিনি নিজে যে কোন কার্য করিতেছেন এমন বোধই তাহার থাকে না। ঐ প্রকার অনুভব পর্যন্ত হয় না। নিজে নিমিত্তমাত্র (কারণ মাত্র) হইয়া থাকেন। তাঁহার সফলতা মিলে তাহাতেই বা কি, নিষ্ফলতা মিলে তাহাতেই বা কি? তিনি উৎফুল্লও হন না আবার ম্রিয়মানও হন না। তাঁহার কর্ম-মাত্রই যজ্ঞের জন্য বা সেবার জন্য হইয়া থাকে। তিনি সকল কর্মের মধ্যে ঈশ্বরকেই দেখেন ও অবশেষে তাঁহাকেই পান।

যজ্ঞ তো নানাপ্রকার বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এ সকলের মূলে শুদ্ধি ও সেবা রহিয়াছে। ইন্দ্রিয় দমন একপ্রকারের যজ্ঞ। কাহাকেও দান করা হইল, উহা আবার আর একপ্রকারের যজ্ঞ। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রাণায়ামাদি করা হয়, উহাও যজ্ঞ। জিজ্ঞাসু এই প্রকার জ্ঞান গুরুর নিকট হইতে পায়। গুরুর নিকট হইতে ইহার প্রাপ্তি বিনয়, পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন ও সেবাদ্বারা হইয়া থাকে। যদি কেহ এসব না বুঝিয়া যজ্ঞের নামে নানারূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয় তবে অজ্ঞানতা-বশতঃ সে যজ্ঞ হইতেছে মনে করিয়া ভালোর পরিবর্তে মন্দ করিয়া বসে। সেই-জন্য প্রত্যেকটি কার্য জ্ঞানপূর্বক হওয়ার পূর্ণ আবশ্যকতা রহিয়াছে।

এই জ্ঞান অক্ষর জ্ঞান নয়; ইহাতে সংশয়ের অবকাশই নাই। শ্রদ্ধা দিয়া ইহার আরম্ভ হয় এবং অন্তিমে অনুভূতিতে পরিণত হয়। এই প্রকার জ্ঞান হইলে মানুষ সমস্ত জীবকে নিজের মধ্যে দেখে ও নিজেকে দেখে ঈশ্বরের মধ্যে অর্থাৎ সকলই যেন তাহার কাছে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরময় বলিয়া বোধ হয়। এই জ্ঞান যদি পাপীও পায় তবে সে উদ্ধার হইয়া যায়। এই প্রকার জ্ঞান কর্মবন্ধন হইতে মনুষ্যকে মুক্ত করে অর্থাৎ কর্মফল তাহাকে স্পর্শ করে না। ইহার মত পবিত্র এ জগতে আর কিছুই নাই। অতএব তুমি শ্রদ্ধাযুক্ত ও ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয় বশে রাখ এবং এই জ্ঞান লাভ করার জন্য চেষ্টা করিয়া যাও। ইহার দ্বারা তুমি পরম শান্তি লাভ করিবে।

পরবর্তী তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়—এই তিনটি একসঙ্গে মনন করার

যোগ্য। উহা হইতে অনাসক্তিযোগ কি তাহা জানা যায়। এই অনাসক্তি বা নিষ্কামতা কেমন করিয়া পাওয়া যায় তাহাও ইহাতে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই তিন অধ্যায় ঠিকভাবে বুঝিয়া লইলে পরের অধ্যায়গুলি বুঝিতে বেশী অসুবিধা হইবে না। পরবর্তী অধ্যায়গুলি অনাসক্তি লাভ করার সাধন নানা-প্রকারে আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়। এই দৃষ্টিতে বারবার গীতা পড়া আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ও উহা করিলে আমাদের প্রতিদিনের সমস্যা গীতা হইতেই বিনা পরিশ্রমে সমাধান করিয়া লইতে পারিবে। প্রতিদিন অভ্যাস করিলেই ইহা হইতে পারে। সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিও—ক্রোধ উপস্থিত হইল সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়ের শ্লোক স্মরণ করিবে ও শান্ত হইবে। কাহারও উপর দ্বেষ হইল, চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল কিম্বা অত্যধিক ভোজনের আকাঙ্ক্ষা আসিল, এটা করিব কি করিব না এই প্রকার সঙ্কট আসিল—এই সকল প্রশ্নের সমাধান যদি শ্রদ্ধা থাকে ও নিত্য মনন করা যায় তবে মাতৃরূপা গীতা হইতেই পাওয়া যায়। এই প্রকার অভ্যাস স্বভাবগত হইয়া যাওয়ার জন্য প্রতিদিনের গীতা পাঠ এবং তাহারই জন্য এই চেষ্টাও বটে।

যজ্ঞ : ১

মঙ্গল-প্রভাত : ২১. ১০. ৩০

আমরা 'যজ্ঞ' শব্দ খুব ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা প্রতিদিনের জন্য মহাযজ্ঞের রচনা করিয়াছি। সেইজন্য যজ্ঞ শব্দের অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝা দরকার। যজ্ঞ মানে ইহলোকে বা পরলোকে কোনও প্রতিদান না লইয়া, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া পরার্থে কৃত যে কোন কর্ম। কর্ম কায়িক, মানসিক ও বাচিক হইয়া থাকে। কর্ম শব্দের খুবই ব্যাপক অর্থ ধরিতে হইবে। আবার এদিকে পর বলিতে কেবল মানুষের কথাই নয়, সমস্ত জীবের কথাই বুঝিতে হইবে। অহিংসার দৃষ্টিতে দেখিলেও মনুষ্য জাতির হিতের জন্য অন্য জীবের হোম (বলি দেওয়া) বা তাহাদের প্রাণনাশ যজ্ঞে করা চলে না। বেদাদিতে অশ্ব, গাভী ইত্যাদি হোম করার যে কথা আছে আমরা তাহা অন্যায় মনে করি। সত্য ও অহিংসার মানদণ্ডে যদি বিচার করি তবে পশু-হিংসার অর্থে এই প্রকার হোম যে হইতে পারে না তাহাতেই আমাদের সন্তোষ। ধর্মের নামে পরিচিত বচনগুলির রূপক অর্থ না করিয়া ঐতিহাসিক অর্থ করিলে করা যায় কিন্তু সেই প্রকার অর্থ খুঁজিয়া বাহির করার যোগ্যতা আমার নাই,

একথা আমি স্বীকার করিতেছি। সে যোগ্যতা লাভের চেষ্টাও আমি করি না, কারণ ঐতিহাসিক অর্থে জীবহিংসা মানিলেও সত্য ও অহিংসাকে সকলের বড় ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করার পর আমার পক্ষে ঐরূপ অর্থ অনুযায়ী আচরণ ত্যাজ্য।

উপরের ব্যাখ্যা অনুসারে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বা মহাযজ্ঞ তাহাই যাহার দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশী জীবের সর্বাধিক কল্যাণ হয়—যে কর্ম অধিক লোক সহজে করিতে পারে। যাহাতে সবচাইতে বেশী সেবা হয় তাহাই মহাযজ্ঞ বা শ্রেষ্ঠযজ্ঞ। কাহারও কল্যাণের জন্য অপর কাহারও অকল্যাণ করা যজ্ঞ কার্য নয় অথচ যজ্ঞ ছাড়া সকল কার্যই বন্ধনকারক ভগবদ্গীতা আমাদিগকে এই কথাই শিখাইতেছে।

এই যজ্ঞ ছাড়া জগৎ এক মুহূর্তও টিকিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্যই গীতাকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কতকটা আভাস দিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে উহা লাভ করার উপায়ের কথা বলিয়াছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে, আমরা জন্মের সঙ্গেই যজ্ঞকে সঙ্গে লইয়া আসি অর্থাৎ এই দেহ কেবল পরমার্থের জন্যই আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য যজ্ঞ না করিয়া যে খায় সে চুরির অন্ন খায়, গীতাকার এমনি শক্ত কথা বলিয়া দিয়াছেন! যে শুদ্ধভাবে জীবনযাপন করিতে চায় তাহার প্রত্যেক কার্য যজ্ঞরূপে হয়। আমরা যজ্ঞকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়াছি, মানে আমরা সর্বদা ঋণী, দেনদার আছি। সেইজন্য আমরা চিরকালের জন্য জগতের গোলাম বা সেবক। প্রভু যেমন সেবা পাওয়ার জন্য গোলামকে অন্নবস্ত্রাদি দেয়, তেমনি জগতের প্রভু আমাদের নিকট হইতে সেবা পাওয়ার জন্য যে অন্নবস্ত্রাদি দেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। এতটা পাওয়া আমাদের দাবী একথা যেন মনে না করি, অর্থাৎ এই অন্নবস্ত্র যদি নাও পাওয়া যায় তবুও প্রভুকে যেন দোষ না দিই। এই শরীর তাঁহার। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে ইহা রাখিতে পারেন, নাও রাখিতে পারেন। এই প্রকার অবস্থা দুঃখজনক নয়। বরঞ্চ যদি নিজেদের স্থান বুঝিয়া লই তবে ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই সুখদায়ক ও ইহাই পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করার যোগ্য। এই পরম সুখ অনুভব করার জন্য অবিচল শ্রদ্ধার প্রয়োজন। নিজের সম্বন্ধে একেবারে চিন্তাই করিবে না, সকলই পরমেশ্বরকে সমর্পণ করিয়া দিবে। এই প্রকার আদর্শ আমি সকল ধর্মেই দেখিয়াছি।

উপরের এই কথায় কাহারও শঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই। মন স্বচ্ছ (নির্মল) রাখিয়া যে সেবার কার্য আরম্ভ করে তাহার পক্ষে যজ্ঞের আবশ্যকতা প্রতিদিনই

স্পষ্ট হয় এবং শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পায়। যে স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়, যে নিজের জন্মের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চায় না, তাহার নিকট সেবামার্গ মাত্রই কঠিন। তাহার সেবায় স্বার্থের গন্ধ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু এইরূপ স্বার্থপর লোক কদাচিৎ দেখা যায়। আমরা জানিয়া না জানিয়া কোনও না কোনও নিঃস্বার্থ সেবা অবশ্যই করিয়া থাকি। এই কার্যই যদি আমরা জ্ঞানপূর্বক করিয়া যাইতে পারি তবে আমাদের পারমার্থিক সেবা করার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে। উহাতেই আমাদের প্রকৃত সুখ ও জগতের কল্যাণ রহিয়াছে।

যজ্ঞ ঃ ২

মঙ্গল-প্রভাত ঃ ২৮. ১০. ৩০

যজ্ঞ সম্বন্ধে গত সপ্তাহে যে পত্র দিয়াছি তাহাতে আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। আরও কিছু লেখার ইচ্ছা হইতেছে। যে বস্তু সঙ্গে লইয়া আমরা জগতে প্রবেশ করিয়াছি তাহার সম্বন্ধে বেশী করিয়া বিচার করা নিরর্থক হইবে না। যজ্ঞ নিত্য-কর্তব্য, চব্বিশ ঘণ্টাই আচরণ করার জিনিস, এই প্রকার বিচার হইতে এবং পরোপকারই সেবা, ইহা জানিয়া 'পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ' ইত্যাদি বচন বলা হইয়াছে। নিষ্কাম সেবা পরোপকার নয়, নিজেরই উপকার—যেমন ঋণ পরিশোধ করা পরোপকার নয়, নিজেরই উপকার, নিজের বোঝা হাল্কা করা, নিজের ধর্ম রক্ষা করা। কেবল সাধুদেরই কর্তব্য পরোপকার বা সেবা তাহা নয়, মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য সেবা। এইরূপ হইলে জীবনের ক্ষেত্র হইতে ভোগের কোঠা উড়িয়া যায়, উহা ত্যাগময় হয় অথবা ত্যাগের দ্বারাই ভোগ হয়। মানুষের ত্যাগেই তাহার ভোগ। মানুষ ও পশুর মধ্যে এইখানেই প্রভেদ।

জীবনের এই প্রকার অর্থ করিলে জীবন শুষ্ক হইয়া যায়, গৃহস্থ জীবনের নাশ হয়, এইরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন ও উপরের বিচার দোষময় বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এ প্রকার বলাতে ত্যাগের কদর্থ করা হয়। ত্যাগের অর্থ ইহা নয় যে, সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া বাস করিবে। উহার মানে এই—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ত্যাগের ভাবনা থাকা চাই। গৃহস্থ জীবন ত্যাগময় হইতে পারে, ভোগময়ও হইতে পারে। মুচি জুতা সেলাই করে, চাষী ক্ষেতে কাজ করে, ব্যবসাদার ব্যবসা করে, নাপিত চুল ছাঁটে, ইহার মধ্যে ত্যাগের ভাবনা থাকিতে পারে আবার ভোগের লালসাও থাকিতে পারে। যজ্ঞার্থে যে ব্যবসা করে সে কোটি টাকার ব্যবসাও লোক-সেবার জন্যই করিবে। সে

কাহাকেও ঠকাইবে না, কোটিপতি হইয়াও সাদাসিধা ভাবে থাকিবে। কোটি টাকা উপার্জন করিয়াও কাহারও লোকসান করিবে না। কাহারও ক্ষতি করার পরিবর্তে কোটি টাকা বলি দিয়া দিবে।

এইরূপ ব্যবসায়ী কেবল আমার কল্পনাতেই আছে একথা বিচার করিয়া কেহ যেন না হাসেন। জগতের সৌভাগ্য যে এমন ব্যবসায়ী পশ্চিম দেশে এবং পূর্ব দেশে আছে। হয়ত তাহারা সংখ্যায় এত কম যে আঙ্গুলে গোনা যায় কিন্তু একটিও জীবন্ত নমুনা যদি পাওয়া যায় তবে এই প্রকার ব্যবসায়ীর কল্পনা বাস্তব হয়। এই রকম একজন দর্জিকে তো আমরা ওয়াড়ওয়ানে* দেখিয়াছি। এমন একজন নাপিতের কথাও আমি জানি। এমন তাঁতিকে আমাদের মধ্যে কে না জানে? বিচার পূর্বক অনুসন্ধান করিলে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, কেহ কেহ নিজের সমস্ত কার্যের মধ্যে কেবল যজ্ঞার্থ ই জীবন যাপন করিতেছে। একথা ঠিক যে—এই প্রকার যাজ্ঞিকেরা নিজেদের ব্যবসা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু তাহারা জীবিকার জন্য সে ব্যবসা করে না। যে কাজ করে তাহার গৌণ ফল হইতেছে জীবিকা পাওয়া।

মতিলাল পূর্বেও দর্জি ছিল, জ্ঞান হওয়ার পরেও দর্জি ছিল। সে তাহার ভাবনা বা কার্যের প্রেরণা বদলাইয়া লইয়াছিল সেইজন্য তাহার ব্যবসা যজ্ঞরূপে পরিণত হইয়াছিল। তাহার জীবনে পবিত্রতা আসিয়া অন্য প্রকার সুখের বিচার দেখা দিয়াছিল, এবং তাহার পরই তাহার জীবনে কলা প্রবেশ করিয়াছিল। যজ্ঞময় জীবনই কলার পরাকাষ্ঠা, সত্যকার রস উহাতেই রহিয়াছে। উহা হইতে নিত্য নূতন রসের ঝরণা বাহির হয়। সে রস পান করিয়া লোকের আশ মিটে না। সে ঝরণা কখনও শুকায় না। যজ্ঞ যদি বোঝা স্বরূপ বোধ হয় তবে তাহা যজ্ঞ নয়। যদি পীড়া বোধ হয় তবে তাহাতে ত্যাগ নাই। ভোগের পরিণতি নাশে, ত্যাগের পরিণতি অমরতায়। রস কোন স্বতন্ত্র বস্তু নয়, রস আপন মনোবৃত্তির মধ্যেই রহিয়াছে। কেহ বা নাটকের দৃশ্যপটে সুখ পায়, আবার কেহ বা আকাশে যে নিত্য নূতন দৃশ্যের অবতারণা হয় তাহাতে রস পায়। অর্থাৎ রসটা বিকাশের উপর নির্ভর করে। যাহা রসরূপে বাল্যকালে শিখান হয়, যাহা রসরূপে জনসাধারণের ভিতর প্রকাশ পায় তাহাই রস বলিয়া গণ্য। একজনের নিকট যাহা রসময় বোধ হয় অপরের নিকটই তাহা রসহীন লাগে—এমন উদাহরণের অভাব নাই।

আবার যজ্ঞকারী অনেক সেবক এমন মনে করে যে, আমরা নিষ্কাম সেবা

* গুজরাটের একটি শহর।

করিয়া থাকি অতএব আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহা ও যাহা প্রয়োজন নাই তাহাও লোকের নিকট হইতে লওয়ার অধিকার পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকার ভাবনা যখনই কোন সেবকের মনে আসে তখনই সে আর সেবক থাকে না; সে সর্দার হয়। সেবার মধ্যে নিজের সুবিধার বিচার করার স্থান নাই। সেবকের সুবিধা ঈশ্বরই দেখিবেন, যাহা দেবার তাহা সেবককে তিনিই দিবেন। এই প্রকার বিচার করিয়া আবার যাহা আসে সেবক যেন তাহাই নিজের করিয়া না বসে। সে প্রয়োজন মাত্র লইয়া বাকীটা ত্যাগ করিবে। নিজের সুবিধার দিকে যদি না দেখিতে হয় তবে সে শান্ত থাকিবে, ক্রোধরহিত হইবে, মনেও তাহার দুঃখ থাকিবে না। যাজ্ঞিকের প্রতিদান বা সেবকের মজুরী হইতেছে যজ্ঞ বা সেবা, তাহাতেই তাহার সন্তোষ।

অধিকন্তু সেবাকার্যে দায় শোধ দেওয়া চলে না। শেষপর্যন্ত উহা টিকে না। নিজের যদি হয় তবে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিব আর পরের যদি হয়, বা বিনা পয়সায় করিতে হয় তবে যেমন তেমন করিলেই চলিবে, এই প্রকার যে ভাবে ও আচরণ করে সে যজ্ঞের মূল কথা কি তাহা জানে না। সেবাকার্য তো ষোড়শোপচারে পূর্ণ করা চাই। নিজের সমস্ত কলার বিকাশ তাহার মধ্যে হওয়া চাই। প্রথমেই উহা সম্পন্ন করিয়া পরে নিজের সেবা করিতে হয়। বাস্তবিক যে শুদ্ধ যজ্ঞ করিতে চায় তাহার নিজের বলিয়া কিছুই থাকে না। সে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া দেয়।

যজ্ঞ ঃ ৩

(ব্যক্তিগত পত্র হইতে)

চরখা ও ফ্রেঞ্চ* পড়ানোর কথা তুমি লিখিয়াছ, উহা আদর্শের দৃষ্টিতে টিকে না। চরখায় সর্বার্পণ করিয়া আবার সেই সময় অন্য কাজের লাভ উঠান চলে না। কেহ যদি (চরখা কাটার সময়) আসিয়া কথা বলে তবে বিবেকের খাতিরে তাহা করিবে। কিন্তু কাহারও কথা বলিয়া যাওয়ার স্থলে যদি কাহাকেও কিছু শিখানই যায় তাহাতে ক্ষতি কি? এ প্রকার ভুল-ন্যায় এখানে খাটে না। কথাবার্তার ব্যাপারে নিজের ইচ্ছার প্রশ্ন উঠে না। যে ব্যক্তি কথা বলিতে আসে সে বেশীক্ষণ ধরিয়া কথা বলে না। কিন্তু

* একই সঙ্গে চরখা কাটা ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া চলে কি-না এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী এই পত্র লেখেন।

যদি শিক্ষকতা করিতে হয় তবে তো পূরা সময় বসিতেই হইবে। যে চরখাকে যজ্ঞার্থে চালাইতে চায়, এ সকল কথা তাহার সম্বন্ধেই খাটে। আমার নিজের বিষয়ে এই সত্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া আসিয়াছি। যদি চরখা কাটিতে কাটিতে অন্য বিষয়ের বিচার করিতে থাকি তবে গতির উপর, সুতার নম্বরের উপর ও সমানতার উপর প্রভাব পড়ে। কল্পনা কর, রোমাঁরোলা পিয়ানোয় বিঠোবেন বাজাইতেছেন তিনি উহাতে এত তন্ময় হইয়া আছেন, যে, কথা বলিতে পারেন না। মনেও অন্য কোন বিচার আনিতে পারেন না। কলা ও কলাকার আলাদা নয়। যদি পিয়ানোর সম্বন্ধে একথা খাঁটি হয় তবে চরখার যজ্ঞ সম্বন্ধে উহা আরও বেশী খাঁটি। আজই এইরূপ আচরণ হওয়া সম্ভব নয়। সে কথা পৃথক কিন্তু আমরা যদি উহা আমাদের বিচারক্ষেত্রে রাখিয়া দিই তবে ঐ প্রকার আচরণে কোনও দিন পৌছিতে পারিব। ইহা মনে রাখিবে যে যাহা হইয়া গিয়াছে সে কথার সমালোচনা ইহাতে করিতেছি না। অতি সামান্য সমালোচনা করার, দোষ ধরার অধিকারও আমাদের নাই। যাহা জানিয়াছি তাহা নিজে পূরা আচরণ করিতেছি কি? যদি করিতাম তবে, কবে সাতলাখ গ্রামে চরখা গুঞ্জন করিতে থাকিত। যাহা জানি তাহাই যদি সর্ণস্পূভাবে আচরণ করিতে পারিতাম তবে আমি এখানে বসিয়া থাকিলেও পবনবেগে চরখা চলিতে থাকিত। যদি মালব্যজী ভাগবত পুরাণের কথা বলিতে ক্লান্ত হন তবেই আমি চরখা সঙ্গীতের কথা বলিতে ক্লান্ত হইব। চরখাকে পুরাণ কি করিয়া বলা যায়? পুরাণ তো আমরা পরে তৈরী করিয়া থাকি। আগে রচনা করার মত করিয়া উঠিলে তবেই না? এখন তো আমরা ইহাতে ভাঙ্গা-চোরা সঙ্গীত রচনা করিতেছি মাত্র। উহা হইতে পরিণামে কি সুর বাহির হইবে তাহা নির্ভর করে আমাদের তপশ্চর্যার উপর, সমর্পণের উপর।

—এখন পূর্বের চিঠির কথা কিছু আরও বলিব। আমার মনে হয় আদর্শ হইল এই যে, যজ্ঞের সময় মৌন হইয়া থাকা এবং সে সময় চরকা ও খাদির বিষয় চিন্তন অথবা রামনাম করা। রামনামের ব্যাপক অর্থ ধরিতে হইবে। সত্য দেখিতে গেলে রামনাম জানা অজানায় সব সময়ই চলিতেছে—সঙ্গীর্তের ভিতর তম্বুরার মত। কিন্তু যে কাজ হাতে করিতেছি তাহাতে যদি একনিষ্ঠ ধ্যান না হয় তখন ইচ্ছাপূর্বক রামনাম জপ করা উচিত। আমরা চরখা চালাইতে চালাইতে কিছু শুনি, কিছু গল্প করি বা অন্য কিছু করি। এ ক্রিয়াকে

তো যজ্ঞ বলা যায় না। যদি যজ্ঞ বলিয়াই ইহা করণীয় হয় তবে ততটা সময় উহাতেই হোম করিয়া দেওয়া চাই। যাহার সমস্ত জীবন যজ্ঞরূপে কাটে, যে অনাসক্ত হইয়াছে, সে একই কাজ এক সময় করে। একথা অল্প বেশী জানিয়াও আমিই পাপীর অগ্রগণ্য আছি। কেনন আমি কোনও দিনই নিরিবিলি বসিয়া একান্তে চরখা কাটি না, একথা বলা যায়। মৌন দিনে যখন চরখা কাটি তখনও চিঠি পড়াইয়া তাহা শুনি অথবা কাহারও কিছু বলার থাকিলে তাহা শুনি। এ বদ অভ্যাস এখনও যায় নাই। তাই ইহাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে যে আমি চরখা কাটায় খুব নিয়মিত হইয়াও নিতান্ত অপটু রহিয়া গিয়াছি এবং ঘণ্টায় ২০০ তার কাটার বেগে এতদিনে পৌঁছিয়াছি। এ বিষয়ে আমার আরও অনেক দোষ আছে, যেমন সূতা ছিঁড়িয়া যায়, মাল তৈরী করিতে জানি না, বেয়ারিং-এর জ্ঞান কম, তুলার জাত চিনি না, সূতা ঠিক সমান হয় না, সূতার শক্তি পরীক্ষা করিতে জানি না,—ইহা কি কোন যাজ্ঞিকের শোভা পায়? ইহার পর যদি খাদি ঢিলাঢালা চলিতে থাকে তবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? যদি দরিদ্রই নারায়ণ হয়—আর দরিদ্র যে নারায়ণ সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহই নাই; সেই নারায়ণের প্রসাদই হইতেছে খাদি, এ কথা যে বলে ও জানে সে ব্যক্তি যদি আমিই হই, তবে তাহা সত্ত্বেও আমার আচরণ কত একাগ্রতাহীন! সেইজন্য এ বিষয়ে কাহাকেও দোষ দিতে ইচ্ছা হয় না। আমি তো কেবল আমার দোষ ও দুঃখ এবং উহা হইতে উৎপন্ন বিচার ও জ্ঞানের দর্শন তোমাকে করাইলাম।

যদিও কাকা সাহেবের কাছে মাঝে মাঝে এ কথা বলিয়াছি, আজ এই প্রথম এত স্পষ্ট করিয়া তোমার কাছে বলিলাম। আর ফ্রেঞ্চের সহিত চরখার কথা জুড়িয়া দিতেই এই স্পষ্টতা আসিল। আর এ কথাও বলি যে, তুমি যে ঐ প্রকার করিয়াছ তাহাতে তোমার অণুমাত্রও দোষ লাগে নাই। আমি চরখা সম্বন্ধে কত কাঁচা মন্ত্রদাতা তাহাই দেখিতেছিলাম। মন্ত্র জানি অথচ তাহার বিধির পূরা আচরণ করি না, ইহাতে মন্ত্রের সম্পূর্ণ শক্তি দেখানো যায় না। এ কথা যেমন এই চরখা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সারাজীবন সম্বন্ধেও তেমনি প্রযোজ্য বলিয়া জানিও। জীবনে প্রয়োগের কল্পনা করিলে দেখিবে যে উহাতে অদ্ভুত শান্তি ও সফলতা অনুভব করার কথা। ইহাই 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'-এর মানে।

এমনি যতটা হয় ততটাই করিও। ততটুকুই হাতে লইও ও সন্তোষ লাভ করিও। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি তাহাই করি তাহাতে নিজের

জীবনের ও সমাজের তীব্রতম প্রগতিতে অংশ লওয়া হয়। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত উহা সম্পূর্ণ ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ ইহা কেবল পাণ্ডিত্য। প্রতিদিন ঐ দিকে অগ্রসর হইতেছি। (জেলের) বাহিরে গেলে যে কি হইবে দৈব জানে। ইতিমধ্যে এইটুকু যদি করিতে পার তো করিয়া লও,—যজ্ঞের জন্য যত তার সুতা কাটা ঠিক করিয়াছ তাহা শাস্ত্রীয় রীতিতে কাটিবে। বাকীটা যেমন করিয়া ইচ্ছা ভারতবর্ষের দ্রব্য বাড়াইবার জন্য কাটিয়া যাইও। আরও লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে কিন্তু এখন এইখানেই শেষ করি।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম-সন্ন্যাস-যোগ

সোম-প্রভাত : ৮. ১২. ৩০

অর্জুন বলিলেন, তুমি জ্ঞানকেই বড় বলিলে তাহাতে আমি বুঝিলাম যে, কর্ম করার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসই ভাল। আবার কর্মেরও স্তুতি করিতেছ, তাহাতে যোগই ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে। এই দুই-এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ কোনটা তাহা নিশ্চয় পূর্বক বল, যাহাতে কতকটা শান্তি পাই।

ইহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন :—সন্ন্যাস মানে জ্ঞান আর কর্মযোগ মানে নিষ্কাম কর্ম। এই দুই-ই ভাল। কিন্তু যদি আমাকে পছন্দ করিতে হয় তবে আমি বলিব যে, যোগ অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া কর্ম করা অনেক ভাল। যে কাহাকেও দ্বেষ করে না, কিছুই ইচ্ছা রাখে না ও সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদিতে অবিচলিত থাকে সে সন্ন্যাসীই বটে—তারপর সে কর্ম করুক আর নাই করুক। ঐ প্রকার লোক সহজেই বন্ধনমুক্ত হয়। অজ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান ও যোগ আলাদা গণ্য করে, জ্ঞানী তেমন করেন না। উভয় পথে একই পরিণাম উপস্থিত হয় অর্থাৎ ঐ দুই পথে একই স্থানে যাওয়া যায়। সেইজন্য যে উভয়কেই একরূপ বলিয়া জানে সে-ই খাঁটি জানিয়াছে। কেননা যাহার শুদ্ধ জ্ঞান হইয়াছে সে সংকল্প দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করে। সেই জন্যই বাহ্য কর্ম করা তাহার প্রয়োজন হয় না। জনকপুরী যখন জ্বলিতেছিল তখন অপরের ধর্ম ছিল আগুন নিভাইতে যাওয়া, জনকের পক্ষে সংকল্প দ্বারাই আগুন নিভাইবার কাজে অংশ গ্রহণ করা হইয়াছিল। কেননা ঐ কার্যে তাঁহার

অধীনে সেবকবর্গ ছিল। রাজা জনক জলের কলসী লইয়া দৌড়াইলে ক্ষতিই হইত। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিলে সেবকেরা নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া যাইত ও হয়ত সোরগোল করিয়া জনককে রক্ষা করিতেই ছুটিয়া আসিত। কিন্তু সকলেই তো চট করিয়া জনক হইতে পারে না। জনকের অবস্থা অত্যন্ত দুর্লভ। অনেক জন্মের সেবার ফলে কোটি লোকের মধ্যে একজন ঐ অবস্থা পাইতে পারে। সে অবস্থা পাইলেই যে বিশেষ ধরণের একটা শান্তি পাওয়া যায় তাহাও নয়। উত্তরোত্তর নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে মানুষের সংকল্প-বল বাড়িয়া যায় এবং বাহ্য কর্ম কমিতে থাকে। সত্য দেখিতে গেলে বাহ্য-কর্ম যে কমিতেছে সে কথা সে জানিতেও পারে না। কর্ম করার জন্য এমন লোকের চেষ্টা পর্যন্ত থাকে না। এই প্রকার লোক তো সেবা-কার্যেই নিমগ্ন থাকে আর সেইরূপ থাকাতে তাহার সেবা-শক্তি এত বেশী বাড়িয়া যায় যে, সেবা-কার্য হইতে বিশ্রাম লইতেও সে জানে না। ইহা হইতে তাহার সংকল্প মাত্রেই সেবা আসিয়া যায়। যেমন খুব গতিশীল বস্তুকে স্থির বলিয়া বোধ হয় এ-ও সেইরূপ। এই প্রকার লোক কিছুই করে না একথা বলা অনুচিত। কিন্তু এমন অবস্থা সাধারণতঃ কল্পনা করা যায়, অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমি কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি। কোটি কোটি লোক নিষ্কাম কর্ম হইতেই সন্ন্যাসের ফল পায়। যদি তাহারা সন্ন্যাসী হইতে যায় তবে দুই দিকই খোয়াইয়া বসে। সন্ন্যাসী হইতে গিয়া মিথ্যাচারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং কর্ম হইতে বিচ্যুত তো হয়ই। উহাতে সর্বনাশ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অনাসক্তি পূর্বক কর্ম করিয়া শুদ্ধ হইয়াছে, যে নিজের মনকে জয় করিয়াছে, যে নিজের ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিয়াছে, যে সকল জীবের সহিত নিজের ঐক্য সাধন করিয়াছে সে কর্ম করিয়াও কর্ম হইতে অলিপ্ত থাকে অর্থাৎ বন্ধনে পড়ে না। এই প্রকার মানুষ বলা, চলা, প্রভৃতি ক্রিয়া করিয়াও জানে যে তাহার ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে কাজ করিয়া যাইতেছে সে নিজে কিছুই করিতেছে না। সুস্থ লোকের শারীরিক ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়। তাহার পাকস্থলী প্রভৃতি আপনা আপনি কাজ করিতে থাকে। সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ারও তাহার প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ যাহার আত্মা সুস্থ সে ব্যক্তি অলিপ্ত থাকে এবং কিছুই করে না একথা বলা যায়। সেই জন্যই মানুষের উচিত সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করা—ব্রহ্মের নিমিত্ত করা। ইহা করিতে থাকিলে পাপ-পুণ্যের বোঝা জমিতে পারে না, জলের মধ্যে থাকিয়াও পদ্মের মত শুকনা থাকে। যাহার অনাসক্তি লাভ

হইয়াছে সে যোগী—শরীর, মন ও বুদ্ধি দ্বারা কার্য করিয়াও সঙ্গরহিত হইয়া অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে থাকে। এইরূপে সে শুদ্ধ হয় ও শান্তি পায়। অযোগী ব্যক্তি পরিণামে আসক্ত থাকিয়া কামনায় বাঁধা কয়েদীর মত বন্ধনে থাকে। এই নয় দরজাযুক্ত দেহরূপ নগরে সকল কর্ম মন হইতে ত্যাগ করিয়া নিজে কিছু না করিয়া, না করাইয়া যোগী সুখে বাস করে।

সংস্কার মুক্ত শুদ্ধ আত্মা পাপও করে না, পুণ্যও করে না। যে ব্যক্তি কর্ম হইতে আসক্তি দূর করিয়াছে, অহংভাবের নাশ করিয়াছে, ফলের আশা ত্যাগ করিয়াছে, সে জড়বৎ হইয়া কার্য করে, সে নিমিত্তমাত্র হয়। তাহাকে পাপ-পুণ্য কেমন করিয়া স্পর্শ করিবে? ইহার বিপরীত যে অজ্ঞানতায় ডুবিয়া আছে সে রোজ হিসাব করে "এতটা পুণ্য করিলাম, এতটা পাপ করিলাম।" এমনি করিয়া সে ক্রমশঃ নীচেই নামিতে থাকে ও অবশেষে তাহার ভাগে পাপই অবশিষ্ট থাকে। আবার যে জ্ঞান দ্বারা নিজের অজ্ঞানকে প্রত্যহ নাশ করিতে থাকে তাহার কার্যে প্রতিদিনই নির্মলতা বাড়িতে থাকে, জগতের দৃষ্টিতে তাহার কর্মে পূর্ণতা ও পবিত্রতা দেখা যায়। এই প্রকার লোকের সকল কর্ম স্বাভাবিক হইয়া যায়; তাহারা সমদর্শী হয়। তাহাদের নিকট বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী, কুকুর, বিবেকহীন পশু অপেক্ষাও নীচ মানুষ—এ সকলই সমান। সকলকেই সে সমানভাবে সেবা করে। একজনকে বড় মনে করিয়া তাহাকে মান দেয় না ও অপরকে ছোট মনে করিয়া তুচ্ছ করে না। অনাসক্ত যে, সে সকলের নিকটই নিজেকে ঋণী বলিয়া মনে করে। সকলের নিকটেই নিজের ঋণ পরিশোধ করে ও পূর্ণ ন্যায় করে। এই প্রকার লোক এইখানেই জগৎ জয় করিয়া লইয়াছে ও সে ব্রহ্মময় হইয়াছে। কেহ তাহার প্রিয় কার্য করিলে তাহাতে সে উৎফুল্ল হইয়া উঠে না আবার কেহ গাল দিলেও দুঃখীত হয় না।

আসক্ত লোক নিজের সুখ বাহিরে খোঁজে। যে অনাসক্ত সে সর্বদা অন্তরেই শান্তি পায়। কেননা সে বাহির হইতে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগমাত্রই দুঃখের কারণ। মানুষকে কামক্রোধাদির উপদ্রব সহ্য করিয়া লইতে হয়। অনাসক্ত যোগী সকল প্রাণীর হিতেই রত থাকে, সে সংসারের পীড়া পায় না। এই প্রকার যোগী বাহ্য জগৎ হইতে পৃথক হইয়া নিভৃতে থাকে, প্রাণায়ামাদি করিয়া ধ্যানমগ্ন হওয়ার চেষ্টা করে এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হয়। সে আমাকে সকলের মহেশ্বর ও মিত্র এবং যজ্ঞাদির ভোক্তা বলিয়া জানে ও শান্তি লাভ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যান যোগ

মঙ্গল-প্রভাত : ১৬. ১২. ৩০

শ্রীভগবান বলিলেন :—কর্মফল ত্যাগ করিয়া যে কর্তব্যকর্ম করে তাহাকে সন্ন্যাসী ও যোগী বলে। যে ক্রিয়ামাত্র ত্যাগ করিয়া বসে সে অলস। আসল কথা এই যে, মনকে ঘোড়দৌড় করানো ছাড়িয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তি যোগ অর্থাৎ সত্যের সাধনা করিতে চায় তাহার কর্ম না করিলে চলেই না। যে সমত্ব লাভ করিয়াছে সে শান্ত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। তাহার ইচ্ছা মাত্রেই কর্মের শক্তি যোগায়। যখন মানুষ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বা কর্মে অনুরক্ত হয় না ও মনের চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইয়াছে তখন তাহার যোগ সাধনা হইয়াছে—সে যোগারূঢ় হইয়াছে, একথা বলা যায়।

আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধার করিতে হয়। অর্থাৎ নিজেই নিজের শত্রু বা মিত্র হয়। যে মন জয় করিয়াছে আত্মাই তাহার মিত্র, আর যে মন জয় করে নাই আত্মাই তাহার শত্রু। যে মন জয় করিয়াছে তাহার দৃষ্টিতে শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অপমানই সকলই সমান। যাহার জ্ঞান হইয়াছে, যাহার জ্ঞান ব্যবহারে সিদ্ধ, যে অবিচল হইয়াছে, যে ইন্দ্রিয়ের উপর বিজয় লাভ করিয়াছে ও যাহার নিকট সোনা, মাটি, পাথর সব সমান তাহারই নাম যোগী। এইরূপ মানুষ শত্রু-মিত্র, সাধু-অসাধু ইত্যাদি প্রত্যেকের প্রতিই সমান ভাব রাখে।

এই প্রকার অবস্থায় পৌছিতে হইলে মন স্থির করিতে হয়, বাসনা ত্যাগ করিতে হয় ও একান্তে বসিয়া পরমাত্মার ধ্যান করিতে হয়। কেবল আসনাদি করাই যথেষ্ট নয়, যে সমত্ব পাইতে চায় তাহাকে ব্রহ্মচর্যাদি মহাব্রত ভালরূপে পালন করিতে হয়। এই প্রকার আসনবদ্ধ হইয়া যমনিয়মাদি পালনকারী নিজের মন পরমাত্মায় স্থির করে ও ইহা হইতে সে পরম শান্তি লাভ করে।

এই প্রকার সমত্ব পেটুকের মত আহার করিলে যেমন পাওয়া যায় না একেবারে উপবাস দ্বারাও তেমনি পাওয়া যায় না। অতিশয় নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও লাভ হয় না। সমত্বকামী ব্যক্তির আহার, পান, নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি সকল বিষয়েই সংযমের দৃষ্টি রাখা উচিত। একদিন খুব খাইলাম আবার অপরদিন উপবাস; একদিন খুব ঘুমাইলাম, অপর দিন জাগিয়া থাকিলাম, একদিন খুব কাজ করিলাম ও অপর দিন আলস্য করা হইল—ইহা যোগীর চিহ্ন

নয়। যোগী সর্বদাই স্থিরচিত্ত থাকে ও সকল কামনা সে সহজেই ত্যাগ করে। যোগী নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির হইয়া থাকে। জগতের উন্মাদনা বা মনের বিচারের ঢেউ তাহাকে টলাইতে পারে না। এই যোগ ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়তা পূর্বক চেষ্টা দ্বারা লাভ করা যায়। মন চঞ্চল বলিয়াই এদিকে সেদিকে দৌড়ায়। উহাকে ধীরে ধীরে স্থির করিতে হয়। স্থির হইলেই শান্তি পাওয়া যায়। মনকে এই প্রকার স্থির করার জন্য সর্বদা আত্ম-চিন্তন দরকার। এই প্রকার মানুষ সকল জীবকে নিজের মধ্যে ও নিজেকে সকলের মধ্যে দেখে। এমনি করিয়া সে সকলকে আমাতে ও আমাকে সকলের মধ্যে দেখিতে পায়। এইরূপে যে আমাতে লীন হয় ও আমার ভিতর সকলকে দেখিতে পায় তাহার আমিত্ব বা অহং লোপ পায়। সে যাহা খুশি করুক না কেন আমার মধ্যেই ওতঃপ্রোত হইয়া থাকে। না-করার যোগ্য কোন কাজ তাহার দ্বারা হয়ই না।

অর্জুনের নিকট এইরূপ যোগ কঠিন বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—এমন আত্মস্থিরতা কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? মন তো বাঁদরের মত চঞ্চল। বায়ু নিরোধ করার মত মন নিরোধ করাও দুঃসাধ্য। এইরূপ চঞ্চল মন কিভাবে ও কি অবস্থায় বশে আসিবে?

ভগবান উত্তর দিলেন—তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক, কিন্তু রাগ-দ্বেষ জয় করিলে ও চেষ্টা করিতে থাকিলে কঠিনকেও সহজ করা যায়। মন জয় না করিলে যে যোগ সাধন করা যায় না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অর্জুন আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ধর কাহারও শ্রদ্ধা আছে কিন্তু তাহার চেষ্টার ত্রুটি আছে সেইজন্যই সে সফল হয় না। এই প্রকার লোকের কি গতি হয়? সে ছিন্ন-মেঘের মত নষ্ট হয় না ত'?

ভগবান বলিলেন—এই প্রকার শ্রদ্ধাপরায়ণের বিনাশ হয়ই না। কল্যাণপথ যে লইয়াছে তাহার অধোগতি কখনও হয় না। এই প্রকার লোক মৃত্যুর পর নিজ কর্ম অনুযায়ী পুণ্য লোকে বাস করে, তাহার পর পৃথিবীতে আসিয়া পবিত্র ঘরে জন্ম লয়।

এইরূপ জন্ম জগতে দুর্লভ। এই প্রকার ঘরে আসিয়া তাহার পূর্ব জন্মের শুভ-সংস্কার দেখা দেয় এবং তাহার তখনকার চেষ্টা তীব্র হয় ও অবশেষে সে সিদ্ধি লাভ করে। এইভাবে চেষ্টা করিতে করিতে কেহ শীঘ্র অথবা কেহ অনেক জন্মের পর নিজের শ্রদ্ধা ও চেষ্টার বল অনুসারে সমত্ব লাভ করে। তপ, জ্ঞান ও বৈদিক কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া প্রভৃতি অপেক্ষা সমত্ব শ্রেষ্ঠ। কেন না তপস্যাদি হইতে

পরিণামে তো সমত্বই দেখা দেওয়া চাই। সেই হেতু তুমি সমত্ব লাভ কর ও যোগী হও। যোগীদের মধ্যে যে আমাকে সর্বস্ব অর্পণ করে এবং শ্রদ্ধাপূবক আমারই আরাধনা করে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ জানিবে।

এই অধ্যায়ে প্রাণায়াম আসনাদির স্তুতি আছে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহার সহিত ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য যম-নিয়মাদি পালনের আবশ্যকতার কথাও ভগবান বলিয়াছেন। কেবল আসনাদি ক্রিয়া হইতে সমত্ব লাভ হয় না। আসন প্রাণায়ামাদি মনকে স্থির করিতে, একাগ্র করিতে কিছুটা সাহায্য করে মাত্র, তাহাও যদি সেই উদ্দেশ্যে ঐ ক্রিয়াগুলি করা হয়। নতুবা উহাকে শারীরিক ব্যায়ামের মতই মূল্য দিবে। শারীরিক ব্যায়ামরূপে প্রাণায়ামাদির খুব উপযোগিতা আছে ও ব্যায়ামের মধ্যে এই ব্যায়াম সাত্ত্বিক বলিয়া আমি মনে করি। শারীর-দৃষ্টি হইতে ইহা অনুশীলন করার যোগ্য। কিন্তু উহার দ্বারা সিদ্ধি পাওয়া বা অলৌকিক কিছু করার উদ্দেশ্যে যদি ঐ ক্রিয়া করা যায় তবে লাভের পরিবর্তে হানি হয়—ইহাই আমি দেখিয়াছি।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহাররূপে এই অধ্যায় গ্রহণ করার যোগ্য। ইহাতে প্রযত্নশীলের আশ্বাস রহিয়াছে। আমরা যেন হারিয়া গিয়াও সমত্ব লাভের চেষ্টা কখনও না ছাড়ি।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ

মঙ্গল-প্রভাত : ২৩, ১২, ৩০

ভগবান বলিলেন—হে পার্থ, আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া আমার আশ্রয় লইয়া কর্মযোগের অনুশীলন করিতে করিতে মানুষ আমাকে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে জানে তাহা তোমাকে বলিব। এই অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানের কথা তোমাকে বলিতেছি, ইহার পর জানার আর কিছু বাকী থাকে না। হাজারের মধ্যে কচিৎ কেহ চেষ্টা করে এবং চেষ্টাকারীদের মধ্যে হাজারের ভিতর কচিৎ কেহ সফল হয়।

পৃথিবী, জল, আকাশ, তেজ ও বায়ু এবং মন, বুদ্ধি ও অহংভাব এই আট প্রকারের আমার এক প্রকৃতি আছে। ইহাকে অপরা প্রকৃতি বলে। ইহা হইতে পরা প্রকৃতি ভিন্ন। উহা জীবরূপ। এই দুই প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ দেহ ও জীবের সম্বন্ধ হইতে সারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সেই জন্যই সকলের উৎপত্তি

ও বিনাশের কারণ আমি। মণিসমূহ যেমন সূতায় গাঁথা থাকে তেমনই এই জগৎ আমার মধ্যে গ্রথিত হইয়া আছে। জলের মধ্যে আমিই রস, আমিই সূর্য-চন্দ্রের তেজ, বেদের ওঙ্কার, আকাশের ধ্বনি আমিই, পুরুষের পরাক্রম আমি, মাটির সুগন্ধ আমি, অগ্নির তেজ আমি, প্রাণীমাত্রের জীবন আমি, তপস্বীর তপও আমি, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং বলবানের শুদ্ধ বল আমি, জীবমাত্রের মধ্যে ধর্মের অবিরোধী কামনা আমি। সংক্ষেপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হইতে উৎপন্ন সকল ভাব আমা হইতে উৎপন্ন ও আমারই আশ্রয়ে থাকে জানিবে। এই তিন ভাবে বা গুণে জড়াইয়া থাকিয়া লোকে অবিনাশী আমাকে চিনিতে পারে না। এমনি আমার ত্রিগুণময়ী মায়া। উহা পার হওয়া কঠিন। কিন্তু যে আমার শরণ নেয় সে এই মায়া অর্থাৎ তিন গুণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু যাহার আচার বিচারের ঠিকানা নাই এমন মূঢ় লোক আমার শরণ কেমন করিয়া লইবে? তাহারা তো মায়ায় পড়িয়া অন্ধকারেই ঘুরিতেছে ও জ্ঞান লাভ করিতেছে না। কিন্তু যাহার আচার শুদ্ধ সে আমাকে পায়। ইহাদের মধ্যে কেহ বা নিজের দুঃখ মিটাইবার জন্য আমাকে ভজনা করে। কেহ বা আমাকে জানিবার জন্য আমার ভজনা করে। কেহ বা কিছু পাওয়ার আশায় আমার ভজনা করে। কেহ বা কর্তব্য বুঝিয়া জ্ঞানপূর্বক আমার ভজনা করে। আমার ভজনা করা মানে আমার জগতের সেবা করা। কেহ বা দুঃখে পড়িয়া, কেহ বা কোন লাভের জন্য, কেহ বা আমার চরিত্র দেখিয়া আমাকে সেবা করে। আবার কেহ বা বুঝিয়া সেবা ছাড়া থাকিতে পারে না বলিয়াই সেবা পরায়ণ থাকে। এই শেষের লোকেরা আমার জ্ঞানী ভক্ত এবং আমার প্রিয় হইতেও প্রিয়। আবার ইহাও বলা যায় যে, তাহারা আমার অধিকাধিক পরিচয় পাইয়াছে, আমার নিকটতম হইয়াছে। এই প্রকার জ্ঞান অনেক জন্মের পরই মানুষ পাইয়া থাকে। আর এই জ্ঞান পাইলে বাসুদেব ভিন্ন জগতে আর কাহাকেও সে দেখে না।

যাহাদের কামনা আছে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভজনা করে। আর যাহাদের যেমন ভক্তি তাহাদিগকে সেই অনুসারে আমি ফল দিয়া থাকি। এই হেতু যাহারা সামান্যমাত্র বুঝে তাহাদের ফল সামান্যই হয়। তাহাতেই তাহাদের সন্তোষও হয়। এই প্রকার লোক নিজেদের অল্পবুদ্ধির হেতু এই মনে করে যে, আমাকে তাহারা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে সমর্থ। তাহারা একথা বুঝে না যে,

আমার অবিনাশী ও অনুপম স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং হাত, কান, নাক, চোখ ইত্যাদির সাহায্যে আমাকে জানা যায় না। আমি সকল বস্তুর স্রষ্টা হইলেও অজ্ঞানী লোক আমাকে চিনিতে পারে না, ইহাই আমার যোগমায়া বলিয়া জানিও। রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি হইতে, দুঃখই হয় আর তাহাতে জগৎ মূর্ছিত বা মোহগ্রস্ত হয়। কিন্তু যাহারা তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছে, যাহাদের আচার বিচার নির্মল হইয়াছে তাহারা নিজ নিজ ব্রতে নিশ্চল থাকিয়া সর্বদা আমাকে ভজনা করে। তাহারা পূর্ণব্রহ্মরূপে সকল প্রাণীর মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতীয়মান জীবরূপে অবস্থিত আমাকে ও আমার কর্মকে জানে। এই ভাবে যাহারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞরূপে জানে তাহারা উহা হইতে সমত্ব লাভ করে এবং মৃত্যুর পর জন্ম-মরণের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কারণ আমাকে এই ভাবে জানার পর তাহাদের মন আর অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়ায় না এবং সমস্ত জগৎ তাহারা ঈশ্বরময় দেখিয়া ঈশ্বরের মধ্যেই লীন হইয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষর-ব্রহ্ম-যোগ

সোম-প্রভাত : ২৯, ১২, ৩০

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি পূর্ণব্রহ্ম, অধ্যাত্ম কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের নাম করিলে কিন্তু এ সকলের অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না। তুমি বলিলে যে, তোমাকে অধিভূতাদি রূপে যাহারা জানে তাহারা সমত্ব পাইয়া মৃত্যুর সময় তোমাকে চিনিতে পারে। এই সকল কথা আমাকে বুঝাও।

ভগবান উত্তর দিলেন—সর্বোত্তম নাশরহিতস্বরূপ যাহা, তাহাই পূর্ণ ব্রহ্ম ও যাহা প্রাণীমাত্রের কর্তা-ভোক্তা-রূপে দেহ ধারণ করিয়া আছে, তাহাই অধ্যাত্ম। প্রাণী-মাত্রের উৎপত্তি যে ক্রিয়া হইতে হয় তাহার নাম কর্ম। আবার ইহাও বলা যায় যে, যাহা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন তাহাই কর্ম। অধিভূত আমার বিনাশশীল দেহস্বরূপ, আর অধিযজ্ঞ হইতেছে যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধকরা ঐ অধ্যাত্মস্বরূপ। এমনি করিয়া দেহরূপে, মোহমুগ্ধ জীবরূপে, শুদ্ধ জীবরূপে ও পূর্ণব্রহ্মরূপে সমস্তই আমি। এইরূপ ভাবে আমাকে যে মরণ সময়ে ধ্যান করে, নিজেকে ভুলিয়া যায়, কোনও চিন্তা করে না, ইচ্ছা রাখে না, সে আমার স্বরূপই পায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। মানুষ যে স্বরূপের নিত্য ধ্যান করে এবং মরণকালেও যদি তাহারই ধ্যানে নিবিষ্ট থাকে

তবে সে সেই স্বরূপই পায়। সেইজন্য তুমি নিত্য আমারই স্মরণ করিতে থাকিও। আমার মধ্যেই মন ও বুদ্ধিকে লীন করিয়া ফেল, তাহা হইলে তুমি আমাকেই পাইবে। তুমি বলিবে, ইহাতে চিত্ত স্থির হয় না। তুমি জানিও যে, রোজ অভ্যাস দ্বারা, প্রতি দিনের চেষ্টা দ্বারা এই প্রকার একাগ্রতা লাভ হয়। কেননা এখনই আমি তোমাকে বলিয়াছি যে মূল বিচার করিতে গেলে, দেহধারী আমারই স্বরূপ। সেইজন্য মানুষের মন প্রথম হইতেই এমনভাবে গঠন করা চাই যে, মরণ সময়ে মন যেন না টলে, ভক্তিতে লীন থাকে, প্রাণকে স্থির রাখে ও আমাকে এই বলিয়া স্মরণ করে যে, আমিই সর্বজ্ঞ, পুরাতন ও নিয়ন্তা— সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও সকলকে পালন করার শক্তিধারণকারী, কিন্তু চিন্তা দ্বারা দুষ্প্রাপ্য। সূর্য যেমন অন্ধকার দূর করে তেমনি আমি অজ্ঞান নাশকারী এবং পরমাত্মা।

এই পরমপদকে বেদ সকল অক্ষরব্রহ্মরূপে জানে। রাগ-দ্বেষ ত্যাগী মুনিরা তাঁহাকে পায়। তাঁহাকে পাওয়ার ইচ্ছা যাহারা করে তাহারা সকলে ব্রহ্মচর্য পালন করে, অর্থাৎ কায়, বাক্য ও মনের উপর শাসন রাখে ও বিষয়মাত্র ত্যাগ করে। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখিয়া, ওঁ উচ্চারণ করিয়া আমাকেই চিন্তা করিতে করিতে যে স্ত্রী বা পুরুষ দেহত্যাগ করে সে পরম পদ লাভ করে। এই প্রকার লোকের চিত্ত অন্য কোথাও ঘুরিয়া বেড়ায় না। আমাকে যে পায় তাহার এই দুঃখময় সংসারে আর আসিতে হয় না। এই জন্ম-মরণ-চক্র হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় হইতেছে আমাকে পাওয়া।

নিজের শতবর্ষ জীবন কাল দ্বারা মানুষ কালের পরিমাপ করে এবং সেই সময়ের মধ্যে সে হাজার রকমের জাল বিস্তার করে। কিন্তু কাল তো অনন্ত। হাজার যুগকে ব্রহ্মার এক দিবস বলিয়া জানিও। ইহার মধ্যে মানুষের এক দিনের বা একশত বৎসরের মূল্য কি? এত অল্প সময়ের হিসাব করিয়া মিথ্যা কেন গর্ব করিবে? এই অনন্ত কালচক্রে মানুষের জীবন ক্ষণমাত্র, এই সময়টুকুর মধ্যে ঈশ্বর-ধ্যান করাই শোভা পায়। সে ক্ষণস্থায়ী ভোগের পিছনে কেন দৌড়াইবে? ব্রহ্মার রাত্রদিন উৎপত্তি ও নাশ চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে।

সৃষ্টি ও বিনাশকারী ব্রহ্মাও আমারই স্বরূপ। উহা অব্যক্ত, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ আমার আর এক অব্যক্ত স্বরূপ আছে তাহার কিছু বর্ণনা তোমার নিকট করিব। তাহা যে পায় তাহার জন্ম-মৃত্যু চলিয়া যায়। কেননা এই স্বরূপে রাত্র ও দিনের মত দ্বন্দ্ব নাই। ইহা কেবল শান্ত অচল

স্বরূপ। ইহার দর্শন অনন্য ভক্তির দ্বারাই সম্ভব। ইহারই আশ্রয়ে সমস্ত জগৎ রহিয়াছে, ঐ স্বরূপ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

এইরূপ বলা হয় যে, উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষের দিনে যে মরে সে উপরের নির্দেশ অনুযায়ী আমার স্মরণ করিয়া আমাকে লাভ করে। আবার দক্ষিণায়নের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে যে মরে তাহার পুনর্জন্মের ফেরে পড়িতে হয়। ইহার এই অর্থ করা যায় যে, উত্তরায়ণ ও শুক্লপক্ষ হইতেছে নিষ্কাম সেবামার্গ এবং দক্ষিণায়ণ ও কৃষ্ণপক্ষ হইতেছে স্বার্থমার্গ। সেবামার্গে মুক্তি ও স্বার্থমার্গে বন্ধন। সেবামার্গ হইতেছে জ্ঞানমার্গ, স্বার্থমার্গ হইতেছে অজ্ঞানমার্গ। যে জ্ঞানমার্গে চলে সে মোক্ষ লাভ করে, যে অজ্ঞানমার্গে চলে সে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই দুই পথের কথা জানার পর কে মোহে থাকিয়া অজ্ঞানমার্গকে পছন্দ করিবে? ইহা জানার পর মানুষ মাত্রেরই সমস্ত পুণ্যফল ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য পরায়ণ থাকিয়া উত্তম স্থান পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত, ইহাই আমার মত।

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ

সোম-প্রভাত : ৫. ১. ৩১

পূর্বের অধ্যায়ে যোগীর উচ্চস্থান বর্ণনা করিয়া, ভগবান এখানে ভক্তির মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন। কেননা গীতার যোগী শুষ্ক জ্ঞানী নয়, বিবশ ভক্তও নয়। গীতার যোগী জ্ঞান ও ভক্তিময় থাকিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্ম করে। এই হেতু ভগবান বলিলেন—তোমাতে দ্বেষ নাই সেজন্য তোমাকে গুহ্য জ্ঞানের কথা বলিতেছি, যাহা পাইলে তোমার কল্যাণ হইবে। এই জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও সহজেই আচরণ করা যায়। ইহাতে যাহার শ্রদ্ধা হয় না সে আমাকে পাইতে পারে না। মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার স্বরূপ দেখিতে না পাইলেও উহা জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জগৎ উহারই আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আছে। উহা জগতের আশ্রয়ে নাই। আবার এক দিক হইতে ইহাও বলা যায় যে, এই সকল প্রাণী আমাতে নাই ও আমি তাহাদের মধ্যে নাই। কেননা আমিই তাহাদের উৎপত্তির কারণ, পোষণ ও পালন-কর্তা। তাহারা আমার ভিতরে নাই ও আমি তাহাদের ভিতরে নাই, কেননা তাহারা অজ্ঞানে ডুবিয়া আমাকে জানে না। তাহাদের ভক্তি নাই। ইহাই আমার অলৌকিকত্ব বলিয়া জানিও।

কিন্তু আমি প্রাণীদের মধ্যে নাই এমন বোধ হইলেও আমি বায়ুর মত সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছি। সকল জীবই যুগান্তে লয় পায় ও যুগ আরম্ভে জন্মে। আমি এইসব কর্মের কর্তা হইলেও উহা আমাকে বন্ধন করে না। কারণ ঐ বিষয়ে আমার কোন আসক্তি নাই। এ সম্বন্ধে আমি উদাসীন। ইহাই আমার প্রকৃতি, ইহাই আমার স্বভাব বলিয়া এই কর্ম হয়। কিন্তু এই স্বরূপে আমাকে লোকে জানে না ও সেইজন্য তাহারা আমার অস্তিত্বই অস্বীকার করে। এই প্রকার লোক নিরর্থক আকাশ-কুসুম রচনা করে। তাহাদের কামনাও মিথ্যা হয়। তাহারা অজ্ঞানতায় ভরা হইয়া থাকে ও সেই হেতু তাহারা আসুরী বৃত্তিযুক্ত এ কথা বলা যায়। কিন্তু যাহারা দৈবী বৃত্তিযুক্ত তাহারা আমাকে অবিনাশী ও স্রষ্টা জানিয়া আমার ভজনা করে। তাহাদের সংকল্প দৃঢ় হয়, তাহারা নিত্য সচেষ্ট থাকে, আমার ভজন কীর্তন করে ও ধ্যান ধারণ করে। আবার কেহ আছে যাহারা আমিই এক—এই প্রকার জানে। আমার অনন্ত গুণ আছে সেই জন্য যাহারা আমাকে বহুরূপী মনে করে তাহারা আমার ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখে। কিন্তু ইহারা সকলেই ভক্ত জানিবে।

আমিই যজ্ঞের সংকল্প, আমিই যজ্ঞ। পিতৃদিগের আশ্রয় আমি, আমিই যজ্ঞের বনস্পতি। আমি মন্ত্র, আমি আহুতি, হবনে নিক্ষিপ্ত দ্রব্যও আমি। আমিই অগ্নি। আমি এই জগতের পিতামাতা। আমি জগৎ ধারণ করিয়া আছি। আমি পিতামহ। আমিই জানার যোগ্য। আমি ওঙ্কার, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ। আমি গতি, পোষণকারী, প্রভু ও সাক্ষী। আমি আশ্রয়, কল্যাণ-ইচ্ছুক, উৎপত্তি ও নাশকারী। শীত-উষ্ণ আমি, সৎ অসৎও আমি।

যাহারা বেদে বর্ণিত ক্রিয়াসমূহ করে তাহারা ফল পাওয়ার জন্যই করে। তাহারা যদিইবা স্বর্গ পায় তবুও জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে থাকে। কিন্তু যাহারা আমিই একমাত্র আদি এইভাবে আমার চিন্তা করে ও ভজনা করে তাহাদের সকল ভার আমি বহন করি। তাহাদের প্রয়োজন আমি পূর্ণ করি। আমিই তাহাদিগকে খাঁটি রাখি। কেহ কেহ অন্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাহাদিগকে ভজনা করে, তাহারা অজ্ঞান। কিন্তু তাহা হইলেও শেষ পর্যন্ত তো তাহারা আমারই ভজনা করে। কেননা আমি যজ্ঞমাত্রেরই স্বামী। কিন্তু আমার এই ব্যাপকতা না জানিয়া তাহারা অন্তিম অবস্থায় পৌঁছিতে পারে না। যাহারা দেবতার পূজা করে তাহারা দেবলোকে যায়, যাহারা পিতৃগণকে পূজা করে তাহারা পিতৃলোক পায়, যাহারা ভূত-প্রেতাদির পূজা করে তাহারা

প্রেতলোকে যায়। আর যাহারা জ্ঞানপূর্বক আমার ভজনা করে তাহারা আমাকে পায়।

যে একটা পাতার মত জিনিষও ভক্তিপূর্বক আমাকে অর্পণ করে সেইরূপ প্রযত্নশীল লোকের ভক্তি আমি স্বীকার করিয়া লই। সেই জন্যই তুমি যাহা কিছু কর সে সকলই আমাকে অর্পণ করিও। তাহা হইলে শুভাশুভ ফলের দায়িত্ব তোমার থাকিবে না, তুমি ফলমাত্র ত্যাগ করায় তোমার জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থাকিবে না। আমার নিকট সকল প্রাণীই সমান। কেহ প্রিয়, কেহ অপ্রিয়, এমন নাই। কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে তাহারা আমার মধ্যে আছে ও আমি তাহাদের মধ্যে আছি। ইহাতে পক্ষপাত নাই। ইহাতে তাহারা নিজেদের ভক্তির ফল লাভ করে। এই ভক্তির মহিমা এমন যে, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ হইয়া আমার ভজনা করে সে দুরাচারী হইলেও সাধু হইয়া যায়। সূর্যের নিকট অন্ধকার যেমন থাকিতে পারে না তেমনি যে লোক আমার আশ্রয় লয় তাহার দুষ্কৃতি নষ্ট হইয়া যায়। তুমি নিশ্চয় জানিও, যে ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করে তাহার কদাপি নাশ হয় না, সে ধর্মাত্মা হয় ও শান্তি লাভ করে। এই ভক্তির মহিমা এমন যে যাহারা পাপযোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হয় এবং নিরক্ষর স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা আমার আশ্রয় লইলে আমাকে পায়। অতএব পুণ্যকর্মকারী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের কথা আর বলার কি আছে? যে ভক্তি করে, সে-ই ফল পায়। তুমি অসার সংসারে জন্মিয়াছ, আমাকে ভক্তি করিয়া তুমি তরিয়া যাও। তোমার মন আমাতে গাঁথিয়া ফেল, আমার ভক্ত হও। আমার জন্যই যজ্ঞ কর, আমাকেই নমস্কার কর। এমনি করিয়া যদি তুমি আমাতে পরায়ণ হইয়া তোমার আত্মা আমাতে হোম করিয়া শূন্যবৎ হইয়া যাও, তবে তুমি আমাকেই পাইবে।

মন্তব্য ঃ—ইহা হইতে আমাদের বুঝা উচিত যে, ভক্তি মানে ঈশ্বরে আসক্তি। অনাসক্তি বিকাশ করার ইহাই সহজতম উপায়। সেইজন্য অধ্যায়ের আরম্ভে দৃঢ়ভাবে বলা হইয়াছে যে, ভক্তিই রাজযোগ ও সহজ মার্গ। ইহা যদি হৃদয়ে বসে তবেই সহজ নতুবা দুঃসাধ্য। সেইজন্যই ইহাকে জীবনদানের মত কঠিন বলিয়াও ধরা হয় কিন্তু "দেখনারা দাঝে জোনে, মাঁহি পড্যা তে মহাসুখ মাণে"—অর্থাৎ যাহারা বাহির হইতে দেখে তাহারা জ্বলে, কষ্ট পায়, যাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে তাহারা মহাসুখ অনুভব করে। কবি লিখিয়াছেন যে, 'সুধন্ব ফুটন্ত তেলের কড়াতে হাসিতেছিল'। নন্দ অন্ত্যজের অগ্নি

পরীক্ষার সময় সে আগুনের মধ্যে নাচিতেছিল বলিয়া কথিত আছে। এই সকল ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের পক্ষে ঠিক হইয়াছিল কি-না তাহা অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। কেহ কোন বস্তুতে লীন হইয়া গেলে তাহার এই অবস্থাই হয়। সে 'আমিত্ব' ভুলিয়া যায়। কিন্তু প্রভুকে ফেলিয়া অপর কিছুতে কে লীন হয়? চিনি ও আখের স্বাদ ছাড়িয়া তিক্ত নিমের রস আস্বাদ করিও না। চন্দ্র সূর্যের আলো পরিত্যাগ করিয়া জোনাকীর পিছনে ছুটিও না।

অতএব নবম অধ্যায় দেখাইতেছে যে, প্রভুতে আসক্তি বা ভক্তি না হইলে কর্মফলে অনাসক্তি অসম্ভব। শেষের শ্লোকে সমস্ত অধ্যায়ের সার রহিয়াছে। আমার ভাষায় উহার অর্থ—"তুমি আমার মধ্যে লীন হইয়া যাও।"

দশম অধ্যায়

বিভূতি-যোগ

সোম প্রভাত : ১২. ১. ৩১

ভগবান বলিলেন—ভক্তের কল্যাণের জন্য আবার তোমাকে বলিতেছি শোন,—দেবতা ও মহর্ষিরা পর্যন্ত আমার উৎপত্তির কথা জানে না, কেননা আমার উৎপত্তিই নাই। আমিই তাহাদের ও অন্য সকলের উৎপত্তির কারণ। যে জ্ঞানী আমাকে অজন্মা ও অনাদি বলিয়া জানে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। কারণ পরমেশ্বরকে এইরূপে জানার পর এবং নিজেকে তাঁহার সন্তান বা অংশ বলিয়া বুঝার পর মানুষের পাপবৃত্তি থাকিতে পারে না। পাপবৃত্তির মূলেই রহিয়াছে নিজের সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

যেমন প্রাণীসকল আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তেমনি প্রাণিগণের বিভিন্ন ভাব, যথা—ক্ষমা, সত্য, সুখ, দুঃখ, মৃত্যু, ভয়, অভয় প্রভৃতিও আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকলই আমার বিভূতি বলিয়া যাহারা জানে তাহাদের সহজেই সমতা উৎপন্ন হয় কারণ তাহারা অহঙ্কার ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহাদের চিত্ত আমাতে লীন হইয়া গিয়াছে। তাহারা আমাকে সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছে। তাহারা একে অপরের সহিতও আমারই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে, আমারই কীর্তন করে এবং সন্তোষ ও আনন্দে থাকে। যাহারা আমাকে এই ভাবে প্রেমের সহিত ভজনা করে, আমার মধ্যেই যাহাদের মন লীন হইয়া আছে তাহাদিগকে আমি জ্ঞান দিই, তাহার সাহায্যে তাহারা আমাকে পায়।

অর্জুন তখন তাঁহার স্তুতি করিয়া বলিলেন—তুমিই পরম ব্রহ্ম, পরমধাম ও পবিত্র, ঋষিরা তোমাকেই আদি দেব, জন্মরহিত ঈশ্বররূপে ভজনা করে একথা তুমিও বলিলে। হে প্রভু, হে পিতা, তোমার স্বরূপ কেহ জানে না। তুমিই তোমাকে জান। এখন তোমার বিভূতির কথা আমাকে বল আর তোমাকে চিন্তা করিতে করিতে কিরূপে তোমাকে জানিতে পারিব তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও।

ভগবান বলিলেন—আমার বিভূতি অনন্ত, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম তোমাকে বলিতেছি। আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে রহিয়াছি। আমি তাহাদের আদি, মধ্য ও অন্ত। আমি আদিত্যদের মধ্যে বিষ্ণু, উজ্জ্বল বস্তুর মধ্যে প্রকাশমান সূর্য, বায়ুদিগের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র, বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়দের মধ্যে মন, প্রাণীদের মধ্যে চেতনাশক্তি, রুদ্রদের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসদের মধ্যে কুবের। দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, পশুদের মধ্যে সিংহ, পক্ষীদের মধ্যে গরুড়, ছলকারীদের মধ্যে পাশা খেলা বলিয়া আমাকে জানিও। এই জগতে যাহা কিছু আছে আমার আজ্ঞা বিনা কেহই থাকিতে পারে না। ভালমন্দ আমিই হইতে দিলে তবে হয়। এই প্রকার জানিয়া মানুষের অহংকার ছাড়িতে হয় ও মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করিতে হয়। কেননা ভালমন্দের ফলদাতাও আমিই। তুমি এইটুকু জানিয়া রাখ যে, সমস্ত জগৎ আমার বিভূতির এক অংশ মাত্রেই দাঁড়াইয়া আছে।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন-যোগ

সোম প্রভাত : ১৯. ১. ৩১.

অর্জুন বিনয় পূর্বক বলিলেন—হে ভগবান, তুমি আত্মার সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিলে তাহাতে আমার মোহ দূর হইয়াছে। তুমিই সব, তুমিই কর্তা, তুমিই সংহারকারী, তুমিই নাশরহিত। যদি সম্ভব হয় তবে তোমার ঈশ্বরীয় রূপ আমাকে দেখাও।

ভগবান বলিলেন—আমার রূপ হাজার হাজার, তাহার বর্ণও অনেক। উহাতে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ইত্যাদি অবস্থিত। চর অচর সহিত সমস্ত জগৎ আমাতে প্রবেশ করিয়া আছে। এই রূপ তোমার চর্ম চক্ষু দ্বারা তুমি

দেখিতে পারিবে না। সেইজন্য তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিতেছি তাহার দ্বারা তুমি দেখ।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—হে রাজন্, ভগবান্ অর্জুনকে এই বলিয়া নিজের অদ্ভুত রূপ দেখাইলেন। উহা বর্ণনা করা যায় না। আমরা তো প্রতিদিন একটি মাত্র সূর্য দেখিয়া থাকি। কিন্তু মনে করুন যদি হাজার হাজার সূর্য উঠে তবে তাহাদের যে তেজ তাহা অপেক্ষাও তাঁহার তেজ উজ্জ্বল হইল। তাঁহার ভূষণ ও বস্ত্রাদিও স্বর্গীয়, তাঁহাকে দর্শন করিয়া অর্জুনের রোমাঞ্চ হইল, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

হে দেব, তোমার এই বিশাল দেহে আমি সকলকে দেখিতেছি। উহাতে ব্রহ্মা আছেন, মহাদেব আছেন, উহাতে ঋষিগণ আছেন, সর্পও আছে। তোমার হাত ও মুখ গণিয়া শেষ করা যায় না। তোমার আদি নাই, তোমার অন্ত নাই, মধ্য নাই। হে তেজপুঞ্জ, তোমার রূপ দেখিয়া চোখ ঝলসাইয়া যায়। তুমি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতেছে ও উত্তাপ দিতেছ। তুমিই জগতের আধার, তুমিই পুরাণ পুরুষ, তুমিই ধর্মের রক্ষক। যে দিকে তাকাই সে দিকেই তোমার রূপ দেখি। সূর্য-চন্দ্র যেন তোমার চক্ষু বলিয়া মনে হয়। তুমি এই পৃথিবী ও আকাশ ব্যাপিয়া আছ। তোমার তেজে সমস্ত জগৎ তপ্ত হইতেছে। এই জগৎ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দেবতা, ঋষি ও সিদ্ধপুরুষগণ সকলে হাত জোড় করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার স্তুতি করিতেছে। এই বিরাট রূপ ও তেজ দেখিয়া আমি ব্যাকুল হইয়া গিয়াছি। শান্তি ও ধৈর্য রাখিতে পারিতেছি না। হে দেব, প্রসন্ন হও। তোমার দাঁত করাল। তোমার মুখের ভিতরে আগুনে পতঙ্গ পড়ার মত সমস্ত লোক পড়িতেছে দেখিতেছি। তুমি তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছ। কে তুমি এই উগ্ররূপ? তোমার কর্ম প্রচেষ্টা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

ভগবান্ বলিলেন—লোকনাশকারী কাল আমি। তুমি যুদ্ধ কর বা নাই কর এ সকলকার নাশ হইয়াই আছে। তুমি তো কেবল নিমিত্তমাত্র।

অর্জুন বলিলেন—হে দেব, হে জগন্নিবাস, তুমি অক্ষর, তুমি সৎ, তুমি অসৎ ও তাহার পর যাহা তাহাও তুমিই। তুমি আদি দেব, তুমি পরাণ পুরুষ, তুমি এই জগতের আশ্রয়। তুমিই জানার যোগ্য। তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি ও প্রজাপতি। তোমাকে অসংখ্য নমস্কার। এক্ষণে তোমার মূলরূপ ধারণ কর।

একথা শুনিয়া ভগবান বলিলেন—তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমাকে

আমার এই বিশ্বরূপ দেখাইলাম। বেদ অভ্যাস, যজ্ঞ, অন্য শাস্ত্র অভ্যাস দান ও তপস্যা দ্বারাও আমার এরূপ দেখা যায় না। সেই রূপ তুমি আজ দেখিলে। ইহা দেখিয়া তুমি ঘাবড়াইয়া যাইও না। ভয় ত্যাগ করিয়া শান্ত হও ও আমার পরিচিত রূপ দেখ। আমার এই প্রকার দর্শন দেবতাদেরও দুর্লভ। এই দর্শন কেবল শুদ্ধভক্তি দ্বারাই হইতে পারে। যে নিজের সমস্ত কার্য আমাকে সমর্পণ করে, যে আমাতে পরায়ণ থাকে, আমার ভক্ত হয়, যে আসক্তিমাত্র ত্যাগ করে, যে প্রাণীমাত্র সম্বন্ধেই প্রেমময় হয় সে-ই আমাকে পায়।

মন্তব্য :—দশম অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়কেও আমি ইচ্ছা করিয়াই সংক্ষেপ করিয়াছি। এই অধ্যায় কাব্যময়। সেইজন্য মূলে বা অনুবাদে যেমন আছে তেমনি পুনঃ পুনঃ পাঠ করার যোগ্য। উহা হইতে ভক্তি-রস উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সে রস উৎপন্ন হইয়াছে কি না তাহা জানার কষ্টিপাথর হইতেছে শেষের শ্লোক। সর্বার্পণ ছাড়া, সর্বব্যাপক প্রেম ছাড়া ভক্তি হয় না। ঈশ্বরের কালরূপ মনন করিলে এবং তাঁহার মুখে সমস্ত প্রবেশ করিতেছে, প্রতিক্ষণ কাল এই কাজই চালাইতেছে, এই প্রকার অনুভব হইলে সর্বার্পণ এবং জীবমাত্রের সহিত ঐক্য সহজ হয়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই মুখে এক অনিশ্চিত ক্ষণে পড়িতেই হইবে। সেখানে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, স্ত্রী-পুরুষের কোনও ভেদ নাই। সমস্ত কালেশ্বরের এক গ্রাস মাত্র জানিয়া আমরা সকলেই কেন দীন ও শূন্যবৎ হই না? কেন সকলের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হই না? এইরূপ করিতে পারিলে তাঁহার কালরূপ ভয়ঙ্কর লাগিবে না—পরন্তু শান্তির স্থান হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তি-যোগ

মঙ্গল-প্রভাত : ৪. ১১. ৩১

আজ দ্বাদশ অধ্যায়ের মর্ম লিখিতেছি। উহা 'ভক্তিযোগ'। বিবাহের সময় দম্পতিকে পাঁচ যজ্ঞের মধ্যে ইহা এক যজ্ঞরূপে কণ্ঠস্থ করিয়া মনন করিবার জন্য বলা হয়। ভক্তি ছাড়া জ্ঞান ও কর্ম শুষ্ক, বন্ধনরূপ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য ভক্তিময় হইয়া গীতার এই অধ্যায় মনন করিতে হইবে।

অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সাকার পূজক ও নিরাকার পূজক

ভক্তদিগের মধ্যে বেশী ভাল কে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া ভগবান বলিতেছেন—যাহারা আমার সাকার রূপের শ্রদ্ধাপূর্বক মনন করে ও তাহাতেই লীন হইয়া যায়, তাহারাই আমার শ্রদ্ধাবান ভক্ত। যাহারা নিরাকার তত্ত্বের ভজনা করে ও তাহাকে ভজনা করার জন্য যাহারা ইন্দ্রিয়মাত্রেরই সংযম করে, সকল জীবের প্রতি সমভাব রাখে, তাহাদের সেবা করে, কাহাকেও উচ্চ-নীচ বলিয়া গণনা করে না তাহারা আমাকে পায়। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও বিশেষ ভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা যায় না। কিন্তু নিরাকারে সম্পূর্ণ ভক্তি শারীরীর পক্ষে অসম্ভব বলা যায়। নিরাকার অর্থে নির্গুণ। উহা মানুষের কল্পনারও অতীত। সেইজন্য সকল দেহধারী জানিয়া না জানিয়াও সাকারের ভক্ত। তুমি সাকার বিশ্বরূপেই তোমার মন সংলগ্ন করিও। সকলই তাহারই নিকট ধরিয়া দিও।

ইহা যদি করিতে না পার তবে চিত্তের বিকার আটকাইবার অভ্যাস কর, অর্থাৎ যমনিয়মাদির পালন করিয়া প্রাণায়াম আসনাদির সাহায্য লইয়া মনের উপর অধিকার লাভ কর। ইহাও যদি করিতে না পার, তবে আমার জন্য করিতেছ, এই ধারণা হইতে সকল কাজ কর। ইহাতে তোমার মোহ ও মমতা কমিবে এবং সেই পরিমাণে তুমি নির্মল ও শুদ্ধ হইবে ও তোমাতে ভক্তির রস আসিবে।

ইহাও যদি সম্ভব না হয় তবে কর্ম মাত্রের ফল ত্যাগ করিয়া যাও অর্থাৎ ফলের ইচ্ছা ছাড়িয়া দাও। তোমার ভাগে যে সেবা কাজ আসিয়া পড়ে তাহাই করিয়া যাও। ফলের কর্তা মানুষ হইতে পারে না। ফল উৎপন্ন করিতে অনেক অঙ্গাদি একত্র করিতে হয় তবেই উহা উৎপন্ন হয়। সেই জন্য তুমি নিমিত্তমাত্র হও। এই যে চার রীতি বলিলাম ইহার মধ্যে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এমন নয়। ইহার মধ্যে যেটা তোমার ভাল লাগে তাহা হইতেই তুমি ভক্তির রস গ্রহণ কর। এমন মনে হয় যে, উপরে যে-সকল যমনিয়ম আসনাদির পথ বলিলাম তাহা অপেক্ষা শ্রবণ-মনন আদি জ্ঞানমার্গ সহজ। তাহা অপেক্ষা উপাসনারূপ ধ্যান সহজ এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ সহজ। সকলের জন্য একই বস্তু সমপরিমাণে সহজ নয়। এমন কি কাহাকেও তো সকল মার্গই লইতে হয়। উহারা একটা আর একটার ভিতরে তো বটেই। তোমাকে তো যেমন করিয়া পার ভক্ত হইতেই হইবে। যে মার্গে তোমার ভক্তি আসে তুমি সেই মার্গ লইয়া সাধনা কর।

ভক্ত কাহাকে বলে সে কথা আমি তোমাকে জানাইতেছি। ভক্ত কাহারও প্রতি দ্বেষ করে না, কাহারও প্রতি বৈরভাব রাখে না, জীবমাত্রের সহিত মৈত্রী

রক্ষা করে, জীবমাত্রের প্রতি করুণা প্রকাশ করে। এই প্রকার করিতে গিয়া সে মমতা ত্যাগ করে, নিজের অহং মিটাইয়া শূন্যবৎ হইয়া যায়। এইরূপ মানুষ সুখ-দুঃখ সমান গণ্য করে, কেহ দোষ করিলে তাহাকে ক্ষমা করে (যেমন সে নিজের দোষের জন্য সারা জগতের কাছে ক্ষমা চাহিয়া থাকে), সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে, নিজের শুভ সংকল্প হইতে কখনও বিচ্যুত হয় না, মন ও বুদ্ধির সহিত সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করে। যাহা হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না, যে লোককে ভয় দেখায় না আবার লোকের নিকট হইতে দুঃখ বা ভয় পায় না, সে আমার ভক্ত। সে হর্ষ, শোক, ভয় ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়, তাহার কোনও প্রকারের ইচ্ছা থাকে না, সে পবিত্র হয়, কুশল হয়। সে বড় বড় কাজ ইচ্ছা করিয়া আরম্ভ করিবার অভ্যাস ছাড়িয়া দেয়। সে নিজের সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকে এবং শুভ ও অশুভ এই দুই পরিণাম ত্যাগ করে অর্থাৎ পরিণামের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়। তাহার শত্রুই বা কে আর মিত্রই বা কে? তাহার আবার মান-অপমান কিসের? মৌন ধারণ করিয়া যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সে যেন একাই এমন ভাবে বিচরণ করে ও সকল প্রকার অবস্থাতেই স্থির থাকে। এই ভাবে যে শ্রদ্ধাবান হইয়া আচরণ করে সে আমার প্রিয় ভক্ত।

মন্তব্য :—

প্রশ্ন :—ভক্ত আরম্ভ করে না ইহার অর্থ কি, দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিন।

উত্তর :—ভক্ত আরম্ভ করে না মানে সে কোন ব্যবসার পরিকল্পনা গড়িয়া তোলে না। ব্যবসায়ী হইয়া আজ কাপড়ের ব্যবসা করিতেছে, কাল কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করিল এবং সে কারবার বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। অথবা কাপড়ের ব্যবসায় আজ এক দোকান, কাল অপর পাঁচটা বসাইল,—ইহারই নাম আরম্ভ। ভক্ত ইহাতে যেন না পড়ে। এই নিয়ম সেবাকার্যেও খাটে। আজ খাদির ভিতর দিয়া সেবা করিতেছে ও কাল গাই-এর সেবা আরম্ভ করিল, পরদিন চাষের ভিতর দিয়া ও পরবর্তী দিন ডাক্তারীর মাধ্যমে সেবা করিতে লাগিল। এমন সেবক পড়িয়া যায়। তাহার ভাগে যে সেবাকার্য আসিয়া পড়ে তাহা পুরাপরি করিয়া তবে ছুটি। যেখানে 'আমি'ই চলিয়া গিয়াছে, সেখানে 'আমার' আর করার কি আছে?

"সুতরণে তাঁতণে মনে হরজীয়ে বাঁধী
জেম তাণে তেম তেমনী রে ;
মনে লাগী কটারী প্রেমনী রে।"

অর্থাৎ ঈশ্বর আমাকে সুতার তারে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যেমন যেমন টানিতেছেন আমি তেমন তেমনই তাঁহার হইতেছি। আমার মনে প্রেমের বর্শা বিদ্ধ হইয়াছে।

ভক্তের সকল আরম্ভই ভগবান রচনা করেন। তাহার সকল কর্ম প্রবাহের মত হইতে থাকে সেইজন্যই তো বলা চলে "সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।" সর্বারম্ভ মানে সকল প্রবৃত্তি বা সকল কার্য নয়। সকল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য করার ইচ্ছা। উহার ত্যাগ মানে আরম্ভ না করা। ছুটাছুটির অভ্যাস ছাড়িবে। "ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্" এই ভাব আরম্ভ পরিত্যাগের বিপরীত। আমার মনে হয় তোমার যাহা জিজ্ঞাসা ছিল তাহার সমস্ত জবাবই ইহাতে আছে। যদি বাকী থাকে তবে জিজ্ঞাসা করিও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ

সোম-প্রভাত: ১৯. ১. ৩২

ভগবান বলিলেন—এই শরীরের অন্য নাম ক্ষেত্র। আর ক্ষেত্রকে যে জানে সে ক্ষেত্রজ্ঞ। সমস্ত শরীরেই আমি আছি। আমাকেই ক্ষেত্র বলিয়া জানিও। খাঁটি জ্ঞান তাহাই যাহাতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে ভেদ জানা যায়। পঞ্চ মহাভূত—পৃথিবী, জল, আকাশ, তেজ ও বায়ু; অহংকার, বুদ্ধি প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় (পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়); এক মন, পাঁচ বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ শরীর যাহাতে তৈরী তাহাদিগের এক হইয়া থাকার শক্তি, চেতন শক্তি ও শরীরের পরমাণুগুলির একে অপরের সহিত লগ্ন হইয়া থাকার গুণ; এইগুলি মিলিয়া বিকারযুক্ত ক্ষেত্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই শরীর ও উহার বিকারের কথা জানা চাই। কেননা উহা ত্যাগ করিতে হইবে। উহা ত্যাগ করিতে হইলে জ্ঞান চাই। জ্ঞান হইতেছে অহং ত্যাগ, দম্ভ ত্যাগ। অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শুদ্ধতা, স্থিরতা, বিষয়ের উপর সংযম, বিষয় সম্বন্ধে বৈরাগ্য, অহংকার ত্যাগ, জন্ম-মৃত্যু-জরা ও তাহার সম্পর্কিত রোগ, দুঃখ ও তাঁহার সহিত নিত্য যুক্ত দোষের পূর্ণ অনুভব, স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাহির, আত্মীয়-স্বজন হইতে মন তুলিয়া লওয়া ও মমত্ব দূর করা, নিজের ইচ্ছা অনুসারে কিছু হউক অথবা না হউক সে বিষয়ে সমতা রক্ষা করা। ঈশ্বরে অনন্য ভক্তি।

একা নির্জনে থাকা। সংসারে থাকিলেও ভোগ্য বস্তুর ভোগে অরুচি, আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানের তৃষ্ণা ও অবশেষে আত্মদর্শন।

ইহা হইতে যাহা বিপরীত তাহাই অজ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা বিকাশ করার ও জানার বস্তু হইতেছে জ্ঞেয়, যাহাকে জানিলে মোক্ষ পাওয়া যায়—তাহার বিষয় শোন। এই জ্ঞেয় অনাদি পরব্রহ্ম। অনাদি এইজন্য যে, তাহার জন্ম নাই। যখন কিছুই ছিল না তখনও পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন—উহার অতীত। অন্য দৃষ্টিতে ইহাকে সৎ বলা যায় কেননা তিনি নিত্য। তাহা হইলেও তাঁহার নিত্যতা লোকে দেখিতে পায় না সেইজন্য তাঁহাকে সৎ-এর অতীত বলিলাম। তিনি ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ সবই তাঁহার দ্বারা পূর্ণ। তাঁহাকে হাজার হাত-পা-যুক্ত বলা যায়। তাঁহার হাত-পা ইত্যাদি আছে এমন মনে হইলেও তিনি ইন্দ্রিয়রহিত। তাঁহার ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা নাই। তিনি উহাতে অলিপ্ত। ইন্দ্রিয় তো আজ আছে কাল নাই।

পরব্রহ্ম হইতেছেন নিত্য। তিনি যেহেতু সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াও সকলকে ধারণ করিয়া আছেন সেইজন্য তিনি গুণের ভোক্তা তথাপি তিনি গুণরহিত। যেখানে গুণ আছে সেইখানেই বিকার আছে আর পরব্রহ্ম হইতেছেন বিকারের অতীত। গুণ মানেই বিকার। এই পরব্রহ্ম প্রাণীদিগের বাহিরে আছেন এমন বলা হয় কেননা যে তাঁহার পরিচয় পায় নাই তাহার নিকট তো তিনি বাহিরেই আছেন। আবার তিনি প্রাণীদিগের অন্তরে, কেননা তিনি সর্বব্যাপক। তেমনি তিনি গতিশীল ও স্থির। তিনি এমন সূক্ষ্ম যে, সেজন্য তাঁহাকে জানা যায় না। তিনি দূরে আছেন আবার নিকটেও আছেন। নামরূপের নাশ হইলেও তিনি থাকেন সেইজন্য তিনি অবিভক্ত। আর তিনি অসংখ্য প্রাণীদিগের মধ্যে থাকেন সেজন্য তিনি বিভক্তরূপে প্রতিভাত হন। তিনিই সৃজন করেন, পালন করেন ও ধ্বংস করেন। তিনি তেজেরও তেজ ও অন্ধকারেরও পরপারে। তিনি জ্ঞানের সীমা। এই প্রকার পরব্রহ্ম জানার যোগ্য অর্থাৎ তিনি জ্ঞেয়। জ্ঞান মাত্র পাওয়া মানে তাঁহাকেই পাওয়া।

প্রভু ও তাঁহার মায়া অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। মায়া হইতেই বিকার উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে অনেক প্রকার কর্মের সৃষ্টি হয়। মায়ার জন্যই লোকে সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের ভোক্তা হয়। ইহা জানিয়া যে অলিপ্ত থাকিয়া কর্তব্য কর্ম করে সে কর্ম করা সত্ত্বেও পুনর্জন্মের ফেরে পড়ে না, কেননা

সে সর্বত্র ঈশ্বরকেই দেখিতে পায়। ঈশ্বরের প্রেরণা বিনা একটা পাতাও নড়িতে পারে না, ইহা জানিয়া সে নিজের বিষয়ে অহঙ্কার ছাড়ে, নিজেকে শরীর হইতে স্বতন্ত্র দেখে ও সেইমত বুঝে। আকাশ সর্বত্র থাকিয়াও যেমন অলিপ্ত, তেমনি জীব শরীরে থাকা সত্বেও জ্ঞান দ্বারা অলিপ্ত থাকিতে পারে।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ

মৌন বার : ২৩. ১. ৩২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—যে উত্তম জ্ঞান পাইয়া মুনি-ঋষিরা পরম সিদ্ধি পাইয়াছেন সেই কথা তোমাকে আবার বলিতেছি। সেই জ্ঞান পাইয়া ও সেই জ্ঞান অনুযায়ী আচরণ করিয়া লোক জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে রক্ষা পায়। হে অর্জুন, আমাকেই আমাকে মাতাপিতা বলিয়া জানিও। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহাই দেহীদিগকে বাঁধে। এই গুণগুলিকে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এইরূপ ক্রম অনুসারে বলিলেও চলে। ইহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল, নির্দোষ ও প্রকাশকারী। সেইজন্য উহার সঙ্গ সুখদায়ক হয়। রজস্ রাগ ও তৃষ্ণা হইতে উৎপন্ন হয় এবং উহা মানুষকে চঞ্চলতার মধ্যে ফেলে। তমসের মূলে অজ্ঞান ও মোহ এবং সেইজন্য উহাতে মানুষ প্রমাদী ও অলস হয়। সংক্ষেপে বলিলে সত্ত্ব হইতে সুখ, রজঃ হইতে কর্মচাঞ্চল্য ও তমঃ হইতে আলস্য উৎপন্ন হয়। রজঃ ও তমঃকে দাবাইয়া সত্ত্ব জয়ী হয়, সত্ত্ব ও তমঃকে দাবাইয়া রজঃ জয়ী হয় এবং সত্ত্ব ও রজঃকে দাবাইয়া তমঃ জয়ী হয়। দেহের সমস্ত ব্যাপারে যেখানে জ্ঞানের অনুভব পাওয়া যায় সেখানে তখন সত্ত্বগুণ প্রধান হইয়া কার্য করিতেছে জানিবে। যেখানে লোভ, চাঞ্চল্য অশান্তি, প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে রজোগুণের বৃদ্ধি জানিবে। যেখানে মোহ ও আলস্য অনুভব করা যায় সেখানে তমঃ-এর রাজ্য বলিয়া জানিবে। যাহার জীবনে সত্ত্বগুণ প্রধান তাহার মরণান্তে জ্ঞানময় নির্দোষ লোকে জন্ম হয়, রজঃ-প্রধান ব্যক্তি কর্মময় লোকে যায় ও তমঃ প্রধান হইলে সে মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখময় ও তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞানময়। সাত্ত্বিক লোকের গতি উচ্চ, রাজসিকের মধ্যম এবং তামসিকের অধোগতি হয়। মানুষ যখন গুণ হইতে

অন্য কর্তা দেখে না, আমাকে গুণের অতীত বলিয়া জানে, তখন সে আমার ভাব পায়। দেহস্থ এই তিন গুণ যে অতিক্রম করিতে পারে সে জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ অতিক্রম করিয়া অমৃতময় মোক্ষ লাভ করে।

গুণাতীতের যদি এমন সুন্দর গতি হয় তবে তাহার চিহ্ন কি, তাহার আচরণ কেমন আর তিন গুণ কেমন করিয়া অতিক্রম করা যায়—এই তিন প্রশ্ন অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভগবান্ উত্তর দিলেন—যে মানুষ নিজের উপর যাহাই আসিয়া পড়ুক—প্রকাশ হউক কিম্বা প্রবৃত্তি বা মোহ হউক; জ্ঞান হউক, কর্মচঞ্চলতা হউক বা অজ্ঞতা হউক তাহার চাপে দুঃখ বা সুখ মনে করে না, যে গুণের বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া বিচলিত হয় না, গুণ নিজের স্বভাব অনুসারে কাজ করিয়া যাইতেছে ইহা বুঝিয়া যে স্থির থাকে, সে সুখ-দুঃখ সমান জ্ঞান করে। যাহার নিকট মাটির ঢেলা, পাথর ও সোনা সমান, তাহার প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া কিছু নাই। যাহাকে স্তুতি ও নিন্দা স্পর্শ করিতে পারে না, যাহার নিকট মান অপমান সমান, যে শত্রু-মিত্রের প্রতি সমভাব রাখে, যে সকল আরম্ভ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে গুণাতীত বলা যায়। এই সব লক্ষণের কথা শুনিয়া ভয় পাইয়া যাইও না বা অলস হইয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিও না। আমি যে কথা বলিলাম উহা তো সিদ্ধ অবস্থার কথা। উহাতে পৌঁছিবার মার্গ হইতেছে এই—ব্যভিচাররহিত ভক্তির দ্বারা আমার ভজনা করা। তৃতীয় অধ্যায়ে তোমাকে দেখাইয়াছি যে কর্ম বিনা, প্রবৃত্তি বিনা কেহ শ্বাস পর্যন্ত লইতে পারে না, অর্থাৎ কর্ম তো দেহী মাত্রের জন্য লাগিয়াই আছে। যে গুণাতীত হওয়ার ইচ্ছা রাখিবে, সে সাধক সকল কর্ম আমাকে অর্পণ করিবে এবং ফলের ইচ্ছামাত্রও করিবে না। এমনি করিতে করিতে তাহার কর্ম তাহাকে বাধা দিবে না। আমিই ব্রহ্ম, আমিই মোক্ষ, আমিই সনাতন ধর্ম, আমি অনন্ত সুখ। মানুষ যখন শূন্যবৎ হয় তখন আমাকে সম্পূর্ণরূপে দেখে—ইহাই গুণাতীত হওয়া।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম-যোগ

সোম-প্রভাত : ৩০. ১. ৩২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই সংসারকে দুই প্রকারে দেখা যায়। এক, এই—যাহার মূল উচ্চে রহিয়াছে, যাহার শাখা নীচের দিকে ও বেদই যাহার পাতা। সংসারকে যে এই প্রকার বটগাছ বলিয়া জানে সে বেদজ্ঞ জ্ঞানী। সংসার দেখার অপর রীতি এই—সংসার গাছের শাখা উপরে ও নীচে বিস্তৃত, উহাতে তিন গুণ দ্বারা বর্ধিত বিষয়রূপ অঙ্কুর আছে, সেই বিষয় মনুষ্যলোকে জীবকে কর্মের বন্ধনে বাঁধে। এই বৃক্ষের স্বরূপ জানা যায় না। এই দ্বিতীয় প্রকার সংসার বৃক্ষের মূল বেশ শক্ত বদ্ধ আছে, কিন্তু তবুও তাহাকে অসহযোগরূপ অস্ত্র দ্বারা কাটিবে যাহাতে আত্মা সেই লোকে যাইতে পারে যেখান হইতে আর ফিরিতে হয় না। ইহা করিতে হইলে তুমি সর্বদা আদি পুরুষের ভজনা করিবে, যাহার মায়াতে এই পুরাণ-প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়া আছে। যাহারা মান মোহ ছাড়িয়া দিয়াছে, যাহারা সঙ্গদোষ জয় করিয়াছে, যাহারা আত্মায় লীন হইয়া আছে, যাহারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, যাহাদের নিকট সুখ-দুঃখ সমান, সেই জ্ঞানীগণ অব্যয় পদ পায়।

যে স্থানে সূর্য, চন্দ্র বা আগুনকে তেজ দিতে হয় না, যেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, উহাই আমার পরম স্থান।

জীবলোকে আমার সনাতন অংশ জীবরূপে প্রকৃতিতে স্থিত মন সহিত ছয় ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। যখন জীব দেহ ধারণ করে বা ত্যাগ করে তখন বায়ু যেমন নিজের স্থান হইতে গন্ধ সঙ্গে লইয়া ফিরে তেমনি এই জীব ইন্দ্রিয়গুলি সঙ্গে লইয়া ফিরে। কান, চোখ, চামড়া, জিভ, নাক ও মনের আশ্রয় লইয়া জীব বিষয়ের সেবা করে। চলিতে বা স্থির থাকিতে বা ভোগ করিতে এই জীবকে মোহগ্রস্ত অজ্ঞানী জানিতে পারে না, জ্ঞানী জানিতে পারে। যত্ন করিলে যোগীরাও নিজের ভিতর স্থিত এই জীবকে দেখিতে পায়। কিন্তু যাহারা সমভাবরূপী যোগ সাধন করে নাই তাহারা যত্ন করিলেও ইহাকে দেখিতে পায় না।

সূর্যের যে কিরণ জগৎকে আলোকিত করে, যে তেজ চন্দ্রে আছে, আগুনে আছে, সে সকলই আমার তেজ বলিয়া জানিও। শরীরে প্রবেশ করিয়া আমার

শক্তিতে আমি জীবদিগকে ধারণ করিয়া আছি। রস উৎপন্নকারী সোম হইয়া ঔষধি মাত্র পোষণ করিতেছি। প্রাণীর দেহে জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান করিয়া চারি প্রকার অন্ন হজম করি। সকলের হৃদয়ে আমি আছি। আমার দ্বারাই স্মৃতি, জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে। সকল বেদ দ্বারা আমিই জ্ঞাতব্য (জানার যোগ্য)। বেদান্তও আমি, বেদজ্ঞও আমিই।

এই জগতে দুই পুরুষ আছে বলা হয়—ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ নাশবন্ত ও নাশরহিত পুরুষ। ইহাদের মধ্যে জীবকে ক্ষর বলে তাহাতেই স্থিরভাবে অবস্থিত আমি অক্ষর। আবার তাহারও পর এমন এক উত্তম পুরুষ আছে যাহাকে পরমাত্মা বলে। এই অব্যয় ঈশ্বর তিনলোকে প্রবেশ করিয়া তাহা পালন করিতেছেন, আমিই সেই অব্যয় ঈশ্বর। সেই হেতু আমি ক্ষর অক্ষর হইতেও উত্তম। আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছি। যে জ্ঞানী আমাকে পুরুষোত্তম রূপে দেখে সে সকলই জানে, সে আমাকে সর্ব ভাবে ভজনা করে।

হে নিষ্পাপ অর্জুন, এই অতি গুহ্য শাস্ত্র আমি তোমাকে বলিলাম। ইহা জানিয়া লোকে বুদ্ধিমান হয় ও নিজের ধ্যেয়কে পায়।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ-বিভাগ-যোগ

মঙ্গল-প্রভাত : ৭. ২. ৩২

শ্রীভগবান্ বলিলেন :—এখন আমি তোমাকে ধর্মবৃত্তি ও অধর্মবৃত্তির ভেদ বুঝাইব। ধর্মবৃত্তির বিষয়ে পূর্বে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছি। এখন তাহার লক্ষণ বলিতেছি—যাহার ধর্মবৃত্তি আছে তাহার মধ্যে নির্ভীকতা, অন্তঃকরণের শুদ্ধি, জ্ঞান, সমতা, ইন্দ্রিয়-দমন, যজ্ঞ, শাস্ত্রের অভ্যাস, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুণতা, সকল-জীবে দয়া, অলোলুপতা, কোমলতা, মর্যাদা, অচঞ্চলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, অন্তরের ও বাহিরের শুদ্ধি. অদ্রোহ ও নিরভিমানতা দেখা দেয়।

যাহাদের ভিতর অধর্মবৃত্তি আছে, তাহাদের মধ্যে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কঠোরতা ও অজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মবৃত্তি মানুষকে মোক্ষের দিকে লইয়া যায়, অধর্মবৃত্তি বন্ধনে ফেলে। হে অর্জুন, তুমি তো ধর্মবৃত্তি লইয়াই

জন্মিয়াছ। যাহাতে লোকে অধর্মবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে সেজন্য তাহার কিছু বর্ণনা করিতেছি। অধর্মবৃত্তি যাহাদের, তাহারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ভেদ জানে না। তাহাদের শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা সত্যাসত্যের জ্ঞান নাই। তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে আর বলিবার কি আছে? তাহারা ভাবে যে, জগৎ মিথ্যা ও আধারশূন্য। জগতের কোনও নিয়ন্তা নাই, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধই ইহাদের জগৎ অর্থাৎ ইহাদের বিষয়ভোগ ছাড়া আর কোন চিন্তাই নাই।

এই প্রকার বৃত্তি যাহাদের, তাহাদের কার্য ভয়ানক হয়। তাহাদের বুদ্ধি মন্দ হয়। এমন লোক নিজেদের দূষিত বিচারই আঁকড়াইয়া থাকে। জগতের নাশের জন্যই তাহাদের সকল প্রবৃত্তি। ইহাদের কামনার অন্ত হয় না। ইহারা দম্ভ, মান ও মদে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার হওয়ায় ইহাদের চিন্তার আর পার থাকে না। ইহাদের নিত্য নূতন ভোগ চাই। ইহারা শত-শত আশার সৌধ রচনা করে এবং নিজেদের কামনা পূরণের জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে গিয়া ন্যায় অন্যায়ের ভেদ রাখে না।

আজ ইহা পাওয়া গেল, কাল উহা পাওয়া যাইবে; এই শত্রুকে আজ মারিয়াছি আবার অপরকেও কাল মারিব; আমি বলবান্, আমার নিকট ঋষি-সিদ্ধি রহিয়াছে, আমার মত আর কে আছে? আমি কীর্তি পাইব, যজ্ঞ করিব, দান করিব ও মজা করিব। এই প্রকার ভাবিয়া তাহারা মনে মনে গর্ববোধ করে এবং অন্তে মোহজালে পড়িয়া নরক বাস করে।

এই প্রকার আসুরী লোক নিজের অহঙ্কারবশে পরনিন্দা করিয়া সর্বব্যাপক ঈশ্বরকেও দ্বেষ করে, ফলে তাহারা বার বার আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

আত্মাকে নাশ করার তিনটি দরজা আছে—কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটি সকলেরই ত্যাগ করা উচিত। যাহারা উহাদিগকে ত্যাগ করে তাহারা কল্যাণ মার্গে যায় এবং পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

যাহারা অনাদি-সিদ্ধান্তরূপ শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় ভোগে লিপ্ত থাকে তাহারা না পায় সুখ, না পায় কল্যাণমার্গে থাকার শান্তি। সেইজন্য কার্য অকার্য স্থির করার জন্য যাহাদের অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান আছে এমন লোকের নিকট হইতে অবিচল সিদ্ধান্ত জানিয়া লইতে হয় এবং তাহাই অনুসরণ করিয়া নিজেদের আচরণ স্থির করিতে হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ

মঙ্গল-প্রভাত : ১৪. ২. ৩২

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহারা বাহ্যিক আচারাদি ছাড়িয়া শ্রদ্ধাপূর্বক সেবা করে, তাহাদের গতি কেমন হয়?

ভগবান্ উত্তর দিলেন : শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেইরূপ ভাবে গড়িয়া উঠে।

সাত্ত্বিক লোকেরা দেবতাকে, রাজসিক লোকেরা যক্ষ-রাক্ষসকে ও তামসিক লোকেরা ভূতপ্রেতের ভজনা করে। কিন্তু কাহার শ্রদ্ধা কেমন তাহা বাহির হইতে দেখিয়া স্থির করা যায় না। তাহার আহার কেমন, যজ্ঞ কেমন, দান কেমন এ সকল জানা চাই। আবার এগুলি সবই তিন প্রকারের—একথা তোমাকে বলিতেছি।

যে আহার হইতে আয়ু, নির্মলতা, বল, স্বাস্থ্য, সুখ ও রুচি বাড়ে সে আহারকে সাত্ত্বিক আহার বলে। যাহা ঝাল, টক, অতিশয় মশলাযুক্ত ও গরম উহা রাজসিক, উহা হইতে দুঃখ ও রোগ উৎপন্ন হয়। যে আহার বাসী, গন্ধ ছাড়িয়াছে, উচ্ছিষ্ট ও অন্য প্রকারে অপবিত্র, উহা তামসিক খাদ্য বলিয়া জানিবে।

যে যজ্ঞ করায় ফলের ইচ্ছা নাই, যাহা কর্তব্য বলিয়াই শুদ্ধভাবে করা হয় তাহাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলে। যাহাতে ফলের আশা আছে, আবার দম্ভও আছে সে যজ্ঞ রাজসিক জানিবে। যাহাতে কোনও বিধি নাই, কিছু উৎপন্ন হয় না; কোনও মন্ত্র নাই, কোনও ত্যাগ নাই, সেই যজ্ঞ তামসিক।

যাহাতে সাধুদের পূজা আছে, পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা আছে উহাই শারীরিক তপস্যা। সত্য, প্রিয়, হিতকর বাক্য, ধর্মগ্রন্থানুযায়ী আচরণ, ইহাই বাচিক তপস্যা। মনের প্রসন্নতা, সৌম্য, মৌন, সংযম, শুদ্ধ ভাবনা এগুলিকে মানসিক তপ বলে। এই প্রকার শারীরিক, বাচিক ও মানসিক তপ যদি ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া করা যায় তবে উহাকে সাত্ত্বিক তপ বলে। যে তপস্যা মানের আশায় দম্ভপূর্বক করা হয় উহাকে রাজসিক বলিয়া জানিবে। যে তপ শরীরকে পীড়া দিয়া দুরাগ্রহ হইতে ও নাশ করার অর্থে করা হয়, যাহাতে শরীরস্থ আত্মাকে নিরর্থক ক্লেশ দেওয়া হয়, সে তপ তামসিক। দিতে হইবে বলিয়াই দেওয়া, ফলের ইচ্ছা যাহাতে নাই ও দেশ কাল পাত্র দেখিয়া যে দান করা হয় তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে। যাহাতে প্রতিদান পাওয়ার আশা আছে, যেখানে দিতে

সঙ্কোচ রহিয়াছে—সে দান রাজসিক। দেশ-কালাদির বিচার না করিয়া, তুচ্ছ করিয়া, অসম্মানের সহিত যে দান তাহা তামসিক।

"ওঁ তৎসৎ" এই বলিয়া বেদ ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়াছেন। সেই জন্য শ্রদ্ধা-পরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞ, দান ও তপঃ ক্রিয়া "ওঁ তৎসৎ" উচ্চারণ করিয়া করে। 'ওঁ' মানে একাক্ষর ব্রহ্ম, 'তৎ' মানে তিনি, 'সৎ' মানে সত্য ও কল্যাণরূপ। অর্থাৎ ঈশ্বর এক, তিনিই আছেন, তিনিই সত্য ও কল্যাণকারী। এই প্রকার ভাবনায় ও ঈশ্বরার্পণ বুঝিতে যে যজ্ঞাদি করে তাহার শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক। সে যদি বাহ্যিক আচারাদি নাও জানে অথবা জানিয়াও ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে উহা হইতে ভিন্ন কিছু করে, তবু সে দোষরহিত হয়। কিন্তু যে ক্রিয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করা হয় না উহাতে শ্রদ্ধা নাই বলা যায়, উহা অসৎ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষসন্ন্যাস-যোগ

মঙ্গল-প্রভাত: ২১. ২. ৩২.

সতের অধ্যায় মনন করার পর অর্জুনের মনে এখনও সন্দেহ রহিয়াছে, তাহার নিকট গীতার সন্ন্যাস প্রচলিত সন্ন্যাস হইতে ভিন্ন বোধ হইতেছে। ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই দুই কি ভিন্ন বস্তু?

এই সন্দেহ নিবারণ করিতে গিয়া ভগবান্ এই শেষ অধ্যায়ে গীতা-উপদেশের সার ভাগ দিতেছেন।

কোনও কোনও কর্মে কামনা ভরা থাকে, অনেক প্রকার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য লোকে অনেক প্রকার কর্ম-প্রচেষ্টা রচনা করে। আবার আবশ্যকীয় ও স্বাভাবিক কর্মও আছে; ধর যেমন শ্বাস লওয়া, দেহ পালন করার জন্য খাওয়া, পরা, শোওয়া, বসা ইত্যাদি। আর তৃতীয় কর্ম আছে, উহা হইতেছে পারমার্থিক। ইহা হইতে কাম্য-কর্মের ত্যাগই গীতার সন্ন্যাস, আর কর্মমাত্রের ফল ত্যাগই গীতার মান্য ত্যাগ।

একথা বলা যায় যে, কর্ম মাত্রেই দোষ আছে। তবু যজ্ঞার্থ কর্ম বা পরোপকারার্থ কর্ম ত্যাগ করিতে নাই। যজ্ঞের ভিতর দান ও তপস্যা আসিয়া পড়ে। কিন্তু পরমার্থ সম্বন্ধেও আসক্তি বা মোহ যেন না হয়, নচেৎ উহাতেও দোষ ঢুকিবার সম্ভাবনা থাকে। মোহের বশীভূত হইয়া নিয়ত-কর্মের ত্যাগকে তামসিক বল

যায়। দেহের কষ্ট হয় এই বুঝিয়া যে কর্মত্যাগ তাহা রাজসিক। আর সেবার জন্য করিতে হইবে এই ভাবনা হইতে যে ত্যাগ করা হয় উহাই সাত্ত্বিক। এই ত্যাগের ভিতর কর্মমাত্রের ত্যাগ নাই, কেবল কর্তব্য কর্মের ফলত্যাগ আছে ও তাহা ছাড়া অন্য কর্ম অর্থাৎ কাম্য-কর্মত্যাগ তো আছেই। এই প্রকার ত্যাগীর সংশয় উপস্থিত হয় না। তাহার ভাবনা শুদ্ধ হয় এবং সে সুবিধা অসুবিধার বিচার করে না।

যে কর্মফল ত্যাগ করে না তাহাকে তো ভালমন্দ ফল ভোগ করিতেই হয়। উহাতেই সে বন্ধনে থাকে। যে কর্মফল ত্যাগ করিয়াছে সে বন্ধনমুক্ত হয়।

আবার কর্মসম্বন্ধে মোহই বা কি? আমি নিজেই কর্তা এই অভিমান মিথ্যা। কর্মমাত্রের সিদ্ধির পাঁচটা কারণ আছে—স্থান, কর্তা, সাধন, ক্রিয়া ও এই সকলের পরেও আছে দৈব। ইহা জানিয়া মানুষের অহংকার ত্যাগ করা উচিত। যে অহংকার রহিত হইয়া কাজ করে, তাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, সে কাজ করিয়াও কিছুই করে না। যে অহংকার ত্যাগ করিয়া কার্য করে সে কাজ করিয়াও কাজ করিতেছে না একথা বলা যায়; যেহেতু ঐ অবস্থায় কর্ম তাহাকে বাঁধে না। এইরূপ নিরভিমান, শূন্যবৎ হওয়ার পর মানুষের সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে, সে হত্যা করিয়াও হত্যা করে না। ইহার অর্থ এই নয় যে, কোনও লোক শূন্যবৎ হওয়ার পরও হিংসা করে এবং অলিপ্ত থাকে। কেননা নিরভিমানের হিংসা করার প্রয়োজনই হয় না।

কর্মের প্রেরণায় তিনটি বস্তু আছে: জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এবং তাহার অঙ্গও তিনটি যথা—ইন্দ্রিয়, ক্রিয়া ও কর্তা। কি করিতে হইবে ইহাই জ্ঞেয়, যে রীতিতে করিতে হইবে উহাই জ্ঞান এবং উহা যে জানে সে পরিজ্ঞাতা। এই প্রকার প্রেরণা হওয়ার পর কর্ম করিতে ইন্দ্রিয় হয় কারণ, যাহা করা হয় তাহা ক্রিয়া ও উহা যে করে সে কর্তা। এই প্রকার বিচার হইতেই আচরণ আসিয়া পড়ে। যাহাতে আমরা প্রাণীমাত্রের মধ্যে একই ভাব দেখি অর্থাৎ সকলই ভিন্ন ভিন্ন মনে হইলেও গভীরভাবে প্রবেশ করিলে যাহা একই রকম বলিয়া বোধ হয় তাহা সাত্ত্বিক জ্ঞান। উহার বিপরীত যাহা ভিন্নভাবে দেখায়, ভিন্ন বলিয়া জানা যায়, তাহাই রাজসিক জ্ঞান। যেখানে কিছু জানাই যায় না, সকলই অকারণ হইতেছে বলিয়া এলোমেলো লাগে তাহা তামসিক জ্ঞান।

যেমন জ্ঞানের বিভাগ করা গেল তেমনি কর্মের বিভাগও করা যায়। যেখানে ফলের ইচ্ছা নাই, রাগ-দ্বেষ নাই, সে কর্ম সাত্ত্বিক। যেখানে ভোগের

ইচ্ছা আছে, যেখানে আমি করিতেছি বলিয়া অহংকার আছে, যেখানে চাঞ্চল্য আছে সে কর্ম রাজসিক। যেখানে পরিণামের কিম্বা বিনাশের অথবা হিংসার বিচার নাই, পারা যাইবে কিনা সে শক্তির জ্ঞান নাই ও যাহা মোহের বশ হইয়া করা হয় সেই কর্ম তামসিক।

কর্ম যেমন তিন প্রকার কর্তাও তেমনি তিন প্রকারের জানিবে। কর্ম জানিয়া পরে কর্তা কি প্রকার তাহা জানিতে আর অসুবিধা হয় না। সাত্ত্বিক কর্তার ক্রোধ নাই, অহঙ্কার নাই; দৃঢ়তা আছে, সাহস আছে কিন্তু ভালমন্দ পরিণামের জন্য তাহার হর্ষ বা শোক নাই। রাজসিক কর্তার ক্রোধ আছে, লোভ আছে, হিংসা আছে, হর্ষ-শোক তো আছেই আর ফলের ইচ্ছায়ই সে কর্ম করে। তামসিক কর্তা অব্যবস্থিত, দীর্ঘসূত্রী, জেদী ও অলস। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সে সংস্কারশূন্য।

বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখেরও ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় লওয়া ভাল। সাত্ত্বিক বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির, কার্যাকার্যের, বন্ধন-মোক্ষের, ভয়-অভয়ের ভেদ ঠিকমত জানে ও সেইরূপ বুঝিয়া চলে। রাজসিক বুদ্ধিও এই ভেদ করিতে যায় কিন্তু বেশীর ভাগ স্থলে খারাপ বা উল্টা করিয়া ফেলে। তামসিক বুদ্ধি তো ধর্মকেই অধর্ম বলিয়া মনে করে ও সমস্তই উল্টা দেখে। ধৃতি মানে ধারণা—কিছু গ্রহণ করিয়া তাহা ধরিয়া রাখার শক্তি। এই শক্তি কমবেশী পরিমাণে সকলের মধ্যেই আছে। যদি তাহা না হইত তবে জগৎ ক্ষণকালও টিকিতে পারিত না। যেখানে মনপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার সাম্য আছে, যেখানে একভাব আছে, একনিষ্ঠা আছে সেখানেই ধৃতি সাত্ত্বিক বলা যায়। যাহার দ্বারা মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম আসক্তিপূর্বক ধারণ করে সেই ধৃতিই রাজসিক। যে ধৃতি মানুষকে নিদ্রা, ভয়, শোক, নিরাশা, অহংকার ইত্যাদি ছাড়িতে দেয় না উহা তামসিক।

যেখানে দুঃখের অনুভব নাই, যাহার আরম্ভ বিষের মত লাগিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, পরিণামে উহা অমৃতের মত হয়, যাহাতে আত্মা প্রসন্ন থাকে সেই সুখই সাত্ত্বিক। বিষয়ভোগে যাহা আরম্ভে মিষ্ট লাগে কিন্তু পরে যাহা বিষের মত হইয়া পড়ে উহাই রাজসিক সুখ। যাহাতে কেবল মূর্ছা, আলস্য ও নিদ্রা রহিয়াছে সে সুখ তামসিক।

এই প্রকারে বস্তুমাত্রেরই তিন ভাগ করা যায়। ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণেরও এই তিন গুণের কমবেশী অনুসারে ভাগ হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্মে শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, অনুভূতি ও আস্তিকতা থাকা চাই। ক্ষত্রিয়ের

ভিতর শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পশ্চাৎপদ না হওয়া, দান ও রাজ্য চালাইবার শক্তি থাকা চাই। চাষের কাজ ও গো-রক্ষা বৈশ্যের কর্ম এবং শূদ্রের কর্ম হইতেছে সেবা করা।

ইহার মানে এমন নয় যে, একের গুণ অন্যে নাই অথবা এই গুণ বিকাশ করার অধিকার একের বা অন্যের নাই। উহার মানে এই যে, যে সকল গুণের কথা যাহার সম্বন্ধে বলা হইল সে গুণ দিয়া তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। যদি প্রত্যেক বর্ণের গুণ-কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তবে একের সহিত অপরের দ্বেষ ভাব থাকে না, হানিকারক প্রতিযোগিতা থাকে না। এখানে উচ্চনীচ ভাবনার স্থানই নাই। বরঞ্চ সকলেই যদি নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে নিষ্কাম হইয়া নিজ কার্য করিয়া যায় তবে তাহারা সেই সেই কর্ম করিয়াই মোক্ষের অধিকারী হয়। সেইজন্যই বলিতেছি যে, পরধর্ম যদি সহজ বলিয়া লাগে ও স্বধর্মে দ্রব্যাদি লাভ কম এমন মনে হয় তবুও স্বধর্ম ভাল। স্বভাবজাত কর্মে পাপ হয় না ইহাই সম্ভব, কেননা তাহাতে নিষ্কামতা পাওয়া যায়। অন্য কিছু করার ইচ্ছার মধ্যেই কামনা আসিয়া থাকে। যেমন আগুনে ধোঁয়া আছেই তেমনি কর্মমাত্রেই দোষ আছে কিন্তু সহজপ্রাপ্ত কর্ম, ফলের ইচ্ছা ছাড়াই আসিয়া পড়ে এজন্য তাহাতে দোষ লাগে না।

এইভাবে স্বধর্ম পালন করিয়া যে শুদ্ধ হইয়াছে, যাহার মন বশে আসিয়াছে, যে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয় ছাড়িয়াছে, যে রাগ-দ্বেষ জয় করিয়াছে, যে নির্জনে থাকে অর্থাৎ অন্তরে ধ্যান করিয়া থাকিতে পারে, যে অল্পাহার করিয়া মন, বাক্য ও শরীরকে বশে রাখে, যে সর্বদা ঈশ্বর-ধ্যানে থাকে, যে অহঙ্কার কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছে, সেই শান্ত যোগী ব্রহ্মভাব পাওয়ার যোগ্য। এই রকম লোক সকলের প্রতিই সমভাব রাখে এবং হর্ষ বা শোক করে না। এই প্রকার ভক্ত ঈশ্বর তত্ত্ব যথার্থ জানে ও ঈশ্বরে লীন হইয়া থাকে। এভাবে যে ভগবানের আশ্রয় লয় সে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—সমস্ত আমাকে অর্পণ কর, আমাতে পরায়ণ হও ও বিবেক বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া আমাতে চিত্ত গাঁথিয়া ফেল, এইপ্রকার করিলে সমস্ত বিড়ম্বনা পার হইবে। আর যদি অহঙ্কার রাখিয়া আমার কথা না শোন তবে বিনষ্ট হইবে। শত কথার মধ্যে একটা কথা এই যে, সকল তর্ক-বিতর্ক ছাড়িয়া আমার শরণ লও, ইহাতেই তুমি পাপমুক্ত হইবে।

যে তপস্বী নয়, যে ভক্ত নয়, যাহার শোনার ইচ্ছা নাই ও যে আমাকে দ্বেষ

করে তাহাকে এই জ্ঞানের কথা বলিতে নাই। কিন্তু এই পরম গুহ্য কথা যে আমার ভক্তকে দিবে সে আমাকে ভক্তি করার জন্য অবশ্যই আমাকে পাইবে।

অবশেষে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, যেখানে ধনুর্ধারী পার্থ আছেন, সেখানে শ্রী আছে, বিজয় আছে, বৈভব আছে ও অবিচল নীতি আছে।"

এইস্থানে কৃষ্ণের প্রতি যোগেশ্বর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা হইতে তাহার শাশ্বত অর্থ শুদ্ধ অনুভবযুক্তজ্ঞান বুঝাইতেছে ও ধনুর্ধারী পার্থ বলিয়া এই বুঝানো হইতেছে যে, যেখানে এই প্রকার অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানের অনুসরণকারী ক্রিয়া আছে সেখানে পরম নীতির সহিত বিরোধশূন্য যে মনস্কামনা তাহা পূর্ণ হয়।

ইতি গীতা-বোধ সমাপ্ত

অনাসক্তি-যোগ

[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য]

মূল, অন্বয় অর্থ ও ব্যাখ্যা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

প্রস্তাবনা

(১)

স্বামী আনন্দ ইত্যাদি মিত্রদিগের ভালবাসার অনুরোধে যেমন আমি সত্যের প্রয়োগের জন্যই আত্মকথা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, গীতার অনুবাদ ব্যাপারটাও তেমনি ভাবেই ঘটে। অসহযোগের যুগে স্বামী আনন্দ আমাকে বলেন—"আপনি যদি সমুদয় গীতার অনুবাদ করিয়া ফেলেন এবং তাহার উপর যে টীকা করা দরকার তাহা করেন, তবে গীতা সম্বন্ধে আপনার অভিমত আমরা জানিতে পারি। এক এক জায়গা হইতে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অহিংসার প্রতিপাদন করা আমার কাছে ঠিক মনে হয় না।" তাঁহার কথা ঠিক বুঝিয়া তাঁহাকে বলি—"সময় হইলে করিব।" তারপর আমি জেলে যাই। সেখানে কিছু গভীরভাবেই গীতা অধ্যয়ন করার অবকাশ মিলে। লোকমান্যের জ্ঞানের ভাণ্ডার পড়ি। তিনিই প্রথমে আমাকে মারাঠী, হিন্দী ও গুজরাটী অনুবাদ প্রীতিপূর্বক পাঠান, আর যদি মারাঠী না পারি তবে গুজরাটী যেন অবশ্যই পড়ি—এই অনুরোধ করেন। জেলের বাহিরে উহা পড়ার অবসর পাই নাই। জেলে গিয়া গুজরাটী অনুবাদ পড়ি। উহা পড়ার পর গীতা সম্বন্ধে আরো অধিক পড়িবার ইচ্ছা হয় এবং গীতা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ নাড়াচাড়া করি।

গীতার সহিত প্রথম পরিচয় ১৮৮৮—৮৯ সালে এডুইন আরনল্ডের পদ্য অনুবাদ হইতে হয়। ইহাতেই গীতার গুজরাটী অনুবাদ পড়িবার তীব্র ইচ্ছা হয় এবং যত অনুবাদ হাতে পাই পড়িয়া যাই। কিন্তু এই রকম পাঠ করাতেই সকলের সামনে নিজের অনুবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার একেবারেই জন্মায় না। দ্বিতীয়তঃ আমার সংস্কৃত জ্ঞান অল্প, গুজরাটী জ্ঞানও পাণ্ডিত্যের হিসাবে কিছু নয়। তাহা হইলে অনুবাদ করার ধৃষ্টতা কেন?

গীতা আমি যেমন বুঝিয়াছি সেই মত আচরণ করার জন্য আমি ও আমার সাথীদের মধ্যে কয়েকজন সতত চেষ্টা করিয়া থাকি। গীতা আমার কাছে আধ্যাত্মিক নিদান-গ্রন্থ। গীতা অনুযায়ী আচরণ করিতে প্রতিদিনই নিষ্ফলতা পাইয়া থাকি। সে নিষ্ফলতা আমাদের প্রযত্ন সত্ত্বেও হইয়া থাকে এবং সেই নিষ্ফলতার মধ্যেই সফলতার উজ্জ্বল কিরণ ঝলকাইয়া উঠে। এই অল্প লোক কয়টি গীতার যে অর্থ অনুযায়ী আচরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেই অর্থ এই অনুবাদে রহিয়াছে।

ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি যাহাদের অক্ষরজ্ঞান অল্প, যাহাদের মূল সংস্কৃত হইতে গীতা বুঝিবার সময় নাই বা ইচ্ছা নাই, অথচ যাহাদের গীতার সাহায্যের প্রয়োজন আছে, তাহাদের জন্য এই অনুবাদের কল্পনা। গুজরাটী ভাষায় আমার জ্ঞান কম হইলেও উহার ভিতর দিয়াই আমার কাছে যাহা কিছু পুঁজি আছে তাহা দিয়া যাওয়ার জন্য আমার সর্বদা ইচ্ছা জাগে। আমি বিশেষ করিয়াই চাই যে, দুর্নীতি পূর্ণ সাহিত্যের প্রবাহ যে সময় প্রবল ভাবে বহিয়া চলিয়াছে, সেই সময় হিন্দুধর্মে অদ্বিতীয় বলিয়া যে গ্রন্থ স্বীকৃত, তাহার সহজ অনুবাদ গুজরাটী জনসাধারণ লাভ করুক ও ঐ প্রবাহের সম্মুখীন হইবার শক্তিও তাহাদের আসুক। এই ইচ্ছার ভিতর গুজরাটী অন্যান্য অনুবাদকে অবহেলা করিবার ভাব নাই। সে সকলের স্থান থাকে ভাল, কিন্তু সেই সকল অনুবাদের পশ্চাতে অনুবাদকের আচরণরূপী অনুভবের দাবী আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু এই অনুবাদের পশ্চাতে আটত্রিশ বৎসরের আচরণের চেষ্টার দাবী আছে। এইজন্য আমি ইচ্ছা করি যে, প্রত্যেক গুজরাটী ভাই-ভগ্নী, যাহাদের ধর্ম অনুযায়ী আচরণ করার ইচ্ছা আছে, তাহারা যেন ইহা পড়েন, বিচার করেন ও ইহা হইতে শক্তি লাভ করেন।

এই অনুবাদ কার্যে আমার সঙ্গীদের পরিশ্রম রহিয়াছে। আমার সংস্কৃত জ্ঞান খুব কম বলিয়া ও শব্দার্থ সম্বন্ধে আমার পুরা বিশ্বাস না থাকার জন্য তাহা পূরণ করিতে এই অনুবাদে বিনোবা, কাকা কালেলকর, মহাদেব দেশাই ও কিশোরলাল মশরুওয়ালা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

(২)

এক্ষণে গীতার অর্থের উপর বিচার করিতেছি। ১৮৮৮—৮৯ সালে গীতার প্রথম দর্শন হয়। তখনই মনে হয় যে, ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়, পরন্তু ভৌতিক যুদ্ধ-বর্ণনের রূপকের মধ্য দিয়া প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে—হৃদয়স্থিত যুদ্ধকে রসপূর্ণ আকার দেওয়ার জন্য জাগতিক যুদ্ধের রূপ দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম ও গীতার বিচার করার পর আমার এই প্রাথমিক অনুভূতিই দৃঢ় হইয়াছে। মহাভারত পড়ার পর উক্ত বিচার আরও দৃঢ় হইয়াছিল। মহাভারত গ্রন্থকে আমি আধুনিক অর্থে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করি না। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আদি-পর্বেই রহিয়াছে। পাত্রদিগের অমানুষী ও অতিমানুষী উৎপত্তির বর্ণনা করিয়া ব্যাস

ভগবান্ রাজা-প্রজার ইতিহাস ধুইয়া ফেলিয়াছেন। মহাভারতে বর্ণিত পাত্র মূলে ঐতিহাসিক হইতে পারে, কিন্তু ব্যাস ভগবান্ কেবল ধর্মের দর্শন করাইবার জন্যই মহাভারতে তাহাদের ব্যবহার করিয়াছেন।

মহাভারতকার ভৌতিক যুদ্ধের সার্থকতা সিদ্ধ করেন নাই, উহার নিরর্থকতাই সিদ্ধ করিয়াছেন। বিজেতাকে রোদন করাইয়াছেন, অনুতাপ করাইয়াছেন, এবং দুঃখ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই।

এই মহাগ্রন্থে গীতা শিরোমণিরূপে বিরাজিত। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় ভৌতিক যুদ্ধ শিখাইবার বদলে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শিখাইতেছে। ভৌতিক যুদ্ধের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, স্থিতপ্রজ্ঞের 'লক্ষণেই তাহা আছে—ইহাই আমার প্রতীতি হইয়াছে। সামান্য পারিবারিক ঝগড়ার যোগ্যতা অযোগ্যতা নির্ণয় করিবার জন্য গীতার ন্যায় গ্রন্থের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর মনে হয় না।

গীতার কৃষ্ণ মূর্তিমন্ত শুদ্ধ পূর্ণ জ্ঞান কিন্তু কাল্পনিক। ইহাতে কৃষ্ণ নামক অবতার পুরুষকে অস্বীকার করা হইতেছে না। মাত্র বলা হইতেছে—পূর্ণ কৃষ্ণ কাল্পনিক, পূর্ণ অবতারের কল্পনা পরে আরোপিত হইয়াছে।

অবতার মানে শরীরধারী পুরুষ বিশেষ। জীবমাত্রই ঈশ্বরের অবতার। কিন্তু লৌকিক ভাষায় সকলকে আমরা অবতার বলি না। যে পুরুষ নিজের যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে ভাবী সমাজ অবতার রূপে পূজা করিয়া থাকে, ইহাতে দোষের কিছু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহাতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব কিছু কমানো হয় না, সত্যের উপরেও আঘাত আসে না। 'আমি খোদা নহি কিন্তু খোদার প্রভা হইতে আমি পৃথকও নহি।' যাঁহার ভিতর নিজ যুগে ধর্ম-জাগৃতি সর্বাপেক্ষা বেশী তিনিই বিশেষ অবতার! এই বিচার অনুসারে কৃষ্ণরূপী সম্পূর্ণাবতার আজ হিন্দু ধর্মের সাম্রাজ্য ভোগ করিতেছেন।

এই দৃষ্টি [পূর্ণাবতার কল্পনা] মানুষের চরম অভিলাষের সূচক। ঈশ্বররূপ না পাইলে মানুষের স্বস্তি মিলে না, শান্তি হয় না। ঈশ্বরত্ব পাওয়ার প্রযত্নই সত্য ও একমাত্র পুরুষার্থ। ইহাই আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শন যেমন সকল ধর্ম গ্রন্থের বিষয়, তেমনি গীতারও বিষয়। কিন্তু গীতাকার ইহাই প্রতিপন্ন করার জন্য গীতা রচনা করেন নাই। আত্মার্থীদিগকে আত্মদর্শন করাইবার এক অদ্বিতীয় উপায় দেখানোই গীতার উদ্দেশ্য। যে জিনিস হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ইতস্ততঃ আছে তাহাই গীতা অনেক রূপে, অনেক শব্দে, বার বার পুনরুক্তি করিয়াও সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই অদ্বিতীয় উপায়—কর্মফল ত্যাগ।

এই মূল কেন্দ্রের চারিদিকে গীতার সকল সজ্জা রচিত। ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি উহারই চারিদিকে তারা-মণ্ডলের ন্যায় সাজানো আছে। দেহ থাকিলে কর্ম তো আছেই। উহা হইতে কেহই মুক্ত নহে। তাহা হইলেও দেহকে প্রভুর মন্দির করিয়া তাহা দ্বারাই মুক্তি পাওয়া যায়—ইহাই সকল ধর্ম প্রতিপাদন করে। পরন্তু কর্মমাত্রেই কিছু না কিছু দোষ আছেই। মুক্তি তো নির্দোষেরই হইয়া থাকে। তাহা হইলে কর্ম-বন্ধন হইতে অর্থাৎ দোষ-স্পর্শ হইতে কেমন করিয়া মুক্তি পাওয়া যাইবে? ইহার জবাব গীতা নিশ্চয়াত্মক শব্দে দিয়াছেন—'নিষ্কাম কর্ম করিয়া, যজ্ঞার্থে কর্ম করিয়া, কর্ম-ফল ত্যাগ করিয়া, সকল কর্ম কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া অর্থাৎ মন, বচন ও শরীর ঈশ্বরের নিকট হোম করিয়া।'

কিন্তু নিষ্কামতা, কর্মফলত্যাগ, বলা মাত্রই হয় না। ইহা কেবল বুদ্ধির প্রয়োগ নহে। ইহা হৃদয়-মন্থন হইতেই উৎপন্ন হয়। এই ত্যাগ-শক্তি উৎপন্ন করার জন্য জ্ঞান চাই। এক প্রকার জ্ঞান তো অনেক পণ্ডিতই পাইয়া থাকেন। বেদাদি তাহাদের কণ্ঠে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভোগাদিতে লিপ্ত থাকেন। জ্ঞানের ব্যবহার শুষ্ক পাণ্ডিত্যরূপে যাহাতে না দেখা দেয়, সেই হেতু গীতাকার জ্ঞানের সাথে ভক্তি মিলাইয়াছেন এবং তাহাকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। ভক্তি বিনা জ্ঞান নিরর্থক। সেই জন্যই বলা হয়—'ভক্তি কর তো জ্ঞান মিলিবেই'। ভক্তি মাথার মূল্যে কিনিতে হয়। সেই হেতু গীতাকার ভক্তের লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য এই যে, গীতার ভক্তি—ভাবে ভুলিয়া থাকা নয়, অন্ধ শ্রদ্ধা নয়। গীতার প্রদর্শিত উপচারের সহিত বাহ্য চেষ্টা বা ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই বলা যায়। মালা, তিলক, অর্ঘাদির সাধনা ভক্তেরা করেন তো করুন, কিন্তু এ সব ভক্তির লক্ষণ নয়। যে দ্বেষ করে না, যে নিরহঙ্কার, যাহার কাছে সুখ-দুঃখ ও শীতাতপ সমান, যিনি ক্ষমাশীল, যিনি সদাই সন্তুষ্ট, যাঁহার সঙ্কল্প কখনো টলে না, যিনি মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন, যাঁহার দ্বারা কেহ ভয় পায় না, যিনি কাহাকেও ভয় করেন না, যিনি হর্ষ, শোক, ভয়াদি হইতে মুক্ত, যিনি পবিত্র, যিনি কার্যদক্ষ হইলেও নিরপেক্ষ, যিনি শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি শত্রু-মিত্রের প্রতি সমভাবাপন্ন, যাঁহার কাছে মান-অপমান সমান, যিনি স্তুতিতে পুলকিত হ'ন না, নিন্দায় গ্লানি বোধ করেন না, যে ব্যক্তি মৌনধারী,

যিনি নির্জনতা-প্রিয়, যিনি স্থিরবুদ্ধি, তিনিই ভক্ত। এই ভক্তি আসক্ত স্ত্রী-পুরুষের পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, জ্ঞান পাওয়া বা ভক্ত হওয়াই আত্মদর্শন। আত্মদর্শন উহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। একটা টাকা দিয়া যেমন বিষও কেনা যায় এবং অমৃতও কেনা যায়, তেমনি জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা মুক্তিও পাওয়া যায় এবং বন্ধনও পাওয়া যায়—এমন নহে। এখানে সাধন ও সাধ্য একেবারে এক বস্তু না হইলেও প্রায় এক বস্তু। সাধনের পরাকাষ্ঠাই মোক্ষ, আর গীতার মোক্ষ মানে পরম শান্তি।

কিন্তু এই জ্ঞান ও ভক্তিকে কর্মফল ত্যাগরূপ কষ্টিপাথরে কষিতে হয়। লৌকিক কল্পনায় শুধু পণ্ডিতও জ্ঞানী বলিয়া গণ্য। তাঁহাকে কোন কার্য করিতে হয় না। একটা ঘটির মত জিনিসও হাতে করিয়া তুলিলে তাঁহার কর্ম বন্ধন হয়। যজ্ঞশূন্য ব্যক্তি যেখানে জ্ঞানী বলিয়া গণ্য, সেখানে ঘটি উঠানোর মত তুচ্ছ লৌকিক ক্রিয়ার স্থান কোথায়?

লৌকিক কল্পনায় ভক্ত হইতেছে নিষ্কর্মা—মালা লইয়া জপকারী। সেবা-কর্ম করিতেও তাহার মালায় বিক্ষেপ আসে। সেইজন্য খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ভোগের কার্যের জন্যই সে মালা হইতে হাত উঠাইতে পারে—যাঁতা চালাইবার জন্য বা দরিদ্রের সেবার জন্য কখনও পারে না।

এই উভয় শ্রেণীর লোককেই গীতা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন—'কর্ম বিনা সিদ্ধি পাওয়া যায় না। জনকাদিও কর্ম দ্বারাই জ্ঞানী হইয়াছেন। যদি আমিও আশা-রহিত হইয়া কর্ম না করি তবে এই লোকের নাশ যাইয়া যাইবে।' ইহার পর মানুষের জন্য জিজ্ঞাসা করার আর কি আছে?

কিন্তু এক দিক দিয়া কর্মমাত্রই বন্ধনস্বরূপ—ইহা নির্বিবাদে স্বীকার্য, আর এক দিক দিয়া দেখিলে, দেহী ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক কর্ম করিয়াই যাইতেছে। শারীরিক ও মানসিক চেষ্টামাত্রই কর্ম। তাহা হইলে মানুষ কর্ম করিতে করিতে কেমন করিয়া বন্ধন-মুক্ত থাকিতে পারে? এই সমস্যার সমাধান গীতা যে রীতিতে করিয়াছেন, আর কোনও ধর্ম-গ্রন্থ সে ভাবে করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। গীতা বলিতেছেন—'ফলাসক্তি ছাড় ও কর্ম কর', 'নিরাশী হইয়া কর্ম কর', 'নিষ্কাম হইয়া কর্ম কর।' গীতার এই ধ্বনি ভুলিবার নহে। যে কর্ম ছাড়ে সে পড়ে, কর্ম করিয়াও যে ফল ত্যাগ করে সে উঠে।

এখানে ফলত্যাগ অর্থে ত্যাগীর ফল মিলে না—এরূপ অর্থ যেন কেহ না করেন। গীতার মধ্যে এরূপ অর্থের কোনও স্থান নাই। ফলত্যাগ মানে ফলের বিষয়ে আসক্তির অভাব। বাস্তবিক ফলত্যাগীর হাজার গুণ ফল মিলে। গীতায় ফলত্যাগে অখণ্ড শ্রদ্ধার পরীক্ষা রহিয়াছে। যে মানুষ ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া কার্য করে সে বহুবার কর্ম ও কর্তব্য-ভ্রষ্ট হয়। তাহার ভিতর অধীরতা আসে তাহা হইতে সে ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং পরে যাহা করা উচিত নয় তাহা করিতে থাকে। সে এক কর্ম হইতে দ্বিতীয় কর্মে, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় কর্মে লাগিয়া যায়। ফলাফল-চিন্তাকারীর অবস্থা বিষয়ান্ধের মত হয়। অবশেষে সে বিষয়ীর মত ভাল-মন্দ নীতি-অনীতির বিবেক ছাড়িয়া দেয় এবং ফল পাওয়ার জন্যই সমস্ত সাধনের ব্যবহার করে ও তাহাই ধর্ম বলিয়া মানে।

ফলাসক্তির এই রকম কটু পরিণাম হইতে গীতাকার অনাসক্তি অর্থাৎ কর্মফলত্যাগের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া জগতের নিকট অতিশয় চিত্তাকর্ষক ভাষায় উহা উপস্থিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহাই স্বীকার করা হয় যে, ধর্ম ও অর্থ পরস্পর বিরোধী বস্তু; ব্যবসা ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে ধর্ম অচল। তাহাতে ধর্মের স্থান হয় না; ধর্মের ব্যবহার কেবল মোক্ষের জন্য; ধর্মের স্থানে ধর্ম, অর্থের স্থানে অর্থ শোভা পায়। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, গীতাকার এই ভ্রম দূর করিয়াছেন। যে ধর্ম ব্যবহারে আনা যায় না তাহা ধর্ম নহে—এই প্রকার ভাব গীতায় বিদ্যমান আছে বলিয়া আমি মনে করি। অর্থাৎ গীতার অভিপ্রায় অনুসারে, যে-কর্ম আসক্তি ছাড়া হইতে পারে না তাহা ত্যাজ্য। এই সুবর্ণ-নিয়ম মানুষকে অনেক ধর্ম-সঙ্কটে বাঁচাইয়া থাকে। এই অভিপ্রায় অনুসারে খুন, লুট, ব্যভিচার ইত্যাদি কর্ম সহজেই পরিত্যাজ্য হইয়া পড়ে ও এই সহজ ভাব হইতে শান্তি উৎপন্ন হয়। ফলত্যাগ অর্থে পরিণাম সম্বন্ধে বিচার করার দরকার নাই—এমনও নহে। পরিণাম ও তাহার সাধনের বিচার এবং তাহার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এইগুলি থাকার পর যে ব্যক্তি ফলের ইচ্ছা না রাখিয়া সাধনায় তন্ময় থাকে সেই ফলত্যাগী।

এই বিচারসমূহ অনুসরণ করিয়া আমার মনে হয়, গীতার শিক্ষা ব্যবহারে পরিণত করিতে সহজেই সত্য ও অহিংসার পালন করিতে হয়। ফলাসক্তি না থাকিলে মানুষের অসত্য বলিবার লালসা হয় না, হিংসা করারও প্রয়োজন হয় না। যে কোনও হিংসার ও অসত্যের কার্য লইয়া বিচার করিলেই জানা

যাইবে যে, তাহার পশ্চাতে ফলের ইচ্ছা আছেই। কিন্তু অহিংসার প্রতিপাদন গীতার বিষয় নহে। গীতাকারের পূর্বেও 'অহিংসা পরম ধর্ম' বলিয়া মানা হইত। গীতায় অনাসক্তির আদর্শ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথাই সুস্পষ্ট করা হইয়াছে।

কিন্তু যদি গীতার সিদ্ধান্ত অহিংসাই হয়, অথবা অনাসক্তিতে অহিংসা যদি সহজেই আসে, তাহা হইলে গীতাকার ভৌতিক যুদ্ধের উদাহরণ লইলেন কেন? গীতার যুগে অহিংসা ধর্ম বলিয়া মান্য থাকিলেও, ভৌতিক যুদ্ধ একটা সাধারণ বস্তু হওয়ার জন্যই গীতাকার এই যুদ্ধের উদাহরণ লইতে সঙ্কোচ করেন নাই, সঙ্কোচ করা যায়ও না।

কিন্তু ফলত্যাগের মহত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া গীতাকারের মনে কি ভাব ছিল, অহিংসার মর্যাদা তিনি কোন্ পর্যন্ত নির্ণয় করিয়াছেন—তাহা আমার বিচার করার বিষয় নহে। কবি মহত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সকল জগতের সম্মুখে রাখেন। তাহা হইতেই একথা বলা যায় না যে, তিনি সকল সময়ই নিজের সিদ্ধান্তের মহত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন, অথবা জানিয়া পরে তাহা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই কাব্য ও কবির বিশেষত্ব। কাব্যের অর্থের অন্ত নাই। যেমন মানুষের তেমনি মহাকাব্যের অর্থের বিকাশও নিরন্তর চলিতে থাকে। ভাষার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, অনেক মহাশব্দের অর্থ নিত্য নূতন হইতেছে। গীতার অর্থ সম্বন্ধেও ইহাই প্রযোজ্য।

গীতাকার নিজেই মহান্ কঠিন শব্দ সকলের অর্থের বিস্তার করিয়াছেন। উপরে উপরে দেখিলেও গীতার ভিতর ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা-যুগের পূর্বে সম্ভবতঃ যজ্ঞে পশু-হিংসা মান্য ছিল। গীতার যজ্ঞে তাহার গন্ধও নাই। গীতায় জপ-যজ্ঞই যজ্ঞের রাজা বলা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায় বলে যে, যজ্ঞ মানে মুখ্যতঃ পরোপকারার্থে শরীরের ব্যবহার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় একত্রে মিলাইয়া অন্য অর্থও করা যায়। কিন্তু যজ্ঞের অর্থ যে পশু-হিংসা তাহা কদাপি করা যায় না।

গীতায় সন্ন্যাসের অর্থ সম্বন্ধেও এমনি হইয়াছে। কর্ম-মাত্রের ত্যাগ গীতার সন্ন্যাসে ভাবিতেও পারা যায় না। গীতার সন্ন্যাসী অতি-কর্মা হইয়াও অতি-অকর্মা। এমনি করিয়া গীতাকার মহান্ শব্দের ব্যাপক অর্থ করিয়াই নিজের ভাষারও ব্যাপক অর্থ করিতে শিখাইয়াছেন। ভৌতিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ কর্ম-ফল-ত্যাগী দ্বারাও হইতে পারে—এইরূপে গীতাকারের ভাষার আক্ষরিক মানে করিলেও করা যায় কিন্তু গীতার শিক্ষা ব্যবহারে আনিবার জন্য প্রায় ৪০ বৎসর

পর্যন্ত সতত প্রযত্ন করিবার পর নম্রতাপূর্বক আমাকে এ কথা বলিতে হইবে যে, সত্য ও অহিংসা পালন না করিলে সম্পূর্ণ কর্মফল-ত্যাগ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

গীতা সূত্র-গ্রন্থ নহে। গীতা এক মহান্ ধর্ম-কাব্য। ইহাতে যতই ডুবিয়া যাওয়া যাইবে ততই নূতন ও সুন্দর সুন্দর অর্থ পাওয়া যাইবে। গীতা জন-সমাজের জন্য। উহাতে একই বস্তু অনেক প্রকারে বলা হইয়াছে। এজন্য গীতার মহাশব্দের অর্থ যুগে যুগে বদলাইতেছে ও বিস্তার লাভ করিতেছে। গীতার মূল মন্ত্র কখনও বদলায় না। এই মন্ত্র যে রীতিতেই সিদ্ধ করা হোক্ সেই রীতিতেই জিজ্ঞাসু ইচ্ছামত অর্থ করিতে পারেন।

গীতা বিধি-নিষেধ দেখাইবার জন্যও নহে। একের জন্য যাহা বিহিত, অপরের জন্য তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে। এক কালে এক দেশে যাহা বিহিত, তাহা অপর কালে অপর দেশে নিষিদ্ধ হইতে পারে।

ফলাসক্তি মাত্রই নিষিদ্ধ ও অনাসক্তি মাত্রই বিহিত।

গীতায় জ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে। তবুও গীতা বুদ্ধিগম্য নহে—হৃদয়গম্য, সেই কারণে ইহা অশ্রদ্ধা-পরায়ণের জন্য নহে।

গীতাকারই বলিয়াছেন—

'যে তপস্বী নয়, যে শুনিতে ইচ্ছুক নয় এবং যে আমাকে দ্বেষ করে তাহাকে এই জ্ঞানের কথা তুমি কখনও বলিও না।' (১৮।৬৭)

'কিন্তু এই পরম গুহ্য জ্ঞান যে আমার ভক্তকে দিবে, সে পরম ভক্তি করার জন্য নিঃসন্দেহে আমাকে পাইবে।' (১৮।৬৮)

'আর যে মনুষ্য দ্বেষ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্বক মাত্র শ্রবণ করে সে-ও মুক্ত হইয়া পুণ্যবানেরা যে লোকে বাস করে সেই শুভলোক প্রাপ্ত হয়।' (১৮।৭১)

কৌসানী (হিমালয়)
সোমবার
২৪. ৬. ২৯

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনাসক্তি-যোগ

প্রথম অধ্যায়

অর্জুন-বিষাদ-যোগ

জিজ্ঞাসা বিনা জ্ঞান হয় না। দুঃখ বিনা সুখ হয় না। ধর্ম-সংকট—হৃদয়-মন্থন এ সব জিজ্ঞাসুর নিকট একবার আসিয়া থাকেই।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—(১) (হে) সঞ্জয় ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ সমবেতাঃ মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব কিম্ অকুর্বত ?। যুযুৎসবঃ—যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। সমবেতাঃ—একত্রিত। মামকাঃ—আমার পুত্রগণ। অকুর্বত—করিলেন। (২) তদা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা রাজা দুর্যোধনঃ আচার্যম্ উপসঙ্গম্য বচনম্ অব্রবীৎ। তদা—তখন। পাণ্ডবানীকং—পাণ্ডবের সেনাকে; অনীক—সেনা। ব্যূঢ়ং—ব্যূহ রচনায় অধিষ্ঠিত অর্থাৎ সজ্জিত। উপসঙ্গম্য—নিকটে গিয়া। অব্রবীৎ—বলিয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—(১) হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় একত্র হইয়া আমার ও পাণ্ডুর পুত্রগণ কি করিলেন তাহা আমাকে বল।

টিপ্পনী—এই শরীররূপী ক্ষেত্রই ধর্মক্ষেত্র। কেননা ইহা মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হইতে পারে। পাপেই ইহার উৎপত্তি ও ইহা পাপেরই ভাজন হইয়া আছে, সেইজন্য শরীর কুরুক্ষেত্রও বটে।

কৌরব হইতেছে আসুরী-বৃত্তি। পাণ্ডু-পুত্রগণ হইতেছে দৈবী-বৃত্তি সকল। প্রত্যেক শরীরেই ভাল ও মন্দ বৃত্তির মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে—ইহা কে না অনুভব করে ?

সঞ্জয় বলিলেন—(২) ঐ সময় পাণ্ডব-সেনা সজ্জিত দেখিয়া রাজা দুর্যোধন আচার্য দ্রোণের নিকট গিয়া বলিলেন—

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

(৩) (হে) আচার্য, তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য। (৪) অত্র যুধি ভীমার্জুনসমাঃ মহেষ্বাসাঃ যুযুধানঃ বিরাটঃ চ মহারথঃ দ্রুপদঃ চ। যুধি—যুদ্ধে। মহেষ্বাসাঃ—মহা ইষ্বাস যাহাদের। ইষ্বাস—ধনুক। ইষু—বাণ। মহারথঃ—যিনি একা এক সহস্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। (৫) ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ বীর্যবান্ কাশিরাজঃ চ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ চ। নরপুঙ্গবঃ—নরশ্রেষ্ঠ। (৬) বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ বীর্যবান্ উত্তমৌজাঃ, সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ সর্ব এব মহারথাঃ। দ্রৌপদীর পুত্রগণ—প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকীর্তি, শতানীক, শ্রুতকর্মা। (৭) (হে) দ্বিজোত্তম, অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ মম সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ নিবোধ তে সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি। নিবোধ—জান। তে—তোমাকে। সংজ্ঞার্থং—গোচরে আনিবার জন্য। ব্রবীমি—বলিতেছি।

(৩) হে আচার্য, আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা ব্যূহ-বদ্ধ পাণ্ডবদিগের ঐ বৃহৎ সেনা দেখুন। (৪) ওখানে ভীম ও অর্জুনের ন্যায় মহাযোদ্ধা, ধনুর্ধারী যুযুধান সাত্যকী), বিরাট এবং মহারথী দ্রুপদরাজ, (৫) ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, শূরবীর কাশিরাজ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজ ও মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ শৈব্য, (৬) তেমনি পরাক্রমী যুধামন্যু, বলবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র (অভিমন্যু) ও দ্রৌপদীর পুত্র—এ সকলেই মহারথী। (৭) হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, এখন আমাদের প্রধান যোদ্ধাদিগকে জানুন; আমাদের সৈন্যদের নায়কদের নাম আপনার গোচরে

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯
অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০
অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩

(৮) ভবান্ ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ অশ্বত্থামা বিকর্ণঃ চ সৌমদত্তিঃ তথৈব চ। সমিতিঞ্জয়ঃ—যুদ্ধে জয়শীল। (৯) অন্যে চ বহবঃ নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। সর্বে যুদ্ধ বিশারদাঃ। (১০) ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং তৎ বলং অপর্যাপ্তম্ এতেষাং ভীমাভিরক্ষিতম্ তু ইদং বলং পর্যাপ্তম্। (১১) যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ সর্বে এব ভবন্তঃ সর্বেষু অয়নেষু ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু। অয়নেষু—দ্বারে, ব্যূহের প্রবেশ পথে। (১২) তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ। সিংহনাদং বিনদ্য—সিংহনাদের মত শব্দ করিয়া। (১৩) ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ সহসা

আনিবার জন্য বলিতেছি। (৮) আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা। (৯) নানা শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে বিশারদ আরো অনেক শূরবীর আছেন যাঁহারা আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে কুশল। (১০) ভীষ্ম-রক্ষিত আমাদের সৈন্যবল অপূর্ণ, কিন্তু ভীম-রক্ষিত উহাদের সৈন্যবল পুরাপুরি আছে। (১১) সেই হেতু আপনারা নিজ নিজ স্থান হইতে সকল পথেই ভীষ্ম পিতামহকে রক্ষা করিবেন। (দুর্যোধন এই প্রকার বলিলেন)। (১২) তাঁহার হর্ষ উৎপন্ন করিয়া কুরুবৃদ্ধ পিতামহ উচ্চৈস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন। (১৩) তাহার পর শঙ্খ, নাগারা, ঢোল,

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭

অভ্যহন্যন্ত সঃ শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ। পণবানকগোমুখাঃ—পণবাঃ আনকাঃ গোমুখাঃ—ঢোল, মৃদঙ্গ ও রামশিঙ্গা (রণশিঙ্গা)। (১৪) ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ। হয়ৈঃ—ঘোড়া সহিত। স্যন্দনে—রথে। মাধবঃ—মা অর্থাৎ প্রকৃতির যিনি ধব বা স্বামী ; প্রকৃতির অধীশ্বর। প্রদধ্মতুঃ—ধারণ করিয়াছিলেন, বাজাইয়াছিলেন। (১৫) হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তম্, ভীমকর্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খম্ পৌণ্ড্রম্। হৃষীকেশঃ হৃষীকাণাম্, ইন্দ্রিয়সকলের ঈশ, অর্থাৎ সর্ব ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। বৃকোদরঃ—বক নামক অগ্নি যাহার উদরে আছে, ভীম। (১৬) কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্ত বিজয়ম্, নকুলঃ সহদেবঃ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ দধ্মৌ। (১৭) পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ, মহারথঃ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ। পরমেষ্বাসঃ—পরম ইষ্বাস অর্থাৎ ধনুক যাহার, যিনি মহাধনুর্ধর।

মৃদঙ্গ এবং রণভেরী [রণশিঙ্গা] এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। (১৪) তখন শ্বেত অশ্বযুক্ত বড় রথে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। (১৫) শ্রীকৃষ্ণ 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় 'দেবদত্ত' শঙ্খ বাজাইয়া ছিলেন। ভয়ানক কর্মী ভীম 'পৌণ্ড্র' নামক মহাশঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। (১৬) কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির 'অনন্ত বিজয়' নামে শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন ও নকুল 'সুঘোষ' এবং সহদেব 'মণিপুষ্পক' নামে শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। (১৭) মহাধনুকধারী কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অজেয় সাত্যকী।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২০-২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২

(১৮) দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াশ্চ, মহাবাহুঃ, সৌভদ্রশ্চ, হে পৃথিবীপতে, সর্বশঃ পৃথক পৃথক শঙ্খান্ দধ্মুঃ। দ্রৌপদেয়াঃ—দ্রৌপদীর পুত্রগণ। সৌভদ্র—সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু। (১৯) নভঃ চ পৃথিবীং চ এব ব্যনুনাদয়ন্ সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ ধার্তরাষ্ট্রাণাম্ হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। ব্যনুনাদয়ন্—বি—বিশেষপ্রকারে, অনুনাদয়ন্ নাদযুক্ত করিয়া, কাঁপাইয়া। ব্যদারয়ৎ—বিদীর্ণ করিয়াছিল. (২০-২১) হে মহীপতে, কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধার্তরাষ্ট্রান্ অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা, শস্ত্র সম্পাতে প্রবৃত্তে, ধনুঃ উদ্যম্য হৃষীকেষম্ ইদম্ বাক্যম্ আহ।

অর্জুন উবাচ—হে অচ্যুত, উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে রথম্ স্থাপয়। কপিধ্বজঃ—যাহার ধ্বজায় কপি আঁকা ছিল; অর্জুন। (২২) এতান্ অবস্থিতান্ যোদ্ধুকামান্ যাবৎ অহম্ নিরীক্ষে, অস্মিন্ রণসমুদ্যমে ময়া কৈঃ সহ যোদ্ধব্যম্।

(১৮) হে রাজন্! দ্রুপদরাজ, দ্রৌপদীর পুত্র, সুভদ্রাপুত্র মহাবাহু অভিমন্যু—ইঁহারা সকলে নিজ নিজ শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। (১৯) পৃথিবী ও আকাশ কাঁপাইয়া এই ভয়ঙ্কর নাদ কৌরবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল। (২০-২১) হে রাজন্, কপিধ্বজ অর্জুন কৌরবদিগকে সজ্জিত দেখিয়া অস্ত্র চালাইতে তৈয়ারী হওয়ার সময় নিজ ধনুকে গুণ চড়াইয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন—

অর্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত, আমার রথ দুই সৈন্যের মধ্যে দাঁড় করাও। (২২) যাহাতে যুদ্ধ-কামনায় যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি দেখিতে পাই ও জানিতে পারি, এই সংগ্রামে আমাকে কাহার সহিত লড়িতে হইবে।

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

(২৩) অত্র যুদ্ধে দুর্বুদ্ধেঃ ধার্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে যোৎস্যমানান্ এতে সমাগতাঃ (তান্) অহং অবেক্ষে। প্রিয়চিকীর্ষবঃ—প্রিয় কার্য করিতে ইচ্ছুক। যোৎস্যমানান্—যুদ্ধে প্রস্তুত যোদ্ধা। অবেক্ষে—দেখি।

সঞ্জয় উবাচ—(২৪-২৫) হে ভারত গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে সর্বেষাম্ চ মহীক্ষিতাম্ চ ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ রথোত্তমম্ স্থাপয়িত্বা উবাচ—হে পার্থ, এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য ইতি। গুড়াকেশ—গুড়াকা, নিদ্রা, তাহার ঈশ—বিজেতা, নিদ্রাজয়ী বা জিতনিদ্র। (২৬-২৭) অথ পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি স্থিতান্ পিতৄন পিতামহান্ আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্ শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ অপশ্যৎ। তান্ অবস্থিতান্ সর্বান্ বন্ধুন্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ স কৌন্তেয়ঃ ইদম্ অব্রবীৎ।

(২৩) এই যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের প্রিয় কার্য করিতে ইচ্ছুক যে যোদ্ধাগণ একত্র হইয়াছেন তাঁহাদিগকে দেখিয়া লই।

সঞ্জয় বলিলেন—(২৪-২৫) অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলে তিনি উভয় সেনার মধ্যে রাজাগণ ও ভীষ্ম দ্রোণের সম্মুখে উত্তম রথ দাঁড় করাইয়া বলিলেন—হে পার্থ, এইখানে সমবেত কুরুদিগকে দর্শন কর। (২৬-২৭) সেইখানে সমবেত সেনার মধ্যে অবস্থিত বৃদ্ধ পিতামহ, আচার্য, মামা, ভাই, পুত্র, পৌত্র, মিত্র, শ্বশুর, সুহৃৎ সমূহকে অর্জুন দেখিলেন। এই সকল বান্ধবকে উপস্থিত দেখিয়া খেদ উৎপন্ন হওয়ায় দীনভাবাপন্ন কুন্তীপুত্র এই প্রকার বলিলেন—

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥ ২৮-২৯
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥ ৩০
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥ ৩১
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥ ৩২

অর্জুন উবাচ—(২৮-২৯) হে কৃষ্ণ, যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ইমান্ স্বজনান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি, মুখম্ চ পরিশুষ্যতি, মে শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে। বেপথুঃ—কম্প। রোমহর্ষঃ—রোমাঞ্চ। (৩০) হস্তাৎ গাণ্ডীবম্ স্রংসতে, ত্বক্ চ এব পরিদহ্যতে, অবস্থাতুম্ ন চ শক্নোমি, মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব। স্রংসতে—স্খলিত হইতেছে। (৩১) হে কেশব, বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি, আহবে স্বজনম্ হত্বা শ্রেয়ঃ ন অনুপশ্যামি। নিমিত্তানি—লক্ষণসকল। আহবে—যুদ্ধে। (৩২) হে কৃষ্ণ, বিজয়ম্ ন কাংক্ষে, ন চ রাজ্যম্, ন চ সুখানি, হে গোবিন্দ, নঃ রাজ্যেন কিম্ ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্। নঃ—আমাদের। কিম্—কি প্রয়োজন।

অর্জুন বলিলেন—(২৮-২৯) হে কৃষ্ণ, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক সমবেত এই স্বজনদিগকে দেখিয়া আমার গাত্র শিথিল হইয়া পড়িতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে, শরীর কাঁপিতেছে এবং রোমাঞ্চিত হইতেছে। (৩০) হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া যাইতেছে, চামড়া যেন দগ্ধ হইতেছে, আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না, কেননা আমার মাথা ঘুরিতেছে। (৩১) হে কেশব! আমি ত বিপরীত চিহ্ন দেখিতেছি। যুদ্ধে স্বজন হত্যা করিয়া শ্রেয় কিছুই দেখিতেছি না! (৩২) ইহাদিগকে হত্যা করিয়া বিজয় ইচ্ছা করি না; রাজ্য অথবা সুখও চাই না। হে গোবিন্দ, (ইহাদিগকে হত্যা করিয়া) আমার রাজ্য বা ভোগ বা জীবনে কি প্রয়োজন আছে?

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥ ৩৫
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭

(৩৩-৩৪) যেষাং অর্থে নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং তে ইমে আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ তথা এব চ পিতামহাঃ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ যুদ্ধে প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা অবস্থিতাঃ। (৩৫) হে মধুসূদন! ঘ্নতঃ অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি, নু মহীকৃতে কিং। (৩৬) হে জনার্দন! ধার্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ? এতান্ আততায়িনঃ হত্বা অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ। নিহত্য—মারিয়া। আততায়িনঃ—শত্রুদিগকে। অস্মান্—আমাদের। (৩৭) তস্মাৎ হে মাধব। স্ববান্ধবান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ। হি স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম। স্ববান্ধবান্—নিজের বান্ধবদিগকে। হন্তুং—হত্যা করিতে। স্যাম—হইবে।

(৩৩-৩৪) যাহাদের জন্য রাজ্য ভোগ ও সুখ পাইতে ইচ্ছা করি সেই আচার্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মামা, শ্বশুর, পৌত্র, শালা ও সম্বন্ধী সকলে জীবন ও ধনের আশা ছাড়িয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। (৩৫) আমাকে উহারা যদি মারিয়া ফেলে অথবা আমার যদি ত্রিলোকের রাজ্য মিলে তবুও, হে মধুসূদন, আমি উহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। তাহা হইলে এক টুকরা জমির জন্য কেন মারিব? (৩৬) হে জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সকলকে হত্যা করিয়া আমার কি আনন্দ হইবে? এই আততায়ীদিগকে হত্যা করিলে আমাদের পাপই হইবে। (৩৭) সেইজন্য হে মাধব, আমার নিজের স্বজন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমার হত্যার যোগ্য নহে। স্বজন হত্যা করিয়া কেমন করিয়া সুখী হইব?

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৮
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥ ৩৯
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত॥ ৪০
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪১
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪২

(৩৮-৩৯) লোভোপহতচেতসঃ যদ্যপি এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে পাতকং চ ন পশ্যন্তি; হে জনার্দন! কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুম্ কথং ন জ্ঞেয়ম্? (৪০) লোভোপহতচেতসঃ—লোভ দ্বারা যাহাদের চিত্ত অপহৃত বা মলিন হইয়াছে। প্রপশ্যদ্ভিঃ—দর্শনকারী। অস্মাভিঃ—আমাদের। নিবর্তিতুম্—নিবৃত্ত হইতে। জ্ঞেয়ম্—জানিব। কুলক্ষয়ে (সতি) সনাতনাঃ কুলধর্মাঃ প্রণশ্যন্তি, উত ধর্মে, নষ্টে অধর্মঃ কৃৎস্নং কুলং অভিভবতি। কৃৎস্নং—সমস্ত। অভিভবতি—অভিভূত করিয়া ফেলে অর্থাৎ ডুবাইয়া দেয়। (৪১) হে কৃষ্ণ! অধর্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি, হে বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীষু দুষ্টাসু বর্ণসঙ্করঃ জায়তে। অধর্মাভিভবাৎ—অধর্মের অভিভব, বৃদ্ধি হইলে। জায়তে—উৎপন্ন হয়। (৪২) সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং কুলস্য চ নরকায় এব (ভবতি) হি এষাং পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পতন্তি।

(৩৮-৩৯) লোভে যাহাদের চিত্ত মলিন হইয়াছে তাহারা কুলনাশের দোষ ও মিত্রদ্রোহের পাতক যদি না-ই দেখিতে পায়, তবে হে জনার্দন, আমরা যাহারা কুলনাশের দোষ দেখিতে পাইতেছি তাহারা এই পাপ হইতে কেন না নিবৃত্ত হইবে? (৪০) কুলনাশ হইলে সনাতন কুলধর্ম নাশ পায় এবং যদি ধর্ম নষ্ট হয় তবে অধর্ম সমস্ত কুল ডুবাইয়া দেয়। (৪১) হে কৃষ্ণ, অধর্ম বৃদ্ধি হইলে কুলস্ত্রী দূষিত হয়, তাহারা দূষিত হইলে বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হয়। (৪২) এই সঙ্কর হইতে কুলঘাতকের জন্ম হয় এবং তাহাদের নরক বাস হয় এবং পিণ্ডোদক ক্রিয়াদি বঞ্চিত হইয়া তাহাদের পিতৃগণের অধোগতি হয়।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩
উৎসন্ন কুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪
অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫
যদিমামপ্রতিকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

(৪৩) কুলঘ্নানাং এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাঃ চ উৎসাদ্যন্তে। উৎসাদ্যন্তে—বিনষ্ট হয়, নাশ হয়। (৪৪) হে জনার্দন! উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম। উৎসন্নকুলধর্মাণাং—যাহাদের কুলধর্ম নাশ হইয়াছে। অনুশুশ্রুম—শুনিয়াছি। (৪৫) অহোবত! বয়ং মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতাঃ যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুং উদ্যতাঃ। অহোবত—হায়! বয়ং—আমরা। ব্যবসিতাঃ—প্রস্তুত হইয়াছি। (৪৬) যদি অশস্ত্রং অপ্রতীকারং মাম্ শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ। অপ্রতীকারং—প্রতীকার করিতে অনিচ্ছুক অর্থাৎ অপ্রস্তুত। ক্ষেমতরং—কল্যাণকারক। সঞ্জয় উবাচ—(৪৭) সংখ্যে

(৪৩) কুলঘাতক লোকদের এই বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন করার ফলে সনাতন জাতিধর্ম ও কুলধর্মের নাশ হয়। (৪৪) হে জনার্দন, আমরা শুনিয়া আসিয়াছি যে, যাহাদের কুলধর্ম নাশ হইয়াছে সেই মানুষদের অবশ্যই নরকে বাস হয়। (৪৫) হায়! কি দুঃখের কথা রাজ্য-সুখ-লোভে স্বজনগণকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়া আমি মহাপাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। (৪৬) শস্ত্রহীন ও সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক আমাকে ধৃতরাষ্ট্রের শস্ত্রধারী পুত্রেরা যদি যুদ্ধে মারিয়া ফেলে তবে তাহাই আমার পক্ষে কল্যাণকর হইবে। সঞ্জয় বলিলেন—(৪৭) এই বলিয়া

শোকসংবিগ্নমানসঃ অর্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সশরং চাপং বিসৃজ্য রথোপস্থে উপাবিশৎ। সংখ্যে—যুদ্ধে। রথোপস্থে—রথের উপস্থে, পশ্চাতের আসনে।

যুদ্ধক্ষেত্রে শোক-ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া অর্জুন ধনুর্বাণ ফেলিয়া রথের পশ্চাৎভাগে বসিয়া পড়িলেন।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে অর্জুন-বিষাদ-যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য-যোগ

মোহবশ হইয়া লোকে অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে করে। মোহের বশ হইয়াই অর্জুন আপনার ও পরের—এই ভেদ করিয়াছিলেন। এই ভেদ যে মিথ্যা ইহা দেখাইতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেহ ও আত্মার ভিন্নতা দেখাইতেছেন; দেহের অনিত্যতা ও পৃথকতা, আত্মার নিত্যতা এবং তাহার একত্ব দেখাইতেছেন। মানুষ কেবল পুরুষার্থের অধিকারী, পরিণামের নহে। সেই হেতু সে কর্তব্য স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিয়া সেই বিষয়ে একনিষ্ঠ হইয়া লাগিয়া থাকিবে। এই একনিষ্ঠতার দ্বারা সে মোক্ষের উপযুক্ত হইবে।

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন॥ ২

সঞ্জয় উবাচ—(১) মধুসূদনঃ তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তম্ ইদম্ বাক্যম্ উবাচ। (২) শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জুন, অনার্যজুষ্টম্

সঞ্জয় বলিলেন—(১) এই প্রকারে করুণায় দীন ও অশ্রুপূর্ণ ব্যাকুলনেত্র, দুঃখিত অর্জুনের প্রতি মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন। শ্রীভগবান বলিলেন—(২) হে

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

অস্বর্গ্যম্ অকীর্তিকরম্ ইদং কশ্মলং ত্বা বিষমে কুতঃ সমুপস্থিতম্। কশ্মল—মোহ। অনার্যজুষ্ট—আর্যদের পক্ষে অনুপযুক্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষের অযোগ্য।

(৩) হে পার্থ, ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ ত্বয়ি এতৎ ন উপপদ্যতে। হে পরন্তপ ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ। পরন্তপ—শত্রুকে যিনি তাপ দেন। অর্জুন উবাচ—(৪) হে মধুসূদন, হে অরিসূদন, অহং সংখ্যে পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ কথং ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি। সংখ্যে—যুদ্ধে। ইষু—বাণ। (৫) হি মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা ইহ লোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। তু গুরূন্ হত্বা ইহ এব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়। ভৈক্ষম্ অপি—ভিক্ষালব্ধ অন্নও। রুধিরপ্রদিগ্ধ—রক্তসিক্ত। ভুঞ্জীয়—ভোগ করিব।

অর্জুন, শ্রেষ্ঠ পুরুষের অযোগ্য, স্বর্গ হইতে বিমুখকারী ও অপযশদানকারী এই মোহ তোমাতে এই বিষম সময়ে কোথা হইতে আসিল ?

(৩) হে পার্থ, তুমি কাপুরুষ হইও না। তোমাতে ইহা শোভা পায় না। হৃদয়ের এই হীন দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া হে পরন্তপ, তুমি উঠ।

অর্জুন বলিলেন—(৪) হে মধুসূদন, ভীষ্ম ও দ্রোণকে রণভূমিতে আমি কেমন করিয়া বাণ মারিব ? হে অরিসূদন, ইঁহারা ত পূজনীয় বটেন। (৫) এইরূপ মহানুভব গুরুজনকে না মারিয়া এই লোকে ভিক্ষান্ন খাওয়াও ভাল। যেহেতু গুরুজনকে হত্যা করিলে তো আমার রক্তমাখা অর্থ ও কামের ভোগই ভুগিতে হইল।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

(৬) যৎ বা জয়েম যদি বা নঃ জয়েয়ুঃ নঃ কতরৎ গরীয়ঃ এতৎ চ ন বিদ্মঃ। যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ তে ধার্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ। কতরৎ গরীয়ঃ—কোনটি শ্রেষ্ঠ। (৭) কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ধর্ম-সংমূঢ়চেতাঃ (অহং) ত্বাং পৃচ্ছামি। যৎ মে নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ ব্রূহি। অহং তে শিষ্যঃ। ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি। প্রপন্ন—আশ্রিত। শাধি—উপদেশ দাও। (৮) ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধং রাজ্যম্ অবাপ্য সুরাণাং চ আধিপত্যম্ (অবাপ্য) যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্ শোকম্ অপনুদ্যাৎ (তৎ) হি ন প্রপশ্যামি। ভূমৌ—পৃথিবীতে। অসপত্ন—নিষ্কণ্টক। উচ্ছোষণ—শোষণকারী।

(৬) আমি বুঝিতেছি না যে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা ভাল—আমি জয় করি, অথবা তাহারাই আমাকে জয় করে। যাহাদিগকে মারিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এই সম্মুখে খাড়া রহিয়াছে। (৭) কৃপণতায় আমার [জাত] বৃত্তি নষ্ট হইয়াছে। কর্তব্য সম্বন্ধে আমি মূঢ় হইয়াছি। সেই জন্য যাহাতে আমার হিত হয়, তাহা আমাকে নিশ্চয়পূর্বক বলিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমার শিষ্য। তোমার শরণ লইলাম। আমাকে পথ দেখাও। (৮) এই লোক যদি ধন-ধান্য-সম্পন্ন নিষ্কণ্টক রাজ্য পাওয়া যায়, ইন্দ্রাসন পাওয়া যায় তাহাতেও ইন্দ্রিয় সকলকে শোষণকারী আমার শোক দূর হইবার মত কিছু দেখি না।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২

সঞ্জয় উবাচ—(৯) পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশং গোবিন্দম্ এবম্ উক্ত্বা 'অহং ন যোৎস্যে' ইতি উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব। ন যোৎস্যে—যুদ্ধ করিব না। (১০) হে ভারত, উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে বিষীদন্তং তম্ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ইদং বচঃ উবাচ। প্রহসন্ ইব—যেন মৃদু হাসিয়া।

শ্রীভগবান্ উবাচ—(১১) ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে চ। পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ অগতাসূন্ চ ন অনুশোচন্তি। অন্বশোচঃ—শোক করিতেছ। গতাসু—মৃত। অসু—প্রাণ। (১২) অহং জাতু ন আসম্ ন তু এব, ন ত্বং ন ইমে জনাধিপাঃ। অতঃ পরং সর্বে বয়ম্ ন চ এব ন ভবিষ্যামঃ। জাতু—কদাচিৎ। আসম্—ছিলাম। ন তু এব—এরূপ নহে।

সঞ্জয় বলিলেন—(৯) হে রাজন্, গুড়াকেশ অর্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে উপযুক্ত প্রকারে বলিয়া 'যুদ্ধ করিব না' কহিয়া চুপ করিয়া গেলেন। (১০) হে ভারত, এই উভয় সৈন্যের মধ্যে উদাসভাবে উপবিষ্ট অর্জুনকে মৃদু হাসিয়া হৃষীকেশ এই বাক্য বলিলেন—

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(১১) তুমি শোক করার অযোগ্য বিষয়ে শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের মত কথাও বলিতেছ। কিন্তু পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিতের জন্য শোক করেন না। (১২) কেননা বাস্তবিক দেখিলে, আমি তুমি অথবা এই নৃপতিবর্গ কেহই কোনও কালে ছিল না. অথবা ভবিষ্যতে হইবে না—এমন নহে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬
অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭

(১৩) যথা অস্মিন্ দেহে দেহিনঃ কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ, ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি। (১৪) হে কৌন্তেয়, মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ আগমাপায়িনঃ অনিত্যাঃ। হে ভারত, তান্ তিতিক্ষস্ব। আগমাপায়িনঃ—উৎপত্তি ও নাশ বিশিষ্ট। তিতিক্ষস্ব—সহ্য কর। (১৫) হে পুরুষর্ষভ, যং সমদুঃখসুখং ধীরং এতে ন ব্যথয়ন্তি সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে। (১৬) অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে। সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে। তত্ত্বদর্শিভিঃ তু উভয়ঃ অপি অনয়োঃ অন্তঃ দৃষ্টঃ। ভাব—অস্তিত্ব। (১৭) যেন ইদং সর্বং ততং তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি। কশ্চিৎ অব্যয়স্য অস্য বিনাশং কর্তুং ন অর্হতি।

(১৩) দেহধারীর যেমন এই দেহে কৌমার, যৌবন ও জরাপ্রাপ্তি হয়, তেমনি অন্য দেহ-প্রাপ্তিও ঘটে। এই বিষয়ে বুদ্ধিমান্ পুরুষ মোহগ্রস্ত হ'ন না। (১৪) হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রসকলের স্পর্শ ঠাণ্ডা-গরম, সুখ ও দুঃখ দেওয়ার হেতু। উহারা অনিত্য—আসে ও যায়। সেই হেতু উহা সহ্য কর। (১৫) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সুখ-দুঃখ সমান অনুভবকারী যে বুদ্ধিমান্ পুরুষকে এই বিষয় ব্যাকুল করে না সে-ই মোক্ষের যোগ্য হয়। (১৬) অসত্যের অস্তিত্ব নাই, সত্যের নাশ নাই। এই উভয়ের নির্ণয় জ্ঞানীরা জানিয়াছেন। (১৭) যাহা দ্বারা অখিল জগৎ ব্যাপ্ত তাহাকে তুমি অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের নাশ করিতে কেহ সমর্থ হয় না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

(১৮) নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ। হে ভারত, তস্মাৎ যুধ্যস্ব। (১৯) যঃ এনং হন্তারং বেত্তি যঃ চ এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ। অয়ম্ ন হন্তি, ন হন্যতে। (২০) অয়ম্ কদাচিৎ ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা। (অয়ং) ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ অয়ং শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে। অজঃ—যাহার জন্ম নাই। (২১) হে পার্থ, যঃ এনম্ অবিনাশিনং নিত্যং অজং অব্যয়ম্ বেদ সঃ পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি, কং হন্তি। এনম্—এই আত্মাকে।

(১৮) নিত্যস্থায়ী, পরিমাপ করা যায় না [অপ্রমেয়], অবিনাশী দেহীর এই দেহ নাশবান্ বলা হয়, সেই হেতু হে ভারত, তুমি যুদ্ধ কর।

(১৯) যে ইহাকে হত্যাকারী মনে করে এবং যে ইহাকে হন্তব্য মনে করে—সে এই উভয়েরই কিছু জানে না। ইহা (আত্মা) হত হয় না, হত্যা করে না।

(২০) ইহা কখনো জন্মে না, মরেও না। ইহা জন্মিয়াছে বা ভবিষ্যতে জন্মিবে না এমন নয়। সেই হেতু ইহা অজন্মা, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। শরীরের নাশ হইলেও ইহার নাশ হয় না। (২১) হে পার্থ, যে পুরুষ আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজন্মা ও অব্যয় বলিয়া মানে সে কাহাকে কেমন করিয়া বধ করায় ও কাহাকে বধ করে?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

(২২) যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃহ্ণাতি তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি (শরীরাণি) সংযাতি। সংযাতি—প্রাপ্ত হয়। (২৩) এনং শস্ত্রাণি ন ছিন্দন্তি, এনং পাবকঃ ন দহতি, এনং আপঃ চ ন ক্লেদয়ন্তি, মারুতঃ ন শোষয়তি। (২৪) অয়ং অচ্ছেদ্যঃ, অয়ং অদাহ্য, অক্লেদ্যঃ, অশোষ্য এব চ। অয়ং নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ সনাতনঃ। অয়ং—এই আত্মা। (২৫) অয়ম্ অব্যক্তঃ অয়ম্ অচিন্ত্যঃ অয়ম্ অবিকার্যঃ উচ্যতে। তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুং ন অর্হসি। (২৬) অথ চ এনং নিত্যজাতং বা নিত্যং মৃতং মন্যসে তথাপি ত্বং হে

(২২) যেমন মানুষ পুরাতন বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করে, সেই মত দেহধারী জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া আবার নূতন দেহ পায়? (২৩) এই আত্মাকে শস্ত্র ছিন্ন করিতে পারে না, আগুন জ্বালাইতে পারে না, জল পচাইতে পারে না, বায়ু শুকাইতে পারে না। (২৪) ইহাকে কাটা যায় না, পোড়ান যায় না, পচান যায় না বা শুকান যায় না। ইহা নিত্য, সর্বগত, স্থির, অচল ও সনাতন। (২৫) আর ইহা ইন্দ্রিয় ও মনের অগম্য, ইহাকে বিকার-রহিত বলা হয়, সেই হেতু ইহাকে উক্তরূপ জানিয়া তোমার শোক করা উচিত নয়। (২৬) অথবা যদি তুমি ইহাকে নিত্য জন্মশীল এবং মরণশীল বলিয়া মান

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

মহাবাহো, এবং শোচিতুং ন অর্হসি। (২৭) হি জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্। তস্মাৎ অপরিহার্যেঽর্থে ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি। (২৮) হে ভারত! ভূতানি অব্যক্তাদীনি ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্ত-নিধনানি। তত্র কা পরিদেবনা। পরিদেবনা—পরিতাপ। (২৯) কশ্চিৎ এনং আশ্চর্যবৎ পশ্যতি, তথা এব অন্যঃ আশ্চর্যবৎ বদতি। অন্যঃ চ এনম্ আশ্চর্যবৎ শৃণোতি। শ্রুত্বা অপি এনং কশ্চিৎ ন চ এব বেদ। (৩০) হে ভারত! সর্বস্য দেহে অয়ং দেহী নিত্যং অবধ্যঃ। তস্মাৎ ত্বং সর্বাণি ভূতানি ন শোচিতুম্ অর্হসি।

তাহা হইলেও হে মহাবাহো, তোমার শোক করা উচিত হয় না। (২৭) যে জন্মিয়াছে তাহার মৃত্যু ও যে মরিয়াছে তাহার জন্ম অনিবার্য। সেই হেতু যাহা অনিবার্য সে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়। (২৮) হে ভারত, ভূতমাত্রের জন্মের পূর্বের এবং মৃত্যুর পরের স্থিতি জানা যায় না, উহাকে অব্যক্ত, মধ্যের স্থিতিই ব্যক্ত। ইহাতে চিন্তার কারণ কি?

টিপ্পনী—ভূত অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি।

(২৯) কেহ ইহাকে আশ্চর্যের ন্যায় দেখে, আর কেহ ইহাকে আশ্চর্যবৎ বর্ণন করে, আবার কেহ ইহাকে আশ্চর্য বর্ণিত হয় বলিয়া শুনিয়া থাকে, এবং শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানে না। (৩০) হে ভারত, সকল দেহে অবস্থিত এই দেহধারী আত্মা নিত্য অবধ্য। সেইজন্য তোমার ভূতমাত্র সম্বন্ধে শোক করা উচিত নয়।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩
অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

(৩১) অপি চ স্বধর্মম্ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুম্ ন অর্হসি। হি ধর্মাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে। (৩২) হে পার্থ! যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্ অপাবৃতম্ স্বর্গদ্বারম্ ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে। উপপন্ন—প্রাপ্ত। (৩৩) অথ চেৎ ত্বম্ ইমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি। ধর্ম্যং—ধর্মানুগত। হিত্বা—পরিত্যাগ করিয়া। (৩৪) ভূতানি চ তে অব্যয়াম্ অকীর্তিং কথয়িষ্যন্তি। সম্ভাবিতস্য চ অকীর্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে। ভূতানি—লোকসকল। সম্ভাবিতস্য—সম্মানিত পুরুষের।

টিপ্পনী—এ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধি-প্রয়োগ দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব ও দেহের অনিত্যত্ব বুঝাইতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোনও স্থিতিতে যদি দেহ নাশ করার যোগ্য গণ্য হয়, তবে স্বজন পরজন ভেদ করিয়া, কৌরবেরা মিত্র সেই হেতু কেমন করিয়া হত্যা করিব এই প্রকার বিচার মোহের জন্যই হয়। এখন ক্ষত্রিয় ধর্ম কি তাহা বুঝাইতেছেন।

(৩১) স্বধর্ম বুঝিয়াও তোমার ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়। যে হেতু ধর্মযুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই অধিক শ্রেয়স্কর নাই। (৩২) হে পার্থ, এইরূপ আপনা আপনি প্রাপ্ত ও যাহাতে স্বর্গদ্বার খুলিয়া যায় এমন যুদ্ধ তো ভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়েরই মিলে। (৩৩) যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম ও কীর্তি খোয়াইয়া উপরন্তু পাপ লইবে। (৩৪) সকল লোক নিরন্তর তোমার নিন্দা করিতে থাকিবে। মানী পুরুষের অপকীর্তি মরণ অপেক্ষাও খারাপ।

ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ! কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯

(৩৫) মহারথাঃ ত্বাং ভয়াৎ রণাদুপরতং মংস্যন্তে। যেষাং ত্বং বহুমতঃ ভূত্বা লাঘবং যাস্যসি। মংস্যন্তে—মনে করিবে। (৩৬) তব অহিতাঃ তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ চ বদিষ্যন্তি। ততো নু কিং দুঃখতরম্। অহিতাঃ—শত্রুগণ। (৩৭) (ত্বং) হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা মহীম্ ভোক্ষ্যসে। তস্মাৎ হে কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ উত্তিষ্ঠ। জিত্বা বা—যদি জয়ী হও। (৩৮) সুখদুঃখে সমে, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ (চ সমৌ) কৃত্বা ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব। এবং পাপম্ ন অবাপ্স্যসি। যুজ্যস্ব—প্রবৃত্ত হও। এবং—এরূপ করিলে। (৩৯) হে পার্থ! সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা, যোগে তু ইমাং

(৩৫) যে সকল মহারথীর নিকট তুমি মান পাইয়াছ, তাহারা মনে করিবে ভয়ের জন্য তুমি রণে নিবৃত্ত হইতেছ এবং তোমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। (৩৬) এবং তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্য সম্বন্ধে নিন্দা করিতে করিতে অনেক অবাচ্য কথা বলিবে। ইহা হইতে অধিক দুঃখদায়ী আর কি হইতে পারে? (৩৭) যদি তুমি নিহত হও তবে স্বর্গ পাইবে। যদি তুমি জয়ী হও তবে পৃথিবী ভোগ করিবে। সেই হেতু হে কৌন্তেয়, যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমি উঠিয়া দাঁড়াও। (৩৮) সুখ ও দুঃখ, লাভ ও হানি, জয় ও পরাজয় সমান মানিয়া যুদ্ধ করিতে তৎপর হও। এরূপ করিলে তোমার পাপ হইবে না। (৩৯) আমি তোমাকে সাংখ্য সিদ্ধান্ত (তর্কবাদ) দ্বারা তোমার কর্তব্য বুঝাইলাম। এক্ষণে যোগবাদ অনুসারে বুঝাইতেছি, তুমি শোন। ইহার আশ্রয়

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩

শৃণু। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি। (৪০) ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে। অস্য ধর্মস্য স্বল্পম্ অপি মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে। অভিক্রমনাশঃ—আরম্ভের নাশ। (৪১) হে কুরুনন্দন! ইহ একা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ অব্যবসায়িনাম্ বুদ্ধয়ঃ হি বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ। ব্যবসায়াত্মিকা—নিশ্চয়াত্মিকা।

(৪২-৪৩-৪৪) হে পার্থ! ন অন্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ, কামাত্মনঃ স্বর্গপরাঃ অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষ-বহুলাং যাম্ পুষ্পিতাং ইমাং বাচং প্রবদন্তি তয়া (বাচা) ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং অপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। অবিপশ্চিতঃ—অজ্ঞানী।

টিপ্পনী—এই প্রকারে ভগবান্ আত্মার নিত্যত্ব ও দেহের অনিত্যত্ব বুঝাইলেন। আর সহজপ্রাপ্ত যুদ্ধ ক্ষাত্রধর্মে বাধা হয় না এ কথাও বুঝাইলেন। অর্থাৎ ৩১-এর শ্লোকে ভগবান্ পরমার্থের সহিত ব্যবহারের মিল করাইলেন।

লইলে তুমি কর্মবন্ধন ছিঁড়িতে পারিবে। (৪০) ইহাতে আরম্ভের নাশ নাই। বিপরীত পরিণাম আসিতে পারে না। এই ধর্মের যৎকিঞ্চিৎ পালনও মহাভয় হইতে উদ্ধার করে। (৪১) হে কুরুনন্দন, যোগবাদীর নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি একরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু অনিশ্চয়বাদীদিগের বুদ্ধি অনেক শাখাযুক্ত ও অনন্ত হয়।

টিপ্পনী—বুদ্ধি এক হইতে যখন অনেক হয় তখন সে বুদ্ধি বাসনারই রূপ লয়। সেই হেতু বুদ্ধিসকল মানে বাসনা।

(৪২-৪৩-৪৪) "ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই"—এই রকম যাহারা বলে এবং যাহারা কামনা-যুক্ত, স্বর্গকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে, এই প্রকার অজ্ঞানী বেদবিদেরা জন্ম-মরণের ফল দেয় এমন ভোগ ও ঐশ্বর্য যে যজ্ঞাদিতে পাওয়া

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫
যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭

(৪৫) হে অর্জুন! বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ, ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব, নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্ (ভব)। (৪৬) উদপানে যাবান্ অর্থঃ সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবান্ অর্থঃ সর্বেষু বেদেষু যাবান্ অর্থঃ তাবান্ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য। (৪৭) কর্মণি এব তে অধিকারঃ ফলেষু কদাচন মা (অস্তু), (ত্বং) কর্মফলহেতুঃ মা ভূঃ। অকর্মণি তে সঙ্গঃ মা অস্তু।

যায় তাহার জন্য নানা কর্মের বর্ণনে অনেক কথা বাড়াইয়া বাড়াইয়া বলিয়া থাকে। ভোগ ও ঐশ্বর্যের বিষয়ে আসক্ত হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধি মলিন হইয়া যায়, তাহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক হয় না এবং সমাধির বিষয়ে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

টিপ্পনী—যোগবাদের বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড অথবা বেদবাদের বর্ণন উপরের তিন শ্লোকে করা হইয়াছে। কর্মকাণ্ড বা বেদবাদের তাৎপর্য হইতেছে ফল উৎপন্ন করিবার জন্য অগণিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা। এই সকল ক্রিয়া বেদের রহস্য হইতে, বেদান্ত হইতে ভিন্ন ও অল্প ফলপ্রসূ বলিয়া নিরর্থক।

(৪৫) হে অর্জুন, যে তিন গুণ বেদের বিষয় তাহাতে তুমি অলিপ্ত থাকিও। সুখ-দুঃখের স্বাদ হইতে মুক্ত থাকিও, নিত্য সত্যবস্তু বিষয়ে স্থিত থাকিও। কোনও বস্তু পাওয়ার ও রক্ষা করিবার ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত থাকিও, আত্মপরায়ণ হইও। (৪৬) যেমন কূপ হইতে যে কার্য হয় সে সমস্তই সরোবর হইতেও হয়, তেমনি যাহা বেদে আছে তাহা জ্ঞানবান্ ব্রহ্মপরায়ণের আত্মানুভবে পাওয়া যায়। (৪৭) কর্মেই তোমার অধিকার, উহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

(৪৮) হে ধনঞ্জয়! সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা, সঙ্গং ত্যক্ত্বা যোগস্থঃ (সন্) কর্মাণি কুরু সমত্বং যোগঃ উচ্যতে। (৪৯) হে ধনঞ্জয়! কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ দূরেণ হি অবরম্। বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ, ফলহেতবঃ কৃপণাঃ। অবরম্—নিকৃষ্ট। কৃপণাঃ—ক্ষুদ্রাশয়। (৫০) বুদ্ধিযুক্তঃ ইহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতি। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব। যোগঃ কর্মসু কৌশলম্। (৫১) বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ কর্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি। (৫২) তে বুদ্ধিঃ যদা মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ নির্বেদং গন্তাসি। মোহকলিলং—মোহরূপ মলিনতা।

এমন ফলে কখনও নাই। কর্মফল তোমার লক্ষ্য যেন না হয়। কর্ম না করিতে যেন তোমার আগ্রহ না হয়। (৪৮) হে ধনঞ্জয়, আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ সফলতা ও নিষ্ফলতা বিষয়ে সমান ভাব রাখিয়া তুমি কর্ম কর। এইরূপ সমত্ব-বুদ্ধিকেই যোগ বলে।

(৪৯) হে ধনঞ্জয়, সমত্ব বুদ্ধির তুলনায় কেবল কর্ম খুব তুচ্ছ। তুমি সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় লও। ফলের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করে সে দীন, কৃপার পাত্র। (৫০) বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ সমতাবান্ পুরুষকে ইহলোকে পাপ-পুণ্য স্পর্শ করে না। সেই হেতু তুমি সমত্বের জন্য প্রযত্ন কর। সমতাই কার্যকুশলতা। (৫১) সমত্ববুদ্ধিযুক্ত লোক কর্ম হইতে উৎপন্ন ফল ত্যাগ করিয়া জন্ম-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নিষ্কলঙ্ক গতি বা মোক্ষ পদ পায়। (৫২) যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপী ক্লেদ পার

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ! মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

(৫৩) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ যদা নিশ্চলা, সমাধৌ অচলা স্থাস্যতি তদা (ত্বং) যোগম্ অবাপ্স্যসি। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—নানা প্রকার সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিক্ষিপ্ত।

অর্জুন উবাচ—(৫৪) হে কেশব! সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা? স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত? কিং আসীত, কিং ব্রজেত? কা ভাষা—লক্ষণ কি।

শ্রীভগবান্ উবাচ—(৫৫) হে পার্থ! যদা মনোগতান্ সর্বান্ কামান্ প্রজহাতি, আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে। প্রজহাতি—সর্বতোভাবে ত্যাগ করে।

হইবে, তখন তুমি শ্রুত বিষয়ে এবং যাহা শোনার বাকী আছে সে বিষয়ে উদাসীনতা প্রাপ্ত হইবে। (৫৩) অনেক প্রকারের সিদ্ধান্ত শুনিয়া তোমার চঞ্চল বুদ্ধি যখন সমাধিতে স্থিত হইবে তখন তুমি সমতা পাইবে।

অর্জুন বলিলেন—(৫৪) হে কেশব, স্থিতপ্রজ্ঞ অথবা সমাধিস্থের লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ কি রীতিতে কথা বলে, কিরূপে বসে ও কিভাবে চলে?

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(৫৫) হে পার্থ, যখন মানুষ মনে উত্থিত সকল কামনা ত্যাগ করে ও আত্মা দ্বারাই আত্মায় সন্তুষ্ট থাকে, তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে।

টিপ্পনী—আত্মা দ্বারাই আত্মায় সন্তুষ্ট থাকার তাৎপর্য—আত্মার আনন্দ ভিতর হইতে খোঁজা, সুখ-দুঃখদানকারী বাহিরের বস্তুর উপর আনন্দের আশ্রয় না রাখা। আনন্দ সুখ হইতে ভিন্ন বস্তু—ইহা মনে রাখা দরকার। আমার পয়সা হইলে আমি যে তাহাতে সুখ মানি তাহা মোহ। আমি ভিখারী আছি, ক্ষুধার দুঃখ আছে তাহা হইলেও আমি চুরি বা অন্য লালসায় পড়ি না—ইহাতে যে ভাব আছে তাহাতে আনন্দ দেয় এবং উহাই আত্ম-সন্তোষ।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

(৫৬) (যঃ) দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ (সঃ) মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে। (৫৭) যঃ সর্বত্র অনভিস্নেহঃ তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি, ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। অনভিস্নেহঃ—স্নেহ-বর্জিত। (৫৮) অয়ং কূর্মঃ অঙ্গানি ইব সর্বশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি যদা সংহরতে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। (৫৯) নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে রসবর্জং। পরং দৃষ্ট্বা অস্য রসঃ অপি নিবর্ততে। নিরাহারস্য—নিরাহারীর, উপবাসীর। দেহিনঃ—দেহধারী জীবদিগের। বিষয়াঃ—ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়সমূহ। বিনিবর্তন্তে—নিবৃত্ত হয়। রসবর্জং—রস বর্জিত হইয়া। পরং—ঈশ্বরকে। রসঃ—আসক্তি।

(৫৬) দুঃখে যে দুঃখী হয় না, সুখের যে ইচ্ছা রাখে না এবং যে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ রহিত তাহাকে স্থিরবুদ্ধি মুনি বলে। (৫৭) সর্বত্র রাগরহিত থাকিয়া যে পুরুষ শুভ অথবা অশুভ পাইলে হর্ষ করে না বা শোক করে না তাহার বুদ্ধি স্থির। (৫৮) কচ্ছপ যেমন সকল দিক হইতে অঙ্গ গুটাইয়া আনে তেমনি যখন এই পুরুষ ইন্দ্রিয় সকলকে তাহাদের বিষয় হইতে সংগৃহীত করে তখন তাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে একথা বলা যায়। (৫৯) দেহধারী যখন নিরাহারী থাকে, তাহার সে বিষয়ের [ভোগ] মন্দা পড়িয়া থাকে, কিন্তু রস যায় না। সে রসও ঈশ্বর সাক্ষাৎকার দ্বারা শান্ত হয়।

টিপ্পনী—এই শ্লোক দ্বারা উপবাসাদি নিষেধ করা হয় নাই। উপরন্তু তাহাদের সীমা দেখান হইয়াছে। বিষয় হইতে মনকে শান্ত করিবার জন্ত উপবাসাদি আবশ্যক। কিন্তু তাহার মূল অর্থাৎ সে বিষয়ে স্থিত রস তো কেবল ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারেই শান্ত হয়। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারে যাহার রস জাগে, সে অন্য রস ভুলিয়া যায়।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

(৬০) হে কৌন্তেয়, বিপশ্চিতঃ যততঃ অপি পুরুষস্য প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং মনঃ হরন্তি। বিপশ্চিতঃ—জ্ঞানী। যততঃ—যত্নশীল। প্রমাথীনি—প্রমথন বা মন্থনকারী। প্রসভং—বলপূর্বক। (৬১)—তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্তঃ মৎপরঃ আসীত। হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। তানি—সেই। সর্বাণি—সকল ইন্দ্রিয়। সংযম্য—বশে রাখিয়া। যুক্তঃ—যোগযুক্ত, যোগী। মৎপরঃ—আমাতে তন্ময়। আসীত—হইবে। (৬২) বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে। সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে। পুংসঃ—পুরুষের। উপজায়তে—উৎপন্ন হয়। (৬৩) ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি। সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ ভবতি। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। সম্মোহঃ—মূঢ়তা। স্মৃতিবিভ্রমঃ—ভ্রান্তি। প্রণশ্যতি—নষ্ট হয়।

(৬০) হে কৌন্তেয়, জ্ঞানী পুরুষ যত্ন করিলেও ইন্দ্রিয় এমন মন্থনকারী যে, তাহার মন বলপূর্বক হরণ করে।

টিপ্পনী—অর্থাৎ ভক্তি বিনা, ঈশ্বরের সহায়তা বিনা পুরুষ-প্রযত্ন মিথ্যা।

(৬১) এই সকল ইন্দ্রিয় বশে রাখিয়া যোগীকে আমাতে তন্ময় হইয়া থাকা চাই। কেননা নিজের ইন্দ্রিয় যাহার বশে তাহার বুদ্ধি স্থির।

(৬২) বিষয়-চিন্তাকারী পুরুষের সেই বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হয় এবং আসক্তি হইতে কামনা হয় ও কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

টিপ্পনী—কামনাকারীর ক্রোধ অনিবার্য। কেননা কামনা কোনদিনও তৃপ্ত হয় না।

(৬৩) ক্রোধ হইতে মূঢ়তা উৎপন্ন হয়, মূঢ়তা হইতে ভ্রান্তি ও ভ্রান্তি হইতে জ্ঞানের নাশ হয়। যাহার জ্ঞানের নাশ হইয়াছে সে তো মৃতের তুল্য।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

(৬৪) রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ বিধেয়াত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি। আত্মবশ্যৈঃ—নিজের বশীভূত। বিষয়ান্ চরন্—বিষয় ভোগ করিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার চালাইয়া। বিধেয়াত্মা—জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। প্রসাদম্—সন্তোষ, চিত্তের প্রসন্নতা। (৬৫) প্রসাদে অস্য সর্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে হি প্রসন্নচেতসঃ বুদ্ধিঃ আশু পর্যবতিষ্ঠতে। প্রসাদে—প্রসন্নতা পাওয়াতে। অস্য—ইহার। আশু—শীঘ্র। পর্যবতিষ্ঠতে—প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থির হয়। (৬৬) অযুক্তস্য বুদ্ধিঃ নাস্তি। অযুক্তস্য ভাবনা চ ন অভাবয়তঃ শান্তি চ ন, অশান্তস্য সুখং কুতঃ? অযুক্তস্য—অযুক্তের, যে যোগযুক্ত নহে, যাহার সমত্ব নাই। বুদ্ধিঃ—সদসৎ বিচারশক্তি, বিবেক। ভাবনা—ভক্তি। (৬৭) চরতাং ইন্দ্রিয়াণাং হি যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে তৎ বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব অস্য প্রজ্ঞাং হরতি। চরতাং—বিষয়াসক্ত। যৎ—যে। অনুবিধীয়তে—অনুসরণ করে, পশ্চাৎগমন করে, পিছনে দৌড়ায়। অম্ভসি—জলে। নাবম্—নৌকা। অস্য—ইহার।

(৬৪) কিন্তু যাহার মন নিজের বশে আছে ও যাহার ইন্দ্রিয় রাগ-দ্বেষ রহিত হইয়া তাহার বশে আছে সে ইন্দ্রিয় ব্যাপার চালাইয়াও চিত্তের প্রসন্নতা পায়। (৬৫) চিত্ত-প্রসন্নতা হইতে সর্ব দুঃখ দূর হয় ও যিনি প্রসন্নতা পাইয়াছেন তাঁহার বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয়। (৬৬) যাহার সমত্ব নাই, তাহার বিবেক নাই, তাহার ভক্তি নাই। আর যাহার ভক্তি নাই তাহার শান্তি নাই, এবং যাহার শান্তি নাই তাহার সুখ কি প্রকারে হইবে? (৬৭) বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়ের পিছনে যাহার মন দৌড়ায়, তাহার মন বায়ু যেমন নৌকাকে জলের উপর ঠেলিয়া লইয়া যায় তেমনি তাহার বুদ্ধিকে যেখানে ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যায়।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো। নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

(৬৮) হে মহাবাহো! তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি সর্বশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ নিগৃহীতানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। তস্মাৎ—সেই হেতু। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ—বিষয় হইতে। নিগৃহীতানি—নিগৃহীত অর্থাৎ বশীভূত হইয়াছে। (৬৯) সর্বভূতানাং যা নিশা তস্যাং সংযমী জাগর্তি। যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি সা পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা। সর্বভূতানাং—সকল প্রাণীর। পশ্যতঃ—আত্মতত্ত্বদর্শীর। মুনেঃ—মুনির।

(৭০) আপূর্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রং আপঃ যদ্বৎ প্রবিশন্তি তদ্বৎ সর্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি, সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি। ন কামকামী। আপূর্যমাণ—ভরিয়া উঠিতেছে এমন। অচলপ্রতিষ্ঠং—অচল প্রতিষ্ঠা যাহার, যাহার পরিবর্তন হইতেছে না, যাহা অচল থাকে। কামকামী—ভোগ-কামনাশীল, কামনাবান্ মানুষ।

---

(৬৮) সেই হেতু, হে মহাবাহো, যাহার ইন্দ্রিয়সকল চারিদিকের বিষয় হইতে বাহির হইয়া নিজের বশে আসিয়াছে তাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। (৬৯) যখন সকল প্রাণী নিদ্রিত তখন সংযমী জাগ্রত থাকেন। যখন লোক জাগ্রত থাকে, জ্ঞানবান্ মুনি সুপ্ত থাকেন।

টিপ্পনী—ভোগী মনুষ্য রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত নাচ গান রঙ্গ-তামাসা এবং খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে সময় কাটায় ও পরে সকাল সাতটা আটটা পর্যন্ত ঘুমায়। সংযমী মানুষ রাত্রি সাতটা-আটটায় শুইয়া মধ্যরাত্রে উঠিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করে। আবার ভোগী সংসারের প্রপঞ্চ বাড়ায় ও ঈশ্বরকে ভোলে, কিন্তু সংযমী সংসারের প্রপঞ্চ জানে না ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করে। এইরূপে উভয়ের পথ ভিন্ন—এই কথা এই শ্লোকে ভগবান্ বুঝাইলেন।

(৭০) নদীর প্রবেশ দ্বারা পূর্ণ হইতে থাকিলেও সমুদ্র যেমন অচল থাকে, তেমনি যে মানুষের সাংসারিক ভোগ শান্ত হইয়াছে সে-ই শান্তি পায়,

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

(৭১) সর্বান্ কামান্ বিহায় যঃ পুমান্ নিস্পৃহঃ নির্মমঃ নিরহঙ্কারঃ (সন্) চরতি সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি। বিহায়—ত্যাগ করিয়া। নিস্পৃহঃ—স্পৃহাশূন্য, ইচ্ছারহিত। নির্মমঃ—মমতারহিত। নিরহঙ্কারঃ—অহঙ্কাররহিত। চরতি—বিচরণ করে। অধিগচ্ছতি—পায়।

(৭২) হে পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, এনাং প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি। অপি অস্যাম্ অন্তকালে স্থিত্বা ব্রহ্মনির্বাণং ঋচ্ছতি। এষা—ইহা। এনাং—ইহাকে। ন বিমুহ্যতি—মোহের বশীভূত হয় না। অপি—এবং। অস্যাম্—এই অবস্থায়। স্থিত্বা—থাকিলে।

কামনাবান্ মানুষ পায় না। (৭১) সকল কামনা ত্যাগ করিয়া যে পুরুষ ইচ্ছা, মমতা ও অহঙ্কাররহিত হইয়া বিচরণ করে সে শান্তি পায়। (৭২) হে পার্থ, ঈশ্বরকে জানার স্থিতি ইহাই। এই অবস্থায় পৌঁছিলে কেহ মোহের বশীভূত হয় না এবং মরণকালে যে এই স্থিতিতে থাকে সে ব্রহ্ম-নির্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলনরূপ মোক্ষ লাভ করে।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগ নামে দ্বিতীয় অধ্যায় পূর্ণ হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম-যোগ

এই অধ্যায় গীতার স্বরূপ জানার চাবির মত—একথা বলা যায়। ইহাতে কর্ম কেমন করিয়া করিব, কেন করিব এবং সত্যকার কাজ কাহাকে বলে তাহা সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, খাঁটি জ্ঞান পারমার্থিক কর্মেই পরিণত হওয়া চাই।

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম ॥ ২

অর্জুন উবাচ—(১) হে কেশব। হে জনার্দন। বুদ্ধিঃ কর্মণঃ জ্যায়সী তে চেৎ মতা তৎ ঘোরে কর্মণি মাং কিং নিয়োজয়সি। তে—তোমার। চেৎ—যদি। কর্মণঃ—কর্ম হইতে। জ্যায়সী—শ্রেষ্ঠ। মতা—মত। কিং নিয়োজয়সি—কেন নিযুক্ত করিতেছ। (২) ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব। তৎ একং নিশ্চিত্য বদ যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্। ব্যামিশ্রেণ—মিশ্রিত। বাক্যেন—বাক্য দ্বারা। মে—আমার। মোহয়সি—মোহগ্রস্ত, শঙ্কাগ্রস্ত করিয়াছ। তৎ—সেই হেতু। একং—একটি (কথা)। নিশ্চিত্য—নিশ্চয় করিয়া। বদ—বল। আপ্নুয়াম্—পাই।

অর্জুন বলিলেন—(১) হে জনার্দন, যদি তুমি কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে কর, তবে হে কেশব, আমাকে ঘোর কর্মে কেন প্রেরণ করিতেছ?

টিপ্পনী—বুদ্ধি অর্থাৎ সমত্ব-বুদ্ধি

(২) তোমার মিশ্র বচন দ্বারা আমার বুদ্ধি তুমি যেন শঙ্কাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছ, সেই জন্য তুমি আমাকে একটি কথা নিশ্চয়পূর্বক বল যাহাতে আমার কল্যাণ হয়।

টিপ্পনী—অর্জুন সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, কেন-না এক দিক্ হইতে ভগবান্ তাঁহাকে শিথিল হওয়ার জন্য দোষ দিতেছেন, অন্যদিকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯-৫০ শ্লোকে কর্মত্যাগের আভাস আসিতেছে। গভীরভাবে বিচার করিলে উক্ত প্রকার যে নহে, তাহা ভগবান্ এখন বুঝাইতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩
ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫

শ্রীভগবান্ উবাচ—(৩) হে অনঘ, অস্মিন্ লোকে ময়া পুরা দ্বিবিধা নিষ্ঠা প্রোক্তা; জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং, কর্মযোগেন যোগিনাম্। অনঘ—নিষ্পাপ। অস্মিন—এই। ময়া—আমাকর্তৃক। প্রোক্তা—কথিত হইয়াছে। (৪) পুরুষঃ কর্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্যং ন অশ্নুতে। সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং চ ন সমধিগচ্ছতি। অনারম্ভাৎ—আরম্ভ না করাতে। নৈষ্কর্ম্যং—নিষ্কর্মতা, নিষ্কর্মভাব। সন্ন্যসনাৎ—সন্ন্যাস দ্বারা। সিদ্ধিং—মোক্ষ। সমধিগচ্ছতি—প্রাপ্ত হয়।

(৫) কশ্চিৎ জাতু ক্ষণমপি অকর্মকৃৎ ন তিষ্ঠতি। হি সর্বঃ অবশঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ কর্ম কার্যতে। কশ্চিৎ—কেহ। জাতু—কদাচিৎ। ক্ষণমপি—ক্ষণমাত্রও। অকর্মকৃৎ—কর্ম না করিয়া। ন তিষ্ঠতি—থাকে না। কার্যতে—করায়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(৩) হে পাপ-রহিত, এই লোকের সম্বন্ধে আমি পূর্বে দুই অবস্থা বলিয়াছি—এক জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের, অন্য কর্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের। (৪) কর্মের আরম্ভ না করিলে মনুষ্য নৈষ্কর্ম্য অনুভব করিতে পারে না এবং কর্মের কেবল বাহ্য ত্যাগ দ্বারাই মোক্ষ মিলে না।

টিপ্পনী—নৈষ্কর্ম্য মানে মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কর্ম না করা। এই প্রকার নিষ্কর্মতার অনুভব কর্ম না করিয়া কেহ পাইতে পারে না। এই অনুভব কি করিয়া পাওয়া যায় তাহা এখন দেখাইতেছেন।

(৫) বাস্তবিক কেহ ক্ষণমাত্রও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ [উহার] বশীভূত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্ম করায়।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

(৬) যঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে সঃ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ উচ্যতে। ইন্দ্রিয়ার্থান্—বিষয়সমূহ।

(৭) হে অর্জুন! যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ (সন্) কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্ আরভতে স বিশিষ্যতে। অসক্তঃ—আসক্তিরহিত। কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ—কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা। আরভতে—আরম্ভ করে। বিশিষ্যতে—শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

(৬) যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয় বদ্ধ করে, কিন্তু ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় মনে মনে চিন্তা করে সেই মূঢ়াত্মাকে মিথ্যাচারী বলা হয়।

টিপ্পনী—যেমন, কোন ব্যক্তি যদি বাক্যরোধ করে, কিন্তু মনে মনে কাহাকেও গালি দেয় সে নিষ্কর্মা নয়, উপরন্তু মিথ্যাচারী। ইহার অর্থ এমন নয় যে, মন যদি রোধ না করা যায় তবে শরীর রোধ করা নিরর্থক। শরীরকে রোধ না করিলে মনের উপর কর্তৃত্ব আসেই না, কিন্তু শরীরকে রোধ করার সহিত মনকে রুদ্ধ করিবার প্রযত্ন থাকা চাই। যে ব্যক্তি ভয় বা বাহ্য কারণের জন্য শরীরকে রোধ করে, কিন্তু মনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, কেবল ইহাই নয়, মন দ্বারা বিষয় ভোগ করে, আর যদি সুবিধা পায় তো শরীর দ্বারাও ভোগ করে, সেই রকম মিথ্যাচারীর এই স্থানে নিন্দা আছে। এক্ষণে পরের শ্লোকে ইহার বিপরীত ভাব দেখাইতেছেন।

(৭) কিন্তু হে অর্জুন, যে মানুষ ইন্দ্রিয় সকলকে মন দ্বারা নিয়মিত রাখিয়া, সঙ্গ-রহিত হইয়া কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মযোগ আরম্ভ করে সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

টিপ্পনী—এখানে বাহিরের সহিত অন্তরের মিল সাধন করা হইয়াছে। মনকে বশে রাখিয়াও মানুষ শরীর দ্বারা অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কিছু না কিছু তো করেই। যাহার মন বশীভূত তাহার কান দূষিত বাক্য শোনে না, ঈশ্বর ভজন শ্রবণ করে, সৎপুরুষের গুণগান শ্রবণ করে। যাহার মন নিজের বশীভূত সে, আমরা যাহাকে বিষয় বলি তাহাতে রস পায় না। এমন লোক আত্মার যাহা শোভা পায় সেই কর্ম করে। এইরূপ কর্ম করাকেই কর্ম-মার্গ কহে। যাহা দ্বারা আত্মাকে শরীরের বন্ধন হইতে মুক্ত করার যোগ সাধিত হয় তাহাই কর্মযোগ। ইহাতে বিষয়াসক্তির স্থানই নাই।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥ ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০

(৮) ত্বং নিয়তং কর্ম কুরু। হি অকর্মণঃ কর্ম জ্যায়ঃ, অকর্মণঃ চ তে শরীরযাত্রা অপি ন প্রসিধ্যেৎ। নিয়তং কর্ম—সংযত কর্ম, ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক যাহা করা যায়। অকর্মণঃ—অকর্ম অপেক্ষা, কর্ম না করা অপেক্ষা। জ্যায়ঃ—শ্রেষ্ঠতর। ন প্রসিধ্যেৎ—সম্পন্ন হয় না।

(৯) অয়ং লোকঃ যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অন্যত্র কর্মবন্ধনঃ (ভবতি) হে কৌন্তেয়, তদর্থং মুক্তসঙ্গঃ সমাচর। অয়ংলোকঃ—ইহলোক। যজ্ঞার্থাৎ—যজ্ঞের উদ্দেশ্যে, ত্যাগার্থে, ঈশ্বরার্থে। কর্মণঃ অন্যত্র—কর্মব্যতীত। তদর্থং—সেই অর্থে, যজ্ঞার্থে। মুক্তসঙ্গ—অনাসক্ত হইয়া। সমাচর—অচরণ কর। (১০) সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরা প্রজাপতিঃ উবাচ অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষঃ বঃ ইষ্টকামধুক্ অস্তু। সহযজ্ঞাঃ—যজ্ঞের সহিত। প্রসবিষ্যধ্বম্—বৃদ্ধি লাভ কর। বঃ—তোমাদের। ইষ্টকামধুক্—অভীষ্ট ভোগপ্রদ অর্থাৎ ঈপ্সিত ফল দানকারী।

টিপ্পনী—নিয়ত শব্দ মূল শ্লোকে আছে। ইহার সম্বন্ধ পূর্বের শ্লোকের সহিত। উহাতে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল নিয়মে রাখিয়া সঙ্গ-রহিত হইয়া কর্ম করার স্তুতি আছে। অর্থাৎ এখানে নিয়ত কর্মদ্বারা ইন্দ্রিয়-সকল নিয়মে রাখিয়া যে কর্ম করা যায় তাহাই করার অনুরোধ আছে।

(৮) সেই হেতু তুমি নিয়ত কর্ম কর। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা অনেক শ্রেষ্ঠ। তোমার শরীরের ব্যাপারও কর্ম বিনা চলে না।

(৯) যজ্ঞার্থে কৃতকর্ম ছাড়া অন্য সকল কর্ম এই লোকে বন্ধন উপস্থিত করে। অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি রাগ-রহিত হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম কর।

টিপ্পনী—যজ্ঞ অর্থ পরোপকারার্থে, ঈশ্বরার্থে কৃতকর্ম।

(১০) যজ্ঞ সহিত প্রজাকে উৎপন্ন করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন—এই যজ্ঞদ্বারা তুমি বৃদ্ধি পাইবে, ইহা তোমাকে ঈপ্সিত ফল দিবে।

দেৱান্ ভাৱয়তানেন তে দেৱা ভাৱয়ন্তু ৱঃ।
পরস্পরং ভাৱয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমৱাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি ৱো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাৱিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এৱ সঃ ॥ ১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩
অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভৱঃ।
যজ্ঞাদ্ ভৱতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

(১১) অনেন দেবান্ ভাবয়ত তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ। অনেন—ইহা দ্বারা, যজ্ঞ দ্বারা। দেবান্—দেবতাগণকে ; এই স্থানে দেবতা মানে ভূতমাত্র। ভাবয়ত—পোষণ করা। বঃ—তোমাদিগকে। পরস্পরং—একে অন্যকে। পরং—পরম। শ্রেয়ঃ—কল্যাণ। অবাপ্স্যথ—পাও।
(১২) দেবাঃ হি যজ্ঞভাবিতাঃ (সন্তঃ) বঃ ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে, তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায় যঃ ভুঙ্‌ক্তে সঃ স্তেন এব। যজ্ঞভাবিতাঃ—যজ্ঞ দ্বারা সংবর্ধিত হইয়া। বঃ—তোমাদিগকে। ইষ্টান্—শ্রেষ্ঠ বিষয়সমূহ। তৈঃ—তাহাদিগের দ্বারা। দত্তান্—প্রদত্ত। এভ্যঃ—ইহাদিগকে। অপ্রদায়—না দিয়া। স্তেনঃ—চোর। (১৩) যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ সর্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে। যে পাপাঃ তু আত্মকারণাৎ পচন্তি তে অঘং ভুঞ্জতে। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ—যজ্ঞের অবশিষ্ট আহারকারী। সন্তঃ—সাধুগণ। সর্বকিল্বিষৈঃ—সকল পাপ হইতে। মুচ্যন্তে—মুক্ত হয়। আত্মকারণাৎ—নিজের জন্য। পচন্তি—পাক করে। অঘং—পাপ। ভুঞ্জতে—ভোগ করে। (১৪) অন্নাদ্

(১১) তুমি যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে পোষণ কর এবং এই দেবতাগণ তোমাকে পোষণ করিবে। এইরূপে একে অন্যকে পোষণ করিয়া তুমি পরম কল্যাণ লাভ করিবে। (১২) যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবতাগণ তোমাকে অভীপ্সিত ভোগ দিবেন। তাঁহাদিগকে [উহার] বদলে না দিয়া তাঁহাদের দেওয়া যে ভোগ করে সে অবশ্যই চোর।

টিপ্পনী—এখানে দেবতা মানে ঈশ্বরের সৃষ্ট ভূতমাত্র। ভূত-মাত্রের সেবা, দেবসেবা, উহাই যজ্ঞ।

(১৩) যে ব্যক্তি যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে নিজের জন্যই পাক করে সে পাপ ভক্ষণ করে। (১৪) অন্ন হইতে

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ! স জীবতি॥ ১৬

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮

ভূতানি ভবন্তি পর্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ যজ্ঞাৎ পর্জন্যঃ ভবতি যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ। অন্নাৎ—অন্ন হইতে। ভূতানি—প্রাণিগণ। ভবন্তি—জন্মে। পর্জন্যাৎ—মেঘ হইতে। অন্নসম্ভবঃ—অন্ন উৎপন্ন (হয়)। কর্মসমুদ্ভবঃ—কর্ম হইতে উৎপন্ন।

(১৫) কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবং তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। ব্রহ্মোদ্ভবং—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম এখানে মহৎব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি। অক্ষর—অক্ষর ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম। ব্রহ্ম—অক্ষর ব্রহ্ম। (১৬) যঃ এবং প্রবর্তিতং চক্রং ইহ ন অনুবর্তয়তি, হে পার্থ! সঃ অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং জীবতি। ন অনুবর্তয়তি—অনুবর্তন করে না। অঘায়ু—পাপই যাহার আয়ু বা জীবন। ইন্দ্রিয়ারামঃ—ইন্দ্রিয়তেই যে আরমণ করে, ইন্দ্রিয়সুখে যে ডুবিয়া থাকে। মোঘং—ব্যর্থ। (১৭) যঃ মানবঃ আত্মরতিঃ আত্মতৃপ্তঃ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ তস্য কার্যং ন বিদ্যতে। আত্মরতিঃ—আত্মাতেই যাহার রতি বা প্রীতি। আত্মতৃপ্তঃ—আত্মাতেই যে তৃপ্ত। (১৮) ইহ কৃতেন

ভূতমাত্র উৎপন্ন। অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয় এবং যজ্ঞ কর্ম হইতে উৎপন্ন।

(১৫) তুমি জানিও যে, কর্ম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি অক্ষরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সর্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞেই স্থিত রহিয়াছেন। (১৬) এই প্রকারে প্রবর্তিত চক্র যে অনুসরণ করে না সে নিজের জীবন পাপে পূর্ণ করে, ইন্দ্রিয়-সুখে ডুবিয়া থাকে এবং হে পার্থ, সে ব্যর্থই জীবন যাপন করে। (১৭) কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতে রমণ করে, যে তাহাতেই তৃপ্ত থাকে এবং তাহাতেই সন্তোষ মানে তাহার কিছুই করিবার থাকে না (১৮) করা আর না করাতে তাহার কোনই স্বার্থ থাকে না। ভূতমাত্র সম্বন্ধে তাহার কোনও স্বার্থ নাই।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥ ২০
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥ ২২

তস্য অর্থঃ ন এব, ন চ অকৃতেন কশ্চন। সর্বভূতেষু অস্য কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন। কৃতেন—কৃতকর্ম দ্বারা। অর্থঃ—স্বার্থ। সর্বভূতেষু—সর্বভূতে। অর্থব্যপাশ্রয়ঃ—প্রয়োজন নিমিত্ত ক্রিয়াসাধ্য ব্যপাশ্রয়, স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত যে কোনও কার্য দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয় তাহাকেই ব্যপাশ্রয় বলে।

(১৯) তস্মাৎ ত্বম্ অসক্তঃ (সন্) সততং কার্যং কর্ম সমাচর, হি পুরুষঃ অসক্তঃ কর্ম আচরন্ পরং আপ্নোতি। কার্যং—করণীয়, কর্তব্য। পরং—মোক্ষ। আপ্নোতি—পায়। (২০) জনকাদয়ঃ কর্মনা এব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ; লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্ কর্তুম্ অর্হসি। জনকাদয়ঃ—জনকাদি। লোকসংগ্রহম্—লোককে স্বধর্মে প্রবৃত্ত করণ, জগতের কল্যাণ সাধন। (২১) শ্রেষ্ঠঃ জনঃ যৎ যৎ আচরতি ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব। সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ তৎ অনুবর্ততে। শ্রেষ্ঠঃ—উত্তম। ইতরঃ—প্রাকৃত, সাধারণ। (২২) হে পার্থ! ত্রিষু লোকেষু মে কিঞ্চন কর্তব্যং ন অস্তি, অবাপ্তব্যম্ অনবাপ্তম্ ন (অহং) কর্মণি বর্তে এব চ। ত্রিষু লোকেষু—ত্রিলোকে। কিঞ্চন—কিছুই। অবাপ্তব্যম্—পাওয়ার যোগ্য। অনবাপ্তম্—অপ্রাপ্ত। কর্মণি বর্তে—কর্ম করি।

(১৯) অতএব তুমি সঙ্গ-রহিত হইয়া নিরন্তর কর্তব্য কর্ম কর। অসঙ্গ থাকিয়া যে পুরুষ কর্ম করে সে মোক্ষ পায়। (২০) জনকাদি কর্মদ্বারাই পরম সিদ্ধি পাইয়াছিলেন। জগৎ-হিতের জন্যও তোমার কর্ম করা দরকার। (২১) যে যে আচরণ উত্তম পুরুষগণ করেন অন্য লোকেরা তাহারই অনুকরণ করে। তাঁহারা যাহা প্রমাণ করেন তাহাই লোকে অনুসরণ করে। (২২) হে পার্থ, আমার

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

(২৩) যদি অহং জাতু অতন্দ্রিতঃ (সন্) কর্মনি বর্তেয়ং হে পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্বশঃ মম বর্ত্ম হি অনুবর্তন্তে। অতন্দ্রিতঃ সন্—অনলস হইয়া, আলস্যপরায়ণ না হইয়া। ন বর্তেয়ং—অনুষ্ঠান না করিয়া। সর্বশঃ—সর্বপ্রকারে।

(২৪) অহং চেৎ কর্ম ন কুর্যাম্, ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ। সঙ্করস্য কর্তা স্যাম্, ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্। চেৎ—যদি। উৎসীদেয়ুঃ—নষ্ট হইবে,

ত্রিলোকে কিছুই করিবার নাই। পাওয়ার যোগ্য অথচ পাই নাই, এমন কিছু নাই। তথাপি আমি কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছি।

টিপ্পনী—সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ইত্যাদির নিরন্তর ও অভ্রান্ত গতি ঈশ্বরের কর্ম সূচিত করে। এই কর্ম মানসিক নহে, শারীরিক বলিয়া গণ্য। ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও শারীরিক কর্ম করেন, ইহা কেমন করিয়া বলা যায়—এ প্রকার আশঙ্কা করার স্থান নাই। যেহেতু তিনি অশরীরী হইয়াও শরীরীর ন্যায় আচরণ করিতেছেন দেখা যায়, সেই হেতু তিনি কর্ম করিয়াও অকর্মী ও অলিপ্ত। মানুষের বুঝিবার তো এই আছে যে, যেমন ঈশ্বরের প্রত্যেক কৃতি যন্ত্রবৎ কার্য করিয়া যায়, তেমনি মনুষ্যেরও বুদ্ধিপূর্বক, কিন্তু যন্ত্রের ন্যায়ই, নিয়মিত কার্য করা উচিত।

যন্ত্র-গতির অনাদর করিয়া স্বচ্ছন্দ থাকা মানুষের বিশেষত্ব নয়। বরং জ্ঞানপূর্বক সেই গতি অনুকরণ করাতেই মানুষের বিশেষত্ব। অলিপ্ত থাকিয়া, অসঙ্গ হইয়া যে যন্ত্রবৎ কার্য করিয়া যায়, তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না, সে মরণ পর্যন্ত নবীন থাকে। দেহ দেহের নিয়ম অনুসরণ করিয়া সময়কালে নষ্ট হয়; কিন্তু তাহাতে স্থিত আত্মা যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া যায়।

(২৩) যদি আমি কখনো (আলস্য ভাঙ্গার মত) গা-মোড়া দিবার মত অবকাশটুকুও না লইয়া (সর্বদা) কর্মে প্রবৃত্ত না থাকি, তবে হে পার্থ, লোক সকল রকমে আমার অনুসরণ করিবে। (২৪) যদি আমি কর্ম না করি তবে লোক ভ্রষ্ট হইবে, আমি অব্যবস্থার কর্তা হইব এবং এই লোকের নাশ করিব।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো! গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

ভ্রষ্ট হইবে। সঙ্করস্য—বর্ণসঙ্করের। স্যাম্—হইব। (২৫) হে ভারত! অবিদ্বাংসঃ কর্মণি সক্তাঃ যথা কুর্বন্তি বিদ্বান্ অসক্তঃ (সন্) লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ তথা কুর্যাৎ। অবিদ্বাংসঃ—অবিদ্বান্‌গণ, অজ্ঞান লোকেরা। সক্তাঃ—আসক্ত হইয়া। বিদ্বান্—জ্ঞানী। লোকসংগ্রহং—জগতের শুভ, কল্যাণ। চিকীর্ষুঃ—ইচ্ছা করিয়া। (২৬) কর্মসঙ্গিনাম্ অজ্ঞানাম্ বিদ্বান্ বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ। যুক্তঃ সর্বকর্মাণি সমাচরন্ যোজয়েৎ। কর্মসঙ্গিনাম্—কর্মে আসক্ত। অজ্ঞানাম্—অজ্ঞানীদিগের। যুক্তঃ—যোগযুক্ত, সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, সমত্ব রক্ষা করিয়া। সমাচরন্—আচরণ করিয়া। যোজয়েৎ—করাইবেন। (২৭) সর্বশঃ কর্মাণি প্রকৃতেঃ গুণৈঃ ক্রিয়মাণানি। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা অহং কর্তা ইতি মন্যতে। সর্বশঃ—সকল প্রকারে। ক্রিয়মাণানি—ক্রিয়মাণ, অনুষ্ঠিত হয়।

(২৮) হে মহাবাহো, গুণকর্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ তু, গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে। গুণকর্মবিভাগয়োঃ—গুণবিভাগের এবং কর্মবিভাগের। গুণাঃ—কারণাত্মক গুণসকল, ইন্দ্রিয়সকল। গুণেষু—বিষয়ে। মত্বা—জানিয়া। ন সজ্জতে—আসক্ত হয় না।

(২৫) হে ভারত, যেমন অজ্ঞানী লোকেরা আসক্ত হইয়া কার্য করে তেমনি জ্ঞানীদের আসক্তি-রহিত হইয়া লোকের কল্যাণ-ইচ্ছায় কার্য করা চাই। (২৬) কর্মে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তির বুদ্ধিকে জ্ঞানী যেন ওলট্‌ পালট্‌ না করে, বরঞ্চ সমত্ব রক্ষাপূর্বক ভাল রকমে কর্ম করিয়া তাহাকে যেন সর্ব কর্মে প্রেরণা দেয়। (২৭) সমস্ত কর্ম প্রকৃতির গুণদ্বারা হইয়া থাকে অহঙ্কার-মূঢ় ব্যক্তি, আমি কর্তা এই প্রকার মনে করে। (২৮) হে মহাবাহো, গুণ ও কর্ম বিভাগ

প্রকৃতেগু´ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১

(২৯) প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ গুণকর্মসু সজ্জন্তে, কৃৎস্নবিৎ তাঁন্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ ন বিচালয়েৎ। গুণসংমূঢ়াঃ—গুণের দ্বারা মোহিত। কৃৎস্নবিৎ—জ্ঞানী। মন্দান্—মন্দবুদ্ধিদিগকে। (৩০) অধ্যাত্মচেতসা ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য নিরাশীঃ নির্মমঃ বিগতজ্বরঃ চ ভূত্বা যুধ্যস্ব। অধ্যাত্মচেতসা—বিবেকবুদ্ধিতে অধ্যাত্মবৃত্তি রক্ষা করিয়া। সংন্যস্য—সমর্পণ করিয়া। নিরাশীঃ—নিষ্কাম। নির্মমঃ—মমতাশূন্য। বিগতজ্বরঃ—শোক রহিত, রাগ রহিত। ভূত্বা—হইয়া। যুধ্যস্ব—যুদ্ধ কর। (৩১) যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ মে ইদং মতং নিত্যং

রহস্য যে পুরুষ জানে "গুণসমূহ গুণের বিষয়ে বর্তায়" এই রকম মনে করিয়া সে তাহাতে আসক্ত হয় না।

টিপ্পনী—যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া নিজে নিজেই হয়, সে বিষয়ে মানুষ আসক্ত হয় না এবং যখন যে অবয়বের ব্যাধি হয় তখনই সেই অবয়বের চিন্তা করিতে হয়, অথবা সেই সময় সেই অবয়বের অস্তিত্বের জ্ঞান হয়, তেমনি স্বাভাবিক কর্ম যদি নিজে নিজেই হয় তবে তাহাতে আসক্তি হয় না। যাহার স্বভাব উদার সে নিজেই তাহা জানে না ; সে দান না করিয়া থাকিতেই পারে না। এই প্রকার অনাসক্তি—অভ্যাস এবং ঈশ্বর কৃপাদ্বারাই আসে।

(২৯) প্রকৃতির গুণদ্বারা মোহিত মনুষ্য গুণের কার্যে আসক্ত থাকে। এই প্রকার মন্দ-বুদ্ধি লোককে জ্ঞানীদের অস্থির করা উচিত নয়। (৩০) অধ্যাত্ম-বৃত্তি রক্ষা করিয়া, সকল কর্ম আমাকে অর্পণ করিয়া আসক্তি ও মমত্ব ত্যাগ করিয়া, রাগ-রহিত হইয়া তুমি যুদ্ধ কর।

টিপ্পনী—যে শরীরস্থ আত্মাকে জানে এবং পরমাত্মার অংশ এইরূপ মনে করে, সেই সমস্তই পরমাত্মাকে অর্পণ করে—সেবক যেমন প্রভুর জন্য কর্ম নির্বাহ করে ও সকল কর্ম তাঁহাকেই সমর্পণ করে।

(৩১) শ্রদ্ধা রাখিয়া দ্বেষ ত্যাগ করিয়া যে মনুষ্য আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী চলে সে কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

অনুতিষ্ঠন্তি, তেঽপি কর্মভিঃ মুচ্যন্তে। অনুতিষ্ঠন্তি—অনুষ্ঠান করে, অনুগমন করে। (৩২) যে তু এতৎ মে মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি তান্ সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ অচেতসঃ নষ্টান্ বিদ্ধি। অসূয়া—গুণে দোষারোপ। অভ্যসূয়ন্তঃ—অসূয়াপরবশ হইয়া, গুণে দোষারোপ করিয়া।

(৩৩) জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে। ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। স্বাস্যাঃ—নিজের। সদৃশং—অনুরূপ। (৩৪) ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ, হি তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য—ইন্দ্রিয়দিগের। অর্থে—জন্য। পরিপন্থিনৌ—বিঘ্নকারী।

(৩২) কিন্তু যাহারা আমার অভিপ্রায়ে দোষ আরোপ করিয়া তাহা অনুসরণ করে না তাহারা জ্ঞানহীন মূর্খ, তাহারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানিও। (৩৩) জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের স্বভাব অনুযায়ী চলে। প্রাণীমাত্র নিজের স্বভাব অনুসরণ করে, এখানে বল-প্রয়োগ কি করতে পারে?

টিপ্পনী—এই শ্লোক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬১ হইতে ৬৮ শ্লোকের বিরোধী নহে। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিতে করিতে মানুষের মরিয়া যাওয়া চাই, কিন্তু তবুও যদি সফলতা না পাওয়া যায় তবে নিগ্রহ অর্থাৎ বল-প্রয়োগ নিরর্থক। ইহাতে নিগ্রহের নিন্দা করা হয় নাই, স্বভাবের সাম্রাজ্য দেখান হইয়াছে। এই তো আমার স্বভাব—এই কথা বলিয়া যদি কেহ শক্ত হইয়া বসে, তবে সে এ শ্লোকের অর্থ বোঝে নাই। স্বভাবের পরিচয় আমরা জানি না। অভ্যাস মাত্র স্বভাব নহে। আত্মার স্বভাব ঊর্ধ্ব-গমন, অর্থাৎ যখন আত্মা নীচে নামে তখন তাহাকে তুলিয়া উঠান কর্তব্য। ইহাই নীচের শ্লোকে স্পষ্ট হইয়াছে।

(৩৪) নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়দিগের রাগ-দ্বেষ রহিয়াছেই৮

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয়! বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

(৩৫) **স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্মঃ শ্রেয়ান্, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মঃ ভয়াবহঃ। স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ**—সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা। **বিগুণঃ**—অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ। **স্বধর্ম**—নিজের বর্ণ-ধর্ম। **পরধর্ম**—অপরের বর্ণ-ধর্ম। **নিধনং**—মৃত্যু।

অর্জুন উবাচ—(৩৬) হে বার্ষ্ণেয়! অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ বলাৎ নিয়োজিত ইব পাপং চরতি? অনিচ্ছন্ অপি—অনিচ্ছা সত্ত্বেও। অয়ং—এই। কেন প্রযুক্তঃ—কাহার প্রেরণায়।

মানুষের তাহাদের বশ হওয়া উচিত নহে। কেননা তাহারা মানুষের পথের শত্রু।

টিপ্পনী—কানের বিষয় শ্রবণ করা। যাহা ভাল লাগে তাহাই শুনিবার ইচ্ছা যায়—ইহা 'রাগ'। যাহা খারাপ লাগে তাহা না শুনার ইচ্ছা 'দ্বেষ'। ইহা তো স্বভাব—এই প্রকার মনে করিয়া রাগ-দ্বেষের বশীভূত না হইয়া উহার সম্মুখীন হওয়া উচিত। আত্মার স্বভাব সুখ-দুঃখ দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকা। সেই স্বভাব পর্যন্ত মানুষের পঁহুছান চাই।

(৩৫) পরের ধর্ম সুলভ হইলেও এবং তাহা অপেক্ষা নিজের ধর্ম বিগুণ হইলেও তাহা [নিজধর্ম] অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে মরাও ভাল। পরধর্ম ভয়ানক।

টিপ্পনী—সমাজে একের ধর্ম ঝাড়ু দেওয়া ও অপরের ধর্ম হিসাব রাখা। হিসাব-রক্ষাকারীকে উত্তম বলা হয় বলিয়া ঝাড়ুদার যদি নিজের ধর্ম ছাড়ে তাহা হইলে সে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ও সমাজে হানি পঁহুছে। ঈশ্বরের দরবারে উভয় সেবারই মূল্য নিজ নিজ নিষ্ঠা অনুসারে পরিমিত হইবে। উপজীবিকার মূল্য সেখানে তো একই। উভয়েই যদি ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি হইতে নিজের কর্তব্য করে, তবে উভয়ে মোক্ষের সমান যোগ্য হয়।

অর্জুন বলিলেন—(৩৬) হে বার্ষ্ণেয়, বল-প্রয়োগ না করিলে করিবে না [এইরূপ তীব্র] অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন্ প্রেরণায় মনুষ্য পাপ করে?

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয়! দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০

শ্রীভগবান্ উবাচ—(৩৭) রজোগুণসমুদ্ভবঃ এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা, এনম্ ইহ বৈরিণং বিদ্ধি। মহাশনঃ—যাহার ক্ষুধা মিটে না, দুষ্পূর। মহাপাপ্মা—মহাপাপী। এনম্—ইহাকে। বৈরিণং—শত্রু। বিদ্ধি—জানিও।
(৩৮) বহ্নিঃ যথা ধূমেন আব্রিয়তে, আদর্শঃ মলেন, যথা উল্বেন গর্ভঃ, তথা তেন ইদং (জ্ঞানং) আবৃতম্। আব্রিয়তে—আবৃত হয়। আদর্শঃ—দর্পণ। মলেন—ময়লা দ্বারা। উল্বেন—গর্ভাবরণ দ্বারা। (৩৯) হে কৌন্তেয়! নিত্যবৈরিণা কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন জ্ঞানিনঃ জ্ঞানম্ আবৃতম্। নিত্যবৈরিণা—নিত্যশত্রু। (৪০) ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে। এতৈঃ এষঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্ বিমোহয়তি। অধিষ্ঠানম্—নিবাস। দেহিনম্—দেহীকে। বিমোহয়তি—মোহিত করে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(৩৭) রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম-ক্রোধই ইহার (প্রেরক), ইহাদের পেট ভরেই না। ইহারা মহাপাপী। ইহাদিগকে এই লোকে শত্রু বলিয়া জানিবে।

টিপ্পনী—আমাদের বাস্তবিক অন্তরস্থিত শত্রু কাম বল—ক্রোধ বল, ইহারাই।

(৩৮) যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, অথবা ময়লা দ্বারা আরসী, অথবা চর্ম দ্বারা গর্ভ ঢাকা থাকে, তেমনি কামাদিরূপ শত্রু দ্বারা এই জ্ঞান ঢাকা থাকে। (৩৯) হে কৌন্তেয়, এই কামরূপ অগ্নিকে তৃপ্ত করা যায় না, ইহা নিত্য শত্রু, ইহা দ্বারা জ্ঞানীদিগের জ্ঞান আবৃত থাকে। (৪০) ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই শত্রুর নিবাস স্থান। ইহাদের দ্বারা জ্ঞান ঢাকিয়া রাখিয়া এই শত্রু দেহীদিগকে মূর্ছিত করে।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

(৪১) হে ভরতর্ষভ! তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং এনং পাপ্মানং প্রজহি। ভরতর্ষভ—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! আদৌ—প্রথমে। প্রজহি—পরিত্যাগ কর। (৪২) ইন্দ্রিয়াণি পরাণি—সূক্ষ্ম বলিয়া দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মনঃ—সঙ্কল্পাত্মক মন। বুদ্ধিঃ—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। পরতঃ—সূক্ষ্মতর। সঃ—তাহা (আত্মা)। (৪৩) এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য হে মহাবহো, কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি। বুদ্ধেঃ পরং—বুদ্ধির পরপারে, বুদ্ধি অপেক্ষা সূক্ষ্ম। সংস্তভ্য—নিশ্চল করিয়া, বশীভূত করিয়া।

টিপ্পনী—ইন্দ্রিয়-সকলে কাম ব্যাপ্ত হয়, তাহাতে মন মলিন হয়, তাহাতে বিবেক-শক্তি মন্দ হয়, তাহাতে জ্ঞানের নাশ হয়। অধ্যায় ২ শ্লোক ৬২—৬৪ দ্রষ্টব্য।

(৪১) হে ভরতর্ষভ, সেই হেতু তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত রাখিয়া জ্ঞান ও অনুভব-নাশকারী এই পাপীকে অবশ্য ত্যাগ কর। (৪২) ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, তাহা অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম মন, তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বুদ্ধি। বুদ্ধি অপেক্ষাও যাহা অধিক সূক্ষ্ম, তাহা আত্মা।

টিপ্পনী—অর্থাৎ যদি ইন্দ্রিয় বশে থাকে, তবে সূক্ষ্ম কামকে জয় করা সহজ হইয়া পড়ে।

(৪৩) এই প্রকার বুদ্ধির অতীত আত্মাকে জানিয়া ও আত্মা দ্বারা মনকে বশ করিয়া, হে মহাবাহো, কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে সংহার কর।

টিপ্পনী—যে ব্যক্তি হৃদয়স্থিত আত্মাকে জানে, মন তার বশে থাকে—ইন্দ্রিয়ের বশে থাকে না। মন যদি জয় করা যায়, তবে কাম কি করিতে পারে?

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-অন্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্ম-যোগ নামে তৃতীয় অধ্যায় পূর্ণ হইল।

চতুর্থ অধ্যা

জ্ঞান-কর্ম-সংন্যাস-যোগ

এই অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়ের অধিকতর আলোচনা আছে। ইহাতে বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞের বর্ণনা আছে।

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

শ্রীভগবানুবাচ—(১) অহং ইমং অব্যয়ং যোগং বিবস্বতে প্রোক্তবান্। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ। অব্যয়ং—অবিনাশী যোগ। বিবস্বতে—সূর্যকে। বিবস্বান্—সূর্য। মনবে—মনুকে। ইক্ষ্বাকবে—ইক্ষ্বাকুকে। অব্রবীৎ—বলিয়াছিলেন। (২) এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ। হে পরন্তপ! ইহ স যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ। এবং—এই প্রকার। পরম্পরাপ্রাপ্ত—একের পর অন্য দ্বারা প্রাপ্ত। ইমং—ইহাকে, এই যোগকে। পরন্তপ—পর অর্থাৎ শত্রুকে যিনি তাপ দান করেন। মহতা—দীর্ঘ। (৩) অদ্য ময়া সঃ এব অয়ং পুরাতনঃ যোগঃ তে প্রোক্তঃ, ত্বং হি মে ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি এতৎ চ উত্তমং রহস্যম্। ময়া—আমাকর্তৃক। তে—তোমাকে। প্রোক্তঃ—বলা হইল। রহস্যম্—মর্মকথা।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(১) এই অবিনাশী যোগ আমি সূর্যকে বলিয়াছিলাম। তিনি মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। (২) এইরূপ পরম্পরা-প্রাপ্ত যোগ রাজর্ষিরা জানিতেন। সেই যোগ দীর্ঘকাল নাশ পাইয়াছে। (৩) সেই পুরাতন যোগ আমি আজ তোমাকে বলিতেছি, কেননা তুমি আমার ভক্ত এবং এই যোগও উত্তম গুহ্যতত্ত্ব।

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

অর্জুন উবাচ—(৪) ভবতঃ জন্ম অপরং, বিবস্বতঃ জন্ম পরং, ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্। অপরং—পশ্চাতে। বিজানীয়াম্—জানিব।

শ্রীভগবানুবাচ—(৫) হে অর্জুন! তব মে চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি, অহং তানি সর্বাণি বেদ, হে পরন্তপ, ত্বং ন বেত্থ। ব্যতীতানি—অতিক্রান্ত হইয়াছে। বেদ—জানি। ন বেত্থ—জান না। (৬) অজঃ সন্ অপি অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি স্বাম্ প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি। অজঃ—জন্মরহিত। অব্যয়াত্মা—অবিনাশী আত্মা। স্বাম্ প্রকৃতিং—আপন প্রকৃতিকে (বৈষ্ণবী মায়াকে)। অধিষ্ঠায়—বশীভূত করিয়া। আত্মমায়য়া—নিজের মায়াদ্বারা। (৭) হে ভারত, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি (তথা)

অর্জুন বলিলেন—(৪) তোমার জন্ম সম্প্রতি হইয়াছে, সূর্যের জন্ম পূর্বে হইয়াছে, তাহা হইলে আমি কেমন করিয়া বুঝিতে পারি যে, তুমি এই যোগ পূর্বে বলিয়াছিলে?

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(৫) হে অর্জুন, আমার ও তোমার জন্ম তো অনেকবার হইয়া গিয়াছে। সে সকল আমি জানি, কিন্তু তুমি জান না। (৬) আমি জন্মরহিত ও অবিনাশী হইলেও ভূতমাত্রের ঈশ্বর। তাহা হইলেও আমার স্বভাবের আশ্রয় লইয়া আমার মায়ার বলে আমি জন্ম ধারণ করিয়া থাকি। (৭) হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম প্রবল হয়, তখন

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

অধর্মস্য অভ্যুত্থানং (ভবতি) তদা অহং আত্মানং সৃজামি। (৮) সাধূনাং পরিত্রাণায় দুষ্কৃতাং বিনাশায় ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ যুগে যুগে সম্ভবামি। (৯) হে অর্জুন, এবং মে দিব্যং জন্ম কর্ম চ তত্ত্বতঃ যো বেত্তি, সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম ন এতি, মাম্ এতি। তত্ত্বতঃ—যথাবৎ, ঠিকমত।

(১০) বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মামুপাশ্রিতাঃ বহবঃ জ্ঞানতপসা পূতাঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ। মন্ময়াঃ—আমাতে তন্ময় হইয়া। মামুপাশ্রিতাঃ—যাহারা

তখনই আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। (৮) সাধুদিগের রক্ষার জন্য, আর দুষ্টদিগের নাশের জন্য এবং ধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য যুগে যুগে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

টিপ্পনী—ইহাতে শ্রদ্ধাবানের আশ্বাস রহিয়াছে এবং সত্যের বা ধর্মের অবিচলতার প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে। এই জগতে জোয়ার-ভাটা হইয়া থাকে, কিন্তু পরিণামে ধর্মেরই জয় হয়। সাধুদিগের নাশ হয় না, কেননা সত্যের নাশ নাই। দুষ্টের নাশ হইবেই, কেন না অসত্যের অস্তিত্ব নাই। ইহা জানিয়া মানুষ নিজের কর্তৃত্বের অভিমানে হিংসা করিবে না, কদাচার করিবে না। ঈশ্বরের অবোধ্য মায়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। এই যে অবতার ইহাই ঈশ্বরের জন্ম। বস্তুতঃ ঈশ্বরের জন্ম হইতে পারে না।

(৯) এমনি করিয়া যে আমার দিব্য জন্ম ও কর্মের রহস্য জানে, হে অর্জুন, সে দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্ম পায় না, আমাকে পায়।

টিপ্পনী—যে মনুষ্যের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ঈশ্বর সত্যেরই জয় করাইবেন, সে তো সত্যকে ছাড়িতে পারে না। সে ধৈর্য রাখিয়া, দুঃখ সহ্য করিয়া, মমতাশূন্য হইয়া, জন্ম মরণের ফের হইতে মুক্ত হইয়া, ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া তাহাতেই লয় পায়।

(১০) সে রাগ, ভয় ও ক্রোধ রহিত হইয়া, আমার ধ্যান-ধারণ করিয়া আমারই আশ্রয় লইয়া, জ্ঞানরূপী তপদ্বারা পবিত্র হইয়া আমার স্বরূপ পায়।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ততে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ ১২
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥ ১৩

আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। পূতাঃ—পবিত্র। (১১) যে মাং যথা প্রপদ্যন্তে অহং তান্ তথা এব ভজামি। হে পার্থ, মনুষ্যাঃ সর্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে। প্রপদ্যন্তে—আশ্রয় লয়। ভজামি—অনুগ্রহ করিয়া থাকি, ফল দান করিয়া থাকি। মম বর্ত্ম—আমার পথ, আমার নিয়ম। অনুবর্তনন্তে—অনুবর্তন করে, অবলম্বন করে। (১২) ইহ কর্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ দেবতাঃ যজন্তে, মানুষে লোকে কর্মজা সিদ্ধিঃ হিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি। (১৩) ময়া গুণকর্মবিভাগশঃ চাতুর্বর্ণ্যং সৃষ্টং তস্য কর্তারম্ অপি মাম্ অব্যয়ং অকর্তারং বিদ্ধি। ময়া—আমাকর্তৃক। গুণকর্মবিভাগশঃ—গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী। চাতুর্বর্ণ্যং—চতুর্বর্ণের নিয়ম; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিভাগ।

(১১) যে যে পরিমাণে আমার আশ্রয় লইয়া থাকে তাহাকে আমি সেই পরিমাণে ফল দিয়া থাকি। হে পার্থ, ইচ্ছামত মানুষ আমার মার্গ অনুসরণ করিয়া থাকে, আমার শাসনের অধীনে থাকে।

টিপ্পনী—অর্থাৎ কেহ কোনও ঐশী নিয়মের লঙ্ঘন করিতে পারে না। যেমন বপন করিবে তেমন ফল পাইবে। ঈশ্বরের নিয়মের, কর্মের নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। সকলেই সমান অর্থাৎ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায় পাইয়া থাকে।

(১২) কর্মের সিদ্ধি ইচ্ছা করিয়া মানুষ ইহলোকে দেবতাদিগকে পূজা করিয়া থাকে, এই হেতু সে তাহার কর্মজনিত ফল শীঘ্রই মনুষ্যলোকে পাইয়া থাকে।

টিপ্পনী—দেবতা অর্থে স্বর্গবাসী ইন্দ্র, বরুণাদি ব্যক্তি নহে; দেবতা অর্থে ঈশ্বরের অংশরূপ শক্তি। এই অর্থে মানুষও দেবতা। বাষ্প, বিদ্যুৎ ইত্যাদি মহতী শক্তিও দেবতা। তাহাদিগকে আরাধনা করিয়া ফল শীঘ্র এবং ইহ-লোকেই পাওয়া যায়, ইহাই আমরা দেখিয়া থাকি। সে ফল ক্ষণিক মাত্র। তাহাতে আত্মার সন্তোষ হয় না, তবে আর মোক্ষ কেমন করিয়া হইবে?

(১৩) গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চারি বর্ণ আমি সৃষ্টি করিয়াছি। উহাদের কর্তা হইলেও আমাকে তুমি অকর্তা বিকাররহিত বলিয়া জানিবে।

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭

(১৪) কর্মাণি মাং ন লিম্পন্তি, কর্মফলে মে স্পৃহা ন ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি সঃ কর্মভিঃ ন বধ্যতে। ন লিম্পন্তি—লিপ্ত করে না, স্পর্শ করে না। স্পৃহা—ইচ্ছা, তৃষ্ণা।

(১৫) পূর্বৈঃ অপি মুমুক্ষুভিঃ এবং জ্ঞাত্বা কর্ম কৃতম্। তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতং কর্ম এব কুরু। মুমুক্ষুভিঃ—মোক্ষার্থীদের দ্বারা। এবং—এই প্রকার। পূর্বৈঃ—পূর্বের লোকদের দ্বারা। পূর্বতরং—পূর্বকালের ন্যায়। কুরু—কর। (১৬) কিম্ কর্ম কিম্ অকর্ম ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে। কবয়ঃ—কবিগণ, পণ্ডিতেরা, জ্ঞানী পুরুষেরা। মোহিতাঃ—মোহপ্রাপ্ত। তৎ—সেই হেতু। তে—তোমাকে। প্রবক্ষ্যামি—বলিতেছি। (১৭) হি কর্মণঃ বোদ্ধব্যম্ অপি বিকর্মণঃ হি বোদ্ধব্যম্ তথা অকর্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্ কর্মণঃ গতিঃ গহনা। বিকর্মণঃ—নিষিদ্ধ কর্মসকলের। অকর্মণঃ—কর্মশূন্যতার। গহনা—দুর্জ্ঞেয়।

---

(১৪) আমাকে কর্ম স্পর্শ করে না, তাহার [কর্মের] ফলেও আমার লালসা নাই—এই রূপে যে ব্যক্তি আমাকে ভাল করিয়া জানে সে কর্মের বন্ধনে পড়ে না।

টিপ্পনী—ইহাতে মানুষের নিকট কর্ম করিয়াও অকর্মী থাকিবার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ঈশ্বরই সকলের কর্তা, আমি নিমিত্ত মাত্র আছি, তবে [এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে] আর কর্তৃত্বের অভিমান কেমন করিয়া হইবে?

(১৫) এই প্রকার জানিয়া পূর্ব-মুমুক্ষুরা কর্ম করিয়া গিয়াছেন, তেমনি তুমিও পূর্বগামীরা সর্বদা যে প্রকার করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রকার কর। (১৬) কর্ম কি, অকর্ম কি এই বিষয়ে জ্ঞানী পুরুষও মোহে পড়িয়া থাকেন। সেই কর্ম আমি তোমাকে সঠিক বলিতেছি। ইহা জানিলে তুমি অশুভ হইতে বাঁচিবে।

(১৭) কর্ম, নিষিদ্ধ কর্ম ও অকর্ম ইহাদের ভেদ জানা চাই। কর্মের গতি গূঢ়।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০

(১৮) যঃ কর্মণি অকর্ম পশ্যেৎ, যঃ অকর্মণি কর্ম চ (পশ্যেৎ) স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্। সঃ যুক্তঃ, সঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ। (১৯) যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্প-বর্জিতাঃ বুধাঃ তম্ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং পণ্ডিতম্ আহুঃ। (২০) কর্মফলাসঙ্গং, ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ (সন্) কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি সঃ কিঞ্চিৎ এব

(১৮) কর্মকে যে অকর্ম বলিয়া বোঝে ও অকর্মকে যে কর্ম বলিয়া বোঝে তাহাকে লোক-মধ্যে বুদ্ধিমান্ গণনা করা হয়। তিনি যোগী ও সম্পূর্ণ কর্মকারী।

টিপ্পনী—কর্ম করিয়াও যে কর্তৃত্বের অভিমান রাখে না, তাহার কর্ম অকর্ম এবং যে ব্যক্তি কর্মকে বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়াও মনে মনে আকাশ-কুসুম রচনা করে, তাহার অকর্মই কর্ম। যাহার পক্ষাঘাত হইয়াছে, সে ইচ্ছাপূর্বক (অহঙ্কারপূর্বক) যদি বিকল অঙ্গ হেলায় তাহা হইলেই উহা হেলিবে। সে এই পীড়িত অঙ্গ হেলান রূপ ক্রিয়ার কর্তা হইল। আত্মার গুণ অকর্তার ন্যায়। যে ব্যক্তি মোহ-মুগ্ধ হইয়া নিজেকে কর্তা মনে করে তাহার আত্মার যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে ও সে অহঙ্কারী হইয়া কর্ম করে। এইরূপ যে কর্মের গতি জানে, সেই বুদ্ধিমান্ যোগীকে কর্তব্যপরায়ণ বলা যায়। "আমি করিতেছি" এইরূপ যাহারা মানে, তাহারা কর্ম-বিকর্মের ভেদ ভুলিয়া যায় ও সাধনপথের ভাল-মন্দ বিচার করে না। আত্মার স্বাভাবিক গতি ঊর্ধ্বমুখী; এজন্য যখন মানুষ নীতিমার্গ ত্যাগ করে তখন তাহাতে অহঙ্কার আছে ইহা অবশ্যই বলা যায়। অভিমান-রহিত পুরুষের কর্ম সহজেই সাত্ত্বিক হয়।

(১৯) যাহার সর্ব কর্মের আরম্ভ কামনা ও সংকল্প-বর্জিত তাহার কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছে। এই রকম লোককে জ্ঞানীরা পণ্ডিত বলেন। (২০) যে কর্মফল ত্যাগ করিয়াছে, যে সর্বদা সন্তুষ্ট, যাহার কোনও আশ্রয়ের অভিলাষ নাই, সে কর্মে ভালরূপ প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করিতেছে না এরূপ বলা যায়।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

ন করোতি। কর্মফলাসঙ্গং—কর্মফলে আসক্তি। নিত্যতৃপ্তঃ—সর্বদা সন্তুষ্ট। নিরাশ্রয়ঃ—নিরবলম্ব।

(২১) নিরাশীঃ যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ, কেবলং শারীরং কর্ম কুর্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি। নিরাশীঃ—কামনারহিত, আশারহিত। যতচিত্তাত্মা—সংযত চিত্ত ও আত্মা যাহার। পরিগ্রহঃ—সম্পত্তি-সঞ্চয় বা সংগ্রহ। শারীরং কর্ম—শরীর দ্বারা যে কর্ম করা যায়। কিল্বিষং—পাপ। (২২) যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ বিমৎসরঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ—যাহা আপনা আপনি পাওয়া যায় তাহাতে যে সন্তুষ্ট। দ্বন্দ্বাতীতঃ—শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত। বিমৎসরঃ—মৎসর অর্থ বৈর বুদ্ধি, যাহার শত্রুতার বুদ্ধি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, দ্বেষরহিত।

টিপ্পনী—তাৎপর্য এই যে, তাহাকে কর্মের বন্ধন ভোগ করিতে হয় না।

(২১) যে আশা-রহিত, যাহার মন নিজের বশীভূত, যে সংগ্রহ মাত্র ছাড়িয়া দিয়াছে, যে শরীর দ্বারা মাত্র কর্ম করে, সে কর্ম করিয়াও দোষ-যুক্ত হয় না।

টিপ্পনী—অভিমানপূর্বক কৃতকর্ম মাত্র যথেষ্ট সাত্ত্বিক হইলেও বন্ধনকারী হয়। উহা যখন ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি হইতে অভিমান-শূন্য হয় তখন বন্ধন-রহিত হয়। যাহার অহং শূন্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার শরীরমাত্র কর্ম করে। সুপ্ত মানুষের শরীরমাত্র কর্ম করে একথা বলা যায়। কয়েদী বল-প্রয়োগের বশীভূত হইয়া অনিচ্ছায় লাঙ্গল চালায়, তাহার শরীরই কার্য করে। যে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের কয়েদী হয় তাহারও শরীরমাত্র কর্ম করে। সে তখন নিজে [অহং] শূন্য হয়, প্রেরক ঈশ্বর।

(২২) যে সহজে প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে, যে সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত থাকে, যে দ্বেষরহিত এবং যে সফলতা ও নিষ্ফলতা বিষয়ে নির্বিকার সে ব্যক্তি কর্ম করিয়াও বন্ধনে পড়ে না।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬

(২৩) গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় কর্ম আচরতঃ সমগ্রং প্রবিলীয়তে। গতসঙ্গস্য—যাহার সঙ্গ বা আসক্তি নাই। মুক্ত—জীবন্মুক্ত। জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ—যাহার চিত্ত জ্ঞানময়। সমগ্রং—কর্মফল সহিত কর্ম। প্রবিলীয়তে—লয়প্রাপ্ত হয়। (২৪) অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং, ব্রহ্মকর্মসমাধিনা তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং। অর্পণং—যাহা দ্বারা আগুনে ঘি ঢালা হয়, হাতা। হবিঃ—ঘি। ব্রহ্মকর্মসমাধিনা—ব্রহ্ম এবং কর্ম এই দুইয়ের সমাধি, সমাধান বা মিল যিনি করিয়াছেন। (২৫) অপরে যোগিনঃ দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্যুপাসতে, অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞং যজ্ঞেন এব উপজুহ্বতি। উপজুহ্বতি—আহুতি দেয়। (২৬) অন্যে শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি, অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি। জুহ্বতি—হোম করে।

(২৩) যে আসক্তিরহিত, যাহার চিত্ত জ্ঞানময়, যে মুক্ত এবং যে যজ্ঞার্থেই কর্ম করে তাহার কর্মমাত্র লয়প্রাপ্ত হয়।

(২৪) (যজ্ঞে) অর্পণ (হাতা) ব্রহ্ম, হবনের বস্তু যে হবি তাহা ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হবনকারী সেও ব্রহ্ম, এই প্রকারে কর্মের সহিত যে ব্রহ্মের মিল সাধন করে সে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়। (২৫) আর কতক যোগী দেবতা-পূজনরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকে এবং অপরে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞকেই হোম করে। (২৬) আবার অপরে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সংযমরূপ যজ্ঞ করে এবং অপর কেহ শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হোম করে।

টিপ্পনী—শ্রবণাদি ক্রিয়া ইত্যাদির সংযম করা এক এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিয়াও সেই বিষয় সকল প্রভু-প্রীত্যর্থে ব্যবহার করা অন্য—যেমন ভজনাদি শ্রবণ। বস্তুতঃ উভয়ই এক।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০

(২৭) অপরে সর্বাণি ইন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চ জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি। জ্ঞানদীপিতে—প্রজ্বলিত জ্ঞানে। (২৮) দ্রব্যযজ্ঞাঃ তপোযজ্ঞাঃ তথা অপরে যোগযজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। দ্রব্যযজ্ঞাঃ—যাহারা দ্রব্যাদি দান দ্বারা যজ্ঞ করে। তপোযজ্ঞাঃ—যাহারা তপশ্চর্যারূপ যজ্ঞ করে। যোগযজ্ঞাঃ—যাহারা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনকারী। সংশিতব্রতাঃ—দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ। (২৯) অপরে অপানে প্রাণং জুহ্বতি, প্রাণে অপানং তথা প্রাণাপানগতীঃ রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।

(৩০) অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি। এতে সর্বে অপি যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ। নিয়তাহারাঃ—সংযতাহারী। যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ—যজ্ঞ

(২৭) আবার অন্যে সকল ইন্দ্রিয়-কর্ম ও প্রাণ-কর্মকে জ্ঞান-দীপ জ্বালাইয়া আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে হোম করে।

টিপ্পনী—অর্থাৎ পরমাত্মায় তন্ময় হইয়া যায়।

(২৮) এই প্রকারে কেহ যজ্ঞার্থে দ্রব্য দানকারী হয়, কেহ তপস্যাকারী হয়। কতক অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধনকারী হয়, কতক স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ করে। ইহারা সকলে কঠিন ব্রতধারী প্রযত্নশীল যাজ্ঞিক। (২৯) অপরে প্রাণায়ামে তৎপর রহিয়া অপানদ্বারা প্রাণ-বায়ুকে হোম করে, প্রাণবায়ু দ্বারা অপানকে হোম করে, অথবা প্রাণ ও অপান উভয়কেই রুদ্ধ করে।

টিপ্পনী—প্রাণায়াম তিন প্রকার; রেচক, পূরক ও কুম্ভক। সংস্কৃতে প্রাণবায়ুর অর্থ গুজরাটীর উল্টা। এই প্রাণবায়ু ভিতর হইতে বাহিরে আসে। আমরা যাহা বাহির হইতে ভিতরে লই সে প্রাণবায়ু 'অক্সিজেন' নামে জানিবে।

(৩০) আবার অন্যে আহারের সংযম করিয়া প্রাণদ্বারা প্রাণের হোম করে। যাহারা যজ্ঞদ্বারা নিজের পাপ ক্ষয় করিয়াছে তাহারা সকলেই যজ্ঞ জানে।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

দ্বারা যাহাদের পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে। (৩১) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি, হে কুরুসত্তম, অযজ্ঞস্য অয়ং লোকঃ নাস্তি অন্যঃ কুতঃ। যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ—যজ্ঞের অবশিষ্ট যে অন্ন থাকে তাহাই অমৃত, যাহারা সেই অমৃত ভোজন করে। সনাতনং—চিরন্তন। (৩২) ব্রহ্মণঃ মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ, তান্ সর্বান্ কর্মজান্ বিদ্ধি এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে। ব্রহ্মণঃ মুখে—বেদের দ্বারা। বিততাঃ—বিহিত হইয়াছে, বর্ণিত হইয়াছে। কর্মজান্—কর্মজনিত, কর্ম হইতে উৎপন্ন। বিমোক্ষ্যসে—বিমুক্ত হইবে। (৩৩) হে পরন্তপ, দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্। হে পার্থ, সর্বং অখিলং কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। অখিলং—খিল রহিত, অবাধ।

(৩১) হে কুরুসত্তম, যজ্ঞের শেষ অমৃত আহারকারী ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্ম পায়, যজ্ঞ যাহারা করে না তাহাদের জন্য ইহলোকই নাই, পরলোক আর কি করিয়া থাকিবে ?

(৩২) এই প্রকার বেদে অনেক যজ্ঞের বর্ণনা আছে ; উহারা কর্ম হইতে উৎপন্ন জানিও। এইরূপ জানিয়া তুমি মোক্ষ পাইবে।

টিপ্পনী—এখানে কর্মের ব্যাপক অর্থ আছে। অর্থাৎ উহা শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক। এই প্রকার কর্ম যজ্ঞ বিনা হইতে পারে না। এইরূপ জানা ও তদনুরূপ আচরণ করার নাম যজ্ঞ জানা। তাৎপর্য এই যে, মানুষ নিজের শরীর, বুদ্ধি ও আত্মা প্রভু-প্রীত্যর্থে, লোক-সেবার্থে যদি ব্যবহার না করে তবে চোর বলিয়া গণ্য হয় ও মোক্ষের উপযুক্ত হইতে পারে না। কেবল যে বুদ্ধি-শক্তির ব্যবহার করে এবং শরীর ও আত্মাকে চুরি করে সে পুরা যাজ্ঞিক নয়। এই শক্তিসকল একত্রিত না হইলে পরোপকারার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। সেই জন্য আত্মশুদ্ধি বিনা লোক-সেবা অসম্ভব। সেবকের পক্ষে শরীর, বুদ্ধি ও আত্মা এই তিন নীতি ভাল রকমে বিকশিত হওয়া দরকার।

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬

(৩৪) তৎ প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া চ বিদ্ধি, তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি। তৎ—সেই জ্ঞান। বিদ্ধি—জানিও। উপদেক্ষ্যন্তি—উপদেশ দিবেন।

(৩৫) হে পাণ্ডব, যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি যেন ভূতানি আত্মনি অথো ময়ি অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি। (৩৬) সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি পাপকৃত্তমঃ চেৎ অসি জ্ঞানপ্লবেন এব সর্বং বৃজিনং সন্তরিষ্যসি। জ্ঞানপ্লবেন—

(৩৩) হে পরন্তপ, দ্রব্য-যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞ অধিক শ্রেষ্ঠ। কারণ, হে পার্থ! কর্মমাত্র জ্ঞানেই পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে।

টিপ্পনী—পরোপকারবৃত্তি হইতে দেওয়ার বস্তু যদি জ্ঞানপূর্বক না দেওয়া হয় তবে তাহা যে অনেক সময় হানিকর হয় ইহা কে না অনুভব করে? সকল বৃত্তি হইতে উৎপন্ন সকল কর্ম তখনই শোভা পায় যখন তাহার সহিত জ্ঞানের যোগ থাকে। অর্থাৎ কর্মমাত্রেরই পূর্ণাহুতি জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।

(৩৪) তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীদের সেবা করিয়া ও নম্রতাপূর্বক বিবেকের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে উহা তুমি জানিবে। তাঁহারা তোমার জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করিবেন।

(৩৫) এই জ্ঞান পাওয়ার পর—হে পাণ্ডব, তোমার আর এই মোহ থাকিবে না। সেই জ্ঞানদ্বারা তুমি ভূতমাত্রকে নিজ আত্মার মধ্যে এবং আমার মধ্যে দেখিবে।

টিপ্পনী—"যথা পিণ্ডে তথা ব্রহ্মাণ্ডে" ইহার অর্থ—যাহার আত্ম-দর্শন হইয়াছে, সে নিজের আত্মা ও অপরের আত্মার মধ্যে ভেদ দেখে না।

(৩৬) সকল পাপীর মধ্যে যদি তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক পাপী হও তথাপি জ্ঞানরূপী নৌকা দ্বারা সকল পাপ তুমি উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

জ্ঞানকেই প্লব, নৌকা করিয়া। বৃজিনং—পাপকে। (৩৭) হে অর্জুন, সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ যথা এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। সমিদ্ধঃ—প্রদীপ্ত, প্রজ্বলিত। এধাংসি—কাষ্ঠ সকল।

(৩৮) ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং নহি বিদ্যতে, যোগসংসিদ্ধঃ স্বয়ম্ কালেন আত্মনি তৎ বিন্দতি। যোগসংসিদ্ধঃ—যোগসিদ্ধ পুরুষ, সমত্বপ্রাপ্ত পুরুষ। স্বয়ম্—নিজে নিজেই। তৎ—সেই জ্ঞান। বিন্দতি—লাভ করে। (৩৯) শ্রদ্ধাবান্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে, জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিং অধিগচ্ছতি। পরাং শান্তি—পরম শান্তি মানে মোক্ষ। অধিগচ্ছতি—পায়। (৪০) অজ্ঞঃ অশ্রদ্ধধানঃ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি। সংশয়াত্মা—সংশয়াকুলিত

টিপ্পনী—জ্ঞান পাইবার তিনটি সর্ত—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—ইহা এই যুগে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। প্রণিপাত মানে নম্রতা, ভব্যতা; পরিপ্রশ্ন মানে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা; সেবা বিনা নম্রতা খোশামুদিতে পরিণত হইতে পারে। আবার জ্ঞান না খুঁজিলে পাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য যতক্ষণ না বোঝা যায় ততক্ষণ গুরুর নিকট নম্রতাপূর্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাই জিজ্ঞাসার চিহ্ন। ইহাতে শ্রদ্ধা আবশ্যক। যাঁহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা না হইবে তাঁহার প্রতি সহৃদয় নম্রতা আসিবে না, তাঁহার সেবা আর কি করিয়া হইবে?

(৩৭) হে অর্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি ইন্ধনকে ছাই করিয়া ফেলে তেমনি জ্ঞানরূপী অগ্নি সমস্ত কর্ম ছাই করিয়া ফেলে।

(৩৮) জ্ঞানের মত পবিত্র এই জগতে আর কিছুই নাই। যোগে বা সমত্বে পূর্ণ মানুষ কালক্রমে নিজে নিজেই সেই জ্ঞান লাভ করে। (৩৯) শ্রদ্ধাবান্ ঈশ্বরপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ জ্ঞান পায়, এবং এই জ্ঞান যে পাইয়াছে সে শীঘ্রই শান্তি লাভ করে। (৪০) যে অজ্ঞান ও শ্রদ্ধারহিত হইয়া সংশয় পরায়ণ

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২

ব্যক্তি। বিনশ্যতি—নাশপ্রাপ্ত হয়। (৪১) হে ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং আত্মবন্তং কর্মানি ন নিবধ্নন্তি। যোগসংন্যস্তকর্মাণং—যে যোগ দ্বারা কর্ম ত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ ফলাসক্তিযুক্ত কর্ম ত্যাগ করিয়াছে। জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ং—জ্ঞান দ্বারা যাহার সংশয় দূর হইয়াছে। আত্মবন্তং—যে আত্মদর্শী তাহাকে।

(৪২) তস্মাৎ হে ভারত, আত্মনঃ হৃৎস্থং অজ্ঞানসম্ভূতং এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ, উত্তিষ্ঠ। আতিষ্ঠ—সাধন কর। সংশয়ং—নিজের স্বরূপ বিষয়ে সংশয়।

হয় তাহার নাশ হয়। সংশয়ীর পক্ষে ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। তাহার কোথাও সুখ নাই। (৪১) যে ব্যক্তি সমত্বরূপী যোগ দ্বারা কর্ম অর্থাৎ কর্মফল ত্যাগ করিয়াছে এবং জ্ঞান দ্বারা সংশয় নাশ করিয়াছে, সেই আত্মদর্শীকে হে অর্জুন, কর্ম বন্ধন করে না।

(৪২) অতএব হে অর্জুন, হৃদয়স্থ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংশয়কে আত্মজ্ঞানরূপী তরবারির দ্বারা নাশ করিয়া যোগ অর্থাৎ সমত্ব ধারণ করিয়া দাঁড়াও।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞান-কর্ম-সন্ন্যাস-যোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় পূর্ণ হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম-সংন্যাস-যোগ

এই অধ্যায়ে কর্মযোগ বিনা কর্ম-সন্ন্যাস যে হয়ই না এবং বস্তুতঃ উভয়ই যে এক—তাহা দেখান হইয়াছে।

অর্জুন উবাচ

সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩

অর্জুন উবাচ—(১) কৃষ্ণ, কর্মণাং সংন্যাসং পুনঃ যোগং চ শংসসি। এতয়োঃ যৎ শ্রেয়ঃ তদেকং মে সুনিশ্চিতং ব্রূহি। কর্মণাং সংন্যাসং—কর্মত্যাগ। যোগং—কর্মযোগ। শ্রীভগবানুবাচ—(২) সংন্যাসঃ কর্মযোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ, তয়োঃ তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে। নিঃশ্রেয়সকরৌ—মোক্ষদানকারী। (৩) যঃ ন দ্বেষ্টি, ন কাঙ্ক্ষতি স নিত্যসংন্যাসী জ্ঞেয়ঃ, হি হে মহাবাহো! নির্দ্বন্দ্বঃ সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। নিত্যসংন্যাসী—সদাই সন্ন্যাসী, কর্মানুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাসী। নির্দ্বন্দ্বঃ—রাগদ্বেষ সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব যাহাতে নাই।

অর্জুন বলিলেন—(১) হে কৃষ্ণ, তুমি কর্মত্যাগেরও স্তুতি করিতেছ, আবার কর্ম যোগেরও স্তুতি করিতেছ, এই উভয়ের মধ্যে যেটি শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে সোজাসুজি নিশ্চয় করিয়া বল।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(২) কর্মের ত্যাগ ও যোগ উভয়ই মোক্ষদায়ক, তন্মধ্যে কর্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ উচ্চ। (৩) যে মানুষ দ্বেষ করে না ও ইচ্ছা করে না তাহাকে সর্বদা সন্ন্যাসী জানিও। যে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত সে সহজেই কর্ম বন্ধন হইতে মুক্তি পায়।

টিপ্পনী—তাৎপর্য এই যে, কর্মের ত্যাগ সন্ন্যাসের নিজস্ব লক্ষণ নয়, পরন্তু দ্বন্দ্বাতীত হওয়াই উহার লক্ষণ। কেহ কর্ম করিয়াও সন্ন্যাসী হয়, অপরে কর্ম না করিয়াও মিথ্যাচারী হয়। (অধ্যায় ৩ শ্লোক, ৬ দেখ)

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫
সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

(৪) সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ, একমপি সম্যক্ আস্থিতঃ উভয়োঃ ফলং বিন্দতে। বালাঃ—বালকেরা, অজ্ঞানীরা। আস্থিতঃ—প্রতিষ্ঠিত। বিন্দতে—লাভ করে। (৫) সাংখ্যৈঃ যৎ স্থানং প্রাপ্যতে তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে। সাংখ্যং যোগঞ্চ যঃ একং পশ্যতি স পশ্যতি। সাংখ্যৈঃ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক। গম্যতে—পাওয়া যায়। (৬) হে মহাবাহো, অযোগতঃ সংন্যাসঃ দুঃখম্ আপ্তুম্। যোগযুক্তঃ মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি। অযোগতঃ যোগ বা কর্মযোগ ব্যতীত। দুঃখম্ আপ্তুম্—দুঃখহেতু পাইতে অশক্য। ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি—ব্রহ্মকে পায়, অপরোক্ষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে।

(৭) যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা—সর্বভূতে যিনি নিজ আত্মাকে দেখেন।

(৪) সাংখ্য ও যোগ, জ্ঞান ও কর্ম—ইহারা ভিন্ন, অজ্ঞানীরা এ কথা বলে, পণ্ডিতেরা বলেন না। একটিতে ভাল রকমে স্থির থাকিলে উভয়ের ফলই মিলে।

টিপ্পনী—জ্ঞানযোগী লোক-সংগ্রহরূপী কর্মযোগের বিশেষ ফল সংকল্পমাত্রই পাইয়া থাকে। কর্মযোগী নিজের অনাসক্তির জন্য বাহ্য কর্ম করিয়াও জ্ঞানযোগীর শান্তি সহজেই পায়।

(৫) যে স্থান সন্ন্যাস-মার্গী পাইয়া থাকে তাহাই যোগীও পাইয়া থাকে। যে সাংখ্য ও যোগকে একরূপ দেখে সে-ই সত্য দেখে। (৬) হে মহাবাহো, কর্মযোগ বিনা কর্মত্যাগ কষ্টসাধ্য। সমত্বযুক্ত মুনি শীঘ্রই মোক্ষ পাইয়া থাকেন।

(৭) যাহার যোগ্য সাধ্য, যে হৃদয় বিশুদ্ধ করিয়াছে এবং যে মন ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে ও যে ভূতমাত্রকেই নিজের মত দেখে—এইরূপ মানুষ কর্ম করিয়াও তাহাতে অলিপ্ত থাকে।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২

(৮-৯) তত্ত্ববিৎ যুক্তঃ পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ নৈব কিঞ্চিৎ করোমি ইতি মন্যতে। যুক্তঃ—সমত্ববুদ্ধিযুক্ত যোগী। তত্ত্ববিৎ—তত্ত্বজ্ঞ। মন্যেত—মনে করে।

(১০) যঃ ব্রহ্মণি আধায় সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্মাণি করোতি সঃ অম্ভসা পদ্মপত্রম্ ইব পাপেন ন লিপ্যতে। আধায়—সমর্পণ করিয়া। (১১) যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ অপি কর্ম কুর্বন্তি। (১২) যুক্তঃ

(৮-৯) দেখিয়া শুনিয়া, স্পর্শ করিয়া, ঘ্রাণ লইয়া, খাইয়া, চলিয়া, শুইয়া, শ্বাস লইয়া, বলিয়া, ত্যাগ করিয়া, গ্রহণ করিয়া, চক্ষু খুলিয়া, বন্ধ করিয়া—নিজের ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে—এইরূপ ভাবনা রাখিয়া তত্ত্বজ্ঞ যোগী জানেন যে, 'আমি কিছুই করিতেছি না।'

টিপ্পনী—যতক্ষণ অভিমান আছে ততক্ষণ এই অলিপ্ত স্থিতি আসে না। সেইজন্য বিষয়াসক্ত মনুষ্য—বিষয় আমি ভোগ করিতেছি না, ইন্দ্রিয় নিজের কাজ করিতেছে—এ কথা বলিয়া পার পায় না। এই রকম কদর্থ যে করে সে গীতাও বোঝে না, ধর্মও জানে না। এই বিষয় পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্ট করা হইয়াছে।

(১০) যে মনুষ্য কর্মকে ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়া থাকে সে যেমন জলে স্থিত পদ্ম অলিপ্ত থাকে তেমনি পাপ হইতে অলিপ্ত থাকে। (১১) শরীর, মন ও বুদ্ধি দ্বারা এবং কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা যোগীজন আসক্তি-রহিত হইয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন।

(১২) সমভাবান্ কর্মফল ত্যাগ করিয়া পরম শান্তি পান, অস্থিরচিত্ত

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ ১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

কর্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্ আপ্নোতি, অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে। নৈষ্ঠিকীং—আত্যন্তিক। কামকারেণ—কামনা-বশতঃ। (১৩) বশী দেহী সর্ব কর্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ নবদ্বারে পুরে সুখং আস্তে। বশী—জিতেন্দ্রিয়, সংযমী। দেহী—পুরুষ। নৈব কুর্বন্—না করিয়া। ন কারয়ন্—না করাইয়া। নবদ্বারে পুরে—নয় দরজাযুক্ত গৃহে।

(১৪) লোকস্য প্রভুঃ কর্তৃত্বং ন সৃজতি, কর্মাণি ন, কর্মফলসংযোগং ন, স্বভাবস্তু প্রবর্ততে। প্রভুঃ—ঈশ্বর। কর্মফলসংযোগং—কর্মের সহিত ফলের যোগ। স্বভাবঃ—প্রকৃতি, মায়া। প্রবর্ততে—প্রবৃত্ত হয় (কর্মে)। (১৫) বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে, সুকৃতং চ ন এব, অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতং তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি। বিভুঃ—ঈশ্বর। ন আদত্তে—গ্রহণ করেন না। জন্তবঃ—প্রাণিগণ। মুহ্যন্তি—মোহগ্রস্ত হয়; ভ্রান্ত হয়।

ব্যক্তিরা কামনাযুক্ত হইয়া ফলে জড়িত হয় ও বন্ধনে থাকে। (১৩) সংযমী পুরুষ মন দ্বারা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বারযুক্ত নগররূপী শরীরে থাকিয়াও কোনো কর্ম না করিয়া এবং না করাইয়া সুখে বাস করে।

টিপ্পনী—দুই নাক, দুই কান, দুই চক্ষু, দুই মলদ্বার, এক মুখ—ইহারা শরীরের নয়টি মুখ্য দ্বার। বাকী তো চামড়ায় অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত দরজা মাত্র। এই দরজার চৌকিদার যদি এই দ্বারে যাতায়াত করিবার অধিকারীদিগকে যাতায়াত করিতে দিয়া নিজধর্ম পালন করে তবে তাহার সম্বন্ধে বলা যায় যে, এই যাতায়াত সত্ত্বেও সে তাহার ভাগীদার নয়—সাক্ষী মাত্র; তাহাতেই সে না-করে, না-করায়।

(১৪) জগতের প্রভু কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই, কর্মও সৃষ্টি করেন নাই কর্ম ও কর্মফলের যোগও সাধন করেন নাই। প্রকৃতিই এই সকল করে।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬
তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭

(১৬) যেষাং তু তৎ অজ্ঞানম্ আত্মনঃ জ্ঞানেন নাশিতম্ তেষাং তৎ আদিত্যবৎ জ্ঞানং পরং প্রকাশয়তি। যেষাং—যাহাদের। আত্মনঃ জ্ঞানেন—আত্মজ্ঞান দ্বারা। আদিত্যবৎ—সূর্যের ন্যায়। পরং—পরমতত্ত্বকে, পরমপুরুষকে। (১৭) জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি। জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ—জ্ঞান দ্বারা যাহাদের পাপ ধুইয়া গিয়াছে। তদ্‌বুদ্ধয়—যাহারা বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছে। তদাত্মানঃ—ঈশ্বরকেই আপন মনে করে, তন্ময়। তন্নিষ্ঠাঃ—তাঁহাতেই যাহাদের নিষ্ঠা বা স্থিতি। তৎপরায়ণাঃ—ঈশ্বরই যাহাদের পরম আশ্রয়। অপুনরাবৃত্তিং—পুনরায় না আসা, অর্থাৎ মোক্ষ। গচ্ছন্তি—পায়।

টিপ্পনী—ঈশ্বর কর্তা নহেন। কর্মের নিয়ম অবিচলিত ও অনিবার্য। যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল পায়। ইহাতে ঈশ্বরের মহান দয়া রহিয়াছে, তাঁহার ন্যায় রহিয়াছে। শুদ্ধ ন্যায়ই শুদ্ধ দয়া। ন্যায়ের বিরোধী দয়া তো দয়াই নহে, উহা ক্রুরতা। কিন্তু মানুষ ত্রিকালদর্শী নহে। সেইজন্য তাহার পক্ষে দয়া অথবা ক্ষমাই ন্যায়। সে নিরন্তর নিজে ন্যায়ের পাত্র হইয়া ক্ষমার যাচক। সে অপরের প্রতি আচরণে ন্যায়, ক্ষমার দ্বারাই পূরণ করিতে পারে। ক্ষমার গুণ বিকশিত হইলেই পরিণামে অকর্তা বা যোগী অথবা সমতাবান্ হইয়া সে ধর্মে কুশল হইতে পারে।

(১৫) ঈশ্বর কাহারও পাপ অথবা পুণ্যের দায়িত্ব ল'ন না। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে এবং তাহাতেই লোক মোহে ডুবিয়া যায়।

(১৬) কিন্তু যাহাদের অজ্ঞান আত্মজ্ঞান দ্বারা নষ্ট হইয়াছে তাহাদের সূর্যের ন্যায় প্রকাশময় জ্ঞান পরম তত্ত্বের দর্শন করায়।

(১৭) জ্ঞান দ্বারা যাহাদের পাপ ধুইয়া গিয়াছে, যাহারা ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা করে, তন্ময় হয়, তাঁহাতে স্থির থাকে, তাঁহাকেই সর্বস্ব মানে, তাহারা মোক্ষ পায়।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

(১৮) বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি, শুনি, শ্বপাকে চ এব পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। শুনি—কুকুরে প্রতি। শ্বপাকে—চণ্ডালের প্রতি।

(১৯) যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতং তৈঃ ইহ এব সর্গঃ জিতঃ। হি ব্রহ্ম সমং নির্দোষং তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ। সাম্যে—সমবুদ্ধিতে। তৈঃ—তাহাদের দ্বারা। ইহ—এই লোকেই। সর্গঃ—সংসার। (২০) স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ অপ্রিয়ং প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ চ। স্থিরবুদ্ধিঃ—যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। অসংমূঢ়ঃ—যাহার মোহ নাই। ব্রহ্মবিদ্—যে ব্রহ্মকে জানে। ন উদ্বিজেৎ—বিষণ্ণ হয় না।

(১৮) বিদ্বান্ ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণের প্রতি, গাভী, হস্তী, কুকুরের প্রতি এবং কুকুর-খাদক মানুষের [চণ্ডাল] প্রতি জ্ঞানীরা সমদৃষ্টি রাখেন।

টিপ্পনী—অর্থাৎ সকলকে আবশ্যকতা অনুরূপ সেবা করে। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমভাব রাখার মানে ব্রাহ্মণকে যদি সাপে কাটে, তবে তাহার দংশন-স্থান যেমন জ্ঞানী প্রেমভাব হইতে চুষিয়া বিষ মুখে লইবার চেষ্টা করিবে, তেমনি চণ্ডালের প্রতিও ঐ অবস্থায় ঐরূপ ব্যবহার করিবে।

(১৯) যাহাদের মন সমত্বে স্থির হইয়াছে তাহারা এই দেহেই সংসার জয় করিয়াছে। ব্রহ্ম নিষ্কলঙ্ক ও সমভাবী, এই হেতু তাহারা ব্রহ্মে স্থির হইয়া থাকে।

টিপ্পনী—মানুষ যেমন চিন্তা করে তেমনই হইয়া থাকে। তাই সে সমত্বের চিন্তা করিয়া দোষমুক্ত হইয়া সমত্বের মূর্তিস্বরূপ নির্দোষ ব্রহ্মকে পায়।

(২০) যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, যাহার মোহ নষ্ট হইয়াছে, যে ব্রহ্মকে জানে ও ব্রহ্ম-পরায়ণ থাকে, সে প্রিয় (বস্তু) পাইয়া সুখী ও অপ্রিয় (বস্তু) পাইয়া নিজেকে দুঃখী মনে করে না।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩

(২১) বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং বিন্দতি সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা অক্ষয়ং সুখং অশ্নুতে। বাহ্যস্পর্শেষু—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে। অসক্তাত্মা—যে অনাসক্ত। আত্মনি—অন্তঃকরণে। বিন্দতি—পায়।

(২২) হে কৌন্তেয়, যে ভোগাঃ সংস্পর্শজাঃ তে দুঃখযোনয়ঃ আদ্যন্তবন্তঃ এব, তেষু বুধঃ ন রমতে। সংস্পর্শজাঃ—বিষয়জাত। দুঃখযোনয়ঃ—দুঃখের কারণভূত। ন রমতে—রত হয় না। (২৩) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ ইহ এব কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ুং যঃ শক্নোতি সঃ নরঃ যুক্তঃ, সঃ সুখী। শরীর-বিমোক্ষণাৎ—দেহপাতের। প্রাক্—পূর্বে। ইহ এব—এই দেহেই।

টিপ্পনী—যে অন্তর্মুখ হইয়াছে, সে-ই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার পায় ও সে-ই পরম আনন্দ লাভ করে। বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া কর্ম করা ও ব্রহ্ম সমাধিতে রমণ করা এই দুই ভিন্ন বস্তু নহে—একই বস্তুকে দেখার দুই বিভিন্ন দৃষ্টি, যেমন একটা টাকার দুই পিঠ।

(২১) যাহার বাহ্য বিষয়ে আসক্তি নাই, এমন পুরুষ অন্তরেই আনন্দ ভোগ করে, সেই ব্রহ্ম-পরায়ণ পুরুষ অক্ষয় আনন্দ অনুভব করে।

(২২) বিষয়-জনিত ভোগ অবশ্যই দুঃখের কারণ হয়। হে কৌন্তেয়, উহা আদি ও অন্তবান্। বুদ্ধিমান মানুষ ইহাতে রত হয় না।

(২৩) দেহান্তের পূর্বে যে ব্যক্তি এই দেহেই কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিবার শক্তি পায় সেই মনুষ্য সমত্ব পাইয়াছে, সে সুখী।

টিপ্পনী—মৃত শরীরে যেমন ইচ্ছা ও দ্বেষ হয় না, সুখ-দুঃখ হয় না, তেমনি জীবিতাবস্থায়ও মৃতের সমান, জড়ভরতের ন্যায় দেহাতীত যে হইতে পারে সে এই জগৎ জয় করিয়াছে, সে প্রকৃত সুখ জানিয়াছে।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭

(২৪) যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ স এব ব্রহ্মভূতঃ যোগী ব্রহ্মনির্বাণং অধিগচ্ছতি। অন্তঃসুখঃ—যাহার অন্তরেই আনন্দ। অন্তরারামঃ—অন্তরেই যাহার ক্রীড়া; শান্তি যাহার অন্তরে। অন্তর্জ্যোতিঃ—যাহার অন্তরেই জ্ঞানের জ্যোতি রহিয়াছে। ব্রহ্মনির্বাণং—ব্রহ্মে লয় পাওয়া। (২৫) ক্ষীণকল্মষাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্বাণং লভন্তে। ক্ষীণকল্মষাঃ—বিগত পাপ। ছিন্নদ্বৈধাঃ—যাহাদের সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। (২৬) বিদিতাত্মনাং কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাম্ যতীনাম্ অভিতঃ ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে। বিদিতাত্মনাং—যাহারা নিজেকে জানিয়াছে তাহাদের। যতচেতসাং—যাহাদের চিত্ত সংযত তাহাদের। অভিতঃ—চারিদিকে, সর্বত্র। (২৭-২৮) বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা, চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব (কৃত্বা), নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা, যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ যঃ মুনিঃ মোক্ষপরায়ণঃ, সঃ সদা মুক্ত এব। স্পর্শান্—বিষয়ভোগ সকল।

(২৪) যাহার অন্তরে আনন্দ আছে, যাহার অন্তরে শান্তি আছে, যাহার অন্তর্জ্ঞান অবশ্যই হইয়াছে, সেই ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত যোগী ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করে। (২৫) যাহার পাপ নাশ হইয়াছে, যাহার শঙ্কাসকল শান্ত হইয়াছে, যাহার মনের উপর দখল হইয়াছে ও যে প্রাণীমাত্রের হিতেই নিযুক্ত থাকে এমন ঋষি ব্রহ্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। (২৬) যে নিজেকে দেখে, যে কাম ক্রোধ জয় করিয়াছে, যে মনকে বশ করিয়াছে এমন যতীর পক্ষে ব্রহ্ম-নির্বাণ সর্বত্র। (২৭-২৮) বাহিরের বিষয়-ভোগ বহিষ্কার করিয়া, দৃষ্টি ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে স্থির রাখিয়া, নাসিকাপথে যাতায়াতকারী প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি এক সমান

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ২৯

বহিঃ কৃত্বা—বহিষ্কার করিয়া। যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ—যাহার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত। মোক্ষপরায়ণঃ—যিনি মোক্ষই পরম গতি বলিয়া জানিয়াছেন।

(২৯) যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্বলোকমহেশ্বরং সর্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ ঋচ্ছতি। ঋচ্ছতি—পায়।

রাখিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বশ করিয়া, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধরহিত হইয়া যে মুনি মোক্ষপরায়ণ থাকে সে সদাই মুক্ত।

টিপ্পনী—প্রাণবায়ু ভিতর হইতে বাহির হয়, অপান বায়ু বাহির হইতে ভিতরে যায়। এই শ্লোকে প্রাণমায়াদি যৌগিক ক্রিয়ার সমর্থন আছে। প্রাণায়ামাদি তো বাহ্য ক্রিয়া, আর তাহার প্রভাব শরীরের স্বাস্থ্য রাখার ও পরমাত্মার বাস করিবার যোগ্য মন্দির গঠন করিবার প্রয়োজনের দ্বারা পরিমিত। ভোগী যে প্রয়োজন সামান্য ব্যায়ামাদি দ্বারা মিটায়, যোগী সেই প্রয়োজন প্রাণমায়াদি দ্বারা মিটায়। ভোগীর ব্যায়ামাদি তাহার ইন্দ্রিয় উত্তেজিত করায় সাহায্য করে। প্রাণায়ামাদি যোগীর শরীর নীরোগ ও কঠিন করিয়া ইন্দ্রিয় সকল শান্ত রাখার সাহায্য করে। আজকাল প্রাণায়ামাদির বিধি কম লোকেই জানে। আবার তাহার মধ্যে খুব কম লোকেই তাহার সদ্ব্যবহার করে। যাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপর অন্ততঃ প্রাথমিক বিজয়লাভ হইয়াছে, যাহার মোক্ষের উৎকট ইচ্ছা হইয়াছে, আর যে রাগ-দ্বেষ জয় করিয়া ভয় ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পক্ষে প্রাণায়ামাদি উপযোগী ও সাহায্যকারী। অন্তঃশৌচ বিনা প্রাণায়ামাদি বন্ধনের এক সাধন হইয়া মানুষকে মোহকূপের খুব নীচে লইয়া যাইতে পারে; লইয়া যায়, এমন অনেকে অনুভব করিয়াছেন। সেইজন্য যোগীন্দ্র পতঞ্জলি যম-নিয়মকে প্রথম স্থান দিয়া উহার সাধকের জন্যই মোক্ষ-মার্গে প্রাণায়ামাদি সহায়ক গণ্য করিয়াছেন।

যম পাঁচ প্রকার—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। নিয়ম পাঁচ প্রকার—শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

(২৯) যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সমস্ত লোকের মহেশ্বর এবং ভূতমাত্রের হিতকারী এমন আমাকে জানিয়া (উক্ত মুনি) শান্তি পায়।

টিপ্পনী—কেহ যেন মনে না করেন যে, এই শ্লোক, এই অধ্যায়ের চৌদ্দ, পনের ও ঐরূপ অন্যান্য শ্লোকের বিরোধী। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ বলিয়া কর্তা, অকর্তা, ভোক্তা, অভোক্তা—যাহা বল তিনি তাহাই এবং তাহা নহেন। তিনি অবর্ণনীয়। তিনি মানুষের ভাষার অতীত। সেই হেতু তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী গুণ ও শক্তি আরোপ করিয়া মানুষ তাঁহার দর্শনের আশা রাখে।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্ম-সংন্যাস-যোগ নামে পঞ্চম অধ্যায় পূর্ণ হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যান-যোগ

এই অধ্যায়ে যোগসাধনার অর্থাৎ সমত্ব লাভ করার কয়েকটি উপায় দেখান হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ ১
যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ—(১) যঃ কর্মফলম্ অনাশ্রিতঃ কার্যং কর্ম করোতি সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ, ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ। অনাশ্রিতঃ—আশ্রয় না করিয়া, বাসনা না করিয়া। নিরগ্নিঃ—যে কর্মের অঙ্গীভূত বা কর্মের সাধন অগ্নি ত্যাগ করিয়াছে। অক্রিয়ঃ—সে সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়াছে। (২) হে পাণ্ডব, যং সংন্যাসমিতি প্রাহুঃ তং যোগং বিদ্ধি, হি অসংন্যস্তসংকল্পঃ কশ্চন যোগী ন ভবতি। বিদ্ধি—জানিও।

---

(১) শ্রীভগবান বলিলেন—কর্মফলের আশ্রয় না লইয়া যে ব্যক্তি বিহিত কর্ম করে সে সন্ন্যাসী—সে যোগী; যে অগ্নি এবং অন্য অন্য ক্রিয়ামাত্র ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে, সে নয়।

টিপ্পনী—অগ্নি অর্থাৎ সাধন মাত্র। যখন অগ্নির দ্বারাই হোম হইত তখন

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ॥ ৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে।
সর্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫

অসংন্যস্তসংকল্পঃ—যাহার সঙ্কল্প ন্যস্ত বা পরিত্যক্ত হয় নাই। কশ্চন—কখনও কেহ।

(৩) যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম কারণম্ উচ্যতে যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণম্ উচ্যতে। আরুরুক্ষোঃ—আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, সাধন করিতে ইচ্ছুক। কারণম্—সাধন। শমঃ—শান্তি। (৪) যদা হি ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মসু অনুষজ্যতে তদা সর্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে। অনুষজ্যতে—আসক্ত হয়। সর্বসংকল্পসংন্যাসী—সমস্ত ভোগ ও বাসনা বিষয়ক সংকল্প ত্যাগী। যোগারূঢ়ঃ—যোগে অধিষ্ঠিত। (৫) আত্মনা আত্মানম্ উদ্ধরেৎ ন তু আত্মানম অবসাদয়েৎ, আত্মা হি এব আত্মানঃ বন্ধুঃ আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ।

অগ্নির আবশ্যকতা ছিল। এই যুগে যদি মনে কর চরখাই সেবার সাধন, তবে তাহা ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

(২) হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাকেই তুমি যোগ বলিয়া জানিবে। যিনি মনের সংকল্প ত্যাগ করেন নাই, তিনি কদাপি যোগী হইতে পারেন না।

(৩) যোগ-সাধনকারীর জন্য নিষ্কাম কর্মই সাধন। উহা যাহার সাধিত হইয়াছে তাহার শান্তিই সাধন।

টিপ্পনী—যাহার আত্মশুদ্ধি হইয়াছে, যে সমত্বের সাধন করিয়াছে, তাহার আত্মদর্শন সহজ। ইহার অর্থ এমন নয় যে, যোগারূঢ়ের লোক-সংগ্রহের জন্যও কর্ম করার আবশ্যকতা থাকে না। লোক-সংগ্রহ বিনা সে বাঁচিতে পারে না অর্থাৎ সেবা-কর্ম করা তাহার স্বভাব। সে দেখাইবার জন্য কিছুই করে না। অধ্যায় ৩—৪র্থ শ্লোক, অধ্যায় ৫—২য় শ্লোক তুলনা কর।

(৪) যখন মানুষ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ও কর্মে আসক্ত হয় না ও সকল সংকল্প ত্যাগ করে তখন তাহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। (৫) আত্মাদ্বারাই মানুষ

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্য বন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

ন অবসাদয়েৎ---অধোগতি করাইবে না। (৬) যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ তস্য আত্মা আত্মনঃ বন্ধুঃ, অনাত্মনঃ তু আত্মা এব শত্রুবৎ শত্রুত্বে বর্ততে।

(৭) জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ পরমাত্মা সমাহিতঃ। জিতাত্মনঃ—যে নিজের মন জয় করিয়াছে (তাহার)। প্রশান্তস্য—যে অন্তঃকরণ শান্ত করিয়াছে (তাহার)। সমাহিতঃ—আত্মনিষ্ঠ। (৮) জ্ঞান-বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা—যাহার আত্মা জ্ঞান বিজ্ঞানে তৃপ্ত হইয়াছে। কূটস্থঃ—অবিচল। সমালোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ—লোষ্ট, অশ্ম ও কাঞ্চন—মাটি, পাথর ও সোনা যাহার নিকট সমান। (৯) সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু—সুহৃদ+মিত্র+অরি+উদাসীন+মধ্যস্থ+দ্বেষ্য+বন্ধুষু। (১০) যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ

আত্মাকে উদ্ধার করিবে, তাহার অধোগতি করিবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু ও আত্মাই আত্মার শত্রু।

(৬) তাহারই আত্মা তাহার বন্ধু যে নিজের বলে মনকে জয় করিয়াছে। যে আত্মা জয় করে নাই সে নিজের প্রতি শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে।

(৭) যে নিজের মন জয় করিয়াছে ও সম্পূর্ণ শান্ত হইয়াছে, তাহার আত্মা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ ও মান-অপমানে একই প্রকার থাকে। (৮) যে জ্ঞান অনুভবে তৃপ্ত হইয়াছে, যে অবিচল, যে ইন্দ্রিয়জয়ী, যে মাটী পাথর ও সোনা সমান দেখে—এইরূপ ঈশ্বরপরায়ণ মানুষকে যোগী বলে।

(৯) হিতৈষী, মিত্র, শত্রু, নিষ্পক্ষপাতী, মধ্যস্থ, দ্বেষকারী, বন্ধু, সাধু ও পাপী—এ সকলের সম্বন্ধে যে সমানভাব রাখে সে শ্রেষ্ঠ। (১০) চিত্ত স্থির

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২
* সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪

অপরিগ্রহঃ একাকী রহসি স্থিত যোগী আত্মানং সততং যুঞ্জীত। যতচিত্তাত্মা—যাহার মন ও আত্মা সংযত। নিরাশীঃ—আকাঙ্ক্ষাশূন্য। অপরিগ্রহঃ—পরিগ্রহ বা সঞ্চয়শূন্য। রহসি—একান্তে।

(১১—১২) শুচৌ দেশে নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ আত্মনঃ স্থিরং আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য, তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জাৎ। শুচৌ দেশে—পবিত্রস্থানে। ন অতি উচ্ছ্রিতং—বেশী উচ্চ নয়। প্রতিষ্ঠাপ্য—স্থাপন করিয়া। উপবিশ্য—বসিয়া। আত্মবিশুদ্ধয়ে—আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত। (১৩-১৪) কায়শিরোগ্রীবং সমম্ অচলম্ ধারয়ন্ স্থিরঃ (সন্) দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্ম-চারিব্রতে স্থিতঃ মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ যুক্তঃ আসীত। সংপ্রেক্ষ্য—দৃষ্টি রাখিয়া। বিগতভীঃ—ভয়শূন্য হইয়া।

করিয়া বাসনা ও সংগ্রহ ত্যাগ করিয়া একাকী একান্তে থাকিয়া যোগী নিরন্তর আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত করে।

(১১-১২) পবিত্র এবং বেশী উচু নয়, বেশী নীচুও নয় এমন স্থানে, দর্ভ, মৃগচর্ম ও বস্ত্র উপর্যুপরি রাখিয়া নিজের জন্য স্থির আসন করিয়া একাগ্র মনে বসিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ সাধন করিবে।

(১৩-১৪) কায়া, গ্রীবা ও মাথা সমরেখায় অচল রাখিয়া, স্থির থাকিয়া, এদিকে সেদিকে না দেখিয়া, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, প্রশান্ত চিত্তে ভয়রহিত হইয়া, ব্রহ্মচর্যে দৃঢ় থাকিয়া মন সংহত করিয়া ও আমাতে পরায়ণ হইয়া যোগী ধ্যান ধারণ করিতে বসিবে।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮

(১৫) এবং নিয়তমানসঃ, যোগী সদা আত্মানং যুঞ্জন্ মৎসংস্থাং নির্বাণপরমাং শান্তিং অধিগচ্ছতি। মৎসংস্থাং—আমার অধীন, আমার প্রাপ্তিতে যাহা পাওয়া যাইবে। নির্বাণপরমাং—যাহাতে নির্বাণই পরমপ্রাপ্তি। অধিগচ্ছতি—পায়। (১৬) হে অর্জুনঃ অত্যশ্নতঃ যোগঃ ন অস্তি, একান্তং অনশ্নতঃ চ ন, অতি-স্বপ্নশীলস্য চ ন, জাগ্রতঃ চ এব ন। অত্যশ্নতঃ—অতি-আহারীর। অতিস্বপ্নশীলস্য—অতি নিদ্রালু ব্যক্তির। (১৭) যুক্তাহারবিহারস্য, কর্মসু যুক্তচেষ্টস্য, যুক্তস্বপ্নাববোধস্য, যোগঃ দুঃখহা ভবতি। দুঃখহা—দুঃখনাশকারী। (১৮) যদা বিনয়তং চিত্তং আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, সর্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ তদা যুক্তঃ ইতি উচ্যতে। বিনিয়তং—বিশেষরূপে নিয়মাধীন। অবতিষ্ঠতে—নিশ্চল থাকে।

টিপ্পনী—নাসিকাগ্র মানে দুই ভ্রূর মধ্যস্থ স্থান। অধ্যায় ৫—২৭ শ্লোক দেখ। ব্রহ্মচারী-ব্রত মানে কেবল বীর্য-সংগ্রহ নয়, পরন্তু ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য আবশ্যকীয় অহিংসাদি সমস্ত ব্রত।

(১৫) এই প্রকারে যাহার মন নিয়মের ভিতর আছে এমন যোগী পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধন করে ও আমার প্রাপ্তিতে প্রাপ্তব্য মোক্ষরূপ পরম শান্তি পায়। (১৬) হে অর্জুন, এই সমত্বরূপ যোগ অতি-আহারী পায় না, তেমনি উহা অতি-উপবাসী, অত্যন্ত নিদ্রালু বা অত্যন্ত জাগরণশীলের মিলে না। (১৭) যে ব্যক্তি আহার-বিহারে, অন্য কর্মে, নিদ্রা-জাগরণে পরিমিত, তাহার যোগ দুঃখ-ভঞ্জনকারী হয়। (১৮) প্রকৃষ্টরূপ নিয়মাধীন মন যখন আত্মা সম্বন্ধে স্থির থাকে, যখন মনুষ্য কামনা মাত্রেই নিস্পৃহ হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে যোগী বলে।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩

(১৯) যতচিত্তস্য আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যোগিনঃ নিবাতস্থঃ দীপঃ যথা ন ইঙ্গতে সা উপমা স্মৃতা। যতচিত্তস্য—স্থিরচিত্ত (ব্যক্তির)। আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ—আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ সাধন করিতে যত্নশীল। (২০) যোগ-সেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তং যত্র উপরমতে, যত্র চ আত্মানম্ আত্মনা পশ্যন্ আত্মনি এব তুষ্যতি। (২১) যত্র বুদ্ধিঃ অতীন্দ্রিয়ম্ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ আত্যন্তিকং যৎ সুখং তৎ বেত্তি, চ (যত্র) স্থিতঃ এব অয়ং তত্ত্বতঃ ন চলতি। (২২) যং লব্ধ্বা অপরং লাভং ততঃ অধিকং ন মন্যতে, যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা অপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে। (২৩) তৎ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগ-সংজ্ঞিতম্ বিদ্যাৎ। অনির্বিণ্ণ-চেতসা সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ। উপরমতে—বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়,

(১৯) যে স্থিরচিত্ত যোগী আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত করিতে প্রযত্নশীল, তাহার স্থিতি বায়ু-রহিত স্থানে নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় বলা যায়।

(২০-২১-২২-২৩) যোগাভ্যাস দ্বারা বশীভূত মনে যে শান্তি পায়, আত্মা দ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দেখিয়া যে সন্তোষ পায় এবং ইন্দ্রিয়াতীত অথচ বুদ্ধিগ্রাহ্য অনন্ত সুখের অনুভব যে পায়, যেখানে অবস্থিত হইয়া মানুষ মূল বস্তু হইতে বিচলিত হয় না, আর যাহা পাইয়া তদপেক্ষা কোনো লাভও অধিক মনে করে না এবং যাহাতে স্থির থাকিয়া মহা দুঃখেও সে বিচলিত হয় না, সেই দুঃখ-সঙ্গ-রহিত স্থিতির নাম যোগীর স্থিতি জানিবে। এই যোগ শিথিলতা ত্যাগ করিয়া দৃঢ়তাপূর্বক সাধন করিতে হয়।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যের বশং নয়েৎ ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

শান্তি পায়। অতীন্দ্রিয়ম্—ইন্দ্রিয়াতীত। তত্ত্বতঃ—আত্মস্বরূপ হইতে, মূলবস্তু হইতে। অনির্বিণ্নচেতসা—নির্বেদ রহিত চিত্তে, (নির্বেদ—প্রযত্ন-শিথিলতা) শিথিলতা ত্যাগ করিয়া।

(২৪-২৫) সংকল্পপ্রভবান্ সর্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা, মনসা এব ইন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ বিনিয়ম্য, ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ। মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ। সমন্ততঃ—সকল দিক হইতে। বিনিয়ম্য—ভাল করিয়া সংযত করিয়া। ধৃতিগৃহীতয়া—ধৈর্যযুক্ত, অচল। উপরমেৎ—শান্ত হইবে। আত্মসংস্থং—আত্মাতে নিবিষ্ট। (২৬) যতঃ যতঃ চঞ্চলং অস্থিরং মনঃ নিশ্চরতি ততস্ততঃ নিয়ম্য এতৎ আত্মনি এব বশং নয়েৎ। নিশ্চরতি—চলিয়া যায়, পালায়। (২৭) প্রশান্তমনসং শান্তরজসং ব্রহ্মভূতং অকল্মষম্ এনং যোগিনম্ উত্তমম্ সুখম্ উপৈতি হি। শান্তরজসং—যাহার রজঃ (এবং তমঃ) গুণ শান্ত হইয়াছে, যাহার বিকারের উপশম হইয়াছে। অকল্মষম্—নিষ্পাপ।

(২৪-২৫) সংকল্প হইতে উৎপন্ন সকল কামনা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সকল দিক হইতে ভাল করিয়া নিয়মাধীনে আনিয়া, স্থির বুদ্ধির দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে শান্ত হয় ও মনকে আত্মাতে নিবিষ্ট করিয়া অন্য কিছুই ভাবনা করে না।

(২৬) যেখানে যেখানে চঞ্চল ও অস্থির মন পলায়ন করে, সেই সেই স্থান হইতে (যোগী) তাহাকে সংযত করিয়া নিজের বশে আনে। (২৭) যাহার মন সব রকমে শান্ত হইয়াছে, যাহার বিকারের উপশম হইয়াছে, এই প্রকার ব্রহ্মময় নিষ্পাপ যোগী অবশ্যই উত্তম সুখ পায়।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮।
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

(২৮) এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষঃ যোগী সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে। আত্মানং যুঞ্জন্—আত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া। (২৯) যোগ-যুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ আত্মানং সর্বভূতস্থং ঈক্ষতে, সর্বভূতানি চ আত্মনি (ঈক্ষতে)। ঈক্ষতে—দেখে। (৩০) যঃ সর্বত্র মাং পশ্যতি, ময়ি চ সর্বং পশ্যতি তস্য অহং ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি। ন প্রণশ্যামি—দৃষ্টির বহির্ভূত হই না। (৩১) একত্বম্ আস্থিতঃ যঃ সর্বভূতস্থিতং মাং ভজতি স যোগী সর্বথাবর্তমানঃ অপি ময়ি বর্ততে। একত্বম্ আস্থিতঃ—(ঈশ্বরের সহিত) একত্বে স্থিত হইয়া, ঈশ্বরে লীন হইয়া। (৩২) হে অর্জুন, যঃ সর্বত্র আত্মৌপম্যেন

(২৮) আত্মার সহিত নিরন্তর যুক্ত হইয়া, পাপ-রহিত হইয়া এই যোগী সহজেই ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ অনন্ত সুখ অনুভব করে। (২৯) সকল সমত্ব-প্রাপ্ত যোগী নিজেকে ভূতমাত্রে ও ভূতমাত্রকে নিজের মধ্যে দেখে।

(৩০) যে আমাকে সর্বত্র দেখে ও সকলকে আমাতেই দেখিতে পায়, সে আমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দূর হয় না এবং আমিও তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হই না। (৩১) আমাতে লীন হইয়া যে যোগী ভূতমাত্রে অবস্থিত আমার ভজনা করে, সে যেমন ইচ্ছা বর্তমান থাকিলেও আমাতেই থাকে।

টিপ্পনী—'নিজ' যে পর্যন্ত আছে, সে পর্যন্ত তো পরমাত্মাও পর। যখন 'নিজ' শেষ হয়—শূন্য হয়, তখনি মানুষ এক পরমাত্মাকে সর্বত্র দেখিতে পায়। অধ্যায়—১৩—২৩ শ্লোকের টীকা দেখ।

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং পশ্যতি স যোগী পরমো মতঃ। আত্মৌপম্যেন—নিজের মত। সর্বথা—সর্বত্র, যেখানে সেখানে।

অর্জুন উবাচ—(৩৩) হে মধুসূদন, অয়ং যঃ যোগঃ ত্বয়া সাম্যেন প্রোক্তঃ চঞ্চলত্বাৎ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং ন পশ্যামি। সাম্যেন—সমত্ব প্রাপ্তির। চঞ্চলত্বাৎ—(মনের) চঞ্চলতাবশতঃ। স্থিরাং স্থিতিম্—স্থিরতা। (৩৪) হে কৃষ্ণ, মনঃ হি চঞ্চলং প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্, অহং তস্য নিগ্রহং বায়োরিব সুদুষ্করং মন্যে।

শ্রীভগবানুবাচ—(৩৫) হে মহাবাহো, মনঃ অসংশয়ং দুর্নিগ্রহং চলম্ তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে—নিগৃহীত, বশীভূত করা যায়।

(৩২) হে অর্জুন, যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় সকলকে দেখে এবং সুখ ও দুঃখ উভয়কেই সমান বলিয়া জানে সেই যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

অর্জুন বলিলেন—(৩৩) হে মধুসূদন, এই (সমত্বরূপী) যোগ যাহা তুমি বলিলে মনের চঞ্চলতার জন্য আমি তাহার স্থিরতা দেখিতে পাইতেছি না। (৩৪) হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল। মনুষ্যকে জোর করিয়া ফেলিয়া দেয়। উহা অত্যন্ত বলবান্। যেমন বায়ুকে দাবাইয়া রাখা খুব কঠিন, তেমনি মনকে বশ করাও কঠিন কাজ বলিয়া মনে করি।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(৩৫) হে মহাবাহো! এ কথা সত্য যে মন চঞ্চল বলিয়া উহাকে বশ করা কঠিন। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

(৩৬) অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ বশ্যাত্মনা যততা তু উপায়তঃ অবাপ্তুম্ শক্যঃ। যততঃ—যত্নশীল। উপায়তঃ—উপায় দ্বারা।

অর্জুন উবাচ—(৩৭) হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধয়া উপেতঃ অযতিঃ যোগাৎ চলিতমানসঃ যোগসংসিদ্ধিম্ অবাপ্য, কাং গতিং গচ্ছতি? (৩৮) হে মহাবাহো, অপ্রতিষ্ঠঃ ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ ছিন্নাভ্রমিব উভয়বিভ্রষ্টঃ ন নশ্যতি কচ্চিৎ? অপ্রতিষ্ঠঃ—যোগভ্রষ্ট। বিমূঢ়ঃ—মোহগ্রস্ত, ভ্রান্ত। ছিন্নাভ্রমিব—ছিন্ন অভ্র, মেঘের ন্যায়। (৩৯) হে কৃষ্ণ, মে এতৎ সংশয়ং অশেষতঃ ছেত্তুম্ অর্হসি। হি অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ত্বদন্যঃ ন উপপদ্যতে। ছেত্তুম্—অপনয়ন করিতে, দূর করিতে। উপপদ্যতে—হয়।

শ্রীভগবানুবাচ। (৪০) হে পার্থ, তস্য বিনাশঃ এব ন ইহ ন অমুত্র বিদ্যতে

(৩৬) যাহার মন নিজের বশে নাই তাহার পক্ষে যোগসাধন খুব কঠিন—ইহাই আমার মত। কিন্তু যাহার মন নিজের বশে আছে ও যে প্রযত্নশীল সে বিহিত উপায় দ্বারা উহা সাধন করিতে পারে।

অর্জুন বলিলেন—(৩৭) হে কৃষ্ণ, যে যত্নশীল থাকিয়া চেষ্টা কম করার জন্য যোগভ্রষ্ট হয়, সে সফলতা না পাইলেও কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়? (৩৮) হে মহাবাহো, যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মমার্গ ভুলিয়া গেলে, খণ্ড মেঘের মত উভয় ভ্রষ্ট হইয়া সে নাশ পায় না তো? (৩৯) হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় তুমিই দূর করিবার যোগ্য, তোমাকে ছাড়া আর কাহারও দ্বারা এই সংশয় দূর হইবার নয়।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

হি হে তাত, কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি। (৪১) যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য, শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা, শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে। শাশ্বতী সমাঃ—দীর্ঘকাল। সমা—সংবৎসর। উষিত্বা—বাস করিয়া। (৪২) অথবা ধীমতাং যোগিনামেব কুলে ভবতি, ঈদৃশঃ যৎ জন্ম এতৎ হি লোকে দুর্লভতরং। (৪৩) হে কুরুনন্দন, তত্র তং পৌর্বদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং লভতে। ততঃ চ ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ যততে। পৌর্বদেহিকং—পূর্ব দেহের, পূর্বজন্মের। বুদ্ধিসংযোগং—বুদ্ধি সংস্কার, ব্রহ্ম বিষয়ে বুদ্ধি।

(৪৪) সঃ অবশঃ অপি তেন এব পূর্বাভ্যাসেন হ্রিয়তে। যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি শব্দব্রহ্ম অতিবর্ততে। হ্রিয়তে—আকৃষ্ট হয়। (৪৫) প্রযত্নাৎ তু যতমানঃ

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(৪০) হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে এইপ্রকার লোকের কখনই নাশ হয় না। হে তাত! কল্যাণ-মার্গে যে চলিয়াছে, কখনও তাহার দুর্গতি হয় না।

(৪১) পুণ্যশালী লোকে যে স্থান পায় তাহাই পাইয়া সেখানে দীর্ঘকাল থাকিয়া যোগভ্রষ্ট মানুষ পবিত্র ও সাধনশীলের গৃহে জন্ম নেয়। (৪২) অথবা জ্ঞানবান্ যোগীর কুলেই সে জন্ম গ্রহণ করে। সংসারে এই প্রকার জন্ম অবশ্য খুবই দুর্লভ। (৪৩) হে কুরুনন্দন, সেখানে সে তাহার পূর্বজন্মের বুদ্ধি-সংস্কার প্রাপ্ত হয় এবং তথা হইতে মোক্ষের জন্য আরও অগ্রসর হয়।

(৪৪) সেই পূর্ব অভ্যাসের জন্য সে অবশ্যই যোগের দিকে আকৃষ্ট হয়।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

সংশুদ্ধকিল্বিষঃ যোগী অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততঃ পরাং গতিং যাতি। প্রযত্নাৎ—অধিক উৎসাহের সহিত। যতমানঃ—সচেষ্ট। (৪৬) যোগী তপস্বিভ্যঃ অপি অধিকঃ, জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ, কর্মিভ্যশ্চ অধিকঃ মতঃ, তস্মাৎ হে অর্জুন, ত্বং যোগী ভব। অধিকঃ—শ্রেষ্ঠ। (৪৭) সর্বেষাং যোগিনাম্ অপি যঃ মদ্গতেন অন্তরাত্মনা শ্রদ্ধাবান্ মাং ভজতে সঃ মে যুক্ততমঃ মতঃ।

যোগের জিজ্ঞাসু হইলেই সকাম বৈদিক কর্মকারীদিগের অবস্থা সে উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়। (৪৫) আরও উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিলে যোগী পাপমুক্ত হইয়া অনেক জন্মে বিশুদ্ধ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। (৪৬) তপস্বী অপেক্ষা যোগী অধিক শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী অপেক্ষা তাহাকে অধিক শ্রেষ্ঠ বলা যায়; তেমনি কর্মকাণ্ডী অপেক্ষাও সে অধিক শ্রেষ্ঠ। এই হেতু হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।

টিপ্পনী—এখানে তপস্বীর তপস্যা ফলেচ্ছাযুক্ত, জ্ঞানী মানে অনুভবজ্ঞানী নয়।

(৪৭) সমস্ত যোগীর মধ্যেও যে আমাতে মন যুক্ত করিয়া আমাকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভজন করে, তাহাকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া জানি।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যান-যোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ

এই অধ্যায়ে ঈশ্বর-তত্ত্ব ও ঈশ্বর-ভক্তি কি তাহা বুঝান আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪

শ্রীভগবান্ উবাচ—(১) হে পার্থ, ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয়ঃ যোগং যুঞ্জন্ অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু। মদাশ্রয়ঃ—আমাকে আশ্রয় করিয়া। যুঞ্জন্—অভ্যাস করিয়া। (২) সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানম্ অহং তে অশেষতঃ বক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে। সবিজ্ঞানম্—বিজ্ঞান বা অনুভব যুক্ত জ্ঞান। অশেষতঃ—পূর্ণরূপে। ভূয়ঃ—পুনরায়। (৩) মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি। যততাং সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি। (৪) ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খং মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ এব চ ইতি ভিন্না মে প্রকৃতিঃ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(১) হে পার্থ, আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া ও আমার আশ্রয় লইয়া নিশ্চয়পূর্বক ও সম্পূর্ণরূপে আমাকে কেমন করিয়া জানিবে তাহা শোন। (২) অনুভবযুক্ত এই জ্ঞান আমি তোমাকে পূর্ণরূপে বলিতেছি। ইহা জানিলে ইহলোকে আর জানার কিছু বাকী থাকে না। (৩) হাজার হাজার লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করে। প্রযত্নকারী সিদ্ধদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ আমাকে প্রকৃত স্বরূপে জানে। (৪) পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি।

টিপ্পনী—এই আট তত্ত্ব-যুক্ত স্বরূপ—ক্ষেত্র বা ক্ষর পুরুষ। (অধ্যায় ১৩—শ্লোক ৫, অধ্যায় ১৫—শ্লোক ১৬ দেখ।)

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯

(৫) হে মহাবাহো, ইয়ং তু অপরা, ইতঃ অন্যাং জীবভূতাং মে পরাং প্রকৃতিং বিদ্ধি, যয়া ইদং জগৎ ধার্যতে। অপরা—নিকৃষ্ট। পরা—প্রকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ। (৬) সর্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি ইতি উপধারয়, অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ। এতদ্‌যোনীনি—এই উভয় প্রকৃতি হইতে জাত। উপধারয়—জানিও। কৃৎস্ন—সকল। (৭) হে ধনঞ্জয়, মত্তঃ পরতরং অন্যৎ কিঞ্চিৎ নাস্তি, সূত্রে মণিগণাঃ ইব ময়ি ইদং সর্বং প্রোতম্। পরতরং—শ্রেষ্ঠ। প্রোতং—গ্রথিত। (৮) হে কৌন্তেয়, অহং অপ্সু রসঃ, শশিসূর্যয়োঃ প্রভা, সর্ববেদেষু প্রণবঃ, খে শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম্ অস্মি। প্রণবঃ—ওঙ্কার। খে—আকাশে। নৃষু—পুরুষের মধ্যে। (৯) পৃথিব্যাং চ পুণ্যঃ গন্ধঃ বিভাবসৌ চ তেজঃ অস্মি, সর্বভূতেষু জীবনং তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি। পৃথিব্যাং পুণ্যঃ গন্ধঃ—পৃথিবীর সুগন্ধ।

(৫) ইহাকে অপরা প্রকৃতি বলে। ইহা হইতে উচ্চ পরা-প্রকৃতি, উহা জীবরূপ। হে মহাবাহো, এই জগৎ উহার আশ্রয়ে চলিতেছে। (৬) সমস্ত ভূত এই দুই প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা জানিও। সুতরাং আমিই সারা জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ। (৭) হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা উচ্চ আর কিছু নাই। যেমন সূত্রে মণিগণ গাঁথা থাকে তেমনি এই সকল আমাতে গ্রথিত। (৮) হে কৌন্তেয়, জলে আমিই রস, সূর্য চন্দ্রে আমিই তেজ, সর্ববেদে আমিই ওঙ্কার, আকাশে আমিই শব্দ ও আমিই পুরুষের পরাক্রম।

(৯) পৃথিবীতে আমিই সুগন্ধ, অগ্নিতে আমিই তেজ, প্রাণীমাত্রে আমিই

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪

বিভাবসৌ—আগুনে। (১০) হে পার্থ, মাং সর্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি। (অহং) বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ অস্মি, অহং তেজস্বিনাং তেজঃ (অস্মি)। সনাতনং—আদিকাল হইতে বর্তমান। বীজ—সজাতীয় কার্যোৎপাদনসমর্থ দ্রব্য। (১১) (অহং) বলবতাং কামরাগবিবর্জিতং বলং, হে ভরতর্ষভ, ভূতেষু (অহং) ধর্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ অস্মি। (১২) যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ যে রাজসাঃ (যে) চ তামসাঃ তান্ মত্তঃ এব বিদ্ধি, অহং তেষু ন, তে তু ময়ি।

(১৩) এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ ইদং সর্বং জগৎ মোহিতং, এভ্যঃ পরং অব্যয়ম্ মাম্ ন অভিজানাতি। (১৪) এষা গুণময়ী মম দৈবী মায়া

জীবন, তপস্বীর আমি তপ। (১০) হে পার্থ, সকল জীবের সনাতন বলিয়া আমাকে জানিও। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি আমি, তেজস্বীর তেজ আমি। (১১) বলবানের কাম ও রাগবর্জিত বল আমি এবং হে ভরতর্ষভ, প্রাণীদের মধ্যে ধর্মের অবিরোধী কাম আমিই। (১২) যে যে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আছে তাহা আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে। কিন্তু আমি তাহাতে আছি এমন নয়, তাহারাই আমাতে আছে।

টিপ্পনী—এই ভাবের উপর পরমাত্মা নির্ভর করেন না, কিন্তু এই ভাব তাঁহার উপর নির্ভর করে, তাঁহার আশ্রয়ে আছে এবং তাঁহার বশে আছে।

(১৩) এই ত্রিগুণময় ভাব দ্বারা সকল জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই জন্য উহা হইতে উচ্চ ও ভিন্ন আমাকে—অবিনাশী আমাকে, উহা জানে না।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯

হি দুরত্যয়া; যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে তে এতাং মায়াং তরন্তি। দুরত্যয়া—দুরতিক্রমণীয়, দুস্তর। প্রপদ্যন্তে—ভজনা করে। (১৫) দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে। (তে) আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ। (১৬) হে ভরতর্ষভ, হে অর্জুন, চতুর্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে (তে) আর্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী চ।

(১৭) তেষাং নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে, অহং হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ, স চ মম প্রিয়ঃ। বিশিষ্যতে—শ্রেষ্ঠ। (১৮) এবে সর্বে এব উদারাঃ জ্ঞানী তু মে আত্মা এব মতম্। হি যুক্তাত্মা সঃ অনুত্তমাং গতিং মামেব আস্থিতঃ। (১৯). বহূনাং জন্মনাং অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, বাসুদেবঃ সর্বম্

(১৪) আমার এই ত্রিগুণময় দৈবীমায়া উত্তীর্ণ হওয়া মুশকিল। কিন্তু যাহারা আমার শরণ লয় তাহারা এই মায়া উত্তীর্ণ হয়। (১৫) দুরাচারী, মূঢ়, অধম মনুষ্য আমার শরণ লয় না। তাহারা আসুরী ভাবযুক্ত। মায়া দ্বারা তাহাদের জ্ঞান অপহৃত। (১৬) হে অর্জুন, চারি প্রকার সদাচারী মনুষ্য আমাকে ভজনা করে—দুঃখী, জিজ্ঞাসু, কিছু পাইতে ইচ্ছুক এবং জ্ঞানী।

(১৭) তাহাদের মধ্যে যে নিত্য সমভাবী একের ভজনকারী সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানী আমার প্রিয়। (১৮) ইহারা সকলেই উত্তম ভক্ত, কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মতুল্য, এই আমার মত—যেহেতু আমাকে পাওয়া ছাড়া আর উচ্চতর গতি কিছু নাই, ইহা জানিয়া সেই যোগী

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

ইতি (যঃ জানাতি) স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। (২০) তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ তং তং নিয়মম্ আস্থায় অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে। তৈঃ তৈঃ -- সেই সেই; পুত্রবিত্তাদি বিষয়ের (কামনা দ্বারা)। আস্থায়—স্বীকার করিয়া, আশ্রয় করিয়া। (২১) যঃ যঃ ভক্তঃ যাং যাং তনুং শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি তস্য তস্য তামেব শ্রদ্ধাং অহং অচলাং বিদধামি। তনুং—স্বরূপ, মূর্তি। বিদধামি—করি।

(২২) তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স তস্যাঃ আরাধনম্ ঈহতে চ ততঃ ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লভতে। ঈহতে—করে। (২৩) তেষাম্ অল্পমেধসাম্ তৎ ফলং তু অন্তবৎ ভবতি। দেবযজঃ দেবান্ যান্তি মদ্ভক্তাঃ অপি মাং যান্তি। অল্পমেধসাম্ —অল্প বুদ্ধি। অন্তবৎ—বিনাশী। দেবযজঃ—দেবতা যজনকারী। (২৪) মম আমারই আশ্রয় লয়। (১৯) অনেক জন্মের পর জ্ঞানী আমাকে পায়। সকলই বাসুদেবময় এই প্রকার যে জানে এইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

(২০) নানা প্রকার কামনা দ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এমন লোকেরা নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিধির আশ্রয় লইয়া অন্য দেবতার ভজনা করিয়া থাকে। (২১) যে ব্যক্তি যে দেবতারই ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করিতে ইচ্ছা করে সেইরূপ লোকের শ্রদ্ধা আমি দৃঢ় করি।

(২২) শ্রদ্ধাপূর্বক দেবতার আরাধনা করিয়া ভক্ত তাহার নিকট হইতে কাম্যবস্তু লাভ করিয়া থাকে। সেই সকল আমাকর্তৃকই বিহিত (কেননা সকল দেবতা আমারই অঙ্গস্বরূপ)। (২৩) সেই অল্প-বুদ্ধি লোক সকল যে ফল পায় তাহা নাশবান্। দেবতা-ভজনকারী ব্যক্তি দেবলোক পায়, আমাকে ভজনকারী আমাকে পায়। (২৪) আমার পরম, অবিনাশী ও অনুপম স্বরূপ

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥ ২৯

অব্যয়ম্ অনুত্তমম্ পরং ভাবম্ অজানন্তঃ অবুদ্ধয়ঃ অব্যক্তং মাম্ ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যন্তে। ব্যক্তিম্ আপন্নং—মূর্তিপ্রাপ্ত, ইন্দ্রিয়গম্য। (২৫) যোগমায়াসমাবৃতঃ অহং সর্বস্য ন প্রকাশঃ, মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ অজং অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি।

(২৬) হে অর্জুন, অহং সমতীতানি বর্তমানানি ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদ। মাং তু কশ্চন ন বেদ। (২৭) হে ভারত, হে পরন্তপ, ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন সর্বভূতানি সর্গে সম্মোহং যান্তি। (২৮) যেষাং পুণ্যকর্মণাম্ জনানাং তু পাপং অন্তগতং, তে দ্বন্দ্ব-মোহনির্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ মাং ভজন্তে। (২৯) মাম্ আশ্রিত্য জরামরণমোক্ষায় যে যতন্তি তে তৎ ব্রহ্ম, কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্, অখিলং কর্ম চ বিদুঃ।

না জানিয়া বুদ্ধিহীন লোকেরা ইন্দ্রিয়াতীত আমাকে ইন্দ্রিয়গম্য মনে করে। (২৫) আমার যোগমায়ায় আবৃত আমি সকলের নিকট প্রকট নহি। এই মূঢ় জগৎ জন্ম মরণ রহিত আমাকে ভালরূপে জানে না।

(২৬) হে অর্জুন, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সমস্ত পদার্থ আমি জানি, কিন্তু আমাকে কেহ জানে না। (২৭) হে ভারত, হে পরন্তপ! ইচ্ছা-দ্বেষ-উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের মোহে পড়িয়া প্রাণিমাত্র এই জগতে মোহিত হইয়া থাকে। (২৮) কিন্তু যে সব সদাচারী লোকের পাপের অন্ত হইয়াছে ও যাহারা দ্বন্দ্ব মোহ হইতে মুক্তি পাইয়াছে সেই দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিরা আমার ভজনা করে। (২৯) যাহারা আমার আশ্রয় লইয়া জরা ও মরণ হইতে মুক্ত হওয়ার উদ্যোগ করে, তাহারা পূর্ণব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও অখিল কর্মকে জানে।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

(৩০) যে চ সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং মাং বিদুঃ, তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালে অপি চ মাং বিদুঃ।

টিপ্পনী—জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি ধারণ করিয়াও অলিপ্ত হওয়ায় পরমাত্মার অদৃশ্য থাকার যে ভাব তাহাই তাঁহার যোগমায়া।

(৩০) যাহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানে, তাহারা সমত্ব পাইয়া মরণ সময়েও আমাকে দেখিতে পায়।

টিপ্পনী—অধিভূতাদির অর্থ অষ্টম অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, এই সংসারে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং সমস্ত কর্মের কর্তা ও ভোক্তা তিনিই—একথা জানিয়া মৃত্যু সময়ে শান্ত হইয়া ঈশ্বরেই যে তন্ময় থাকে ও ঐ সময় কোনও বাসনা যাহার হয় না সে-ই ঈশ্বরকে জানিয়াছে, আর সে-ই মোক্ষ পাইয়াছে।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষর ব্রহ্ম-যোগ

এই অধ্যায়ে ঈশ্বর-তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝান হইয়াছে।

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

অর্জুন উবাচ—(১) হে পুরুষোত্তম তৎ ব্রহ্ম কিং? অধ্যাত্মম্ কিম্? কর্ম কিম্? কিং অধিভূতং প্রোক্তম্? কিং চ অধিদৈবং উচ্যতে?

অর্জুন বলিলেন—(১)—হে পুরুষোত্তম এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে? অধিদৈব কাহাকে বলা হয়?

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪

(২) হে মধুসূদন, অস্মিন্ দেহে অধিযজ্ঞঃ কঃ? অত্র কথং? নিয়তাত্মভিঃ প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি?

শ্রীভগবান্ উবাচ—(৩) পরমং অক্ষরং ব্রহ্ম, স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে, ভূত-ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ। স্বভাবঃ—আত্মার ভাব। বিসর্গঃ—সৃষ্টি।

(৪) অধিভূতম্ ক্ষরঃ ভাবঃ, পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্। হে দেহভৃতাং বর, অত্র দেহে অহমেব অধিযজ্ঞঃ। অধিভূতম্—প্রাণিগণের ভোগের জন্য যাহা উৎপন্ন হয়। ক্ষরঃ—নাশবস্তু। পুরুষঃ—পুরে যে বাস করে। অধিযজ্ঞঃ—সকল যজ্ঞের উপর যিনি কর্তা তিনি, বিষ্ণু। দেহদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে এই জন্য যজ্ঞ দেহে থাকে, অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে সুতরাং

(২) হে মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কি এবং কেমন ভাবে আছে ও সংযমী পুরুষ তাহাকে মরণসময়ে কেমন করিয়া জানিতে পারে?

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(৩) যিনি সর্বোত্তম, অবিনাশী তিনি ব্রহ্ম, প্রাণি-মাত্রের স্বসত্তায় যিনি থাকেন তিনি অধ্যাত্ম ও প্রাণিমাত্র উৎপন্ন করার যে সৃষ্টি-ব্যাপার উহাকেই কর্ম বলে।

(৪) অধিভূত আমার নাশবন্ত স্বরূপ, অধিদৈবত উহাতে নিবাসী আমার জীবস্বরূপ এবং হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, অধিযজ্ঞ এই দেহে স্থিত ও যজ্ঞদ্বারা শুদ্ধ জীবস্বরূপ।

টিপ্পনী—অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নাশবন্ত দৃশ্য পদার্থ মাত্র পরমাত্মাই বটে ও সমস্তই তাঁহার কৃতি। তাহা হইলে মানুষ নিজের কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার দাসরূপে সকলই কেন তাঁহাকে সমর্পণ করিবে না?

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্-
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্-
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯

যজ্ঞাভিমানী দেবতাও দেহে থাকেন। (৫) অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি। (৬) হে কৌন্তেয়, সদা তদ্ভাবভাবিতঃ যং যং বাপি ভাবং স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি অন্তে তম্ তম্ এব এতি (৭) তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ, ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ অসংশয়ং মাম্ এব এষ্যসি। এষ্যসি—পাইবে।

(৮) হে পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা অনুচিন্তয়ন্ দিব্যং পরমং পুরুষং যাতি। অনুচিন্তয়ন্—একধ্যানী থাকিয়া। (৯-১০) যঃ প্রয়াণকালে অচলেন মনসা ভক্ত্যা যুক্তঃ যোগবলেন চ ভ্রুবোঃ মধ্যে সম্যক্ এব প্রাণম্ আবেশ্য,

---

(৫) অন্তকালে আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করে সে আমারই ভাব পায়, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

(৬) হে কৌন্তেয়, প্রতিদিন মানুষ যে স্বরূপের ধ্যান করে মরণকালেও যদি তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে তবে সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। (৭) এই জন্য তুমি সর্বদা আমার স্মরণ কর ও যুদ্ধ করিতে থাক। এইরূপে আমাতে মন ও বুদ্ধি ন্যস্ত করিলে আমাকে অবশ্যই পাইবে।

(৮) হে পার্থ, অভ্যাস দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া উহাকে অন্য কোথাও দৌড়াইতে না দিয়া যে ব্যক্তি একধ্যানী হইয়া থাকে, সে দিব্য পরম পুরুষ প্রাপ্ত হয়।

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১
সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

কবিং, পুরাণং, অনুশাসিতারং অণোঃ অণীয়াংসম্, সর্বস্য ধাতারম্, অচিন্ত্যরূপম্, আদিত্যবর্ণং, তমসঃ পরস্তাৎ অনুস্মরেৎ স তং পরং দিব্যং পুরুষম্ উপৈতি। প্রয়াণকালে—মৃত্যুকালে। কবিং—সর্বজ্ঞ। অনুশাসিতা—নিয়ন্তা। অণোঃ অণীয়াংসম্—সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। ধাতা—পালনকারী।

(১১) বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি বীতরাগাঃ যতয়ঃ যৎ বিশন্তি, যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। বীতরাগাঃ—যাহার 'রাগ' নষ্ট হইয়াছে, জ্ঞানপ্রাপ্ত। পদং—গন্তব্যস্থান। সংগ্রহেণ—সংক্ষেপে। (১২-১৩) সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ মূর্ধ্নি আত্মনঃ প্রাণম্ আধায় যোগধারণাম্

(৯-১০) যে ব্যক্তি মরণকালে অবিচল চিত্তে ভক্তিমান্ হইয়া যোগবলে ভ্রূযুগলের মধ্যে উত্তমরূপে প্রাণকে স্থাপিত করিয়া সর্বজ্ঞ, পুরাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্মতম, সকলের পালনকারী, অচিন্ত্য, সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, অজ্ঞানরূপী অন্ধকারের অতীত স্বরূপকে ঠিক স্মরণ করে সে দিব্য পুরুষকে পায়।

(১১) যাঁহাকে বেদজ্ঞেরা অক্ষর নামে বর্ণন করে, যাঁহাতে বীতরাগী মুনিরা প্রবেশ করে ও যাঁহাকে পাওয়ার ইচ্ছায় মানুষ ব্রহ্মচর্য পালন করে, সেই পদের কথা সংক্ষেপে আমি তোমাকে বলিব। (১২-১৩) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার সংযত করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া, ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে ধারণ করিয়া, সমাধিস্থ হইয়া

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬
সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭

আস্থিতঃ, ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্ যঃ প্রযাতি সঃ পরমাং গতিং যাতি। ব্যাহরন্—উচ্চারণ করিতে করিতে। (১৪) হে পার্থ, অনন্যচেতাঃ যঃ মাং নিত্যশঃ সততং স্মরতি তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ।

(১৫) মাম্ উপেত্য পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ মহাত্মানঃ দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্ পুনর্জন্ম ন আপ্নুবন্তি। (১৬) হে অর্জুন, আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ, হে কৌন্তেয়, মাম্ উপেত্য তু পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। (১৭) সহস্রযুগপর্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ যুগ-সহস্রান্তাং রাত্রিং (চ যে) বিদুঃ তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ।

ওঁ এই একাক্ষর-ব্রহ্ম উচ্চারণ পূর্বক ও আমার চিন্তন করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। (১৪) হে পার্থ অনন্যচিত্ত হইয়া যে নিত্য ও নিরন্তর আমাকেই স্মরণ করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগী আমাকে সহজেই পায়।

(১৫) আমাকে পাইয়া পরমগতিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ দুঃখের আলয়স্বরূপ এই অনিত্য পুনর্জন্ম পায় না। (১৬) ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোক হইতে মানুষ পুনঃ পুনঃ আসিয়া থাকে। পরন্তু আমাকে পাইয়া মানুষের পুনরায় জন্ম হয় না। (১৭) হাজার যুগ পর্যন্ত ব্রহ্মার একদিন, আর হাজার যুগ পর্যন্ত ব্রহ্মার একরাত্রি—ইহা যাহারা জানে তাহারাই রাত্রি-দিবস জানে।

টিপ্পনী—তাৎপর্য এই যে, আমাদের ২৪ ঘণ্টার রাত-দিন অনন্ত কালচক্রের তুলনায় এক মুহূর্ত অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। ইহার কোন মূল্যই নাই। সেইজন্য ঐ সময়ে প্রাপ্ত ভোগ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক—এইরূপ বুঝিয়া সে বিষয়ে উদাসীন থাকা উচিত এবং যেটুকু সময় পাওয়া যায় তাহা ভগবদ্ভক্তিতে ও সেবাকার্যে লাগাইয়া সার্থক করা উচিত। আর আজই যদি আত্মার দর্শন না হয় তবে ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করা চাই।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২

(১৮) অহরাগমে সর্বাঃ ব্যক্তয়ঃ অব্যক্তাৎ প্রভবন্তি রাত্র্যাগমে তত্রৈব অব্যক্তসংজ্ঞকে প্রলীয়ন্তে। (১৯) হে পার্থ, সঃ এব অয়ং ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা অবশঃ (সন্) রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে অহরাগমে প্রভবতি। (২০) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ তু অন্যঃ যঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ ভাবঃ সঃ সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু অপি ন বিনশ্যতি। (২১) অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তিঃ, তং পরমাং গতিং আহুঃ। যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম। (২২) হে পার্থ, সঃ পরঃ পুরুষঃ অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ, ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি, যেন ইদং সর্বং ততম্।

---

(১৮) (ব্রহ্মার) দিন আরম্ভ হইলে অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয় আবার রাত্রি হইলে তাহারা লয় প্রাপ্ত হয়।

টিপ্পনী—এই প্রকার জানিলে মানুষ ইহা বুঝিতে পারিবে যে, তাহার হাতে খুব অল্পই ক্ষমতা আছে। (ঈশ্বরের ইচ্ছায়) উৎপত্তি ও নাশের ক্রিয়া যুগপৎ চলিতেছে।

(১৯) হে পার্থ! এই প্রাণী সমুদয় এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া রাত্র্যাগমে বিবশ হইয়া লয় পায় ও দিবস আরম্ভে উৎপন্ন হয়। (২০) কিন্তু এই অব্যক্তের অতীত যে নিত্য সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে তাহা সকল প্রাণীর নাশ হইলেও বিনষ্ট হয় না। (২১) যাহাকে অব্যক্ত অক্ষর (অবিনাশী) বলা যায়, তাহাকেই পরমগতি বলা হয়। যাহাকে পাইয়া আর পুনর্জন্ম হয় না তাহাই আমার পরম ধাম। (২২) হে পার্থ, এই উত্তম পুরুষের দর্শন অনন্যভক্তি দ্বারা হয়। ইহাতেই ভূতমাত্র রহিয়াছে এবং এই সকল তাহার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

(২৩) হে ভরতর্ষভ, যোগিনঃ যত্র কালে প্রযাতাঃ আবৃত্তিম্ অনাবৃত্তিং চ যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি। (২৪) ষণ্মাসঃ উত্তরায়ণম্, শুক্লঃ, অহঃ অগ্নিঃ, জ্যোতিঃ ; তত্র প্রযাতাঃ জনাঃ ব্রহ্মবিদঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি। (২৫) ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্, কৃষ্ণঃ রাত্রিঃ তথা ধূমঃ তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য যোগী নিবর্ততে।

(২৬) জগতঃ এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী শাশ্বতে মতে, একয়া অনাবৃত্তিং যাতি,

(২৩) যে কালে মরণ হইলে যোগীরা মোক্ষ পায় ও যে কালে মরণ হইলে তাহাদের পুনর্জন্ম হয় সেইকাল, হে ভরতর্ষভ, আমি তোমাকে বলিতেছি। (২৪) উত্তরায়ণের ছয়মাসের শুক্ল পক্ষে দিবসে যখন অগ্নির জ্বালা চলিতে থাকে তখন যাহার মরণ হয় সে ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম পায়। (২৫) দক্ষিণায়ণের ছয় মাসের কৃষ্ণপক্ষে রাত্রি যখন ধূমে ব্যাপ্ত থাকে সেই সময় যাহার মরণ হয় সে চন্দ্রলোক পাইয়া পুনর্জন্ম লাভ করে।

টিপ্পনী—উপরের দুই শ্লোক আমি পুরা বুঝিতে পারি নাই। উহার শব্দার্থ গীতার শিক্ষার সহিত মিল খায় না। গীতার শিক্ষানুসারে যে ভক্তিমান্, যে সেবা-মার্গ অনুসরণ করে ও যাহার জ্ঞান হইয়াছে সে যখন হয় মরুক, তবুও সে মোক্ষই পায়। উহা হইতে এই শ্লোকের অর্থ বিরোধী। উহার ভাবার্থ অবশ্য এরূপ বাহির করা যায় যে, যে-ব্যক্তি যজ্ঞ করে, অর্থাৎ পরোপকারেই যে জীবন যাপন করে, যাহার জ্ঞান লাভ হইয়াছে, যে ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ জ্ঞানী, মৃত্যুসময়েও যদি তাহার এই স্থিতি থাকে, তবে সে মোক্ষ লাভ করে। ইহা হইতে বিপরীত— যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে না, যাহার জ্ঞান নাই, যে ভক্তি কি তাহা জানে না, সে চন্দ্রলোক অর্থাৎ ক্ষণিক লোক পাইয়া পরে ভবচক্রে ঘুরিতে থাকে। চন্দ্রের জ্যোতি নাই।

(২৬) জগতে জ্ঞান ও অজ্ঞানের এই দুই পূর্ব-প্রচলিত মার্গ আছে বলিয়া

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥ ২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে। (২৭) হে পার্থ, এতে, সৃতী জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি, তস্মাৎ হে অর্জুন, সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভব। (২৮) ইদং বিদিত্বা বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ যোগী তৎ সর্বম্ অত্যেতি, আদ্যং পরং স্থানম্ চ উপৈতি। অত্যেতি—অতীত হইয়া যায়।

স্বীকার করা হয়। এক অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে মনুষ্য মোক্ষ পায় ও অন্য অর্থাৎ অজ্ঞানমার্গে পুনর্জন্ম পায়।

(২৭) হে পার্থ, এই দুই মার্গ যাহারা জানে এমন কোনও যোগী বিষয়ে মুগ্ধ হয় না। সেইহেতু হে অর্জুন, তুমি সর্বকালেই যোগযুক্ত থাক।

টিপ্পনী—দুই মার্গ যে জানে সে সমভাব রাখিয়া অন্ধকার বা অজ্ঞানের মার্গ লয় না, সে মোহে পড়ে না—ইহাই অর্থ।

(২৮) এই বিষয় জানিয়া পরে বেদ যজ্ঞ তপ ও দানে যে পুণ্যফল আছে বলা যায়, সে সকল লঙ্ঘন করিয়া যোগী উত্তম আদিস্থান পায়।

টিপ্পনী—অর্থাৎ যাঁহার মধ্যে জ্ঞান ভক্তি ও সেবাকর্ম সমানভাবে মিলিত হইয়াছে তাঁহার সমস্ত পুণ্যের ফল পাওয়া হইয়াছে, কেবল ইহাই নহে, তাঁহার পরম মোক্ষ পদও লাভ হইয়াছে।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে অক্ষরব্রহ্ম-যোগ নামে অষ্টম অধ্যায় পূর্ণ হইল।

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ

ইহাতে ভক্তির মহিমা গীত হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥ ২

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪

শ্রীভগবান্ উবাচ—(১) অনসূয়বে তে ইদং তু গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানং বক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে। অনসূয়বে—দ্বেষরহিত। (২) ইদং রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যং, পবিত্রম্, প্রত্যক্ষাবগমং, ধর্ম্যং কর্তুং সুসুখম্ অব্যয়ম্। রাজ-বিদ্যা—বিদ্যার রাজা। রাজগুহ্যং—রহস্যের রাজা। প্রত্যক্ষাবগমং—অনুভবে প্রত্যক্ষ। কর্তুং সুসুখম্—আচরণ করিতে সুখদায়ক। (৩) হে পরন্তপ, অস্য ধর্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাং অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি নিবর্তন্তে। অশ্রদ্দধানাঃ—অশ্রদ্ধাপরায়ণ। (৪) অব্যক্তমূর্তিনা ময়া ইদং সর্বং জগৎ ততম্ এবং মৎস্থানি সর্ব-

শ্রীভগবান বলিলেন—(১) তুমি দ্বেষরহিত বলিয়া তোমাকে আমি গুহ্য হইতে গুহ্য অনুভব-যুক্ত জ্ঞান দিব যাহা জানিলে তুমি অকল্যাণ হইতে রক্ষা পাইবে। (২) ইহা বিদ্যার রাজা, গূঢ় বস্তুদের রাজা। এই বিদ্যা পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষ অনুভবে আসার যোগ্য, ধর্মসঙ্গত, সহজে আচরণীয় ও অবিনাশী।

(৩) হে পরন্তপ, এই ধর্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই, এইরূপ লোক আমাকে না পাইয়া, মৃত্যুময় সংসারমার্গে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া যায়। (৪) আমার অব্যক্ত স্বরূপ দ্বারা সারা জগৎ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, আমাতে—আমার আশ্রয়ে সকল প্রাণী আছে, আমি তাহাদের আশ্রয়ে নাই।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭

ভূতানি, অহং চ তেষু ন অবস্থিতঃ। ততং—ব্যাপ্ত। মৎস্থানি—আমাতে বা আমার আশ্রয়ে স্থিত। (৫) ভূতানি চ ন মৎস্থানি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য, (অহং) ভূতভৃৎ ভূতস্থঃ ন, মম আত্মা ভূতভাবনঃ চ। ভূতভৃৎ—ভূতদিগের পালনকারী। ভূতভাবনঃ—ভূতের (প্রাণিগণের) উৎপত্তির হেতু।

(৬) যথা সর্বত্রগঃ মহান্ বায়ুঃ নিত্যং আকাশস্থিতঃ তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয়। আকাশস্থিতঃ—আকাশে আছে অথচ তাহার সহিত নির্লিপ্ত। উপধারয়—জানিও। (৭) হে কৌন্তেয়, সর্বভূতানি কল্পক্ষয়ে

টিপ্পনী—আমাতে সকল জীব আছে ও নাই। তাহাদের মধ্যে আমি আছি ও নাই। ইহা ঈশ্বরের যোগবল, তাঁহার মায়া, তাঁহার অলৌকিকত্ব। ঈশ্বরের বর্ণনা ভগবানকে মানুষের ভাষাতেই করিতে হয়। অর্থাৎ অনেক প্রকার ভাষা প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সন্তোষ হয়। সকলই ঈশ্বরময়। এইজন্য সকলই তাঁহাতে রহিয়াছে। তিনি অলিপ্ত। সাধারণভাবে তিনি কর্তা নহেন। সেই হেতু তাঁহাতে জীব নাই এ কথা বলা যায়। আর যাহারা তাঁহার ভক্ত তাহাদের মধ্যে তিনি তো আছেনই। যে নাস্তিক তাহার মধ্যে, তাহার দৃষ্টিতে তিনি নাই এবং ইহা যদি তাঁহার অলৌকিকত্বই না হয় তবে ইহাকে কি বলিব?

(৫) তাহা হইলেও প্রাণীসকল আমাতে নাই ইহাও বলা যায়। আমার এই যোগবল তুমি দেখ। আমি জীবদিগের পালনকারী, তাহা হইলেও আমি তাহাদিগের মধ্যে নাই। কিন্তু আমি তাহাদের উৎপত্তির কারণ।

(৬) যেমন সকল স্থানে বিচরণকারী মহান্ বায়ু নিত্য আকাশের মধ্যেই রহিয়াছে তেমনি সকল প্রাণী আমার মধ্যে রহিয়াছে এইরূপ জানিও। (৭) হে কৌন্তেয়, সকল প্রাণী কল্পের অন্তে আমার প্রকৃতিতে লয় পায় এবং কল্পের

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥ ১০
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১

মামিকং প্রকৃতিং যান্তি কল্পাদৌ পুনঃ অহং তানি বিসৃজামি। (৮) স্বাং প্রকৃতিং অবষ্টভ্য প্রকৃতের্বশাৎ অবশং ইমং কৃৎস্নং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি। অবষ্টভ্য —বশীভূত করিয়া ; অবলম্বন করিয়া।

(৯) হে ধনঞ্জয়, তেষু কর্মসু উদাসীনবৎ অসক্তং আসীনম্ মাং তানি কর্মাণি ন চ নিবধ্নন্তি। (১০) প্রকৃতিঃ ময়া অধ্যক্ষেণ সচরাচরম্ সূয়তে। হে কৌন্তেয়, অনেন হেতুনা জগৎ বিপরিবর্ততে। (১১) মম ভূতমহেশ্বরং পরং ভাবম্ অজানন্তো মূঢ়াঃ মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্ মাং অবজানন্তি। ভূতমহেশ্বরং—সর্বভূতের মহেশ্বররূপ। অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে। (১২) মেঘাশাঃ মোঘ-

আরম্ভ হইলে আমি পুনরায় তাহাদিগকে উৎপন্ন করি। (৮) আমার মায়াকে অবলম্বন করিয়া আমি এই প্রকৃতির প্রভাবের অধীন থাকিয়া প্রাণী সমুদয় বারংবার উৎপন্ন করিয়া থাকি।

(৯) হে ধনঞ্জয়, এই কর্ম আমাকে বন্ধন করে না যেহেতু আমি তাহাদের সম্বন্ধে উদাসীন এবং আসক্তিরহিত হইয়া থাকি। (১০) আমার অধিকারের বশীভূত হইয়া প্রকৃতি স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ উৎপন্ন করে, আর এই কারণে হে কৌন্তেয়, জগৎ চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। (১১) প্রাণীমাত্রের মহেশ্বর-রূপ আমার ভাব না জানিয়া মূর্খ লোকেরা মনুষ্যরূপধারণকারী আমাকে অবজ্ঞা করে।

টিপ্পনী—যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাহারা দেহস্থ অন্তর্যামীকে জানিতে পায় না ও তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া জড়বাদী থাকিয়া যায়।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬

কর্মাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ মোহিনীং রাক্ষসীং আসুরীং চ প্রকৃতিম্ এব শ্রিতাঃ। মোঘ—ব্যর্থ। মোঘজ্ঞানাঃ—ব্যর্থজ্ঞানযুক্ত। শ্রিতাঃ—আশ্রয় লয়।

(১৩) হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ মাং ভূতাদিং অব্যয়ং জ্ঞাত্বা অনন্যমনসঃ ভজন্তি। (১৪) দৃঢ়ব্রতাঃ যতন্তঃ মাং সততং কীর্তয়ন্তঃ ভক্ত্যা মাং নমস্যন্তঃ চ নিত্যযুক্তাঃ উপাসতে। (১৫) অন্যে অপি চ একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ মাং জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ উপাসতে। একত্বেন—অদ্বৈতরূপে। পৃথক্ত্বেন—দ্বৈতরূপে। বিশ্বতোমুখম্—সর্বাত্মক, বহুরূপে। (১৬) অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ, অহং স্বধা, অহং ঔষধম্, অহং মন্ত্রঃ, অহমেব আজ্যং, অহম্ অগ্নিঃ, অহমেব হুতম্। ক্রতু—যজ্ঞের সংকল্প। হুতম্—হোমক্রিয়া।

(১২) ব্যর্থ-আশাযুক্ত, ব্যর্থ-কর্মকারী ও ব্যর্থ-জ্ঞানযুক্ত মূঢ় লোকেরা নিজেদের মোহযুক্ত করিয়া রাখে এবং রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির আশ্রয় লয়।

(১৩) হে পার্থ, উহার বিপরীত মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় লইয়া প্রাণীদিগের আদি কারণ এবং অবিনাশী আমাকে একনিষ্ঠার সহিত ভজনা করে। (১৪) দৃঢ়নিশ্চয়, প্রযত্নকারী তাহারা নিরন্তর আমার কীর্তন করে। আমাকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করে ও নিত্য ধ্যানযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করে। (১৫) আবার কেহ অদ্বৈতরূপে ও দ্বৈতরূপে ও বহুরূপে সর্বত্র অবস্থিত আমাকে জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করে। (১৬) আমি যজ্ঞের সংকল্প, আমি যজ্ঞ, আমি যজ্ঞ দ্বারা পিতৃগণের অবলম্বন, আমি যজ্ঞের বনস্পতি, আমি মন্ত্র, আমি আহুতি, আমি অগ্নি এবং আমিই হবন-দ্রব্য।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ১৯
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্-
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০

(১৭) অহম্ অস্য জগতঃ পিতা মাতা ধাতা পিতামহঃ বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুঃ এব চ। (১৮) (অহম্) গতিঃ ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং অব্যয়ং বীজম্। (১৯) অহং তপামি অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি উৎসৃজামি চ, হে অর্জুন, অহম্ এব অমৃতং মৃত্যুঃ চ, সৎ অসৎ চ। (২০) ত্রৈবিদ্যাঃ সোমপাঃ পূতপাপাঃ যজ্ঞৈঃ মাং ইষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্যং সুরেন্দ্রলোকম্ আসাদ্য দিবি দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি। ত্রৈবিদ্যাঃ—ঋক্ সাম যজুঃ এই তিন বেদ অনুযায়ী কর্মকারীরা। আসাদ্য—পাইয়া।

(১৭) আমি এই জগতের পিতা, আমি মাতা, আমি ধারণকারী, আমি জানার যোগ্য, আমি পবিত্র ওঙ্কার, ঋক, সাম ও যজুর্বেদও আমিই। (১৮) আমি গতি, পোষক, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, আশ্রয়, হিতেচ্ছু, উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, আধার ও অব্যয় বীজও আমি। (১৯) আমি উত্তাপ দিই, ভূমি হইতে জল আকর্ষণ করি, পুনর্বার জল বর্ষণ করি। আমিই জীবের জীবন, আমিই জীবের মৃত্যু। হে অর্জুন—আমি সৎ ও অসৎ।

(২০) ত্রিবেদ অনুযায়ী কর্মকারীরা সোমরস পান করিয়া, পাপরহিত হইয়া, যজ্ঞদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া স্বর্গ কামনা করে। তাহারা পবিত্র স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া দিব্যভোগ সমূহ উপভোগ করিয়া থাকে।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩

(২১) তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি; এবং ত্রয়ীধর্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ কামকামাঃ গতাগতং লভন্তে। গতাগতম্—গমনাগমন, জন্মমৃত্যু। (২২) যে জনাঃ অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ মাং পর্যুপাসতে অহং তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামি।

(২৩) হে কৌন্তেয়, যে অপি ভক্তাঃ অনন্যদেবতাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ যজন্তে তে

টিপ্পনী—বৈদিক ক্রিয়াসকল ফল-প্রাপ্তির জন্যই হয় বলিয়া ও উহাতে কোনও অঙ্গে সোমপান হইত বলিয়া এখানে উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল ক্রিয়া কি ছিল, সোমরস কি তাহা আজ বস্তুতঃ কেহ বলিতে পারে না।

(২১) এই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া তাহাদের পুণ্য ক্ষীণ হওয়ার পরে তাহারা পুনরায় মৃত্যুলোকে প্রবেশ করে। এই প্রকার ত্রিবেদানুযায়ী কর্মকারীরা, ফল-ইচ্ছাকারীরা, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে পড়িয়া থাকে। (২২) যে লোক অনন্যভাবে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমরা ভজনা করে সেই নিত্য আমাতে রত ব্যক্তির যোগক্ষেমের ভার আমিই বহন করি।

টিপ্পনী—এই রকম যোগী চিনিবার তিনটি সুন্দর লক্ষণ আছে—সমত্ব, কর্ম-কুশলতা ও অনন্য-ভক্তি। এই তিন একে অপরের মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে থাকা চাই। ভক্তি বিনা সমত্ব পাওয়া যায় না, সমত্ব বিনা ভক্তি পাওয়া যায় না ও কর্মকুশলতা বিনা ভক্তি ও সমত্ব আভাসমাত্র হওয়ার আশঙ্কা আছে। যোগ মানে অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া ও ক্ষেম মানে প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করা।

(২৩) আরও হে কৌন্তেয়, যাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক অন্য দেবতার ভজনা করে তাহারাও বিধি বিনা হইলেও, আমাকেই ভজনা করে।

টিপ্পনী—'বিধি বিনা' মানে অজ্ঞতাবশতঃ আমাকে এক নিরঞ্জন নিরাকার না জানিয়া।

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮

অপি অবিধিপূর্বকং মামেব যজন্তি। (২৪) অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ, প্রভুঃ এব চ, তে তু মাং তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি অতঃ চ্যবন্তি। চ্যবন্তি—পতিত হয়। (২৫) দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তি, পিতৃব্রতাঃ পিতৄন্ যান্তি, ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি, মদ্‌যাজিনঃ অপি মাং যান্তি। ভূতেজ্যাঃ—ভূতপূজকেরা। (২৬) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যঃ ভক্ত্যা মে প্রযচ্ছতি প্রযতাত্মনঃ ভক্ত্যুপহৃতং তৎ অহম্ অশ্নামি। (২৭) হে কৌন্তেয়, যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি, তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব। (২৮) এবং শুভাশুভফলৈঃ কর্মবন্ধনৈঃ

---

(২৪) আমিই সকল যজ্ঞের ভোগের কর্তা। এইরূপ আমাকে সত্যস্বরূপে জানে না বলিয়া তাহারা পতিত হয়। (২৫) দেবতাপূজকেরা দেবলোক পায়, পিতৃপূজাকারীরা পিতৃলোক পায়, ভূতপ্রেতাদি পূজকেরা সেই লোক পায় ও আমার ভজনকারীরা আমাকে পায়।

(২৬) পত্র পুষ্প ফল ও জল যে আমাকে ভক্তিপূর্বক অর্পণ করে সেই প্রযত্নশীলের ভক্তিপূর্বক অর্পিত বস্তু আমি গ্রহণ করিয়া থাকি।

টিপ্পনী—তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে যাহা কিছু সেবা ভাব হইতে দেওয়া হয় তিনি তাহা গ্রহণ করেন। সেই সেই প্রাণীতে স্থিত অন্তর্যামীরূপে ভগবানই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(২৭) সেই হেতু হে কৌন্তেয়, যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হবনের সময় দিয়া হোম কর, যাহা দানে দাও, যাহা তপ কর সে সকল আমাকে অর্পণ কর। (২৮) তাহা হইলে তুমি শুভাশুভ ফল-দানকারী কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩

মোক্ষ্যসে, সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তঃ মাম্ উপৈষ্যসি। (২৯) অহং সর্বভূতেষু সমঃ, মে দ্বেষ্যঃ ন অস্তি, প্রিয় ন (অস্তি), যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি তে ময়ি, অহমপি চ তেষু। (৩০) সুদুরাচারঃ অপি চেৎ অনন্যভাক্ মাং ভজতে সঃ সাধুরেব মন্তব্যঃ হি সঃ সম্যগ্ব্যবসিতঃ। সম্যগ্ব্যবসিতঃ—যাহার সংকল্প সাধু। (৩১) (সঃ) ক্ষিপ্রং ধর্মাত্মা ভবতি, শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি, হে কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি। শশ্বৎ—নিত্য, চিরন্তন। (৩২) হে পার্থ, যে অপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ, (যে অপি) স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তে অপি মাং হি ব্যপাশ্রিত্য পরাং গতিং যান্তি। (৩৩) কিং পুনঃ পুণ্যাঃ ভক্তাঃ

লাভ করিবে এবং ফলত্যাগরূপী সমত্ব পাইয়া জন্ম-মরণ হইতে মুক্ত হইয়া আমাকেই পাইবে। (২৯) সকল প্রাণীর মধ্যে আমিই সমভাবে আছি। আমার কেহ অপ্রিয় বা প্রিয় নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে তাহারা আমার মধ্যে আছে, আমিও তাহাদের মধ্যে আছি। (৩০) খুব দুরাচারীও যদি আমাকে অনন্যভাবে ভজনা করে তবে সে সাধু হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যেহেতু এখন তাহার সাধু-সংকল্প হইয়াছে।

টিপ্পনী—অনন্যভক্তি দুরাচার শান্ত করিয়া দেয়।

(৩১) সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইয়া যায় ও নিরন্তর শান্তি ভোগ করে। হে কৌন্তেয়, তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনো নাশ পায় না। (৩২) অধিকন্তু হে পার্থ, যে পাপ-যোনি সে এবং স্ত্রী, বৈশ্য অথবা শূদ্র যে-ই আমার আশ্রয় লয় সে-ই পরম গতি প্রাপ্ত হয়। (৩৩) তাহা হইলে ভক্ত, পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

ব্রাহ্মণাঃ তথা রাজর্ষয়ঃ? ইমম্‌ অনিত্যম্‌ অসুখং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব। (৩৪) মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী ভব, মাং নমস্কুরু, এবং মৎপরায়ণঃ আত্মানং যুক্ত্বা মামেব এষ্যসি। এষ্যসি—পাইবে।

ও রাজর্ষিদের কথা আর বলিবার কি আছে? অতএব এই অনিত্য ও সুখ-শূন্য লোকে জন্মিয়া তুমি আমাকে ভজনা কর। (৩৪) আমাতে চিত্ত সংলগ্ন কর, আমার ভক্ত হও, আমার নিমিত্ত যজ্ঞ কর, আমাকে নমস্কার কর, অর্থাৎ আমাতে পরায়ণ হইয়া আত্মা আমার সহিত যুক্ত করিলে তুমি আমাকেই পাইবে।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ নামক নবম অধ্যায় পূর্ণ হইল।

দশম অধ্যায়

বিভূতি-যোগ

সাত, আট ও নয় অধ্যায়ে ভক্তি ইত্যাদি নিরূপণ করিয়া পরে ভগবান্‌ ভক্তের জন্য নিজের অনন্ত বিভূতির যৎকিঞ্চিৎ দর্শন করাইতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২

শ্রীভগবান্‌ উবাচ—(১) হে মহাবাহো, ভূয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু, যৎ প্রীয়মাণায় তে অহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি। (২) সুরগণাঃ মে প্রভবং ন বিদুঃ,

---

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন—(১) হে মহাবাহো, পুনরায় আমার পরম (হিতকারী) বাক্য শ্রবণ কর। ইহা আমি তোমা-সদৃশ প্রিয়জনের হিতের জন্য বলিব। (২) দেবতা ও মহর্ষিরা আমার উৎপত্তির কথা জানে না—যেহেতু আমিই

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥ ৫
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭

মহর্ষয়ঃ চ ন, হি অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ আদিঃ। (৩) যঃ মাম্ অনাদিম্ অজং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি সঃ মর্তেষু অসংমূঢ়ঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। অসংমূঢ়ঃ—বিজ্ঞ, জ্ঞানী। (৪-৫) বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ সুখং দুঃখং ভবঃ অভাবঃ ভয়ম্ অভয়ম্ এব চ অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপঃ দানং যশঃ অযশঃ ভূতানাং পৃথগ্‌বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব ভবন্তি। ভবঃ—উৎপত্তি, জন্ম। অভাবঃ—বিনাশঃ, মৃত্যু।

(৬) সপ্ত মহর্ষয়ঃ, পূর্বে চত্বারঃ, তথা মনবঃ, মদ্ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ, লোকে ইমাঃ যেষাং প্রজাঃ। (৭) মম এতাং বিভূতিং যোগং চ যঃ তত্ত্বতঃ বেত্তি

দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্বপ্রকারে আদি কারণ। (৩) মৃত্যুলোকে বাস করিয়া যে জ্ঞানী আমাকে লোকের মহেশ্বর জন্মরহিত ও অনাদিরূপে জানে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। (৪-৫) বুদ্ধি, জ্ঞান, অমূঢ়তা, ক্ষমা, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শান্তি, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ভয় ও অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপ, দান, যশ, অপযশ—প্রাণীদের এইসকল বিভিন্ন ভাব আমা হইতে উৎপন্ন হয়।

(৬) সপ্তর্ষি, তাহার পূর্বে সনকাদি চার ও (চৌদ্দ) মনু আমার স্বরূপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইতে এই লোক উৎপন্ন হইয়াছে। (৭) আমার এই বিভূতি ও শক্তি যে যথার্থ জানে সে অবিচল সমতা পায়—এই বিষয়ে সংশয় নাই।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮
মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২

সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে; অত্র সংশয়ঃ ন। (৮) অহং সর্বস্য প্রভবঃ; মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ইতি মত্বা বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ মাং ভজন্তে। (৯) মচ্চিত্তাঃ মদ্‌গতপ্রাণাঃ মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ নিত্যং কথয়ন্তঃ চ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।

(১০) সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি, যেন তে মাম্ উপযান্তি। (১১) তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব আত্মভাবস্থঃ অহং ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি।

অর্জুন উবাচ। (১২-১৩) ভবান্ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমং পবিত্রম্; সর্বে ঋষয়ঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ ত্বাং শাশ্বতং দিব্যং পুরুষম্

(৮) আমি সকল উৎপত্তির কারণ ও সমস্তই আমা হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে—এই প্রকার জানিয়া জ্ঞানীরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করে। (৯) আমাতে যাহারা চিত্ত গ্রথিত করিয়াছে, আমাকে যাহারা প্রাণ অর্পণ করিয়াছে তাহারা আমাকেই নিত্য কীর্তন করিয়া সন্তোষে ও আনন্দে থাকে।

(১০) এমনি যাহারা আমাতে তন্ময় থাকে ও আমাকে প্রেমপূর্বক ভজনা করে তাহাদিগকে আমি জ্ঞান দিয়া থাকি। তাহাতে তাহারা আমাকে পায়। (১১) তাহাদের উপর দয়াপরবশ হইয়া, হৃদয়বাসী আমি, জ্ঞানরূপী প্রকাশময় দীপে তাহাদের অজ্ঞানরূপী অন্ধকার নাশ করিয়া থাকি।

অর্জুন বলিলেন—(১২-১৩) হে ভগবন্, তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধার্মিক, পরম

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া ॥ ১৭

আদিদেবম্ অজং বিভূম্ আহুঃ, স্বয়ং চ এবং মে ব্রবীষি। শাশ্বতম্—চিরস্থায়ী, অবিনাশী।

(১৪) হে কেশব, মাং ষৎ বদসি এতৎ সর্বম্ ঋতং মন্যে, হে ভগবন্, তে ব্যক্তিং ন দেবাঃ ন (চ) দানবাঃ বিদুঃ। ঋতম্—সত্য। ব্যক্তিম্—স্বরূপ। (১৫) হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ। বেত্থ—জান। (১৬) ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ হি অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি। (১৭) হে যোগিন্, অহং কথং ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ বিদ্যাম্? হে ভগবন্, কেষু কেষু ভাবেষু চ ময়া চিন্ত্যঃ অসি? পরিচিন্তয়ন্—চিন্তা করিতে

পবিত্র; সকল ঋষি, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস তোমাকে অবিনাশী দিব্যপুরুষ, আদিদেব, অজন্ম, ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়াছেন ও তুমি নিজেও উহাই বলিলে।

(১৪) হে কেশব, তুমি যাহা বলিলে তাহা আমি যথার্থ বলিয়া মানি। হে ভগবন্, তোমার স্বরূপ দেব ও দানবগণ জানে না। (১৫) হে পুরুষোত্তম, হে জীবগণের পিতা, হে জীবেশ্বর, হে দেব-দেব, হে জগতের স্বামী, তুমি নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জান। (১৬) যে বিভূতি দ্বারা তুমি এই লোক ব্যাপ্ত করিয়া আছ, তোমার সেই দিব্য বিভূতির কথা সম্পূর্ণরূপে আমাকে বলো। (১৭) হে যোগিন্, নিত্য চিন্তা করিতে করিতে তোমাকে কি ভাবে জানিব? হে ভগবন্, কিরূপে তোমাকে চিন্তা করিব?

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২

করিতে। বিত্তাম্—জানিব। (১৮) হে জনার্দন, আত্মনঃ যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়; হি অমৃতং শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি।

শ্রীভগবান্ উবাচ। (১৯) হন্ত, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, প্রাধান্যতঃ দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ তে কথয়িষ্যামি; মে বিস্তরস্য হি অন্তঃ ন অস্তি। (২০) হে গুড়াকেশ, অহম্ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা, অহম্ এব ভূতানাং আদিঃ মধ্যং অন্তঃ চ। (২১) অহম্ আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাম্ অংশুমান্ রবিঃ, মরুতাং মরীচিঃ অস্মি, অহং নক্ষত্রাণাং শশী। অংশুমান—দীপ্তিশালী। (২২) বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং চ মনঃ অস্মি, ভূতানাং চেতনা অস্মি।

---

(১৮) হে জনার্দন, তোমার শক্তি ও তোমার বিভূতির কথা বিস্তারপূর্বক আমার নিকট পুনর্বার বর্ণন কর। তোমার অমৃতময় বাণী শুনিয়া আমার ক্ষুধা মিটিতেছে না।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(১৯) উত্তম কথা, হে কুরু-শ্রেষ্ঠ, (এখন) আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতির কথা তোমাকে বলিব। উহার বিস্তারের অন্তই নাই। (২০) হে গুড়াকেশ, আমি সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত আত্মা। আমি ভূতমাত্রের আদি, মধ্য ও অন্ত। (২১) আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু। জ্যোতির মধ্যে আমি প্রদীপ্ত সূর্য। বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি ও নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্র। (২২) আমি বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবতাদিগের মধ্যে আমি ইন্দ্র। আমি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন ও প্রাণীদিগের মধ্যে চেতনা শক্তি।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রানাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭

(২৩) রুদ্রাণাং শঙ্করঃ যক্ষরক্ষসাং চ বিত্তেশঃ অস্মি, বসূনাম্ পাবকঃ অস্মি, অহং শিখরিণাং চ মেরুঃ (অস্মি)। শিখরিণাং—পর্বতগণের (মধ্যে)। (২৪) হে পার্থ, মাং পুরোধসাং মুখ্যং বৃহস্পতিং চ বিদ্ধি; অহং সেনানীনাং স্কন্দঃ, সরসাং সাগরঃ অস্মি। স্কন্দঃ—কার্ত্তিকেয়, দেবসেনাপতি। (২৫) অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ (অস্মি), গিরাম্ একম্ অক্ষরম্ অস্মি, যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ অস্মি, স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ (অস্মি)। গিরাম্—বাক্যসমূহের মধ্যে। একম্ অক্ষরম্—ওঙ্কার। (২৬) (অহম্) সর্ববৃক্ষাণাম্ অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং চ নারদঃ, গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ। (২৭) অশ্বানাং মাম্ অমৃতোদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসম্। গজেন্দ্রাণাম্ ঐরাবতং, নরাণাং চ নরাধিপং বিদ্ধি।

---

(২৩) রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের। বসুদিগের মধ্যে আমি অগ্নি, পর্বতের মধ্যে আমি মেরু। (২৪) হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতদিগের প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। সেনাপতিদিগের মধ্যে আমি কার্ত্তিক ও জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর। (২৫) মহর্ষিদিগের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে একাক্ষরী 'ওঁ', যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ ও স্থাবরের মধ্যে আমি হিমালয়। (২৬) সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ। দেবর্ষিদের মধ্যে আমি নারদ; গন্ধর্বদিগের মধ্যে আমি চিত্ররথ ও সিদ্ধদিগের মধ্যে আমি কপিল মুনি। (২৭) অশ্বদিগের মধ্যে অমৃত হইতে উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া আমাকে জানিও, হস্তীর মধ্যে আমি ঐরাবত ও মানুষের মধ্যে আমি রাজা।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২

(২৮) আয়ুধানাম্ অহং বজ্রং, ধেনূনাং কামধুক্ অস্মি, প্রজনঃ কন্দর্পঃ অস্মি চ, সর্পাণাং বাসুকিঃ অস্মি। (২৯) নাগানাম্ অনন্তঃ অস্মি, যাদসাং চ অহং বরুণঃ, পিতৃণাং চ অর্যমা অস্মি, সংযমতাম্ অহং যমঃ। সংযমতাম্—নিয়ামক, দণ্ডদাতাগণের মধ্যে। (৩০) দৈত্যানাং প্রহ্লাদঃ অস্মি, কলয়তাং চ অহং কালঃ (অস্মি), অহং মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রঃ, পক্ষিণাং চ বৈনতেয়ঃ (অস্মি)। কলয়তাম্—কলন অর্থাৎ গ্রাসকারীদিগের মধ্যে। মৃগেন্দ্রঃ—সিংহ। বৈনতেয়—গরুড়। (৩১) পবতাং পবনঃ অস্মি, শস্ত্রভৃতাম্ অহং রামঃ, ঝষাণাং চ মকরঃ অস্মি, স্রোতসাং জাহ্নবী অস্মি। পবতাং—বেগবান্‌দিগের মধ্যে। ঝষাণাম্—মৎস্যদিগের মধ্যে। স্রোতসাম্—নদীদিগের মধ্যে।

(৩২) হে অর্জুন, সর্গাণাম্ আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ অহম্ এব। অহং বিদ্যানাম্

---

(২৮) অস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, গাভিদিগের মধ্যে আমি কামধেনু, প্রজা-উৎপত্তির কারণ আমি কামদেব, সর্পদিগের মধ্যে আমি বাসুকি। (২৯) নাগদিগের মধ্যে আমি শেষনাগ, জলচরদিগের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃদিগের মধ্যে আমি অর্যমা ও দণ্ডদাতাদিগের মধ্যে আমি যম।

(৩০) দৈত্যদিগের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গ্রাসকারীদিগের মধ্যে আমি কাল, পশুদিগের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীদিগের মধ্যে আমি গরুড়। (৩১) বেগবান-দিগের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি রাম, মৎস্যদিগের মধ্যে আমি মকর, নদীদিগের মধ্যে আমি গঙ্গা।

(৩২) হে অর্জুন, আমি সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য। বিদ্যার মধ্যে আমি

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭

অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদঃ। সর্গাণাম্—সৃষ্টিসমূহের। প্রবদতাম্—বিবাদকারী (তার্কিক) দিগের। (৩৩) অক্ষরাণাম্ অকারঃ অস্মি, সামাসিকস্য চ দ্বন্দ্বঃ; অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ, অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা। বিশ্বতোমুখঃ—সর্বব্যাপী। ধাতা—ধারণকর্তা। (৩৪) অহং সর্বহরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাং চ উদ্ভবঃ, নারীণাং (মধ্যে) কীর্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ। (৩৫) অহং সাম্নাং বৃহৎসাম, ছন্দসাং গায়ত্রী তথা মাসানাম্ অহং মার্গশীর্ষঃ, ঋতূনাং কুসুমাকরঃ। কুসুমাকরঃ—বসন্তকাল। (৩৬) অহম্ ছলয়তাং দ্যূতম্, তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি, অহং জয়ঃ অস্মি, ব্যবসায়ঃ অস্মি, অহং সত্ত্ববতাং সত্ত্বম (অস্মি)।

(৩৭) অহং বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়, মুনীনাম্ অপি ব্যাসঃ,

---

অধ্যাত্মবিদ্যা ও বিবাদকারীদিগের মধ্যে আমি বাদ। (৩৩) অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, আমিই অক্ষয় কালস্বরূপ এবং আমিই সমুদয় কর্মফলের বিধানকর্তা। (৩৪) সকলের-হরণকারী মৃত্যু আমি। ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার উৎপত্তির কারণ আমি ও নারীগণের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা আমি। (৩৫) সামগণের মধ্যে আমিই বৃহৎসাম, ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী ছন্দ, মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুদিগের মধ্যে আমি বসন্ত। (৩৬) ছলনাকারীদিগের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বিগণের আমি তেজ, বিজয়ী পুরুষের আমি জয়, উদ্যোগী পুরুষের উদ্যম এবং সাত্ত্বিক পুরুষের আমি সত্ত্বগুণ।

টিপ্পনী—ছলনাকারীদিগের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া এ কথা বলায় ভয় পাইবার

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

কবীনাম্ উশনা কবিঃ অস্মি। (৩৮) অহং দময়তাং দণ্ডঃ অস্মি, জিগীষতাম্ নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং মৌনম্ এব (অস্মি), জ্ঞানবতাং চ জ্ঞানম্ অস্মি। দময়তাম্—শাসন-কর্তৃগণের। জিগীষতাম্—জয়েচ্ছুদিগের। (৩৯) হে অর্জুন, যৎ চ অপি সর্বভূতানাং বীজম তৎ অহম্। চরাচরং ভূতং যৎ স্যাৎ তৎ ময়া বিনা ন অস্তি। বীজম্—উৎপত্তির কারণ।

(৪০) হে পরন্তপ, মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অন্তঃ ন অস্তি ; এষঃ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ। উদ্দেশতঃ—সংক্ষেপে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ। (৪১) যৎ যৎ বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ঊর্জিতম্ এব বা (অস্তি) তৎ তৎ এব ত্বম্ মম তেজোঽংশসম্ভবম্ অবগচ্ছ। ঊর্জিতম্—প্রভাবসম্পন্ন। অবগচ্ছ—জানিবে, অবগত

আবশ্যকতা নাই। এখানে ভাল-মন্দের নির্ণয় নাই, পরন্তু যাহা কিছু আছে ঈশ্বরের আজ্ঞা বিনা নাই ইহাই বুঝাইয়া দেওয়ার ভাব ইহাতে আছে। এইরূপে সকলই তাঁহার অধীন—এই কথা জানিয়া কপটাচারীও আপন অভিমান ত্যাগ করিয়া ছলনা ছাড়িয়া দিবে।

(৩৭) বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে আমি শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি অর্জুন। মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস ও কবিদিগের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য। (৩৮) রাজ-কার্যকারীদের (শাসকদের) আমি দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের আমি নীতি, গুহ্যবাক্যের মধ্যে আমি মৌন ও জ্ঞানবানের মধ্যে আমি জ্ঞান। (৩৯) হে অর্জুন, সকল প্রাণীর উৎপত্তির কারণ আমি, যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম আছে তাহা আমা ছাড়া (কিছুই) নাই।

(৪০) হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতির অন্তই নাই। বিভূতির বিস্তার আমি কেবল দৃষ্টান্তরূপেই বলিলাম। (৪১) যাহাকিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

হইবে। (৪২) অথবা, হে অর্জুন, তব এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিম্? অহম্ একাংশেন ইদং কৃৎস্নম্ জগৎ বিষ্টভ্য স্থিতঃ। কৃৎস্নম্—সমগ্র। বিষ্টভ্য—ধারণ করিয়া।

অথবা প্রভাবশালী আছে তাহারা আমার তেজ ও অংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে জানিবে। (৪২) অথবা হে অর্জুন, ইহা বিস্তার-পূর্বক জানিয়া তোমার কি হইবে? আমার এক অংশমাত্র দ্বারা এই সমুদয় জগৎ আমি ধারণ করিয়া আছি।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতি-যোগ নামে দশম অধ্যায় পূর্ণ হইল।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ

এই অধ্যায়ে ভগবান্ নিজের বিরাট স্বরূপ অর্জুনকে দেখাইতেছেন। ভক্তের নিকট এই অধ্যায় অত্যন্ত প্রিয়। ইহাতে যুক্তি নাই, কেবল কাব্য আছে। এই অধ্যায় পাঠ করিতে মানুষ ক্লান্ত হয় না।

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

অর্জুন উবাচ—ত্বয়া মদনুগ্রহায় যৎ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ পরমং গুহ্যম্ বচঃ উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ। অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্—অধ্যাত্মবিষয়ক। গুহ্যম্—গোপনীয়। (২) ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ ময়া ত্বত্তঃ বিস্তরশঃ শ্রুতৌ, হে কমলপত্রাক্ষ,

অর্জুন বলিলেন—(১) তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই আধ্যাত্মিক পরম রহস্য বলিলে। যে বাক্য তুমি আমাকে বলিলে তাহাতে আমার মোহ দূর হইয়াছে। (২) প্রাণীদিগের উৎপত্তি ও নাশ বিষয়ে তোমার নিকট হইতে

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

অব্যয়ং মাহাত্ম্যম্ অপি চ। ভবাপ্যয়ৌ—উৎপত্তি ও বিনাশ। ত্বত্তঃ—তোমার নিকট হইতে। (৩) হে পরমেশ্বর, ত্বং যথা আত্মানম্ আত্থ এতৎ এবম্, হে পুরুষোত্তম, তে ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। আত্থ—বলিলে।

(৪) হে প্রভো, যদি তৎ ময়া দ্রষ্টুং শক্যং ইতি মন্যসে ততঃ হে যোগেশ্বর, ত্বম্ অব্যয়ম্ আত্মানং মে দর্শয়। মন্যসে—মনে কর।

শ্রীভগবান্ উবাচ—(৫) হে পার্থ, মে শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য, (যানি) নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ। (৬) হে ভারত, আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ পশ্য। বহূনি অদৃষ্টপূর্বাণি পশ্য। (৭) হে

আমি বিস্তারপূর্বক শুনিয়াছি। হে কমল-পত্রাক্ষ, তোমার অবিনাশী মাহাত্ম্য তোমার নিকট শুনিয়াছি। (৩) হে পরমেশ্বর, তুমি যেমন নিজ পরিচয় দিতেছ তাহা সেই মতই বটে। হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিবার আমার ইচ্ছা হইতেছে।

(৪) হে প্রভু, উহা দর্শন করিবার জন্য যদি তুমি আমাকে উপযুক্ত মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, তোমার সেই অব্যয় রূপ আমাকে দর্শন করাও।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(৫) হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত, সহস্র সহস্র বিভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট আমার এই অদ্ভুত রূপ দর্শন কর। (৬) হে ভারত, আদিত্য, বসু, রুদ্র, দুই অশ্বিন ও মরুতকে দেখ। পূর্বে দেখ নাই এমন বহু আশ্চর্য বস্তু তুমি দেখ। (৭) হে গুড়াকেশ, এইখানে আমার শরীরে এক

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ :
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২

গুড়াকেশ, ইহ মমদেহে একস্থং কৃৎস্নং সচরাচরং জগৎ যৎ চ অন্যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি অদ্য পশ্য। (৮) অনেন স্বচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং তু নৈব শক্যসে, তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য।

সঞ্জয় উবাচ—(৯) হে রাজন্, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস। (১০) অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্। (১১) দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং সর্বাশ্চর্যময়ং দেবম্ অনন্তং বিশ্বতোমুখম্। (১২) যদি দিবি সূর্য-সহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ তদা সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ।

রূপে স্থিত সকল স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ ও অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা আজ দেখ।

(৮) তোমার এই চর্মচক্ষুদ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না। সেইজন্য আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি। তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ।

সঞ্জয় বলিলেন—(৯) হে রাজন্, যোগেশ্বর কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া পার্থকে নিজের পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন। (১০) উহা অনেক মুখ ও চক্ষু-যুক্ত, অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য আভরণযুক্ত, অনেক দিব্য উদ্যত অস্ত্রযুক্ত: (১১) তাঁহার অনেক দিব্য মালা ও বস্ত্র ধারণ করা ছিল, তাহাতে দিব্য সুগন্ধী প্রলেপ ছিল। এই প্রকারে তিনি সকল রকমে আশ্চর্যময় অনন্ত ও সর্বব্যাপী দেবতারূপে বিরাজিত হইলেন। (১২) আকাশে যদি হাজার হাজার সূর্যের তে.

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

(১৩) তদা তত্র দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবঃ অনেকধা প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ একস্থম্ অপশ্যৎ। (১৪) ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত।

অর্জুন উবাচ—(১৫) হে দেব, তব দেহে সর্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্, কমলাসনস্থম্ ঈশং ব্রহ্মাণম্, সর্বান্ ঋষীন্, দিব্যান্ উরগাংশ্চ পশ্যামি। (১৬) অনেক-বাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ অনন্তরূপম্ ত্বাং সর্বতঃ পশ্যামি। তব অন্তং ন মধ্যং ন, পুনঃ আদিং ন পশ্যামি, হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ।

এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়, তবে সেই তেজ কদাচিৎ সে মহাত্মার তেজের সমান হইতে পারে।

(১৩) সেখানে দেবাদিদেবের শরীরে পাণ্ডব অনেক প্রকারে বিভক্ত সারা জগৎ একরূপে স্থিত দেখিলেন। (১৪) পরে আশ্চার্যান্বিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া ধনঞ্জয় মাথা নত করিয়া হাত জোড় করিয়া এই প্রকার বলিলেন।

অর্জুন বলিলেন—(১৫) হে দেব, তোমার দেহমধ্যে আমি দেবতাদিগকে, বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর সমষ্টিকে, কমলাসনে বিরাজিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে, সকল ঋষি ও দিব্য সর্পাদিগকে দেখিতেছি। (১৬) তোমাকে আমি অনেক

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯

(১৭) কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং তেজোরাশিং সর্বতোদীপ্তিমন্তং দুর্নিরীক্ষ্যম্ অপ্রমেয়ম্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি। অপ্রমেয়ম্—যাহা পরিমাপ করা যায় না। সমন্তাৎ—সকল দিকে। (১৮) ত্বম্ বেদিতব্যং পরমম্ অক্ষরম্, ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্, ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা, ত্বম্ সনাতনঃ পুরুষঃ মে মতঃ। (১৯) অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তবীর্যম্ অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি।

বাহু, উদর, মুখ ও নেত্রযুক্ত, অনন্ত রূপযুক্ত দেখিতেছি। তোমার অন্ত নাই, মধ্য নাই, তোমার আদি নাই, হে বিশ্বেশ্বর, তোমার বিশ্বরূপ আমি দর্শন করিতেছি।

(১৭) মুকুটধারী, গদাধারী, চক্রধারী, তেজঃপুঞ্জ, সর্বত্র উজ্জ্বল জ্যোতি যুক্ত আবার দুর্নিরীক্ষ্য, অপরিমেয়, প্রজ্বলিত অগ্নি অথবা সূর্যের ন্যায় সকল দিকে দীপ্ত তোমাকে আমি দেখিতেছি। (১৮) তোমাকে আমি জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর রূপ, এই জগতের অন্তিম আধার, সনাতন ধর্মের অবিনাশী রক্ষক ও সনাতন পুরুষ বলিয়া মনে করি। (১৯) যাহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, যাহার শক্তি অনন্ত, যাহার অনন্ত বাহু, যাহার সূর্য চন্দ্র রূপ চক্ষু, যাহার মুখ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ও যিনি নিজের তেজে এই জগতকে তাপিত করিতেছেন —এই প্রকার তোমাকে আমি দেখিতেছি।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদম্
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২

(২০) দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদং অন্তরং ত্বয়া একেন হি ব্যাপ্তং (তথা) সর্বাঃ দিশশ্চ; হে মহাত্মন্, তব ইদম্ অদ্ভুতম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্। দ্যাবাপৃথিব্যোঃ—(দ্যৌ) আকাশ ও পৃথিবীর। প্রব্যথিতম্—ব্যথিত, কম্পমান্। (২১) সুরসঙ্ঘাঃ ত্বাং হি বিশন্তি, কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি। মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্বস্তি ইত্যুক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি। সুরসঙ্ঘাঃ—দেবতার সঙ্ঘ। প্রাঞ্জলয়ঃ—কৃতাঞ্জলি। গৃণন্তি—স্তুতি করিতেছে। পুষ্কলাভিঃ—প্রচুর। (২২) রুদ্রাদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ বিশ্বে, অশ্বিনৌ, মরুতঃ উষ্মপাঃ চ গন্ধর্বযক্ষাসুর-সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্বে বিস্মিতাঃ এব ত্বাং বীক্ষন্তে। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্ব, মরুৎ—ইহারা সকলে গণদেবতা। উষ্মপাঃ—উষ্মপায়ী পিতৃগণ। গন্ধর্ব—দেব-গায়ক। বীক্ষন্তে—দেখিতেছে।

(২০) হে মহাত্মন্, একমাত্র তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল এই অন্তরীক্ষ ও সকল দিকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। তোমার এই অদ্ভুত উগ্র রূপ দেখিয়া তিন লোক থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। (২১) আর এই দেবতার সঙ্ঘ তোমাতে প্রবেশ করিতেছে। ভীত হইয়া কত জন হাত জোড় করিয়া স্তুতি করিতেছে। মহর্ষিরা ও সিদ্ধেরা "জগতের কল্যাণ হউক"—এই বলিয়া অনেক প্রকারে তোমার স্তুতি করিতেছেন। (২২) রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য,

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫

(২৩) হে মহাবাহো, তে বহুবক্ত্রনেত্রং বহুবাহূরুপাদং বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ তথা অহম্। (২৪) হে বিষ্ণু, নভস্পৃশং দীপ্তম্ অনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি। ন বিন্দামি—লাভ করিতে পারিতেছি না।

(২৫) কালানলসন্নিভানি দংষ্ট্রাকরালানি তে মুখানি চ দৃষ্ট্বা এব দিশঃ ন জানে ন চ শর্ম লভে, হে দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসীদ। শর্ম—শান্তি।

বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, মরুৎ, উষ্ণপায়ী পিতৃগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণের সঙ্ঘ, সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছে।

(২৩) হে মহাবাহো, অনেক মুখ ও অনেক চক্ষুযুক্ত, অনেক বাহু, অনেক উরু ও পদযুক্ত, অনেক উদরযুক্ত, অনেক দাঁতের জন্য বিকট দর্শন, বিশাল রূপ দেখিয়া লোক ব্যাকুল হইয়া গিয়াছে, আমিও ব্যাকুল হইয়াছি। (২৪) আকাশ স্পর্শকারী দীপ্তিমান্ অনেক বর্ণযুক্ত, ব্যাদিত মুখযুক্ত ও বিশাল তেজঃপূর্ণ চক্ষুযুক্ত তোমাকে দেখিয়া, হে বিষ্ণু, আমার অন্তর ব্যাকুল হইয়াছে; ধৈর্য ও শান্তি রাখিতে পারিতেছি না।

(২৫) প্রলয়াগ্নি সদৃশ বিকট দন্তযুক্ত তোমার মুখ দেখিয়া আমার দৃষ্টিভ্রম হইতেছে, আমি স্বস্তি পাইতেছি না, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

—প্রসন্ন হও। (২৬-২৭) অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ ধৃতরাষ্ট্রস্য অমী সর্বে এব পুত্রাঃ তথা চ ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ সূত্রপুত্রশ্চ অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বাং (বিশন্তি); ত্বরমাণাঃ তে দ্রংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি। কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে। অমী—এই সমস্ত।

(২৮) যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ সমুদ্রম্ এব অভিমুখাঃ দ্রবন্তি তথা তব অভিবিজ্বলন্তি বক্ত্রাণি অমী নরলোকবীরাঃ বিশন্তি। (২৯) যথা পতঙ্গাঃ নাশায়

হও। (২৬-২৭) রাজন্যবর্গ সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, সূত-পুত্র কর্ণ আর আমাদের মুখ্য যোদ্ধাগণ করাল দন্তযুক্ত তোমার ভয়ানক মুখে বেগে প্রবেশ করিতেছে। কতজনের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া তোমার দন্তের মধ্যে লগ্ন দেখা যাইতেছে।

(২৮) যেমন নদীর বৃহৎ প্রবাহ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়, তেমনি তোমার জ্বলন্ত মুখে এই লোক-নায়কগণ প্রবেশ করিতেছে। (২৯) যেমন পতঙ্গ সকল

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ-
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২

সমৃদ্ধবেগাঃ প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি তথা তব বক্ত্রাণি অপি লোকাঃ নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ বিশন্তি (৩০) সমন্তাৎ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ লেলিহ্যসে। হে বিষ্ণো, তব উগ্রাঃ ভাসঃ সমগ্রং জগৎ তেজোভিঃ আপূর্য প্রতপন্তি। লেলিহ্যসে—লেহন করিতেছে।

(৩১) উগ্ররূপঃ কঃ ভবান্ মে আখ্যাহি, হে দেববর, তে নমঃ অস্তু, প্রসীদ। আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি, তব প্রবৃত্তিং হি ন জানামি।

শ্রীভগবান্ উবাচ—(৩২) অহম্ লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ, ইহ লোকান্ সমাহর্তুম্ প্রবৃত্তঃ অস্মি। প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ সর্বে ত্বাম্ ঋতে

নিজেদের নাশের জন্য বর্দ্ধিত বেগে প্রজ্বলিত দীপে ঝাঁপ দেয় তেমনি তোমার মুখে সকল লোক বর্ধিত-বেগে প্রবেশ করিতেছে। (৩০) সমস্ত লোক সমস্ত দিক্ হইতে গ্রাস করিবার জন্য তুমি তোমার প্রজ্বলিত মুখে লেহন করিতেছ। হে সর্বব্যাপী বিষ্ণু! তোমার উগ্র প্রকাশ সমগ্র জগৎকে তেজদ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে ও তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

(৩১) উগ্ররূপ তুমি কে আমাকে বল। হে দেববর, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি যে আদি কারণ—উহাই জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার প্রবৃত্তি আমি জানি না।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(৩২) আমি লোক-নাশকারী অতি ভীষণ কাল। এখন

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

অপি ন ভবিষ্যন্তি। অনীকেষু—সেনায়। প্রত্যনীকেষু—প্রত্যেক সেনায়, দলে। ত্বাম্ ঋতে—তোমাকে বাদ দিলেও। ন ভবিষ্যন্তি—রক্ষা পাইবে না। (৩৩) তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশঃ লভস্ব, শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যম্ ভুঙ্ক্ষ্ব, ময়া এব এতে পূর্বম্ এব নিহতাঃ। হে সব্যসাচিন্ নিমিত্তমাত্রং ভব।

(৩৪) দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথা অন্যান্ যোধবীরান্ অপি ময়া হতান্ ত্বং জহি, মা ব্যথিষ্ঠাঃ, যুধ্যস্ব রণে সপত্নান্ জেতা অসি। ত্বং জহি—তুমি হনন কর, মার। মা ব্যথিষ্ঠাঃ—ভীত হইও না।

সঞ্জয় উবাচ—(৩৫) কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিঃ বেপমানঃ ভূয়ঃ

এই লোকদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে তাহারা কেহই থাকিবে না। (৩৩) অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও শত্রু জয় করিয়া কীর্তিলাভ কর, ধন-ধান্যে ভরা রাজ্য ভোগ কর। এই সকলকে আমি পূর্ব হইতেই মারিয়াছি। হে সব্যসাচী, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও।

(৩৪) দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য যোদ্ধাগণকে আমি মারিয়াছি। সেই হেতু তুমি সেই মৃতগণকে হত কর। ভীত হইও না। যুদ্ধ কর, শত্রুকে রণে তোমার জয় করিতে হইবে।

সঞ্জয় বলিলেন—(৩৫) শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন কম্পিত

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

নমস্কৃত্বা তথা ভীতভীতঃ এব প্রণম্য (চ) স কিরীটী কৃষ্ণং সগদ্গদং আহ। ভূয়ঃ—পুনঃপুনঃ। বেপমানঃ—কাঁপিতে কাঁপিতে। কিরীটী—অর্জুন।

অর্জুন উবাচ—(৩৬) হে হৃষীকেশ, তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ (তৎ) স্থানে। রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ নমস্যন্তি। প্রকীর্ত্যা—গুণকীর্তনে। তৎ স্থানে—তাহা উপযুক্তই। দিশঃ দ্রবন্তি—দিকে দিকে পলায়। (৩৭) হে মহাত্মন্, কস্মাৎ ন নমেরন্ তে ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে আদিকর্ত্রে চ। হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ত্বম্ অক্ষরং সৎ অসৎ,

---

কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কেশবকে নমস্কার করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রণামপূর্বক গদ্গদ্ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন।

অর্জুন বলিলেন—(৩৬) হে হৃষীকেশ! তোমার কীর্তনে জগৎ আনন্দ পায় ও তোমার সম্বন্ধে অনুরাগ উৎপন্ন হয়,—ইহা যুক্তিযুক্ত বটে। রাক্ষসেরা ভীত হইয়া যে এদিক্ ওদিক্ পলায়ন করে এবং সিদ্ধগণ তোমাকে নমস্কার করে তাহাও আশ্চর্য নয়। (৩৭) হে মহাত্মন্, তোমাকে তাহারা কেন না নমস্কার করিবে? তুমি ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ আদি কর্তা। হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস! তুমি সৎ, তুমি অসৎ এবং তাহার পর যে অক্ষরব্রহ্ম তাহাও তুমি।

রায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব ॥ ৪০
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

তৎ পরং যৎ। (৩৮) ত্বম্ আদিদেবঃ, পুরাণঃ পুরুষঃ ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং। (ত্বং) বেত্তা বেদ্যঞ্চ পরং ধাম চ অসি। হে অনন্তরূপ, ত্বয়া বিশ্বম্ ততম্।

(৩৯) বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিঃ প্রপিতামহশ্চ ত্বম্। তে সহস্রকৃত্বঃ নমঃ অস্তু পুনঃ চ নমঃ ভূয়ঃ অপি তে নমঃ। (৪০) হে সর্ব, তে পুরস্তাৎ নমঃ পৃষ্ঠতঃ নমঃ সর্বতঃ এব নমঃ অস্তু। ত্বম্ অনন্তবীর্যামিতবিক্রমঃ ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততঃ সর্বঃ অসি।

(৪১-৪২) সখা ইতি মত্বা তব ইদং মহিমানম্ অজানতা হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, ইতি ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি প্রসভং যৎ উক্তং

(৩৮) তুমি আদিদেব। তুমি পুরাণপুরুষ। তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয় স্থান। তুমি সকল জান ও জানিবার যোগ্য। তুমি পরম ধাম। হে অনন্তরূপ, এই জগতে তুমি (সর্বত্র) ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ।

(৩৯) বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি, প্রপিতামহ তুমি। তোমাকে সহস্র বার নমস্কার, পুনরায় তোমাকে নমস্কার। (৪০) হে সর্ব! তোমাকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ সকল দিক্ হইতে নমস্কার। তোমার বীর্য অনন্ত, তোমার শক্তি অপার, তুমিই সকল ধারণ করিয়া আছ, সেই হেতু তুমিই সমস্ত।

(৪১-৪২) মিত্র মনে করিয়া প্রেমবশতঃ ও তোমার মহিমা না জানার জন্য

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪

বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ অথবা তৎসমক্ষম্ অপি অবহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ অসি, অপ্রমেয়ম্ ত্বাম্ অহম্ হে অচ্যুত, তৎ ক্ষাময়ে। ক্ষাময়ে—ক্ষমা করাইতেছি, চাহিতেছি। (৪৩) ত্বং চরাচরস্য লোকস্য পিতা অসি ত্বম্ অস্য পূজ্যঃ গরীয়ান্ গুরুঃ চ অসি। ত্বৎ সমঃ ন অন্যঃ অস্তি, অভ্যধিকঃ কুতঃ। (ত্বম্) লোকত্রয়ে অপি অপ্রতিমপ্রভাব। (৪৪) তস্মাৎ কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য ঈড্যম্ ঈশং ত্বাং অহং প্রসাদয়ে। হে দেব, পিতা ইব পুত্রস্য, সখা ইব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায় (মে) সোঢ়ুম্ অর্হসি। সোঢ়ুম্—সহ্য করিতে।

হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা—এই প্রকার বলা আমার ভুল বা অবিবেক বশতঃ হইয়াছে। বিনোদন করিবার জন্য খেলিতে, শুইতে, বসিতে বা খাইতে অর্থাৎ সঙ্গ বশতঃ তোমার যা কিছু অমর্যাদা করিয়াছি তাহা ক্ষমা করিবার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। (৪৩) এই চরাচর সমস্ত জগতের তুমি পিতা। তুমি সকলের পূজ্য ও শ্রেষ্ঠ। তোমার সমান কেহ নাই। তবে আর তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোথা হইতে আসিবে। ত্রিলোকে তোমার সামর্থ্যের জুড়ি নাই। (৪৪) সেই হেতু সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, পূজ্য ঈশ্বর, তোমাকে প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। হে দেব, যেমন পিতা পুত্রকে, সখা সখাকে, প্রিয় প্রিয়াকে সহ্য করে, তেমনি তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭

(৪৫) অদৃষ্টপূর্বং রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি, ভয়েন মে মনঃ প্রব্যথিতং চ, হে দেব, মে তৎ রূপম্ এব দর্শয়, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসীদ। তদেব —পূর্বের। (৪৬) অহং ত্বাং তথৈব কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। হে সহস্রবাহো বিশ্বমূর্তে, তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব।

শ্রীভগবান্ উবাচ। (৪৭) হে অর্জুন, প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ তব ইদং পরং তেজোময়ম্ অনন্তম্ আদ্যং বিশ্বং রূপম্ দর্শিতম্ যৎ ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্। আত্মযোগাৎ—নিজের শক্তির দ্বারা।

(৪৫) হে দেব, পূর্বে যাহা কখনও দেখি নাই সেই রূপ দেখিয়া আমার রোমাঞ্চ হইয়াছে, ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব হে দেব, তোমার পূর্বের (পরিচিত) রূপ দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। (৪৬) পূর্বের ন্যায় তোমার কিরীটধারী গদাচক্রপাণি রূপই আমি দেখিতে চাই। হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্তে, তোমার চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(৪৭) হে অর্জুন, তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আমার যোগপ্রভাবে এই তেজোময় অনন্ত, বিশ্বাত্মক পরম রূপ দেখাইলাম। আমার এই রূপ তুমি ছাড়া পূর্বে আর কেহ দেখে নাই।

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-
र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

(৪৮) হে কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ এবং রূপঃ অহং নৃলোকে ত্বদন্যেন কেনাপি দ্রষ্টুং শক্যঃ । (৪৯) মম ঈদৃক্ ঘোরং ইদং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা, মা চ বিমূঢ়ভাবঃ । ত্বং পুনঃ ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ মে ইদং তদেব রূপং প্রপশ্য ।

সঞ্জয় উবাচ । (৫০) বাসুদেবঃ ইতি অর্জুনম্ উক্ত্বা তথা স্বকং রূপং ভূয়ঃ দর্শয়ামাস পুনশ্চ সৌম্যবপুঃ ভূত্বা মহাত্মা ভীতম্ এনম্ আশ্বাসয়ামাস ।

(৪৮) হে কুরুপ্রবীর, বেদাভ্যাস, যজ্ঞ, শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া ও উগ্র তপস্যা দ্বারা, মনুষ্যলোকে তোমা ব্যতীত অন্য কেহ আমার এইরূপ দেখিতে সমর্থ হয় নাই। (৪৯) আমার এই বিকট রূপ দেখিয়া তুমি ভীত হইও না, বিমূঢ় হইও না। ভয় ত্যাগ করিয়া শান্তচিত্ত হও এবং আমার পরিচিত রূপ পুনরায় দেখ।

সঞ্জয় বলিলেন—(৫০) বাসুদেব অর্জুনকে এই প্রকার বলিয়া নিজের প্রচলিত রূপ পুনরায় দেখাইলেন। তারপর শান্তমূর্তি ধারণ করিয়া ভীত অর্জুনকে সেই মহাত্মা আশ্বাস দিলেন।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

অর্জুন উবাচ। (৫১) হে জনার্দন, তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীম্ (অহং) সচেতাঃ সংবৃত্তঃ প্রকৃতিং গতঃ অস্মি।

শ্রীভগবান্ উবাচ। (৫২) মম যৎ ইদং রূপং দৃষ্টবান্ অসি (তৎ) সুদুর্দর্শম্। দেবাঃ অপি নিত্যম্ অস্য রূপস্য দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। (৫৩) (ত্বং) মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি এবং বিধঃ অহং ন বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন ন চ ইজ্যয়া দ্রষ্টুং শক্যঃ। (৫৪) হে অর্জুন, হে পরন্তপ, এবং বিধঃ অহং জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং তত্ত্বেন চ প্রবেষ্টুম্ অনন্যয়া ভক্ত্যা (এব) তু শক্যঃ। (৫৫) হে পাণ্ডব, যঃ মৎকর্মকৃৎ মৎপরমঃ মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ সর্বেষু ভূতেষু (চ) নির্বৈরঃ সঃ মাম্ এতি।

অর্জুন বলিলেন—(৫১) হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মনুষ্যরূপ দেখিয়া এক্ষণে আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(৫২) আমার যে রূপ তুমি দেখিলে তাহা দর্শন করা অত্যন্ত দুর্লভ। দেবতারাও সেই রূপ দেখিতে আগ্রহান্বিত। (৫৩) আমাকে তুমি যেমন দর্শন করিলে, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ দ্বারা ঐ রূপের দর্শন হয় না। (৫৪) কিন্তু হে অর্জুন, হে পরন্তপ, আমার সম্বন্ধে এমন জ্ঞান, এই রূপে আমার দর্শন ও আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পায়া কেবল

অনন্তভক্তি দ্বারাই সম্ভবপর। (৫৫) হে পাণ্ডব, যে মানুষ আমাকে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে, আমাতে পরায়ণ থাকে, আমার ভক্ত হয়, আসক্তি ত্যাগ করে ও প্রাণিমাত্র সম্বন্ধেই দ্বেষরহিত হয় সে আমাকে পায়।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তি-যোগ

পুরুষোত্তমের দর্শন অনন্য ভক্তি দ্বারাই সম্ভব; ইহা ভগবান বলার পর ভক্তির স্বরূপ তো প্রকট হওয়া চাই। এই দ্বাদশ অধ্যায় সকলের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা দরকার। ইহা খুব ছোট অধ্যায়ের অন্যতম। ইহাতে বর্ণিত ভক্তের লক্ষণ নিত্য মনন করার যোগ্য।

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২

অর্জুন উবাচ। (১) এবং যে ভক্তাঃ সততযুক্তাঃ ত্বাং পর্যুপাসতে যে চ অপি অক্ষরম্ অব্যক্তং (পর্যুপাসতে) তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ?

শ্রীভগবান্ উবাচ—(২) যে নিত্যযুক্তাঃ ময়ি মনঃ আবেশ্য পরয়া শ্রদ্ধয়া

অর্জুন বলিলেন—(১) এই প্রকারে যে ভক্ত তোমার নিরন্তর ধ্যান-ধারণ করিয়া তোমার উপাসনা করে ও যাহারা তোমার অবিনাশী অব্যক্ত স্বরূপের চিন্তন করে তাহাদের মধ্যে কোন্ যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য?

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(২) আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্য আমার ধ্যান করিয়া যে শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে উপাসনা করে তাহাকে আমি শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬

উপেতাঃ মাম্ উপাসতে তে যুক্ততমাঃ মে মতাঃ। (৩-৪) ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ধ্রুবম্ অচলং কূটস্থম্ অচিন্ত্যং সর্বত্রগম্ অব্যক্তম্ অনির্দেশ্যম্ অক্ষরং যে পর্যুপাসন্তে তে সর্বভূতহিতে রতাঃ তু মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি। (৫) তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাং ক্লেশঃ অধিকতরঃ, হি অব্যক্তা গতিঃ দেহবদ্ভিঃ দুঃখম্ অবাপ্যতে।

(৬-৭) হে পার্থ, যে তু, সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ অনন্যেন

গণ্য করি। (৩-৪) সকল ইন্দ্রিয় বশে রাখিয়া, সর্বত্র সমত্ব পালন করিয়া যাহারা দৃঢ়, অচল, ধীর, অচিন্ত্য, সর্বব্যাপী, অব্যক্ত, অবর্ণনীয়, অবিনাশী স্বরূপের উপাসনা করে তাহারা সকল প্রাণীর হিতে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া আমাকেই পায়। (৫) অব্যক্ত নির্গুণব্রহ্মে আসক্তচিত্ত সেই সাধকগণের সিদ্ধিলাভে অধিকতর ক্লেশ হয়, কারণ দেহধারিগণ অতিকষ্টে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

টিপ্পনী—দেহধারী মনুষ্য অমূর্ত স্বরূপের মাত্র কল্পনাই করিতে পারে, কিন্তু তাহার নিকট অমূর্ত স্বরূপের জন্য একটিও নিশ্চয়াত্মক শব্দ নাই, সেইজন্য তাহাকে নিষেধাত্মক 'নেতি' শব্দ দ্বারাই সন্তোষ পাইতে হয়। এই হেতু মূর্তি-পূজা-নিষেধকারীও সূক্ষ্ম রীতিতে দেখিলে মূর্তি-পূজকই বটে। পুস্তকের পূজা করা—এই সকল সাকার পূজার লক্ষণ। তথাপি সাকারের পরপারে নিরাকার অচিন্ত্য স্বরূপ আছেন, এইরূপ সকলে বুঝিতে পারিলে তবে ছুটি। ভক্তির পরাকাষ্ঠা এই যে, ভক্ত ভগবানে বিলীন হইয়া যায় ও অন্তে এক অদ্বিতীয় অরূপ ভগবানই থাকেন। সাকার দ্বারা এই স্থিতিতে সহজে পৌঁছানো যায়। সেইজন্য নিরাকারে একেবারে সিধা পৌঁছিবার মার্গ কষ্টসাধ্য বলা হইয়াছে।

(৬-৭) কিন্তু হে পার্থ, যাহারা আমাতে পরায়ণ থাকিয়া, সকল কর্ম

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

এব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং অহং মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ ন চিরাৎ সমুদ্ধর্তা ভবামি। (৮) ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় অতঃ ঊর্ধ্বং ময়ি এব নিবসিষ্যসি সংশয় ন। আধৎস্ব—যুক্ত কর। অতঃ ঊর্ধ্বং—এই জন্মের পর।

(৯) হে ধনঞ্জয়, অথ ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি, ততঃ অভ্যাস-যোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ। (১০) অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি মৎকর্মপরমঃ ভব, মদর্থম্ কর্মাণি কুর্বন্ অপি সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি।

আমাকে সমর্পণ করিয়া একনিষ্ঠতার সহিত আমার ধ্যান করিয়া (আমার) উপাসনা করে ও আমাতে যাহাদের চিত্ত গ্রথিত, তাহাদিগকে মৃত্যুরূপী সংসার-সাগর হইতে আমি অচিরে ত্রাণ করি। (৮) তোমার মন আমাতে নিবিষ্ট কর, তোমার বুদ্ধি আমাতে স্থির রাখ, তাহা হইলে এই জন্মের পর নিঃসংশয়ে আমাকে পাইবে।

(৯) যদি তুমি আমাতে তোমার মন স্থির করিতে অসমর্থ হও, তবে হে ধনঞ্জয়, অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে পাওয়ার ইচ্ছা রাখ। (১০) অভ্যাস যোগেও যদি তুমি অসমর্থ হও তবে কর্ম মাত্র আমাকে অর্পণ কর এবং এই রূপে আমার নিমিত্ত কর্ম করিতে করিতেই তুমি মোক্ষ লাভ করিবে।

টিপ্পনী—অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের সাধনা, জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবণ মননাদি, ধ্যান অর্থাৎ উপাসনা। ইহাতে পরিণামে যদি কর্মফল ত্যাগ দেখা না দেয়, তবে অভ্যাস অভ্যাসই নহে, জ্ঞান জ্ঞানই নহে ও ধ্যান ধ্যানই নহে।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌॥ ১১
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

(১১) অথ এতদ্‌ অপি কর্তুম্‌ অশক্তঃ অসি ততঃ মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ যতাত্মবান্‌ সর্বকর্মফলত্যাগং কুরু। (১২) অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে, ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগঃ, ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ।

(১৩-১৪) যঃ সর্বভূতানাম্‌ অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ করুণঃ এব চ নির্মমঃ নিরহঙ্কারঃ, সমদুঃখসুখঃ, ক্ষমী, সততং সন্তুষ্টঃ যোগী, যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ যঃ মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। (১৫) লোকাঃ যস্মাৎ ন উদ্বিজতে, যঃ চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, যশ্চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ। (১৬) যঃ অনপেক্ষঃ

---

(১১) যদি আমার নিমিত্ত কর্ম করিবার মত শক্তিও তোমার না হয়, তবে যত্নপূর্বক সব কর্মের ফল ত্যাগ কর। (১২) অভ্যাসমার্গ হইতে জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যানমার্গ হইতে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই ত্যাগের পরিণামে শীঘ্রই শান্তি লাভ হয়।

(১৩-১৪) যে ব্যক্তি প্রাণীমাত্রের প্রতি দ্বেষরহিত, সকলের মিত্র, দয়াবান্‌, মমতারহিত, অহঙ্কাররহিত, সুখ-দুঃখে সমান, ক্ষমাবান্‌, সর্বদা সন্তুষ্ট, যোগযুক্ত, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহী, দৃঢ়নিশ্চয় ও যে আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে—এইপ্রকার আমার ভক্ত আমার প্রিয়। (১৫) যাহার দ্বারা লোক উদ্বেগ পায় না, যে লোক দ্বারা উদ্বেজিত হয় না, যে হর্ষ, ক্রোধ, ঈর্ষা, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত সে আমার প্রিয়। (১৬) যে ইচ্ছারহিত, পবিত্র, কর্তব্যকর্মে অনলস, পক্ষপাত শূন্য, চিন্তারহিত,

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

শুচিঃ দক্ষঃ উদাসীন গতব্যথঃ সর্বারম্ভপরিত্যাগী চ স মদ্‌ভক্তঃ, মে প্রিয়ঃ। (১৭) যঃ ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি, যঃ শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ।

(১৮-১৯) শত্রৌ চ মিত্রে চ, তথা মানাপমানয়োঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গবিবর্জিতঃ তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ মৌনী, যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ। (২০) ইদং যথোক্তং ধর্মামৃতং যে তু মৎপরমাঃ ভক্তাঃ শ্রদ্দধানাঃ পর্যুপাসতে, তে অতীব মে প্রিয়াঃ।

যে সংকল্প মাত্র ত্যাগ করিয়াছে সে আমার ভক্ত, সে আমার প্রিয়। (১৭) যে ইষ্টলাভে হৃষ্ট হয় না, দ্বেষ করে না, চিন্তা করে না, আশা রাখে না; যে শুভাশুভ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছে, সেই ভক্তি-পরায়ণ মনুষ্য আমার প্রিয়।

(১৮-১৯) শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ এই সকলের সম্বন্ধেই যে সমতাবান্, যে আসক্তি ছাড়িয়াছে, যে নিন্দা ও স্তুতিতে সমান থাকে, যে মৌন ধারণ করে, যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই যাহার সন্তোষ, যাহার নিজের কোনও স্থান নাই, স্থির চিত্ত—এই রকম মুনি-ভক্ত আমার প্রিয়। (২০) যে আমাতে পরায়ণ থাকিয়া, এই পবিত্র অমৃতরূপ জ্ঞানের শ্রদ্ধাপূর্বক অনুশীলন করে সে আমার অতিশয় প্রিয়।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তি-যোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ

এই অধ্যায়ে শরীর ও শরীরীর ভেদ দেখান হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ। ১
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥ ২
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫

শ্রীভগবান্ উবাচ। (১) হে কৌন্তেয়, ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে; এতদ্ যঃ বেত্তি তং তদ্বিদঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি প্রাহুঃ। (২) হে ভারত, সর্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞম্ বিদ্ধি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানম্ (ইতি) মম মতম্। (৩) তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ (তথা) স চ যঃ যৎপ্রভাবঃ চ তৎ সমাসেন মে শৃণু। (৪) বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ পৃথক্, তথা হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ ঋষিভিঃ বহুধা গীতম্। (৫-৬) মহাভূতানি অহঙ্কারঃ,

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে ও ইহা যে জানে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানীরা ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। (২) হে ভারত, সকল ক্ষেত্রে—শরীরে—স্থিত আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদের জ্ঞানই জ্ঞান—ইহাই আমার মত। (৩) এই ক্ষেত্র কি, কেমন, কি রকম বিকারযুক্ত, কোথা হইতে হইয়াছে ও ক্ষেত্রজ্ঞ কে, তাহার শক্তি কি ইহা আমার নিকট হইতে সংক্ষেপে শোন। (৪) বিবিধ ছন্দে, বিভিন্ন রীতিতে, যুক্তি দ্বারা নিশ্চয়াত্মক ব্রহ্মসূচক বাক্যে ঋষিগণ এই বিষয়ে অনেক গান রচনা করিয়াছেন। (৫-৬) পঞ্চ মহাভূত,

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

:, অব্যক্তং চ এব, দশ একং চ ইন্দ্রিয়াণি, ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ পঞ্চ, ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতঃ চেতনা ধৃতিঃ এতৎ সবিকারং ক্ষেত্রং সমাসেন উদাহৃতম্।

(৭-১১) অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্, অহিংসা, ক্ষান্তিঃ, আর্জবম্, আচার্যোপাসনং শৌচং, স্থৈর্যম্, আত্মবিনিগ্রহঃ, ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কারঃ এব চ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্, পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তিঃ অনভিষঙ্গঃ চ,

অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন, পাঁচ বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, সঙ্ঘাত, চেতনাশক্তি, ধৃতি—এগুলি বিকার-সহিত ক্ষেত্র, সংক্ষেপে বলিলাম।

টিপ্পনী—মহাভূত পাঁচটি—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ। অহঙ্কার অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধে বিদ্যমান 'অহং' এর ভাব, অহং-পনা। অব্যক্ত অর্থাৎ অদৃশ্য মায়া, প্রকৃতি। দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—নাক, কান, চোখ, জিহ্বা, চর্ম; তেমনি পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়—হাত, পা, মুখ ও দুই গুহ্যেন্দ্রিয়। পাঁচ গোচর মানে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয়, গন্ধ লওয়া, শোনা, দেখা, আস্বাদ লওয়া, স্পর্শ করা। সঙ্ঘাত অর্থাৎ শরীরের তত্ত্বের একের সহিত অপরের সহযোগিতা করার শক্তি, ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্যরূপী সূক্ষ্ম গুণ নয়, কিন্তু এই শরীরের পরমাণু সকলের একের সহিত অন্যের সংলগ্ন থাকার গুণ। এই গুণ অহং ভাবের জন্যই সম্ভব ও এই অহংভাব অব্যক্ত প্রকৃতিতে রহিয়াছে। এই অহং ভাব মোহশূন্য ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক ত্যাগ করেন। এই জন্য তিনি মৃত্যু সময়েও অন্য আঘাত হইতে দুঃখ পান না। জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলেরই তো শেষে এই বিকার-যুক্ত ক্ষেত্রকে ত্যাগ করিয়া তবে ছুটি।

(৭-১১) অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্যের সেবা, শুদ্ধতা স্থিরতা, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধে বৈরাগ্য, অহঙ্কাররহিত ভাব, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের নিরন্তর বোধ, পুত্র স্ত্রী গৃহ ইত্যাদির

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১
জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বম্, ময়ি চ অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বং জনসংসদি অরতিঃ, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্, এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্; যৎ অতঃ অন্যথা (তৎ) অজ্ঞানম্।

(১২) যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে তৎ জ্ঞেয়ং যৎ (তৎ) প্রবক্ষ্যামি। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম তৎ ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে।

(১৩) তৎ সর্বতঃপাণিপাদং সর্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং সর্বতঃ শ্রুতিমৎ, লোকে সর্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি।

মোহ ও মমতার অভাব, প্রিয় ও অপ্রিয় সম্বন্ধে নিত্য সমভাব, আমার প্রতি অনন্য ধ্যানপূর্বক একনিষ্ঠ ভক্তি, একান্ত স্থলে বাস, জনসমূহের সহিত মিলিত হওয়ার অনিচ্ছা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিত্যতার বোধ, আত্মদর্শন—এই সকলকে জ্ঞান বলে। ইহার বিপরীত যাহা তাহা অজ্ঞান।

(১২) যাহাকে জানিলে মোক্ষ পাওয়া যায় সেই জ্ঞেয় কি তাহা তোমাকে বলিতেছি। তিনি অনাদি পরব্রহ্ম, তাঁহাকে সৎ বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না।

টিপ্পনী—পরমেশ্বরকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না। কোনও এক শব্দ দ্বারা তাঁহার ব্যাখ্যা বা পরিচয় দেওয়া যায় না—এমনি সেই গুণাতীত স্বরূপ।

(১৩) যেখানেই দেখ সেইখানেই তাঁহার হাত, পা, চোখ, মাথা, মুখ ও কান রহিয়াছে। সর্বব্যাপ্ত হইয়া তিনি এই লোকে রহিয়াছেন।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

(১৪) সর্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসম্ সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্, অসক্তম্, সর্বভৃৎ চ এব নির্গুণম্ গুণভোক্তৃ চ। (১৫) (তৎ) ভূতানাং বহিঃ অন্তঃ চ, অচরং চরং চ এব, সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ম্, তৎ দূরস্থং চ অন্তিকে চ। (১৬) ভূতেষু অবিভক্তম্, চ বিভক্তমিব চ স্থিতম্, তৎ জ্ঞেয়ং ভূতভর্তৃ চ গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ। (১৭) তৎ জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ, তমসঃ পরম্ উচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং চ, সর্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতম্।

(১৪) সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের আভাস তাঁহাতে আছে, তবুও সেই স্বরূপ ইন্দ্রিয়-বর্জিত ও সর্বথা অলিপ্ত, আবার তিনি সকলকে ধারণকারী; তিনি গুণরহিত বটেন, তবুও তিনি গুণের ভোক্তা। (১৫) তিনি ভূত সকলের বাহিরে ও ভিতরে। তিনি গতিমান্ ও স্থির। সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে জানা যায় না। তিনি দূরেও আছেন, তিনি নিকটেও আছেন।

টিপ্পনী—যে তাঁহাকে জানে সে তাঁহার ভিতরে। গতি ও স্থিরতা, শান্তি ও অশান্তি আমরা যাহা অনুভব করি এবং অন্যান্য সকল প্রকার ভাব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়, সেই হেতু তিনি গতিমান্ ও স্থির।

(১৬) ভূতগণের মধ্যে তিনি অবিভক্ত আছেন ও বিভক্তের ন্যায়ও রহিয়াছেন। তিনি জানার যোগ্য (ব্রহ্ম), প্রাণিগণের পালক, নাশক ও কর্তা। (১৭) জ্যোতিষ্কদিগের মধ্যে তিনি জ্যোতি, তাঁহাকে অন্ধকারের পরপারে বলা হয়। তিনিই জ্ঞান; তিনি জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞান দ্বারা যাঁহাকে পাওয়া যায় সে তিনিই। তিনি সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯
কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২

(১৮) ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ সমাসতঃ উক্তম্, মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় উপপদ্যতে। (১৯) প্রকৃতিং পুরুষং চ এব উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি। বিকারান্ গুণান্ এব চ প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি। (২০) কার্য-কারণ-কর্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে, সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে পুরুষঃ হেতুঃ উচ্যতে। (২১) পুরুষ প্রকৃতিস্থঃ হি প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে, গুণসঙ্গঃ অস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু কারণম্। (২২) অস্মিন্ দেহে পরঃ পুরুষঃ উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ

(১৮) এই প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে বলিলাম। উহা জানিয়া আমার ভক্ত আমার ভাব পাওয়ার যোগ্য হয়। (১৯) প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি জানিও, বিকার ও গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়—এই প্রকার জানিও। (২০) কার্য ও কারণের হেতু প্রকৃতি এবং পুরুষ সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু—একথা বলা যায়। (২১) পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে এবং গুণসমূহের সংসর্গই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনীতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়।

টিপ্পনী—প্রকৃতিকে আমরা লৌকিক ভাষায় মায়া নামে সম্বোধিত করিয়া থাকি। পুরুষ তো জীব। মায়া অর্থাৎ মূল স্বভাবের বশীভূত জীব সত্ত্ব, রজঃ অথবা তমঃ হইতে উৎপন্ন কার্যের ফলভোগ করে ও কর্ম অনুযায়ী পুনর্জন্ম পায়।

(২২) এই দেহে স্থিত সেই পরম পুরুষকে সর্বসাক্ষী, অনুমতিদাতা, ভর্তা,

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যের মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ। (২৩) যঃ এবং পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ বেত্তি সর্বথা বর্তমানঃ অপি স ভূয়ঃ ন অভিজায়তে। (২৪) কেচিৎ আত্মনা আত্মনি আত্মানম্ ধ্যানেন পশ্যন্তি অন্যে সাংখ্যেন যোগেন, অপরে চ কর্মযোগেন। (২৫) অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা শ্রুতিপরায়ণাঃ উপাসতে অপি মৃত্যুম্ অতিতরন্তি।

(২৬) হে ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং সংজায়তে তৎ ক্ষেত্র-

ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মাও বলা হইয়া থাকে। (২৩) যে ব্যক্তি এই পুরুষকে ও গুণময়ী প্রকৃতিকে জানে সে সকল প্রকার কার্য করিয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না।

টিপ্পনী—২, ৯, ১২ ও অন্যান্য অধ্যায়ের সহায়তায় আমরা জানিতে পারি যে, এই শ্লোক স্বেচ্ছাচারের সমর্থন করার জন্য নহে বরং ভক্তির মহিমা সূচিত করিবার জন্য। কর্মমাত্র জীবের বন্ধনকারক। কিন্তু যদি কেহ সেই সকল কর্মই পরমাত্মায় অর্পণ করে, তবে সে বন্ধনমুক্ত হয় এবং এই প্রকারে যাহার মধ্যে কর্তৃত্বরূপী অহংভাব নাশ পাইয়াছে ও যে চব্বিশ ঘণ্টাই অন্তর্যামীকে দেখিতে থাকে সে পাপ কর্ম করিতেই পারে না। পাপের মূলে অভিমান। অহং নাই তো পাপও নাই। এই শ্লোক পাপ কর্ম না করার যুক্তি দেখাইতেছে।

(২৪) কেহ ধ্যানমার্গে আত্মা দ্বারা আত্মাকে নিজের মধ্যে দেখে, কেহ জ্ঞানমার্গে অন্য কতক কর্মমার্গে দেখে। (২৫) আবার কেহ এই সকল মার্গ না জানায় অপরের নিকট হইতে পরমাত্মার সম্বন্ধে শুনিয়া শ্রুত বিষয়ে শ্রদ্ধা রাখিয়া, তাঁহাতে পরায়ণ থাকিয়া উপাসনা করে। উহারাও মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়।

(২৬) হে ভরতর্ষভ, চর বা অচর যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র ও

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০

ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ (ইতি) বিদ্ধি। (২৭) বিনশ্যৎসু সর্বেষু ভূতেষু অবিনশ্যন্তং সমং তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। (২৮) সর্বত্রং সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্ পশ্যন্ হি আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি। ততঃ পরাং গতিং যাতি। (২৯) সর্বশঃ প্রকৃত্যা এব তু কর্মাণি ক্রিয়মাণানি, তথা আত্মানম্ অকর্তারং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি।

(৩০) যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ একস্থম্, ততঃ এব চ বিস্তারম্ অনুপশ্যতি তদা

ক্ষেত্রজ্ঞর অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে হয়—একথা জানিও। (২৭) সকল নাশবান্ প্রাণীতে অবিনাশী পরমেশ্বর সমভাবে আছেন বলিয়া যে জানে—সে-ই ঠিক জানে। (২৮) ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত বলিয়া যে জানে সে নিজেকে নিজে আঘাত করে না, আর এতদ্দ্বারা সে পরম গতি পায়।

টিপ্পনী—যে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখে সে নিজে তাঁহাতে লীন হয় এবং আর কিছু দেখে না। সেইজন্য সে বিকারের বশ হয় না ও সে কারণ সে মোক্ষ লাভ করে, নিজে নিজের শত্রু হয় না।

(২৯) সর্বত্র প্রকৃতিই কর্ম করে—এই রকম যে বোঝে ও সেই হেতু আত্মাকে অকর্তা রূপে যে জানে—সে-ই ঠিক জানে।

টিপ্পনী—যেমন সুপ্ত মানুষের আত্মা সুপ্তির কর্তা নয়, কিন্তু প্রকৃতিই নিদ্রার কর্ম করে—ইহাও তেমনি। নির্বিকার পুরুষের চক্ষু মন্দ কিছু দেখে না। প্রকৃতি ব্যভিচারিণী নহে। অহঙ্কারী পুরুষ যখন তাহার স্বামী হয় তখন তাহার সঙ্গ-বশতঃ বিষয়-বিকার উৎপন্ন হয়।

(৩০) জীবের অস্তিত্ব পৃথক পৃথক হইলেও যখন সে একেতেই অর্থাৎ ব্রহ্ম-

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। (৩১) হে কৌন্তেয়, অয়ম্ অব্যয়ঃ পরমাত্মা অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ শরীরস্থঃ অপি ন করোতি ন লিপ্যতে। (৩২) সৌক্ষ্ম্যাৎ সর্বগতম্ আকাশং যথা ন উপলিপ্যতে তথা সর্বত্র দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে। (৩৩) যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি তথা হে ভারত, ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি।

(৩৪) যে এবম্ জ্ঞানচক্ষুষা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ বিদুঃ তে পরং যান্তি।

বস্তুতেই সকল অবস্থিত দেখে ও ব্রহ্ম হইতেই নানাত্বের বিস্তার দর্শন করে তখন সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।

টিপ্পনী—অনুভবে সকলই ব্রহ্মতে যে দেখে সে-ই ব্রহ্মকে পায়। তখন জীব শিব হইতে আর ভিন্ন থাকে না।

(৩১) হে কৌন্তেয়, এই অবিনাশী পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ হওয়ায় শরীরে থাকিয়াও কিছু করে না ও কিছুতে লিপ্ত হয় না। (৩২) সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য সর্বব্যাপী আকাশ যেমন লিপ্ত হয় না, তেমনি সকল দেহে বিদ্যমান আত্মা লিপ্ত হয় না। (৩৩) যেমন এক সূর্য এই সমুদয় জগৎকে প্রকাশিত করে তেমনি হে ভারত, এক ক্ষেত্রজ্ঞ সকল ক্ষেত্র বা দেহকে প্রকাশ করে।

(৩৪) যাহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে প্রভেদ এবং ভূত প্রকৃতির বন্ধন হইতে প্রাণীদের মুক্তি কিরূপে হয় তাহা জানে তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ নামে ত্রয়োদশ অধ্যায় পূর্ণ হইল।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ

গুণময়ী প্রকৃতির কিছু পরিচয় দেওয়ার পর সহজেই তিন গুণের বর্ণন এই অধ্যায়ে আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইতেই গুণাতীতের লক্ষণ ভগবান্ উল্লেখ করিতেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞে দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বাদশে ইহা ভক্তের মধ্যে দেখা যায়, আবার এই অধ্যায়েও গুণাতীতে তাহা দেখা যায়।

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২
মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩

শ্রীভগবান্ উবাচ। (১) জ্ঞানানাং যৎ উত্তমং পরং জ্ঞানম্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে ইতঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ (তৎ তে) ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি। (২) ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তি। (৩) হে ভারত, মহদ্‌ব্রহ্ম মম যোনিঃ তস্মিন্ অহং গর্ভং দধামি, ততঃ সর্বভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি। মহদ্‌ব্রহ্ম—প্রকৃতির অপর নাম।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(১) জ্ঞানের মধ্যে যে উত্তম জ্ঞান অনুভব করিয়া মুনিগণ এই দেহ পরিত্যাগ করার পর পরম গতি পাইয়াছেন তাহা আমি তোমাকে পুনর্বার বলিতেছি।

(২) এই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া যাহারা আমার ভাব পাইয়াছে, উৎপত্তিকালে তাহাদের জন্ম-প্রাপ্তি নাই, প্রলয়কালেও ব্যথা-প্রাপ্তি নাই। (৩) হে ভারত, মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতিই আমার গর্ভাধান স্থান। আমি তাহাতে গর্ভাধান করি, তাহা হইতে প্রাণিমাত্রের উৎপত্তি হয়।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮

(৪) হে কৌন্তেয়, সর্বযোনিষু যাঃ মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি মহদ্‌ব্রহ্ম তাসাং যোনিঃ, অহং বীজপ্রদঃ পিতা। (৫) হে মহাবাহো, সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ অব্যয়ং দেহিনম্ দেহে নিবধ্নন্তি। (৬) তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ম্ হে অনঘ, (তৎ সত্ত্বম্) সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি। (৭) হে কৌন্তেয়, রজঃ রাগাত্মকং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং বিদ্ধি, তৎ দেহিনম্ কর্মসঙ্গেন নিবধ্নাতি। (৮) হে ভারত, তমঃ তু অজ্ঞানজং সর্বদেহিনাং মোহনম্ বিদ্ধি তৎ প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিঃ নিবধ্নাতি।

(৪) হে কৌন্তেয়, বিভিন্ন যোনিতে যে সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয় তাহাদের উৎপত্তিস্থান আমার প্রকৃতি এবং আমি তাহাতে বীজরোপণকারী পিতা—পুরুষ। (৫) হে মহাবাহো, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি-উৎপন্ন তিন গুণ, উহারা অবিনাশী আত্মাকে দেহের সম্বন্ধে বাঁধে।

(৬) তাহার মধ্যে সত্ত্ব নির্মল বলিয়া প্রকাশক ও আরোগ্যকর হয়। হে নিষ্পাপ, উহা দেহীকে সুখের ও জ্ঞানের সম্বন্ধে বাঁধে। (৭) হে কৌন্তেয়, রজোগুণ রাগরূপ হওয়ায় উহা তৃষ্ণা ও আসক্তির মূল। উহা দেহধারীকে কর্মপাশে বাঁধে। (৮) হে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞানমূলক। উহা দেহধারী মাত্রকেই মোহে ফেলে। উহা অসাবধানতা, আলস্য ও নিদ্রার বন্ধনে দেহীদিগকে বাঁধে।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩

(৯) হে ভারত, সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি, রজঃ কর্মণি উত তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি। সঞ্জয়তি—সঙ্গ করায়। উত—ও। (১০) হে ভারত, সত্ত্বং রজঃ তমঃ চ আভিভূয় ভবতি, রজঃ সত্ত্বং তমঃ চ (অভিভূয় ভবতি), তথা তমঃ সত্ত্বং রজঃ এব চ (অভিভূয় ভবতি)। (১১) যদা অস্মিন্ দেহে সর্বদ্বারেষু জ্ঞানম্ প্রকাশঃ উপজায়তে তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ। (১২) হে ভরতর্ষভ, রজসি বিবৃদ্ধে লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ কর্মণাম্ আরম্ভঃ, অশমঃ, স্পৃহা, এতানি জায়ন্তে। (১৩) হে কুরুনন্দন, তমসি বিবৃদ্ধে অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তিঃ চ প্রমাদঃ মোহঃ এব চ এতানি জায়ন্তে।

(৯) হে ভারত, সত্ত্বগুণ আত্মাকে শান্তি সুখের সঙ্গ করায়। রজঃ কর্মের ও তমঃ জ্ঞান ঢাকিয়া প্রমাদের সঙ্গ করায়। (১০) হে ভারত, যখন রজঃ তমঃ চাপা থাকে তখন সত্ত্ব উপরে আসে, সত্ত্ব ও তমঃ চাপা থাকিলে তখন রজঃ এবং সত্ত্ব ও রজঃ চাপা থাকিলে তমঃ উপরে আসে। (১১) সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই দেহে যখন প্রকাশ ও জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ জানিও। (১২) হে ভরতর্ষভ, যখন রজোগুণের বৃদ্ধি পায় তখন লোভ, প্রবৃত্তি, কর্মের আরম্ভ, অশান্তি ও ইচ্ছার উদয় হয়। (১৩) হে কুরুনন্দন, যখন তমোগুণের বৃদ্ধি পায় তখন অজ্ঞান, শৈথিল্য, অসাবধানতা এবং মোহ উৎপন্ন হয়।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

(১৪) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু যদা দেহভৃৎ প্রলয়ং যাতি তদা উত্তম-বিদাং অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে। (১৫) রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে। তথা তমসি প্রলীনঃ মূঢ়যোনিষু জায়তে। (১৬) সুকৃতস্য কর্মণঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্ রজসঃ তু দুঃখং ফলং তমসঃ অজ্ঞানং ফলম্ আহুঃ। (১৭) সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সংজায়তে, রজসঃ চ লোভঃ এব, তমসঃ প্রমাদমোহৌ ভবতঃ অজ্ঞানং চ এব।

(১৮) সত্ত্বস্থাঃ ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি, রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি, জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ

---

(১৪) সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে যদি দেহধারীর মৃত্যু হয় তবে সে উত্তম জ্ঞানীদিগের নির্মল লোক পায়। (১৫) রজোগুণে মৃত্যু হইলে পর দেহধারী কর্ম-সঙ্গীর লোকে জন্মগ্রহণ করে। আর তমোগুণে মৃত্যু হইলে মূঢ়যোনিতে জন্মলাভ করে।

টিপ্পনী—কর্ম-সঙ্গী অর্থাৎ মনুষ্যলোক ও মূঢ়যোনি অর্থাৎ পশ্বেতর প্রাণী।

(১৬) সৎকর্মের ফল সাত্ত্বিক ও নির্মল হয়। রাজসিক কর্মের ফলে দুঃখ হয় ও তামসিক কর্মের ফলে অজ্ঞান হয়।

টিপ্পনী—যাহাকে আমরা সুখ-দুঃখ বলি, সেই সুখ-দুঃখের উল্লেখ এখানে বুঝিতে হইবে না। সুখ অর্থাৎ আত্মানন্দ, আত্ম-প্রকাশ, তাহার বিপরীত যাহা তাহাই দুঃখ। ১৭ শ্লোকে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে।

(১৭) সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রজোগুণ হইতে লোভ ও তমোগুণ হইতে অসাবধানতা, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

(১৮) সাত্ত্বিক ব্যক্তি ঊর্ধ্বে উঠে, রাজসিক মধ্যে থাকে ও অন্তিম গুণযুক্ত

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২

তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি। (১৯) যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যং কর্তারং ন অনুপশ্যতি, গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি তদা সঃ মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি। (২০) দেহী দেহসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে।

অর্জুন উবাচ। (২১) হে প্রভো, কৈঃ লিঙ্গৈঃ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি? কিমাচারঃ? কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে?

শ্রীভগবান্ উবাচ। (২২-২৫) হে পাণ্ডব, প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহম্

তামসিক ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়। (১৯) গুণ ছাড়া আর কোনও কর্তা নাই—জ্ঞানী এই রকম যখন দেখে ও গুণের অতীত যে পরমবস্তু তাঁহাকে জানে তখন সে আমার ভাব (ব্রহ্মভাব) পায়।

টিপ্পনী—গুণকে কর্তা বলিয়া যে জানে তাহার অহংভাব হয়ই না। তেমনি তাহার কার্য সর্বপ্রকারে স্বাভাবিক হয় এবং তাহার শরীর-যাত্রা পরমার্থের জন্য হয় বলিয়া তাহার কার্যমাত্রেই নিরন্তর ত্যাগ ও বৈরাগ্য দেখা দেওয়া চাই। এই রকম জ্ঞানী সহজেই গুণের পর যে নির্গুণ ঈশ্বর তাঁহাকে চিনিতে পারে ও তাঁহার ভজনা করে।

(২০) দেহের সঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই তিন গুণ উত্তীর্ণ হইয়া, দেহধারী জন্ম, মৃত্যু ও জরার দুঃখ হইতে মুক্তি পায় ও মোক্ষ লাভ করে।

অর্জুন বলিলেন—(২১) হে প্রভো! এই গুণ হইতে যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগকে কি চিহ্ন দ্বারা জানা যায়? তাহাদের আচার কি? ও তাহারা ত্রিগুণ কি করিয়া উত্তীর্ণ হয়?

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(২২-২৫) হে পাণ্ডব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

এব চ সংপ্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি; নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে গুণাঃ এব বর্তন্তে ইতি যঃ অবতিষ্ঠতি, ন ইঙ্গতে, সমদুঃখ-সুখঃ, স্বস্থঃ, সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ, ধীরঃ, তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ, (যঃ) মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ, সর্বারম্ভপরিত্যাগী চ স গুণাতীতঃ উচ্যতে।

প্রাপ্ত হইলেও যে দুঃখ মনে করে না ও যে উহা অপ্রাপ্ত হইলে পাওয়ার ইচ্ছা করে না, যে উদাসীনের মত স্থির থাকে, যাহাকে গুণসকল বিচলিত করিতে পারে না, গুণই নিজের কার্য করিতেছে এই মনে করিয়া যে স্থির থাকে ও বিচলিত হয় না, যে সুখ-দুঃখে সমতাবান থাকে, স্বাভাবিক থাকে, মাটির ঢেলা পাথর ও সোনা সমান জ্ঞান করে, প্রিয় ও অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া এক রকম থাকে, নিন্দা ও স্তুতি যাহার নিকট সমান, এই প্রকার বুদ্ধি যাহার; যাহার নিকট মান ও অপমান সমান, যাহার মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষের বিষয়ে সমভাব, ও যে সমস্ত আরম্ভ ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে গুণাতীত বলা যায়।

টিপ্পনী—২২ হইতে ২৫ শ্লোক এক সঙ্গে বিচার করিতে হইবে। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ পূর্বের শ্লোক অনুসারে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের পরিণাম বা চিহ্ন। অর্থাৎ গুণসকলের পরিচয় যে পাইয়াছে তাহার উপর উহাদের পরিণামের প্রভাব হয় না—ইহাই বলা এখানে উদ্দেশ্য। পাথর প্রকাশের ইচ্ছা করে না, প্রবৃত্তিও জড়তার দ্বেষ করে না, ইহাতে ইচ্ছার উদ্রেক ছাড়াও শান্তি রহিয়াছে। উহাকে যদি কেহ গতি দেয় তো উহা তাহার প্রতি দ্বেষ করে না। গতি দেওয়ার পর স্থির করিয়া রাখিলেও প্রবৃত্তি বা গতি বন্ধ হওয়ায় মোহ বা জড়তা প্রাপ্তি হইল বলিয়া তাহার দুঃখ হয় না, পরন্তু সেই স্থিতিতেই সে একই রকম থাকে। পাথরে ও গুণাতীতে ভেদ এই যে, গুণাতীত চেতনময় ও সে জ্ঞানপূর্বক গুণের পরিণাম বা স্পর্শ ত্যাগ করে

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭

(২৬) যঃ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন মাং সেবতে স এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। (২৭) অহম্ ব্রহ্মণঃ অমৃতস্য অব্যয়স্য চ প্রতিষ্ঠা (তথা) শাশ্বতস্য ধর্মস্য চ ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ।

ও জড় পাথরের ন্যায় হইয়া যায়। পাথর গুণের অর্থাৎ প্রকৃতির কার্যের সাক্ষী মাত্র, কিন্তু কর্তা নহে। তেমনি জ্ঞানীও কার্যের সাক্ষী মাত্র হয়, কর্তা থাকে না। এই প্রকার জ্ঞানীর সম্বন্ধে কল্পনা করা যায় যে, সে ২৩ শ্লোকের উক্তি অনুযায়ী "গুণ নিজের কার্য করিতেছে" এমন বুঝিয়া বিচলিত হয় না, দৃঢ় থাকে, উদাসীনের ন্যায় বসিয়া থাকে অর্থাৎ অটল থাকে। এই গুণে তন্ময় হওয়ার স্থিতি আমরা ধৈর্যপূর্বক কেবল কল্পনায় বুঝিতে পারি, অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু সেই কল্পনাকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা আমাদের "আমিত্ব" দিন দিন কমাইতে ও অবশেষে গুণাতীতের স্থিতির নিকট পৌঁছিতে ও তাহার দর্শন করিতে পারি। গুণাতীত নিজের স্থিতি অনুভব করিতে পারে বর্ণন করিতে পারে না, যদি বর্ণন করিতে পারে তবে সে গুণাতীত নহে, কেননা তাহাতে অহং ভাব রহিয়াছে। সাত্ত্বিকতা গুণাতীতের নিকট হইতে নিকটতম অবস্থা—ইহাই গীতা স্থানে স্থানে স্পষ্ট করিয়াছে। সেই হেতু মানুষ মাত্রেরই সত্ত্বগুণের বিকাশ করার প্রযত্ন করা চাই। উহা হইতে গুণাতীত অবস্থা পাওয়া যাইবেই—এই বিশ্বাস রাখিবে।

(২৬) যে একনিষ্ঠ ভক্তিযোগ দ্বারা আমার সেবা করে, সে-ই এই গুণসকল পার হইয়া ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হয়। (২৭) আর ব্রহ্মের স্থিতি আমিই, শাশ্বত মোক্ষের স্থিতি আমি, তেমনি সনাতন ধর্মের ও উত্তম সুখের যে স্থিতি তাহাও আমিই।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ নামে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম-যোগ

এই অধ্যায়ে ক্ষর ও অক্ষরের উর্ধ্বে তাঁহার যে উত্তম স্বরূপ তাহা ভগবান্ বুঝাইতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

শ্রীভগবান্ উবাচ। (১) ঊর্ধ্বমূলম্ অধঃ শাখম্ অব্যয়ং অশ্বত্থং প্রাহুঃ যস্য পর্ণানি ছন্দাংসি; তং যঃ বেদ স বেদবিৎ। ছন্দাংসি—বেদ অর্থাৎ ধর্মের শুদ্ধ জ্ঞান। (২) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ তস্য শাখাঃ অধঃ ঊর্ধ্বং চ প্রসৃতাঃ, কর্মানুবন্ধীনি মূলানি অধঃ মনুষ্যলোকে অনুসন্ততানি চ। বিষয়প্রবালাঃ—বিষয়রূপ পল্লববিশিষ্ট। প্রসৃতাঃ—বিস্তৃত। অনুসন্ততানি—ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(১) যাহার মূল উচ্চে, যাহার শাখা নীচে ও বেদ যাহার পত্র এমন অবিনাশী অশ্বত্থ বৃক্ষকে পণ্ডিতেরা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যিনি জানেন তিনি বেদজ্ঞ জ্ঞানী।

টিপ্পনী—'শ্ব' শব্দের অর্থ আগামী কাল। তাহা হইতে অশ্বত্থ অর্থাৎ আগামী কাল পর্যন্ত টিকিবে না, এমন ক্ষণিক সংসার সূচিত হয়। সংসারের প্রতিক্ষণ রূপান্তর হইতেছে, সেইহেতু উহা অশ্বত্থ। কিন্তু এমন অবস্থাতেও উহা সর্বদাই রহিয়াছে ও উহার মূল উর্ধ্বে অর্থাৎ ঈশ্বরে—এই জন্য উহা অবিনাশী। উহাতে যদি বেদ অর্থাৎ ধর্মের শুদ্ধ জ্ঞানরূপী পত্র না হয় তবে উহা শোভা পায় না। এই প্রকার সংসারের যথার্থ জ্ঞান যাহার আছে ও যে ধর্মকে জানে সে-ই জ্ঞানী।

(২) গুণের স্পর্শ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও বিষয়রূপী প্রবালযুক্ত এই অশ্বত্থের ডাল নীচে উপরে বিস্তৃত। কর্মের বন্ধনকারী তাহার মূল নীচে মনুষ্যলোকে বিস্তৃত রহিয়াছে।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪
নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

(৩-৪) ইহ অস্য রূপম্ ন উপলভ্যতে ; অন্তঃ ন, আদিঃ চ ন, সম্প্রতিষ্ঠা চ ন ; এনম্ সুবিরূঢ়মূলম্ অশ্বত্থম্ দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা, "যতঃ পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা তমেব চ আদ্যম্ পুরুষম্ প্রপদ্যে" (এবম্ চিন্তয়েৎ) ; ততঃ তৎপদম্ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতাঃ ভূয়ঃ ন নিবর্তন্তি।

(৫) নির্মানমোহাঃ, জিতসঙ্গদোষাঃ, অধ্যাত্মনিত্যাঃ, বিনিবৃত্তকামাঃ, সুখ-

---

টিপ্পনী—অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা সংসার বৃক্ষের বর্ণনা! সে উচ্চে ঈশ্বরে স্থিত মূল দেখে না, পরন্তু বিষয়ের রমণীয়তায় মুগ্ধ থাকিয়া তিনগুণ দ্বারা এই বৃক্ষকে পোষণ করে ও মনুষ্যলোকে কর্ম-পাশে বদ্ধ হয়।

(৩-৪) ইহার যথার্থ স্বরূপ দৃষ্টিতে আসে না। ইহার অন্ত নাই, আদি নাই, ভিত্তি নাই। অত্যন্ত গভীর-প্রবিষ্ট মূলযুক্ত এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপী বলবান্ অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিয়া মানুষের এই প্রার্থনা করা উচিত যে, "যিনি সনাতন প্রবৃত্তি বা মায়া বিস্তার করিয়াছেন সেই আদি পুরুষের যেন আশ্রয় পাই।" আর সেই পদের খোঁজ করা চাই যাহা পাইলে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়িতে হয় না।

টিপ্পনী—অসঙ্গ অর্থাৎ অসহযোগ, বৈরাগ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বিষয়ের সহিত অসহযোগ না করে, বিষয়ের প্রলোভন হইতে দূরে না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাহাতে পড়িতেই থাকে। বিষয়ের সহিত ক্রীড়ার আনন্দ ভোগ করা ও তাহাতে অলিপ্ত থাকা—ইহা ঘটিয়া উঠে না—ইহাই এই শ্লোক দেখাইতেছে।

৫) যে মান-মোহ ত্যাগ করিয়াছে, যে আসক্তি-উৎপন্ন দোষ দূর করিয়াছে,

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

দুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ, অমূঢ়াঃ তৎ অব্যয়ম্ পদম্ গচ্ছন্তি। (৬) সূর্যঃ তৎ ন ভাসয়তে তথা শশাঙ্কঃ ন, পাবকঃ ন, যৎ গত্বা ন নিবর্তন্তে তৎ মম পরমম্ ধাম। (৭) মমৈব সনাতনঃ অংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি। (৮) ঈশ্বরঃ যৎ শরীরম্ অবাপ্নোতি, যচ্চ অপি উৎক্রামতি বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্ ইব এতানি গৃহীত্বা সংযাতি।

(৯) অয়ং শ্রোত্রম্ চক্ষুঃ স্পর্শনম্ রসনম্ ঘ্রাণম্ এব চ মনশ্চ অধিষ্ঠায়

যে আত্মায় নিত্য নিমগ্ন, যাহার ইন্দ্রিয় শান্ত হইয়াছে, সুখদুঃখরূপী দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত সেই জ্ঞানী অবিনাশী পদ পায়। (৬) সেখানে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির প্রকাশ দেখা যায় না। যেখানে গেলে পুনরায় জন্ম নাই তাহাই আমার পরম ধাম। (৭) আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীব হইয়া প্রকৃতিতে স্থিত পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করে। (৮) জীবভূত এই আমার অংশরূপী ঈশ্বর যখন শরীর-ধারণ করে অথবা ত্যাগ করে তখন বায়ু যেমন আশ-পাশের পরিবেশ হইতে গন্ধ লইয়া যায়, তেমনি ইহা মন সহিত ইন্দ্রিয় সকলকে সাথে লইয়া যায়।

(৯) জীবাত্মা কান, চোখ, চর্ম, জিভ, নাক ও মনের আশ্রয় লইয়া বিষয়ের ভোগ করে।

টিপ্পনী—এখানে বিষয় শব্দের অর্থ উৎকট ভোগ-বিলাস নয়, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া মাত্র—যেমন চক্ষুর দ্বারা দেখি, কান দ্বারা শুনি, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ লই। এই ক্রিয়া সকল যদি বিকারযুক্ত বা অহংভাবযুক্ত হয় তবে তাহা দোষযুক্ত বলা হয়। যখন নির্বিকার হয় তখন উহা নির্দোষ হয়। বালক চোখে দেখিয়া, স্পর্শ করিয়া বিকার প্রাপ্ত হয় না। নীচের শ্লোকে এই কথা বলা হইয়াছে।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩

বিষয়ান্ উপসেবতে। (১০) উৎক্রামন্তম্, স্থিতম্ বা অপি গুণান্বিতম্ ভুঞ্জানম্ বা বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি। (১১) যোগিনঃ যতন্তঃ আত্মনি অবস্থিতম্ এনম্ পশ্যন্তি অকৃতাত্মনঃ অচেতসঃ যতন্তঃ অপি এনম্ ন পশ্যন্তি।

(১২) আদিত্যগতম্ যৎ তেজঃ অখিলম্ জগৎ ভাসয়তে যৎ চন্দ্রমসি যৎ চ অগ্নৌ তৎ মামকম্ তেজঃ বিদ্ধি। (১৩) অহম্ চ ওজসা গাম্ আবিশ্য ভূতানি ধারয়ামি রসাত্মকঃ সোমঃ চ ভূত্বা সর্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি। ওজসা—

(১০) শরীর ত্যাগ করায় অথবা তাহাতে থাকায় অথবা গুণের আশ্রয় লইয়া ভোগ করায় উহার অংশরূপী ঈশ্বরকে নির্বোধ ব্যক্তি দেখে না, কিন্তু দিব্যচক্ষু জ্ঞানী দেখিতে পায়। (১১) যোগিগণ প্রযত্ন করিয়া অন্তরস্থিত ঈশ্বরকে দেখিতে পায়। যে আত্ম-শুদ্ধি লাভ করে নাই এমন মূঢ় যত্ন করিলেও তাহাকে দেখিতে পায় না।

টিপ্পনী—ইহাতে ও নবম অধ্যায়ে দুরাচারীর প্রতি ভগবান্ যে বাক্য বলিয়াছেন তাহার সহিত বিরোধ নাই। অকৃতাত্মা মানে ভক্তিহীন, স্বেচ্ছাচারী, দুরাচারী। যে নম্রতা ও শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরকে ভজনা করে সে আত্ম-শুদ্ধ হয় ও ঈশ্বরের দর্শন পায়। যে যম-নিয়মাদি পালন না করিয়া কেবল বুদ্ধি-প্রয়োগ দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে চায় সে অচেতন, হৃদয়হীন; রামবিহীন ব্যক্তি রামকে দেখিতে পায় না।

(১২) সূর্যের যে তেজ জগৎ উদ্ভাসিত করে ও যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই—ইহা জানিও। (১৩) আমার শক্তি পৃথিবীতে প্রবেশ করাইয়া প্রাণিগণকে ধারণ করি ও রস উৎপাদনকারী চন্দ্র হইয়া সকল

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥ ১৪
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

শক্তিদ্বারা। গাম্—পৃথিবীতে। সোমঃ—চন্দ্র। (১৪) অহম্ প্রাণিনাম্ দেহম্ আশ্রিতঃ বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (সন্) চতুর্বিধম্ অন্নম্ পচামি। বৈশ্বানরঃ—জঠরাগ্নি। (১৫) অহম্ চ সর্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ; মত্তঃ স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনম্ চ; সর্বৈঃ বেদৈঃ চ অহম্ এব বেদ্যঃ; বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ চ অহম্ এব। (১৬) লোকে ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ ইতি দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ, সর্বভূতানি ক্ষরঃ কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে। (১৭) উত্তমঃ পুরুষঃ তু অন্যঃ, পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ যঃ অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্তি।

বনস্পতিকে পোষণ করি। (১৪) আমি প্রাণিদেহে আশ্রয় লইয়া জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা চারিপ্রকার অন্ন পরিপাক করি। (১৫) আমি অন্তর্যামীরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি, আমা হইতেই প্রাণিগণের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞানের বিলোপও সম্পাদিত হয়। আমিই বেদসমূহের একমাত্র জ্ঞাতব্য, আমিই আচার্যরূপে বেদান্তের অর্থ প্রকাশক এবং আমিই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বেদার্থ পরিজ্ঞাত হই।

(১৬) এই লোকে ক্ষর অর্থাৎ নাশবান্ ও অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী এমন দুই পুরুষ আছেন। ভূতমাত্রই ক্ষর, তাহাদের মধ্যে স্থির যে অন্তর্যামী তাঁহাকে অক্ষর বলে। (১৭) ইহার উপরিস্থিত উত্তম পুরুষ ইহা হইতে ভিন্ন। তাঁহাকে পরমাত্মা বলে। এই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোকে প্রবেশ করিয়া উহার পোষণ করেন।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

(১৮) যস্মাৎ অহম্ ক্ষরম্ অতীতঃ অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ চ, অতঃ লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ (ইতি) প্রথিতঃ অস্মি। (১৯) হে ভারত, অসম্মূঢ়ঃ যঃ মাম্ এবম্ পুরুষোত্তমম্ জানাতি সঃ সর্ববিৎ, (সঃ) মাম্ সর্বভাবেন ভজতি। (২০) হে অনঘ, ইতি ইদম্ গুহ্যতমম্ শাস্ত্রম্ ময়া উক্তম্। হে ভারত, এতৎ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ।

(১৮) যেহেতু আমি ক্ষর হইতে অতীত ও অক্ষর হইতেও উত্তম, সেই হেতু লোক-ব্যবহারে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত। (১৯) হে ভারত, মোহ-রহিত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া যে জানে, সে সকলই জানে ও আমাকে পূর্ণভাবে ভজনা করে। (২০) হে অনঘ, এই গুহ্য হইতে গুহ্য শাস্ত্র আমি তোমাকে বলিলাম। হে ভারত, ইহা জানিয়া মানুষ বুদ্ধিমান্ ও কৃতকৃত্য হয়।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-যোগ নামে পঞ্চদশ অধ্যায় পূর্ণ হইল।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্‌-বিভাগ-যোগ

এই অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্‌॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩

শ্রীভগবান্‌ উবাচ। (১-৩) হে ভারত, অভয়ম্‌ সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ দানম্‌ দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ আর্জবম্‌ অহিংসা সত্যম্‌ অক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তিঃ অপৈশুনম্‌ ভূতেষু দয়া আলোলুপ্ত্বম্‌ মার্দবম্‌ হ্রীঃ অচাপলম্‌ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্‌ অদ্রোহঃ নাতিমানিতা দৈবীম্‌ সম্পদম্‌ অভিজাতস্য ভবন্তি।

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন—(১-৩) হে ভারত, অভয়, অন্তঃকরণশুদ্ধি, জ্ঞানে ও যোগে নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন, ভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, মর্যাদা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, নিরভিমান—এই সকল গুণ যিনি দৈবীসম্পদ্‌ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাতে দেখা যায়।

টিপ্পনী—দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, অপৈশুন অর্থাৎ কাহারও অগোচরে নিন্দা না করা, অলোলুপতা অর্থাৎ লোভী না হওয়া, লম্পট না হওয়া; তেজ অর্থাৎ প্রত্যেক হীনবৃত্তির বিরোধিতা করিবার প্রবল ইচ্ছা, অদ্রোহ অর্থাৎ কাহারও মন্দ করার ইচ্ছা না করা, মন্দ না করা।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্‌॥ ৪
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্‌ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌॥ ৮

(৪) দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ ক্রোধঃ পারুষ্যম্‌ এব চ অজ্ঞানম্‌ চ হে পার্থ, আসুরীম সম্পদম্‌ অভিজাতস্য (ভবন্তি)। (৫) দৈবী সম্পদ্‌ বিমোক্ষায় আসুরী নিবন্ধায় মতা। হে পাণ্ডব, মা শুচঃ (ত্বম্‌) দৈবীম্‌ সম্পদম্‌ অভিজাতঃ অসি। (৬) অস্মিন্‌ লোকে দ্বৌঃ ভূতসর্গে), দৈবঃ আসুরঃ চ এব। হে পার্থ, দৈবঃ, বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ, আসুরম্‌ মে শৃণু। ভূত—প্রাণী। সর্গ—সৃষ্টি। (৭) আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিম্‌ চ নিবৃত্তিম্‌ চ ন বিদুঃ। তেষু ন শৌচম্‌ ন চ অপি আচারঃ ন সত্যম্‌ বিদ্যতে। (৮) তে আহুঃ জগৎ অসত্যম্‌ অপ্রতিষ্ঠম্‌

(৪) হে পার্থ, দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য, অজ্ঞান, এই সকল আসুরী সম্পদ্‌ লইয়া জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে দেখা যায়।

টিপ্পনী—যাহা নিজের মধ্যে নাই তাহা দেখানো দম্ভ, ছল ও ভণ্ডামী ভাব, দর্প অর্থাৎ অহংকার, পারুষ্য অর্থ কঠোরতা।

(৫) দৈবী সম্পদ্‌ মোক্ষ-দানকারী ও আসুরী সম্পদ্‌ বন্ধনকারী বলিয়া গণ্য। হে পাণ্ডব, তুমি বিষাদগ্রস্ত হইও না, তুমি দৈবী সম্পদ্‌ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। (৬) হে পার্থ, জগতে দৈবী ও আসুরী—দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। দৈবী প্রকৃতির বিস্তারপূর্বক বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে আসুরী প্রকৃতির কথা শোনো। (৭) আসুরী লোকেরা প্রবৃত্তি কি, নিবৃত্তি কি তাহা জানে না। তেমনি তাহাদের শৌচ, আচার ও সত্যের জ্ঞান নাই। (৮) তাহারা বলে যে, জগৎ অসত্য, আশ্রয়শূন্য ও ঈশ্বরশূন্য, কেবল স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ হইতেই

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥ ১১

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪

অনীশ্বরম্ অপরস্পরসম্ভূতম কামহৈতুকম্ অন্যৎ কিম্। অপরস্পরসম্ভূতম্—পরস্পর-সম্ভূত অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন। কামহৈতুকম্—কামনার হেতু, বিষয় ভোগ। (৯) উগ্রকর্মাণঃ নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য অহিতাঃ (সন্তঃ) জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি। (১০) দুষ্পূরম্ কামম্ আশ্রিত্য দম্ভমানমদান্বিতাঃ অশুচিব্রতাঃ মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা প্রবর্তন্তে। (১১-১২) প্রলয়ান্তাম্ অপরিমেয়াম্ চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ কামোপভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতিনিশ্চিতাঃ আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে। এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ—ইহাই শেষ, ভোগই শেষ, এরূপ নিশ্চয়কারী। (১৩-১৬) অদ্য ময়া ইদম্ লব্ধম্ ইমম্ মনোরথম্ প্রাপ্স্যে,

উৎপন্ন। উহাতে বিষয়ভোগ ছাড়া আর কি হেতু থাকিতে পারে? (৯) ক্রূর কর্মকারী মন্দ-বুদ্ধি দুষ্টেরা এই অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া জগতের শত্রু হইয়া জগতের নাশের জন্য উৎপন্ন হয়। (১০) দুষ্পূর কামনায় পূর্ণ, দম্ভপরায়ণ, মানী, মদান্ধ, অশুভ সংকল্পযুক্ত হইয়া মোহবশে মন্দ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়। (১১-১২) মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপরিমেয় বিষয়-চিন্তার আশ্রয় লইয়া কামনাভোগী, 'ভোগই সর্বস্ব' এইরূপ নিশ্চয়কারী শত আশার জালে পড়িয়া কামী, ক্রোধী বিষয় ভোগের জন্য অন্যায়পূর্বক দ্রব্যসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে। (১৩-১৬) আজ ইহা পাইলাম, এই মনোরথ পূর্ণ হইল, এত ধন আমার আছে, ভবিষ্যতে

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥ ১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

ইদং মে অস্তি, ইদমপি ধনং পুনঃ মে ভবিষ্যতি, অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ, অপরান্ অপি চ হনিষ্যে, অহম্ ঈশ্বরঃ, অহম্ ভোগী, অহম্ সিদ্ধঃ বলবান্ সুখী চ, (অহম্) আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি, অহম্ যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে চ ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজালসমাবৃতাঃ কামভোগেষু প্রসক্তাঃ অশুচৌ নরকে পতন্তি।

(১৭) আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমান-মদান্বিতাঃ দম্ভেন অবিধিপূর্বকম্ নাম-যজ্ঞৈঃ তে যজন্তে। (১৮) অহঙ্কারম্ বলম্ দর্পম্ কামম্ ক্রোধম্ চ সংশ্রিতাঃ অভ্যসূয়কাঃ আত্মপরদেহেষু মাম্ প্রদ্বিষন্তঃ। (১৯) তান্ দ্বিষতঃ ক্রূরান্ অশুভান্

আরো এত হইবে; এই শত্রুকে মারিলাম, অপরকেও মারিব, আমি সর্বসম্পন্ন, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি শ্রীমন্ত, আমি কুলীন, আমার মত আর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব— অজ্ঞানে মূঢ় হইয়া লোক এইরূপ মনে করে ও অনেক ভ্রমে পড়িয়া মোহজালে জড়াইয়া বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া অশুভ নরক ভোগ করে।

(১৭) নিজেকে শ্রেষ্ঠ গণ্যকারী, অবিনয়ী এবং ধন ও মান-মদে গর্বিত (লোক) দম্ভ পূর্বক বিধিবিহীন ও নামেই মাত্র যজ্ঞ করিয়া থাকে।

(১৮) অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রয় লইয়া এইরূপ নিন্দাকারীরা তাহাদের ও অন্যের ভিতর অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে। (১৯) এই নীচ, দ্বেষ-পরায়ণ, ক্রূর, অমঙ্গলকারী নরাধমদিগকে আমি এই সংসারে আসুরী

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩

নরাধমান্ অহম্ সংসারেষু আসুরীষু এব যোনিষু অজস্রম্ ক্ষিপামি। (২০) হে কৌন্তেয়, জন্মনি জন্মনি আসুরীম্ যোনিম্ আপন্নাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মূঢ়াঃ ততঃ অধমাম্ গতিম্ যান্তি।

(২১) কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ আত্মনঃ নাশনম্ নরকস্য ত্রিবিধম্ দ্বারম্। তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ। (২২) হে কৌন্তেয়, এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি, ততঃ পরাম্ গতিম্ যাতি। (২৩) যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য কামকারতঃ বর্ততে সঃ সিদ্ধিম্ ন অবাপ্নোতি, ন সুখম্, ন পরাম্ গতিম্ (অবাপ্নোতি)।

যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি। (২০) হে কৌন্তেয়, এই সকল মূঢ় ব্যক্তি জন্মে-জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় ও আমাকে না পাইয়া এমনি করিয়া একেবারে অধোগতি লাভ করে।

(২১) কাম, ক্রোধ ও লোভ—আত্মাকে নাশ করিবার জন্য নরকের এই তিনটি দ্বার। সুতরাং এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে।

(২২) হে কৌন্তেয়, এই ত্রিবিধ নরকের দ্বার হইতে দূরে থাকিয়া মানুষ আত্মার কল্যাণ সাধন পূর্বক পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

(২৩) যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় ভোগে লীন হয় সে সিদ্ধি পায় না, সুখ পায় না, পরম গতিও লাভ করে না।

টিপ্পনী—শাস্ত্র-বিধি অর্থে ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত অনেক ক্রিয়া নহে, পরন্তু অনুভব-জ্ঞানযুক্ত সৎপুরুষ-প্রদর্শিত সংযমমার্গ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥ ২৪

(২৪) তস্মাৎ কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ শাস্ত্রম্ তে প্রমাণম্। শাস্ত্রবিধানোক্তম্ জ্ঞাত্বা ইহ কর্ম কর্তুম্ অর্হসি।

(২৪) সেই হেতু কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে তুমি শাস্ত্রকেই প্রমাণ জানিবে। শাস্ত্র-বিধি কি তাহা জানিয়া যথাধিকার কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও।

টিপ্পনী—যাহা উপরে বলা হইয়াছে, এখানেও 'শাস্ত্র' শব্দের সেই অর্থ। সকলেরই নিজ নিজ নিয়ম গড়িয়া স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয় বরং ধর্ম অনুভবকারীগণের বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা উচিত, ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগ-যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ

শাস্ত্রীয় আচরণ-বিধি অর্থাৎ শিষ্টাচার প্রামাণ্য গণ্য করা উচিত—এই প্রকার শুনিয়া অর্জুনের আশঙ্কা হয়, সে জানিতে ইচ্ছা করে যে, শিষ্টাচার স্বীকার না করিয়াও যে শ্রদ্ধাপরায়ণ থাকে তাহার কি প্রকার গতি হয়। ইহার উত্তর দেওয়ার প্রযত্ন এই অধ্যায়ে হইয়াছে। শিষ্টাচাররূপ দীপস্তম্ভ ত্যাগ করিলে শ্রদ্ধা নাশের আশঙ্কা আছে, ইহা ভগবান্ অনুগ্রহপূর্বক জানাইতেছেন এবং সেই হেতু শ্রদ্ধা ও উহার আশ্রয়াধীন যজ্ঞ তপ ও দানাদিকে গুণ অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং 'ওঁ তৎসৎ'-এর মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ। (১) হে কৃষ্ণ, যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যজন্তে, তেষাং কা নিষ্ঠা? সত্ত্বং রজঃ আহো তমঃ?

শ্রীভগবান্ উবাচ। (২) দেহিনাং সা স্বভাবজা শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চ ইতি ত্রিবিধা ভবতি, তাং শৃণু। (৩) হে ভারত, সর্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি। অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ, যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ সঃ এব সঃ।

অর্জুন বলিলেন—(১) শাস্ত্র-বিধি অর্থাৎ শিষ্টাচার যে মানে না, যে কেবল শ্রদ্ধা হইতেই পূজাদি করে, তাহার গতি কি প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক?

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(২) হে পার্থ, স্বভাবতঃই মানুষের তিন প্রকারের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। (৩) হে ভারত, নিজের শ্রদ্ধা নিজের স্বভাবের অনুসরণ করে। মানুষের কোনও না কোনও বিষয়ে শ্রদ্ধা তো আছেই। যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেই প্রকারের হয়।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬
আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭
আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য সুখপ্রীতি-বিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮
কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯

(৪) সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে, রাজসাঃ যক্ষঃরক্ষাংসি, অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে। (৫-৬) যে দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ অশাস্ত্রবিহিতম্ ঘোরম্ তপঃ তপ্যন্তে (তে) অচেতসঃ শরীরস্থম্ ভূতগ্রামম্ অন্তঃশরীরস্থম্ মাম্ চ কর্শয়ন্তঃ, তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি। (৭) সর্বস্য আহারঃ তু অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি যথা যজ্ঞঃ তপঃ দানম্ চ; তেষাম্ ইমম্ ভেদম্ শৃণু। (৮) আয়ুঃসত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ। (৯) কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ

(৪) সাত্ত্বিক লোক দেবতাদিগকে ভজনা করে, রাজসিক লোকেরা যক্ষ ও রাক্ষসের ভজনা করে এবং অন্যান্য তামসিক লোকেরা ভূত প্রেতাদির পূজা করে। (৫-৬) দম্ভ ও অহঙ্কার-যুক্ত কাম ও রাগ দ্বারা প্রেরিত হইয়া যাহারা শাস্ত্রীয় বিধিবিহীন ঘোর তপ করে সেই মূঢ়েরা শরীর মধ্যস্থ পঞ্চ মহাভূত ও অন্তঃকরণস্থ আমাকেও কষ্ট দেয়। ইহাদিগকে আসুরী সংস্কার-যুক্ত জানিও। (৭) আহারও তিন প্রকারের প্রিয় হয়। তেমনি যজ্ঞ, তপ ও দানও (তিন প্রকারের) প্রিয় হয়। তাহাদের মধ্যে এই ভেদের বিষয় শ্রবণ কর। (৮) আয়ু, সাত্ত্বিকতা, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচিবর্ধনকারী রসযুক্ত স্নিগ্ধ হৃদ্য ও প্রীতিকর আহার সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়। (৯) কটু, অম্ল, লবণ

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪

দুঃখশোকাময়প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ। (১০) যাতযামম্ গতরসম্ চ পূতি পর্য্যুষিতম্ উচ্ছিষ্টম্ অপি চ অমেধ্যম্ যৎ ভোজনম্ (তৎ) তামসপ্রিয়ম্। (১১) অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায় বিধিদিষ্টঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে সঃ সাত্ত্বিকঃ। (১২) হে ভরতশ্রেষ্ঠ ফলম্ অভিসন্ধায় অপি চ দম্ভার্থম্ এব বা যৎ ইজ্যতে তম্ যজ্ঞম্ রাজসম্ বিদ্ধি। (১৩) বিধিহীনম্ অসৃষ্টান্নম্ মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণম্ শ্রদ্ধাবিরহিতম্ যজ্ঞম্ তামসম্ পরিচক্ষতে। অসৃষ্টান্নম্—যাহাতে অন্নের সৃষ্টি নাই। অদক্ষিণম্—যাহাতে ত্যাগ নাই। (১৪) দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনম্ শৌচম্ আর্জবম্ ব্রহ্মচর্যম্ অহিংসা চ শারীরম্ তপঃ উচ্যতে।

অত্যন্ত গরম, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ ও দাহকারক আহার রাজসিক লোকের প্রিয়; আর উহা দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপন্নকারী হয়।

(১০) যাহা প্রহরাবধি পড়িয়া আছে, নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসি, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র—এইরূপ ভোজন তামসিক লোকের প্রিয়। (১১) যাহাতে ফলের ইচ্ছা নাই, বিধিপূর্বক কর্তব্য বুঝিয়া, মন লাগাইয়া যে যজ্ঞ করা হয় উহা সাত্ত্বিক। (১২) হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যাহা ফল লাভের উদ্দেশ্যে ও দম্ভ পূর্বক হয়, সে যজ্ঞ রাজসিক বলিয়া জানিও। (১৩) যাহাতে বিধি নাই, অন্নের উৎপত্তি নাই, মন্ত্র নাই, ত্যাগ নাই, শ্রদ্ধা নাই, সে যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলে।

(১৪) দেব, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানীদের-পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা—এই সকলকে শারীরিক তপ বলা হয়।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭
সৎকার-মান-পূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

(১৫) অনুদ্বেগকরম্ সত্যম্ প্রিয়হিতম্ বাক্যম্ চ যৎ স্বাধ্যায়াভ্যসনম্ চ এব (তৎ) বাঙ্ময়ম্ তপঃ উচ্যতে। (১৬) মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ মানসম্ তপঃ উচ্যতে। (১৭) যুক্তৈঃ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তম্ তৎ ত্রিবিধম্ তপঃ সাত্ত্বিকম্ পরিচক্ষতে। (১৮) সৎকারমানপূজার্থম্ যৎ তপঃ চ দম্ভেন এব ক্রিয়তে তৎ ইহ চলম্ অধ্রুবম্ রাজসম্ প্রোক্তম্।

(১৯) মূঢ়গ্রাহেণ আত্মনঃ পীড়য়া, পরস্য উৎসাদনার্থম্ যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। (২০) দাতব্যম্ ইতি অনুপকারিণে দেশে কালে

---

(১৫) যাহা দ্বারা দুঃখ দেওয়া হয় না এইরূপ এবং সত্য, প্রিয় ও হিতকর বচন ও ধর্মগ্রন্থের অভ্যাস—এগুলিকে বাচিক তপ বলা হয়। (১৬) মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌন, আত্মসংযম, ভাবনা-শুদ্ধি—এই সকলকে মানসিক তপ বলা হয়। (১৭) সমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষ যখন ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া পরমশ্রদ্ধাপূর্বক এই তিন প্রকারের তপ করে, তখন সেই তপকে সাত্ত্বিক তপ বলে। (১৮) যে সৎকার, মান ও পূজার জন্য দম্ভপূর্বক করা হয় সেই অস্থির ও অনিশ্চিত তপকে রাজস্ তপ বলা হয়। (১৯) যে তপ পীড়নপূর্বক, দুরাগ্রহ হইতে অথবা পরের নাশের জন্য হয় তাহাকে তামস তপ বলে। (২০) দেওয়ার যোগ্য বুঝিয়া, প্রতিদান

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫

পাত্রে চ যৎ (দানম্) দীয়তে তৎ দানম্ সাত্ত্বিকম্ স্মৃতম্। (২১) যৎ তু প্রত্যুপকারার্থম্ বা ফলম্ উদ্দিশ্য পুনঃ পরিক্লিষ্টম্ চ দীয়তে তৎ দানম্ রাজসম্ স্মৃতম্। (২২) অদেশকালে অপাত্রেভ্যঃ চ অবজ্ঞাতম্ অসৎকৃতম্ যৎ দানম্ দীয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। (২৩) ব্রহ্মণঃ ওঁ তৎসৎ ইতি ত্রিবিধঃ নির্দেশঃ স্মৃতঃ, তেন পুরা ব্রাহ্মণাঃ বেদাঃ চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ। বিহিতাঃ—সৃষ্ট হইয়াছে। (২৪) তস্মাৎ ব্রহ্মবাদিনাম্ ওম্ ইতি উদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততম্ বিধানোক্তাঃ প্রবর্তন্তে।

(২৫) মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ তৎ ইতি ফলম্ অনভিসন্ধায় যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ বিবিধাঃ

পাইবার আশা না করিয়া দেশ কাল ও পাত্র বুঝিয়া যে দান, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়। (২১) যে দান প্রতিদানের আশায় অথবা দুঃখের সহিত দেওয়া হয় সে দানকে রাজসিক দান বলা হয়। (২২) দেশ কাল ও পাত্রের বিচার না করিয়া তাচ্ছিল্য ভাবে ও তিরস্কারের সহিত যে দান দেওয়া হয় তাহাকে তামস্ দান বলা হয়। (২৩) 'ওঁ তৎসৎ' এই তিন প্রকারে পরব্রহ্মের নাম নির্দেশ করা হইয়াছে। এই নির্দেশ হইতেই পূর্বকালে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি হইয়াছে। (২৪) সেই হেতু ব্রহ্মবাদিগণ ওঁ উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম বিধিবৎ করিয়া থাকেন। (২৫) যাহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী তাহারা তৎ শব্দ উচ্চারণ করিয়া, ফলের কামনা ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ, তপ ও দানরূপী বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ২৮

দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে। (২৬) হে পার্থ, সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে, তথা প্রশস্তে কর্মণি সৎ শব্দঃ যুজ্যতে। (২৭) যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সৎ ইতি উচ্যতে। তদর্থীয়ম্ চ সৎ ইতি এব অভিধীয়তে। তদর্থীয়ম্—'তৎ' (পরমাত্মা) অর্থ বা ফল যাহার তাদৃশ। (২৮) হে পার্থ, অশ্রদ্ধয়া হুতম্ দত্তম্ তপঃ তপ্তম্ যৎ কৃতম্ চ (তৎ) অসৎ ইতি উচ্যতে, তৎ ইহ ন প্রেত্য চ ন। প্রেত্য—মৃত্যুর পর, পরলোকে।

(২৬) হে পার্থ, সদ্ভাব ও সাধুভাবে অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশার্থ সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। হে পার্থ, প্রশস্ত (মঙ্গলজনক) কর্মে সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়। (২৭) যজ্ঞ, তপ ও দানে স্থিতি অর্থাৎ নিষ্ঠা বা তৎপর হইয়া থাকাকেও সৎ বলে। এই সকলের নিমিত্তই কর্ম, এই প্রকার সঙ্কল্পকেও সৎ বলা হয়।

টিপ্পনী—উপরোক্ত তিন শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াই করা চাই, কেননা ওঁ-ই সৎ ও সত্য। তাঁহাকে অর্পিত কর্মই সফল অর্থাৎ মোক্ষানুকূল।

(২৮) হে পার্থ, যজ্ঞ, দান, তপ ও অন্য যাহা কিছু অশ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে অসৎ বলা হয়। সে সকল ইহলোকেও কোন কাজের হয় না, পরলোকেও ফলদায়ক হয় না।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাস-যোগ

এই অধ্যায় উপসংহাররূপে গণ্য। এই অধ্যায়ের অথবা সমগ্র গীতার প্রেরক মন্ত্র হইতেছে—"সমস্ত ধর্ম ত্যাগ কর, আমার শরণ লও।" ইহাই বাস্তবিক সন্ন্যাস। কিন্তু সকল ধর্মের ত্যাগ মানে সকল কর্মের ত্যাগ নহে। পরোপকারার্থ কৃত কর্ম সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম। উহা তাঁহাকেই অর্পণ করা ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করা—ইহাই সর্ব-ধর্ম-ত্যাগ ও সন্ন্যাস।

অর্জুন উবাচ

সংন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩

অর্জুন উবাচ। (১) হে মহাবাহো হৃষীকেশ, হে কিশিনিষূদন, সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বম্ পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি।

শ্রীভগবান্ উবাচ। (২) কাম্যানাম্ কর্মণাম্ ন্যাসম্ কবয়ঃ সংন্যাসম্ বিদুঃ। সর্বকর্মফলত্যাগম্ বিচক্ষণাঃ ত্যাগম্ প্রাহুঃ। (৩) একে মনীষিণঃ কর্ম দোষবৎ ইতি ত্যাজ্যং প্রাহুঃ। অপরে চ যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি (প্রাহুঃ)।

অর্জুন বলিলেন—(১) হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিষূদন। সন্ন্যাস ও ত্যাগের পৃথক্ পৃথক্ রহস্য আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(২) কাম্য (কামনা হইতে উৎপন্ন) কর্মের ত্যাগকেই জ্ঞানীরা সন্ন্যাস বলিয়া জানেন; এবং সকল কর্মের ফলত্যাগকে পণ্ডিতেরা ত্যাগ বলেন। (৩) কোন কোন বিচারবান্ পুরুষ বলিয়া থাকেন যে, কর্মমাত্রই দোষযুক্ত বলিয়া উহা ত্যাগ করিবার যোগ্য। অপরে বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপরূপ কর্ম ত্যাজ্য নহে।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬
নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮
কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯

(৪) হে ভরতসত্তম, তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ম্ শৃণু। হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ। নিশ্চয়ম্—নির্ণয়, সিদ্ধান্ত। (৫) যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যম্ তৎ কার্যম্ এব। যজ্ঞঃ দানম্ তপঃ চ মনীষিণাম্ পাবনানি। (৬) হে পার্থ, এতানি কর্মাণি অপি তু সঙ্গম্ ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্তব্যানি ইতি মে নিশ্চিতম্ উত্তমম্ মতম্। (৭) নিয়তস্য কর্মণঃ সংন্যাসঃ তু ন উপপদ্যতে। মোহাৎ তস্য (কর্মণঃ) পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্তিতঃ। (৮) দুঃখম্ ইতি এব কায়ক্লেশভয়াৎ যৎ কর্ম ত্যজেৎ স রাজসং ত্যাগম্ কৃত্বা ত্যাগফলম্ নৈব লভেৎ। (৯) হে অর্জুন, কার্যম্ ইতি এব যৎ নিয়তম্ কর্ম সঙ্গম্ ফলম্ চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ।

---

(৪) হে ভরতসত্তম, এই ত্যাগের সম্বন্ধে আমার নির্ণয় শোন। হে পুরুষ-ব্যাঘ্র, ত্যাগ তিন প্রকারের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) যজ্ঞ, দান ও তপস্যা রূপ কর্ম ত্যাজ্য নয় বরং করণীয়। যজ্ঞ, দান এবং তপ বিদ্বানগণেরও চিত্তশুদ্ধিকর। (৬) হে পার্থ, এই সকল কর্ম ও আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করিয়া করিতে হইবে, ইহা আমার নিশ্চিত ও উত্তম অভিপ্রায়। (৭) নিয়ত কর্ম ত্যাগের যোগ্য নয়। মোহের বশ হইয়া যে ত্যাগ, সে ত্যাগ তামস বলিয়া পরিগণিত। (৮) দুঃখদায়ক বিবেচনা করিয়া, শরীরের কষ্টের ভয়ে যে কর্ম-ত্যাগ, সে ত্যাগ রাজসিক ত্যাগ। সেই হেতু সেই ত্যাগে ত্যাগের ফল লাভ হয় না। (৯) হে অর্জুন, 'করা উচিত' এই বোধ হইতে যে নিয়ত-কর্ম সঙ্গ ও ফল ত্যাগ পূর্বক করা হয় সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া মান্য করা হয়।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০
ন হি দেবভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২
পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪

(১০) ছিন্নসংশয় সত্ত্বসমাবিষ্ট ত্যাগী মেধাবী অকুশলম্ কর্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে ন অনুষজ্জতে। (১১) কর্মাণি অশেষত ত্যক্তুম্ দেহভৃতা ন শক্যম্, যঃ তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে। (১২) অত্যাগিনাম্ প্রেত্য কর্মণঃ ত্রিবিধম্ ফলম্ (ভবতি) অনিষ্টম্ ইষ্টম্ মিশ্রঞ্চ। সংন্যাসিনাম্ ক্বচিৎ ন। (১৩) হে মহাবাহো, কৃতান্তে সাংখ্যে সর্বকর্মণাম্ সিদ্ধয়ে প্রোক্তানি ইমানি পঞ্চ কারণানি মে নিবোধ। (১৪) অধিষ্ঠানম্ তথা কর্তা পৃথগ্‌বিধম্ করণম্ চ বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ চ অত্র পঞ্চমম্ দৈবম্ এব চ।

(১০) সংশয় রহিত হইয়া শুদ্ধ ভাবনাযুক্ত ত্যাগী ও বুদ্ধিমান পুরুষ অসুবিধাজনক কার্যে দ্বেষ করেন না, সুবিধানজক কার্যে প্রীত হন না। (১১) কর্মের সর্বথা ত্যাগ দেহধারীর পক্ষে সাধ্য নহে। কিন্তু যে কর্মফল ত্যাগ করে তাহাকে ত্যাগী বলা যায়। (১২) যাহারা ফল-কামনা ত্যাগ করে না সেই অত্যাগী পুরুষগণের কর্মের ফল কালক্রমে তিন প্রকারের হয়—শুভ, অশুভ ও শুভাশুভ। যে ত্যাগী (সন্ন্যাসী) তাহার কদাপি এইরূপ হয় না। (১৩) হে মহাবাহো, সাংখ্যশাস্ত্রে কর্ম মাত্রের সিদ্ধির সম্বন্ধে পাঁচটি কারণ আছে—এরূপ বলা হইয়াছে। তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। (১৪) সেই পাঁচটি ইহাই—অধিষ্ঠান (স্থান), কর্তা, বিবিধ সাধন, বিবিধ ক্রিয়া ও পঞ্চম কারণ দৈব।

শরীররাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং রা রিপরীতং রা পঞ্চৈতে তস্য হেতরঃ ॥ ১৫
তত্রৈরং সতি কর্তারমাত্মানং কেরলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬
যস্য নাহংকৃতো ভারো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

(১৫) শরীরবাঙ্মনোভিঃ ন্যায্যম্ বা বিপরীতম্ বা যৎ কর্ম নরঃ প্রারভতে এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ। (১৬) তত্র এবম্ সতি যঃ কেবলম্ আত্মানম্ কর্তারম্ পশ্যতি স দুর্মতিঃ অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন পশ্যতি। (১৭) যস্য ভাবঃ অহঙ্কৃতঃ ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে, স ইমান্ লোকান্ হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে।

(১৫) শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যাহা কিছু নীতি-সম্মত অথবা নীতি-বিরুদ্ধ কর্ম মানুষ করে তাহার এই পাঁচটি কারণ। (১৬) বাস্তবিক অবস্থা এইরূপ হইলেও (অর্থাৎ পূর্বোক্ত পাঁচটিই কর্মের কারণ হইলেও) যে নিঃসঙ্গ আত্মাকে কর্তা বলিয়া মনে করে তাহার বুদ্ধি শাস্ত্রাদি জ্ঞানের দ্বারা পরিমার্জিত না হওয়ায় সে প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পায় না। (১৭) যাহার মধ্যে অহঙ্কারের ভাব নাই, যাহার বুদ্ধি কর্মের ফলাফলে আসক্ত হয় না, সে এই জগৎকে হত্যা করিয়াও হত্যা করে না ও বন্ধনে পাড় না।

টিপ্পনী—উপরে উপরে দেখিতে গেলে এই শ্লোক মানুষকে ভুলে ফেলিতে পারে। গীতার অনেক শ্লোক কাল্পনিক আদর্শ অবলম্বনকারী। সেই আদর্শের হুবহু নমুনা জগতে মিলে না। রেখা-গণিতে কাল্পনিক আদর্শের আবশ্যকতা যেমন আছে, তেমনি ধর্ম-ব্যবহারেও ঐ প্রকার আদর্শের আবশ্যকতা আছে। সেইজন্য এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করা যায়—যাহার অহংজ্ঞান ভস্ম হইয়া গিয়াছে ও যাহার বুদ্ধিতে লেশ মাত্র মলিনতা নাই, সে যদি সারা জগৎকে মারে তো মারুক। কিন্তু যাহার মধ্যে অহংজ্ঞান নাই তাহার শরীরও নাই। যাহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ সে ত্রিকালদর্শী। এইরূপ পুরুষ তো কেবল এক ভগবান। তিনি কর্ম করিয়াও অকর্তা, হত্যা করিয়াও অহিংস। সেই হেতু মানুষের কাছে হত্যা না করাই শিষ্টাচার ও শাস্ত্র-সম্মত একমাত্র মার্গ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯
সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০
পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

(১৮) কর্মচোদনা ত্রিবিধা—জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ পরিজ্ঞাতা ইতি। কর্মসংগ্রহঃ ত্রিবিধঃ—করণম্ কর্ম কর্তা ইতি। (১৯) জ্ঞানম্ কর্ম চ কর্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে, গুণসংখ্যানে অপি; তানি যথাবৎ শৃণু। (২০) সর্বভূতেষু যেন একম্ অব্যয়ভাবম্ বিভক্তেষু চ অবিভক্তম্ ঈক্ষতে তৎ সাত্ত্বিকম্ জ্ঞানম্ বিদ্ধি। (২১) যৎজ্ঞানং সর্বভূতেষু পৃথগ্‌বিধান্ নানাভাবান্ পৃথকত্বেন বেত্তি তৎ জ্ঞানম্ রাজসম্ বিদ্ধি।

(২২) যৎ একস্মিন্ কার্যে অহৈতুকম্ কৃৎস্নবৎ সক্তম্ অতত্ত্বার্থবৎ অল্পম্ চ তৎ

(১৮) কর্মের প্রেরণায় তিন তত্ত্ব আছে—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা। কর্মের অঙ্গ তিন প্রকার—ইন্দ্রিয়সকল, ক্রিয়া ও কর্তা।

টিপ্পনী—ইহা বিচার ও আচারের সমীকরণ। প্রথমে মানুষ করিবার হেতু (জ্ঞেয়) ও তাহার রীতি (জ্ঞান) জানে এবং শেষে পরিজ্ঞাতা হয়। এই কর্ম-প্রেরণার ধারায় সে ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্রিয়ার কর্তা হয়। ইহাই কর্ম-সংগ্রহ।

(১৯) জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা গুণ-ভেদ অনুসারে তিন প্রকারের। গুণ-গণনায় উহার যে প্রকার বর্ণনা করা হয় তাহা শোন। (২০) যাহা দ্বারা মানুষ সর্বভূতে এক এবং অবিনাশী ভাব ও বিবিধের ভিতর ঐক্য দেখে তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। (২১) (দেখিতে) বিভিন্ন বলিয়া যাহা দ্বারা মানুষ সর্বভূতে বিভিন্ন বিভক্ত ভাব দেখে তাহার সেই জ্ঞান রাজস্ জানিও।

(২২) যাহা প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিয়া, ইহাই যাহা কিছু সমস্ত, এইরূপ বুদ্ধিতে

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩
যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

তামসম্ উদাহৃতম্। কৃৎস্নবৎ সক্তম্—যেন ইহাই সকল এই ভাবে আসক্ত। অতত্ত্বার্থবৎ—যাহাতে তত্ত্বার্থ নাই, রহস্য নাই। অল্পম্—তুচ্ছ। (২৩) অফলপ্রেপ্সুনা সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ নিয়তম্ যৎ কর্ম তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে। (২৪) কামেপ্সুনা সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ বহুলায়াসম্ যৎ কর্ম তু ক্রিয়তে তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্। (২৫) যৎ কর্ম অনুবন্ধম্ ক্ষয়ম্ হিংসাম্ পৌরুষম্ চ অনপেক্ষ্য মোহাৎ আরভ্যতে তৎ তামসম্ উচ্যতে। (২৬) মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে। (২৭) রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুঃ লুব্ধঃ হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ।

কোন একমাত্র বিষয়ে আসক্ত থাকে সেই যুক্তি বিরুদ্ধ অক্ষয় তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস বলে। (২৩) ফলেচ্ছা-রহিত পুরুষ দ্বারা আসক্তি ও রাগ-দ্বেষ শূন্য হইয়া কৃত নিয়ত কর্মকে সাত্ত্বিক বলে।

টিপ্পনী—(টিপ্পনী ৩—৮ দেখ)

(২৪) ভোগের ইচ্ছা রাখিয়া 'আমি করিতেছি' এই ভাব হইতে বহু ক্লেশ পূর্বক যে কর্ম করা হয় তাহাকে রাজস বলে। (২৫) যে কর্ম ফলেচ্ছাযুক্ত হানিকর, হিংসাযুক্ত এবং নিজের শক্তির বিচার না করিয়া মোহের বশ হইয়া আরম্ভ করা হয় তাহাকে তামস কর্ম বলা হয়। (২৬) যে ব্যক্তি আসক্তি ও অহঙ্কার-রহিত, যাহার মধ্যে দৃঢ়তা ও উৎসাহ আছে, যে সফলতা-নিষ্ফলতায় হর্ষ কিম্বা শোক করে না, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্তা বলে। (২৭) যে রাগী, যে কর্মফলেচ্ছু, যে লোভী, যে হিংস্রক, যে আসক্ত, যে হর্ষ ও শোকযুক্ত তাহাকে রাজস কর্তা বলা যায়।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

(২৮) অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠঃ নৈষ্কৃতিকঃ অলসঃ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামসঃ উচ্যতে। (২৯) হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ ধৃতেশ্চ গুণতঃ এব অশেষেণ পৃথক্ত্বেন ত্রিবিধম্ ভেদম্ প্রোচ্যমানম্ শৃণু। (৩০) হে পার্থ, যা বুদ্ধিঃ প্রবৃত্তিম্ চ নিবৃত্তিম্ চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে বন্ধম্ মোক্ষম্ চ বেত্তি সা সাত্ত্বিকী। (৩১) যয়া ধর্মম্ অধর্মম্ চ কার্যম্ চ অকার্যম্ এব চ অযথাবৎ প্রজানাতি হে পার্থ, সা বুদ্ধিঃ রাজসী। (৩২) হে পার্থ, তমসাবৃতা যা বুদ্ধিঃ অধর্মম্ ধর্মম্ ইতি মন্যতে, সর্বার্থান্ বিপরীতান্ চ মন্যতে সা বুদ্ধিঃ তামসী। (৩৩) হে পার্থ, যয়া অব্যভিচারিণ্যা

---

(২৮) যে অব্যবস্থিত, অমার্জিত, গর্বিত, শঠ, নীচ, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী সেই কর্তাকে তামস বলা যায়। (২৯) হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধি ও ধৃতি গুণানুসারে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকারের—বলিতেছি শোন। (৩০) প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য, অকার্য, ভয়, অভয়, বন্ধন ও মোক্ষের ভেদ যে (যোগ্য রীতিতে) জানে তাহার বুদ্ধি সাত্ত্বিক। (৩১) যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম-অধর্ম ও কার্য-অকার্য যথার্থরূপে বুঝা যায় না, হে পার্থ, সে বুদ্ধি রাজসী।

(৩২) হে পার্থ, যে বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন থাকায়, অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে করে ও সমস্ত বস্তু উল্টা দেখে, তাহা তামসী। (৩৩) যে অবিচলিত ধৃতিদ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল সাম্য বুদ্ধি হইতে ধারণ করে, হে পার্থ, সেই

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমের চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ যোগেন ধারয়তে সা সাত্ত্বিকী ধৃতিঃ। (৩৪) হে পার্থ, হে অর্জুন, যয়া ধৃত্যা ফলাকাঙ্ক্ষী ধর্মকামার্থান্ প্রসঙ্গেন ধারয়তে সা রাজসী ধৃতিঃ। (৩৫) দুর্মেধাঃ যয়া স্বপ্নম্ ভয়ম্ শোকম্ বিষাদম্ মদম্ এব চ ন বিমুঞ্চতি সা তামসী ধৃতিঃ। (৩৬-৩৭) হে ভরতর্ষভ, ইদানীম্ ত্রিবিধম্ সুখম্ তু মে শৃণু। যত্র অভ্যাসাৎ রমতে, দুঃখান্তম্ চ নিগচ্ছতি, যৎ তৎ অগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃতোপমম্ তৎ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ সুখম সাত্ত্বিকম্ প্রোক্তম্।

(৩৮) বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ তৎ অগ্রে অমৃতোপমম্ পরিণামে বিষমিব তৎ সুখম্ রাজসম্ স্মৃতম্। (৩৯) যৎ অগ্রে অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনম্, নিদ্রালস্য-

ধৃতি সাত্ত্বিকী। (৩৪) যে ধৃতি দ্বারা মনুষ্য ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ধর্ম, কাম ও অর্থ আসক্তিপূর্বক ধারণ করে সেই ধৃতি রাজসী। (৩৫) যে ধৃতি দ্বারা দুর্বুদ্ধি মনুষ্য নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ ত্যাগ করিতে পারে না, হে পার্থ, উহা তামসী। (৩৬-৩৭) হে ভরতর্ষভ, এক্ষণে তিন প্রকারের সুখের বর্ণনা আমার নিকট শোন— যাহাতে অভ্যাস বশতঃ মানুষ আনন্দ পায়, যাহা লাভ হইলে দুঃখের অন্ত হয়, যাহা আরম্ভে বিষের মত লাগে কিন্তু পরিণামে অমৃতের মত হয়; যাহা আত্মজ্ঞানের প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে।

(৩৮) বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-বশতঃ যাহার আরম্ভ অমৃতের ন্যায় ও পরিণাম বিষের মত হয় সেই সুখকে রাজসিক সুখ বলে। (৩৯) যাহা আরম্ভে

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ ৪২
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

প্রমাদোত্থম্ তৎ সুখম্ তামসম্ উদাহৃতম্ (৪০) পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা তৎ সত্বম্ নাস্তি যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তম্ স্যাৎ। (৪১) হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্ শূদ্রাণাম্ চ কর্মাণি স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি।

(৪২) শমঃ দমঃ তপঃ শৌচম্ ক্ষান্তিঃ আর্জবম্ এব জ্ঞানম্ বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম্ ব্রহ্ম কর্ম।

(৪৩) শৌর্যম্ তেজঃ ধৃতিঃ দাক্ষ্যম্ যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্ দানম্ ঈশ্বরভাবঃ চ স্বভাবজম্ ক্ষাত্রম্ কর্ম। (৪৪) কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্ স্বভাবজম্ বৈশ্যকর্ম। শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্ কর্ম পরিচর্যাত্মকম্।

ও পরিণামে আত্মাকে মূর্চ্ছিত করে, যাহা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই সুখ তামস। (৪০) পৃথিবীতে বা স্বর্গে দেবতার মধ্যে এমন কেহ নাই যে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই তিনগুণ হইতে মুক্ত। (৪১) হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম সকল উহাদের স্বভাবজ গুণের কারণ বিভক্ত হইয়াছে।

(৪২) শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, অনুভব, আস্তিকতা—এ সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম। (৪৩) শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান, শাসন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব—এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। (৪৪) কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম এবং সেবাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯

(৪৫) নরঃ স্বে স্বে কর্মণি অভিরতঃ সংসিদ্ধিম্ লভতে। স্বকর্মনিরতঃ যথা সিদ্ধিম্ বিন্দতি তৎ শৃণু। বিন্দতি—লাভ করে, পায়। (৪৬) যতঃ ভূতানাম্ প্রবৃত্তিঃ যেন ইদম্ সর্বম্ ততম্, মানবঃ তৎ স্বকর্মণা অভ্যর্চ্য সিদ্ধিম্ বিন্দতি।

(৪৭) স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্মঃ শ্রেয়ান্। স্বভাবনিয়তম্ কর্ম কুর্বন্ কিল্বিষম্ ন আপ্নোতি। (৪৮) হে কৌন্তেয়, সহজম্ কর্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ। হি ধূমেন অগ্নিঃ ইব সর্বারম্ভাঃ দোষেণ আবৃতাঃ। (৪৯) সর্বত্র

(৪৫) নিজ নিজ কর্মে রত থাকিয়া পুরুষ মোক্ষ পাইবে। নিজের কর্মে রত থাকিয়া পুরুষ কি প্রকারে মোক্ষ পায় তাহা শোন। (৪৬) যাঁহার দ্বারা প্রাণিগণের প্রবৃত্তি (কর্ম প্রচেষ্টা) পরিচালিত হয়, যাঁহার দ্বারা এই সকল চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহাকে যে পুরুষ স্বকর্ম দ্বারা ভজনা করে সে মোক্ষ পায়।

(৪৭) পর-ধর্ম সহজ আচরণীয় হইলেও তাহা অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্ম সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। স্বভাব-অনুযায়ী কর্মকারী মনুষ্যের জগতে পাপ হয় না।

টিপ্পনী—স্বধর্ম অর্থাৎ নিজের কর্তব্য। গীতার শিক্ষার মধ্যবিন্দু কর্মফল-ত্যাগ। স্বধর্ম ছাড়া উত্তম কর্তব্য খুঁজিলে ফল-ত্যাগের স্থান থাকে না। সেই হেতু স্বধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে। সকল ধর্মের ফল উহা পালনে পাওয়া যায়।

(৪৮) হে কৌন্তেয়, সহজ-প্রাপ্ত কর্ম সদোষ হইলেও উহা ত্যাগ করিবে না। যেমন আগুনের সহিত ধোঁয়া থাকে, তেমনি সকল কর্ম মাত্রের সহিতই দোষ থাকে। (৪৯) যে ব্যক্তি বিষয় হইতে আসক্তি টানিয়া আনিয়াছে, যে কামনা ত্যাগ

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

অসক্তবুদ্ধিঃ জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ সন্ন্যাসেন পরমাম্ নৈষ্কর্মসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি। (৫০) হে কৌন্তেয়ঃ, সিদ্ধিম্ প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি তথা মে সমাসেন নিবোধ, যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা।

(৫১—৫৩) বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ আত্মানম্ ধৃত্যা নিয়ম্য চ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ, বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ নিত্যম্ ধ্যানযোগপরঃ বৈরাগ্যম্ সমুপাশ্রিতঃ অহঙ্কারম্ বলম্ দর্পম্ কামম্ ক্রোধম্ পরিগ্রহম্ বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। (৫৪) ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সর্বেষু ভূতেষু সমঃ পরাম্ মদ্ভক্তিম্ লভতে।

করিয়াছে, যে মনকে জয় করিয়াছে, সে সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি পায়। (৫০) হে কৌন্তেয়, সিদ্ধি পাওয়ার পর মানুষ ব্রহ্মকে কি প্রকার পায় তাহা আমার নিকট হইতে সংক্ষেপে শোন, উহাই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

(৫১-৫৩) যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়াছে এমন যোগী দৃঢ়তাপূর্বক নিজেকে বশ করিয়া, শব্দাদি বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া, রাগ দ্বেষ জয় করিয়া, একান্তে থাকিয়া, অল্প আহার করিয়া, বাক্য কায় ও মনকে সংযত করিয়া, নিত্য ধ্যান-যোগ পরায়ণ থাকিয়া, বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া, মমতারহিত ও শান্ত হইয়া ব্রহ্ম ভাব পাওয়ার যোগ্য হয়। (৫৪) ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত মনুষ্য শোক করে না, কিছুই ইচ্ছা করে না, ভূতমাত্র সম্বন্ধে সমভাব রাখিয়া আমার প্রতি পরম ভক্তি প্রাপ্ত হয়।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫
সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬
চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮
যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯

(৫৫) (অহম্) যাবান্ যশ্চ অস্মি ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ অভিজানাতি, ততঃ মাম্ তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরম্ বিশতে।

(৫৬) মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ সদা সর্বকর্মাণি কুর্বন্ অপি, মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতম্ অব্যয়ম্ পদম্ অবাপ্নোতি। (৫৭) চেতসা সর্বকর্মণি ময়ি সংন্যস্য, মৎপরঃ বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য সততম্ মচ্চিত্তঃ ভব। (৫৮) মচ্চিত্তঃ মৎপ্রসাদাৎ সর্বদুর্গাণি তরিষ্যসি, অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি। (৫৯) অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে এষঃ তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যা, প্রকৃতিঃ

(৫৫) আমি কেমন ও কে তাহা ভক্তিদ্বারা সে যথার্থ জানে এবং এমনি করিয়া আমাকে যথার্থ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করে।

(৫৬) আমার যে আশ্রয় সে সর্বদা সর্ব কর্ম করিয়াও আমার কৃপায় শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়।

(৫৭) চিত্ত দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, আমাতে পরায়ণ হইয়া, বিবেক বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া নিরন্তর আমাতে চিত্ত যুক্ত কর। (৫৮) আমাতে চিত্ত সংযুক্ত করিলে সমস্ত সঙ্কটের পর্বত আমার কৃপায় উল্লঙ্ঘন করিবে। কিন্তু যদি অহঙ্কারের বশ হইয়া আমার কথা না শোন তবে নষ্ট পাইবে।

(৫৯) অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া, "যুদ্ধ করিব না" এই রকম যদি মনে কর, তবে তোমার এই সংকল্প মিথ্যা হইবে। তোমার স্বভাবই তোমাকে সেই দিকে বলপূর্বক টানিয়া লইয়া যাইবে।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫

ত্বাম্ নিয়োক্ষ্যতি। (৬০) হে কৌন্তেয়, স্বেন স্বভাবজেন কর্মণা নিবদ্ধঃ যৎ মোহাৎ কর্তুম্ ইচ্ছসি তৎ অবশঃ অপি করিষ্যসি।

(৬১) হে অর্জুন, ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি, মায়য়া যন্ত্রারূঢ়ানি সর্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (তিষ্ঠতি)। (৬২) হে ভারত, তমেব সর্বভাবেন শরণম্ গচ্ছ। তৎপ্রসাদাৎ পরাম্ শান্তিম্ শাশ্বতম্ স্থানম্ চ প্রাপ্স্যসি। (৬৩) গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্ ইতি জ্ঞানম্ ময়া তে আখ্যাতম্, এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য যথা ইচ্ছসি তথা কুরু। (৬৪) ভূয়ঃ সর্বগুহ্যতমম্ মে পরমম্ বচঃ শৃণু। মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি ততঃ তে হিতম্ বক্ষ্যামি ইতি। (৬৫) মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ ভব, মদ্‌যাজী মাম্ নমস্কুরু,

---

(৬০) হে কৌন্তেয়, মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজ স্বীয় কর্মে আবদ্ধ থাকায় তোমাকে অবশ হইয়া তাহা করিতে হইবে।

(৬১) হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন ও নিজের মায়ার বলে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় তিনি প্রাণীদিগকে ঘুরাইতেছেন। (৬২) হে ভারত, সর্বভাবে তুমি তাঁহার স্মরণ লও। তাঁহার কৃপায় পরম শান্তিময় অমর পদ পাইবে। (৬৩) এই গুহ্য হইতে গুহ্য জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম। এই সকল উত্তম মত বিচার করিয়া যাহা তোমার ঠিক বোধ হয় তাহা কর। (৬৪) আরো সর্বাপেক্ষা গুহ্য এইরূপ আমার পরম বচন শোন—তুমি আমার খুব প্রিয়, সেই হেতু তোমাকে হিতবাক্য বলিতেছি। (৬৫) আমাতে লগ্ন হও,

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬
ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ ৬৭
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০

মামেব এষ্যসি, তে সত্যম্ প্রতিজানে (ত্বম্) মে প্রিয়ঃ অসিঃ। (৬৬) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একম্ শরণম্ ব্রজ, অহম্ ত্বাম্ সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ। (৬৭) অতপস্কায় ইদম্ তে কদাচন ন বাচ্যম্ তথা অভক্তায় ন, অশুশ্রূষবে চ ন, যঃ মাম্ অভ্যসূয়তি (তস্মৈ) চ ন। (৬৮) ইদম্ পরমম্ গুহ্যম্ যঃ মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি সঃ ময়ি পরাম্ ভক্তিম্ কৃত্বা অসংশয়ঃ মাম্ এব এষ্যতি। (৬৯) মনুষ্যেষু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ ন। তস্মাৎ অন্যঃ প্রিয়তরঃ মে ভুবি ন ভবতি।

(৭০) আবয়োঃ ইমম্ ধর্ম্যম্ সংবাদম্ চ যঃ অধেষ্যতে তেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহম্

আমার ভক্ত হও, আমার জন্য যজ্ঞ কর, আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে তুমি আমাকে অবশ্যই পাইবে—এই আমার সত্য প্রতিজ্ঞা; কেন না তুমি আমার প্রিয়। (৬৬) সকল ধর্ম ত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শোক করিও না। (৬৭) যে তপস্বী নয়, যে ভক্ত নয়, যে শুনিতে ইচ্ছা করে না ও আমাকে যে দ্বেষ করে তাহাকে এই (জ্ঞান) তুমি কখনও বলিও না। (৬৮) কিন্তু যে এই পরম গুহ্য-জ্ঞান আমার ভক্তকে দিবে, সে আমাকে পরম ভক্তি করার জন্য নিঃসন্দেহে আমাকে পাইবে। (৬৯) তাহার অপেক্ষা মনুষ্য মধ্যে আমার কেহ অধিক প্রিয় সেবক নাই ও এই পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয়ও হইবে না।

(৭০) যে আমার এই ধর্ম-সংবাদ অধ্যয়ন করিবে সে আমাকে জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা ভজনা করিবে—ইহাই আমার অভিপ্রায়।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ। (৭১) যঃ নরঃ শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি সঃ অপি মুক্তঃ পুণ্যকর্মণাম্ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ। (৭২) হে পার্থ, ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা কচ্চিৎ এতৎ শ্রুতম্ হে ধনঞ্জয়, তে অজ্ঞানসম্মোহঃ কচ্চিৎ প্রনষ্টঃ ?

অর্জুন উবাচ—(৭৩) হে অচ্যুত, ত্বৎপ্রসাদাৎ মোহঃ নষ্টঃ, স্মৃতিঃ লব্ধা, গতসন্দেহঃ, স্থিতঃ অস্মি। তব বচনম্ করিষ্যে।

সঞ্জয় উবাচ—(৭৪) মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইতি ইমম্ অদ্ভুতম্ রোম-

---

(৭১) আর যে ব্যক্তি দ্বেষরহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্বক মাত্র শ্রবণ করে, সে মুক্ত হইয়া পুণ্যবান্‌গণ যে লোকে বাস করে সেই শুভ-লোক প্রাপ্ত হয়।

টিপ্পনী—ইহার তাৎপর্য এই যে, এই জ্ঞান যিনি অনুভব করেন তিনিই অপরকে দিতে পারেন। শুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া অর্থ সহিত যে শোনায় তাহার সম্বন্ধে উপরের এই দুই শ্লোক প্রযোজ্য নহে।

(৭২) হে পার্থ, ইহা কি তুমি একাগ্রচিত্তে শুনিলে ? হে ধনঞ্জয়, অজ্ঞান-জনিত তোমার যে মোহ হইয়াছিল তাহা কি নষ্ট হইয়াছে ?

অর্জুন বলিলেন—(৭৩) হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে। আমার চেতনা আসিয়াছে। সংশয়ের সমাধান হওয়ায় আমি স্থির হইয়াছি। তোমার কথানুযায়ী কার্য করিব।

সঞ্জয় বলিলেন—(৭৪) এই প্রকারে বাসুদেব ও মহাত্মা পার্থের এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত সংবাদ আমি শুনিলাম।

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদামিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ৭৮

হর্ষণম্ সংবাদম্ অহম্ অশ্রৌষম্। (৭৫) ব্যাসপ্রসাদাৎ স্বয়ম্ যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ কথয়তঃ এতৎ পরম্ গুহ্যম্ যোগম্ অহম্ সাক্ষাৎ শ্রুতবান্। (৭৬) হে রাজন্, কেশবার্জুনয়োঃ ইমম্ পুণ্যম্ অদ্ভুতম্ সংবাদম্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি। (৭৭) হে রাজন্, হরেঃ তৎ অত্যদ্ভুতম্ রূপম্ সংস্মৃত্য চ মে মহান্ বিস্ময়ঃ, পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি চ। (৭৮) যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ, তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ মম মতিঃ।

(৭৫) ব্যাসের কৃপাবলে যোগেশ্বর কৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই গুহ্য পরম যোগ আমি শুনিলাম। (৭৬) হে রাজন্, কেশব ও অর্জুনের এই অদ্ভুত ও পবিত্র সংবাদ স্মরণ করিয়া বারংবার আনন্দে রোমাঞ্চিত হইতেছি। (৭৭) হে রাজন্, হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে আমার অতিশয় বিস্ময় জন্মিতেছে ও বারংবার আনন্দিত হইতেছি। (৭৮) যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, যেখানে ধনুর্ধারী পার্থ আছেন সেইখানেই শ্রী আছে, বিজয় আছে, বৈভব আছে ও অবিচল নীতি আছে—ইহাই আমার মত।

টিপ্পনী—যোগেশ্বর কৃষ্ণ অর্থাৎ অনুভব-সিদ্ধ শুদ্ধ জ্ঞান ও ধনুর্ধারী অর্জুন—তদনুসারিণী ক্রিয়া। এই উভয়ের সঙ্গম যেখানে হয় সেখানে সঞ্জয় যেমন বলিলেন তাহা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে সন্ন্যাস-যোগ নামে অষ্টাদশ অধ্যায় পূর্ণ হইল।

রামনাম

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

উত্তম বীজ-বপন

'আমার ভূতপ্রেতের ভয় ছিল। আমার ধাই রম্ভা আমায় বলে—রামনামে ভূত ভাগে। তাহার ঐ প্রতিকার-পন্থায় আমার আস্থা যতটা থাক বা না থাক, তাহার উপর আমার বিশ্বাস ছিল অগাধ। তাই ভূতের ভয় হইতে বাঁচার জন্য ছোটবেলাতেই আমি রামনাম করিতে শিখি। আর আমি মনে করি যে ঐ উত্তম নারী যে বীজ বপন করিয়াছিল ইহা তাহারই ফল।'

ছয় কি সাত বছর বয়সে স্কুলে যাই। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলের পড়া চলে। স্কুলে সব কিছু শেখানো হইত, কেবল শেখানো হইত না ধর্ম। শিক্ষকেরা সহজেই যাহা দিতে পারিতেন তাহা তাঁহাদের কাছ হইতে পাই নাই, একথা বলিলে তাঁহাদের উপর অন্যায় করা হইবে না। তা হোক, প্রতিবেশে যাহা কিছু ভাল দেখিতে পাইতাম আত্মসাৎ করিয়া লইতাম। 'ধর্ম' শব্দ এখানে আমি উহার ব্যাপকতম অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান অর্থে ব্যবহার করিতেছি।

বৈষ্ণব পরিবারে আমার জন্ম; তাই হাবেলীতে (পুষ্টিমার্গীয়* মন্দির) যাওয়া ছিল আমার প্রায় নিত্য কর্ম। কিন্তু উহার প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় নাই। উহার বৈভব, উহার ঠাটবাট আমার ভাল লাগিত না। হাবেলীর দুর্নীতি ও কদাচারের কথাও আমার কানে আসিয়াছিল। অতএব উহার প্রতি আমার লেশমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। কাজেই হাবেলী হইতে আমার কোনই লাভ হয় নাই।

হাবেলী হইতে যাহা পাই নাই পরিবারের পুরাতন পরিচারিকা আমার ধাই-এর কাছ হইতে তাহা আমি পাই। তাহার স্নেহের কথা ভুলি নাই, তাহা ভুলিবার নয়। ভূতপ্রেতের ভয় আমার ছিল সেকথা বলিয়াছি। রম্ভা (আমার ধাত্রী) আমায় বলে—রামনামে ভূত পালায়। তাহার ঐ প্রতিকার-পন্থায় আমার আস্থা যতটা থাক বা না-থাক তাহার উপর আমার বিশ্বাস ছিল অগাধ। তাই ভূতের ভয় হইতে বাঁচার জন্য ছোটবেলায়ই আমি রামনাম করিতে শিখি। বেশীদিন অবশ্য তাহা টেকে নাই। তবুও বাল্য-কালে যে বীজ বোনা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ যায় নাই। রামনাম ত এখন আমার অনন্য আশ্রয়, অমোঘ ঔষধ। আর আমি মনে করি যে ঐ উত্তম নারী যে বীজ বপন করিয়াছিল ইহা তাহারই ফল।

*পুষ্টিমার্গ—বল্লভাচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবমার্গ।

রামায়ণভক্ত আমার এক খুড়তুতো ভাই ঐ সময়ে মেঝদা ও আমাকে রামরক্ষা শেখাবার ব্যবস্থা করেন। রামরক্ষা আমরা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে স্নানের পরে উহা আমরা প্রতিদিন আবৃত্তি করিতাম। পোরবন্দরে যতদিন ছিলাম উহা চলিয়াছিল। কিন্তু পোরবন্দর হইতে রাজকোটে যাওয়ার পরে উহা ভুলিয়া যাই। ওখানকার পরিবেশ ছিল কতকটা আলাদা। তা ছাড়া রামরক্ষার উপর আমার তেমন বিশ্বাসও ছিল না। তবুও যে আবৃত্তি করিতাম তাহার কারণ ছিল—এক, দাদার কথা অমান্য করিতে নাই এই ভাব, আর দুই, শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারি এই অভিমান।

কিন্তু যে বস্তু আমার মনে গভীর রেখাপাত করে সে ছিল রামায়ণের পারায়ণ। অসুস্থতার কারণ বাবা কিছু দিন পোরবন্দরে ছিলেন। সেখানে রামজী মন্দিরে বাবা প্রত্যহ রাত্রে রামায়ণ-পাঠ শুনিতেন। পাঠ করিতেন বিল্বেশ্বর নিবাসী পরম রামভক্ত পণ্ডিত লাধ মহারাজ। লোকে বলিত, এক সময় তাঁহার কুষ্ঠ হইয়াছিল; কোন চিকিৎসা না করিয়া কেবল বিল্বেশ্বর মহাদেবের পূজান্তে ফেলে-দেওয়া বেলপাতা ক্ষতে লাগাইয়া এবং রাম নাম নিয়মিত জপ করিয়া তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। সত্য-মিথ্যা জানি না, লোকে বিশ্বাস করিত যে ভক্তিবলে তিনি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। অন্যের কথা বলিতে পারি না অন্ততঃ শ্রোতা আমরা একথা বিশ্বাস করিতাম। আর যে সময়ে তাঁহাকে আমি রামায়ণ পাঠ করিতে দেখিয়াছি তখন তাঁহার দেহে কুষ্ঠের চিহ্নমাত্র ছিল না। ইহা আমার নিজের চোখে দেখা কথা। তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর ছিল। দোহা ও চৌপাই তিনি সুর করিয়া পড়িতেন এবং ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিজে তিনি ভাবরসে ডুবিতেন আর তাঁহার সঙ্গে শ্রোতারাও ডুবিত। সম্ভবতঃ তখন আমি তের বছরের ছিলাম। কিন্তু বেশ মনে আছে আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার পাঠ শুনিতাম। উহা হইতে রামায়ণের প্রতি আমার গভীর টান ও ভক্তি জন্মে। আজ ত আমার তুলসীদাসের রামায়ণ ভক্তিমার্গের সর্বোত্তম গ্রন্থ।

রামনামের প্রভাব

'দ্বিতীয় অনশনের শেষ দিকে আমার রীতিমত কষ্ট হইয়াছিল। রামনামের পরম আশ্চর্য মহিমার কথা তখন আমি ঠিক ঠিক জানিতাম না। আর ঐ কমতির অনুপাতেই কষ্ট সহিবার শক্তি আমার কম ছিল।'

প্রথম অনশনে[১] আমাদের কাহারও কষ্ট হয় নাই। কাজকর্ম যেমনটা তেমন চলিতেছিল। কোন কাজ স্থগিত বা বন্ধ করিতে হয় নাই। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তখন আমি শুদ্ধ ফলাহারী ছিলাম। দ্বিতীয় উপবাসের[২] শেষের দিকে বেশ কষ্ট হইয়াছিল। রামনামের পরম আশ্চর্য মহিমার কথা আমার তখন ঠিক ঠিক জানা ছিল না। আর ঐ কর্মশক্তির অনুপাতেই কষ্ট সহিবার শক্তি আমার কম ছিল। তা ছাড়া, উপবাসের বাহ্য উপচারের (যথা গা বমি করিলেও বা অতি বিস্বাদ লাগিলেও পর্যাপ্ত জল খাইতে হয়) জ্ঞানও আমার ছিল না। প্রথম উপবাস বিনা কষ্টে সাঙ্গ হইয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় উপবাসের সময়ে মনে কিছুটা উপেক্ষার ভাবও ছিল, উদাহরণার্থ, প্রথম উপবাসের সময়ে কুহ্নে (kuhne) পদ্ধতিতে প্রত্যহ কটিস্নান করিতাম কিন্তু দ্বিতীয়বারে প্রথম দুইতিন দিন বাদে কটিস্নান করা হয় নাই। অতি বিশ্রী লাগিত ও গা বমি করিত বলিয়া জলও খুব কম খাইতাম। গলা শুকাইয়া গিয়াছিল; আওয়াজ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। শেষের কয়দিন খাদেইমাত্র কথা বাহির হইত। তবুও কাজে ছেদ পড়ে নাই। কোন কিছু লেখার থাকিলে বলিয়া যাইতাম অন্যে টুকিয়া লইত। নিত্য রামায়ণ ও অন্য ধর্মগ্রন্থের পাঠ শুনিতাম। জরুরী বিষয়ের আলোচনা করার ও তৎসম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার মতন শক্তিও ছিল।

জীবনের অবলম্বন

> 'কামরিপু জয় করার পক্ষে রামনাম বা তদবিধ মন্ত্র অপেক্ষা অধিক শক্তিমান সহায় আর কিছু নাই……যে নামই করেন, তন্ময় হইয়া করা চাই……। মন্ত্র, জীবনের অবলম্বন। উহা সকল বিপদ-বারণ, সকল আপদ-তারণ।'

জাগ্রত অবস্থায় আমি সদা সাবধান। দেহ আমার বশে আসিয়াছে, বাক-সংযমেও আমি খুব পিছাইয়া নাই। কিন্তু মন সম্বন্ধে একথা আমি বলিতে পারিতেছি না। সেই অবস্থায় পৌছিতে আরও অনেকটা প্রযত্ন আমার করিতে হইবে। কোন বিষয়ে মন একাগ্র করিতে যাই ত নানা অবান্তর চিন্তা আসিয়া

১. ফিনিক্স্ আশ্রমের (দক্ষিণ আফ্রিকা) দুইজন আশ্রমবাসীর নৈতিক পতনের প্রায়শ্চিত্ত রূপে সপ্তাহকালের উপবাস। কেলেনবেক সঙ্গে উপবাস করিয়াছিলেন।

২. দ্বিতীয় উপবাস প্রথম উপবাসের জের। ব্যাপ্তিকাল চৌদ্দ দিন।

ভিড় পাকায়; একের সঙ্গে অন্যের ঠোকাঠুকি হয় আর আমার একাগ্রতা নষ্ট হয়। তাহা হইলেও জাগ্রত অবস্থায় উহাদের সংঘর্ষ নিবারণ করিতে পারি। আত্মোন্নতির যে স্তরে পৌঁছিলে মন কু-চিন্তা মুক্ত হয়, বলিতে পারি, সেই স্তরে আমি পৌঁছিয়াছি। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় মন আমার তেমন বশে নয়। ঘুমের সময় মনে নানা চিন্তার উদয় হয় এবং অবাঞ্ছিত স্বপ্নও দেখিয়া থাকি। কখন কখন অতীত ভোগ-উপভোগের বাসনা মনে জাগে। কু-বাসনা হইলে তাহা হইতে কু-স্বপ্নের উদ্রেক হয়। পাপজীবনের তাহা সাক্ষী।

কু-চিন্তা আমার আহত হইয়াছে, নিহত হয় নাই। গত দশ বছরে আমি প্লুরেসি, আমাশয়, এপেণ্ডিসাইটিস্ ইত্যাদি রোগে ভুগিয়াছি। চিন্তা যদি আমার পূর্ণ বশে[১] থাকিত তবে এসব রোগ আমার হইত না। আমার বিশ্বাস, আত্মা যখন নিষ্পাপ হয় তখন উহার ভৌতিক আধারও নীরোগ হয়। তাহার অর্থ, আত্মার পাপরাহিত্যের তুলনায়ই দেহের রোগ-প্রতিষেধ (রোগ নিবারণ) শক্তি বৃদ্ধি পায়। সুস্থ দেহ বলিতে এখানে তাগড়া (সবল) দেহ বুঝিবেন না। ক্ষীণদেহেই মাত্র (কেবল) শক্তিমান আত্মার অধিষ্ঠান। আত্মার ঐশ্বর্য যতই বাড়িতে থাকে দেহ ততই ক্ষীণ হইতে থাকে। নিতান্ত ক্ষীণকায় মানুষও নিখুঁত স্বাস্থ্যবান হইতে পারে। সচরাচর দেখা যায়, হৃষ্টপুষ্ট দেহ ব্যাধিপিণ্ডপাত্র। রুগ্ন না হইলেও তাহা অত্যন্ত রোগ-প্রবণ। ইহার উল্টা, যে মানুষ পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী তাহার দেহে রোগ প্রবেশই করিতে পায় না। বিশুদ্ধ রক্তে জীবাণু-নাশের শক্তি রহিয়াছে……

এতক্ষণ ব্রহ্মচর্যের ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মচর্যের আলোচনা করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য

১. পূর্ণতার আমি অধম সাধক। পূর্ণতা লাভের পথ যে কি তা-ও আমি জানি। কিন্তু পথ জানা ও গন্তব্যে পৌঁছানো এক কথা নয়। যদি পাপরহিত হইতাম, মনের ব্যাপারেও যদি রিপুসমূহ আমার পূর্ণ বশে থাকিত তবে আমার শরীর একেবারে নীরোগ হইত। মনকে বাগ মানাইতে প্রত্যহ আমার খানিকটা মানসিক শক্তি ক্ষয় করিতে হয় একথা স্বীকার করিতে আমার সংকোচ নাই। এই ক্ষেত্রে যদি জয় লাভ হয়, আদৌ যদি হয়, ভাবিয়া দেখুন সেবার নিমিত্তে কতই না উদ্যমের সঞ্চার তখন আমাতে হইবে। আমার মনে হয়, চিন্তার তথা মনের দুর্বলতার কারণ আমার এপেণ্ডিসাইটিস হইয়াছিল। অস্ত্রোপচারে আমি রাজি হই। আমার মানসিক দুর্বলতার তাহা সমধিক নিদর্শন। সম্পূর্ণ অহংভাব শূন্য হইলে বিনা উদ্বেগে ভবিতব্যের জন্য প্রস্তুত হইতাম। কিন্তু এই দেহে বাঁচিয়া থাকার বাসনা প্রবল হইল। যন্ত্রবৎ চলিলাম আর হইল অনাসক্তি লাভ এত সহজ তাহা নয়। নিরলস সাধনায় ও নিরন্তর প্রার্থনায় ধীরে ধীরে তাহা লাভ হয়। —ইয়ং ইণ্ডিয়া, এপ্রিল—৩, ১৯২৪

বলিতে লোকে চিন্তায়-কথায়-কার্যে কামরিপু দমন করা বোঝে : ব্রহ্মচর্যের ইহা সাধারণ তথা প্রচলিত সংজ্ঞা। কাম দমনকে অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার মনে করা হয় বলিয়া ব্রহ্মচর্যের এই সংজ্ঞাও ঠিক। স্বাদেন্দ্রিয় সংযমের উপর কিন্তু লোকে ততটা জোর দেয় না। তাহার ফলে কাম দমন দুরূহ ও প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে…

পূর্ণ স্বাদ বা আহার-সংযম ব্যতীত কাম বশে আনা যায় না একথা নিজে অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতেছি। স্বাদ-সংযম সহজ কথা নয়। তা হোক, কাম দমন করার প্রথম সোপান স্বাদ-সংযম। মসলা ও মুখরোচক পদার্থের সম্পূর্ণ বা যতদূর সম্ভব পরিহার স্বাদ-সংযমের প্রশস্ত উপায়। অন্য উপায়—এই কথা সদা স্মরণ রাখা চাই যে,আমরা খাই শরীর রক্ষার নিমিত্তে, রসনার তৃপ্তির জন্য নয়। ইহা সমধিক ফলপ্রসূও বটে। শ্বাস লইতে ভাল লাগে বলিয়া আমরা শ্বাস লই না, লই বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনে। তৃষ্ণা পায় তাই না আমরা জল খাই। তদ্রূপ একমাত্র ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্যই খাওয়া উচিত। পরিতাপের কথা, আমাদের মাতাপিতা শৈশবে আমাদের ইহার উল্টা শিক্ষা দেন। পোষণের দৃষ্টি হইতে নয় অন্ধ ভালবাসার তাগিদে এটা ওটা মুখরোচক বস্তু খাইতে দিয়া তাঁহারা আমাদের রুচি বিকৃত করিয়া দেন। গৃহের এই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু কামরিপু জয় করার পক্ষে রামনাম বা তদ্বিধ মন্ত্র অপেক্ষা অধিক শক্তিমান সহায় অন্য কিছু নাই। দ্বাদশ মন্ত্র[১] হইতেও অনুরূপ ফল লাভ হইবে। যে মন্ত্রে যাহার রুচি ও ভক্তি সেই মন্ত্রেই সে তাঁকে ডাকিতে পারে। তবুও যে রামনামের কথা বলিলাম তাহার কারণ বাল্যকাল হইতে ঐ নামে আমি অভ্যস্ত হইয়াছি। তা ছাড়া, জীবন-সংগ্রামে তাহা বরাবর আমার সহায় হইয়াছে। যে নামই করেন, একেবারে তন্ময় হইয়া তাহা করা চাই। নাম জপ করার সময় মন যদি এদিক ওদিক ধায় ত অস্থির হওয়ার কিছু নাই। তাহা সত্ত্বেও বিশ্বাসভরে জপ করিতে থাকিলে অন্তে জয়লাভ হইবে একথা নিঃসংশয়ে মন্ত্র তখন হয় জীবনের অবলম্বন, হয় বিপদ-বারণ[২] ও আপদ্-তারণ।

১. ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

২. ব্রহ্মচর্যের সাধক কোন ব্রহ্মচারীকে গান্ধী লেখেন :

'প্রার্থনা অন্তিম আশ্রয়। অন্য কোন উপায় অপেক্ষা ইচ্ছার শক্তি কম নহে। আকুল হৃদয়ে নিয়মিতভাবে নিত্য রামনাম করিবেন, ভগবানের কৃপা বাঞ্ছা করিবেন।

—ইয়ং ইণ্ডিয়া, এপ্রিল ২৯, ১৯২৬

এই সকল পাবন মন্ত্রের জপ পার্থিব লাভের জন্য করিতে নাই। এই সব মন্ত্র জপকারীকে প্রহরীর ন্যায় আবিলতা হইতে রক্ষা করে। আর এখানেই এই সকল মন্ত্রের মাহাত্ম্য। মুমুক্ষু ব্যক্তি অচিরে ইহা উপলব্ধি করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, তোতার মতন আবৃত্তি করিলে হইবে না। মন্ত্রে অন্তরাত্মা ঢালিয়া দিতে হইবে। তোতার মতন আওড়াইলে চলিবে না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া এই নাম করিতে হইবে। এই নাম জপ করিলে পাপ-চিন্তা নষ্ট হইবে, উহার শক্তি-প্রভাবে অবাঞ্ছিত কু-চিন্তা দূর হইবে এই অটল বিশ্বাসে এই নাম জপিতে হইবে।

রামনাম একমাত্র আশ্রয়

'রামকে (ভগবানকে) জীবনের সর্বক্ষেত্রে খণ্ডন করিয়া পরিত্রাণের নিমিত্তে যাহারা রামনাম করে রামনাম তাহাদের জন্য নয়। ভগবানে যাহাদের ভয়ভক্তি আছে, আত্মসংযমের চেষ্টা যাহারা করে কিন্তু পারিয়া উঠে না রামনাম তাহাদেরই সহায়।'

ভাবাবেগে প্রতিজ্ঞা করা খুব সহজ। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন করা কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ প্রলোভনের মুখে। তখন একমাত্র ভগবানই আমাদের সহায়। তাই না সভায়* আমি রামনামের কথা বলিয়াছিলাম। রাম আল্লা গড—এই সবই সেই একেরই বিভিন্ন নাম। আমি জানি যে সরল-বিশ্বাসী লোকেরা এই কথা মনে করিয়া আত্ম-ছলনা করে যে আপদ-বিপদে আমি তাহাদের পাশে গিয়া দাঁড়াই। এই অন্ধ-বিশ্বাস দূর করিবার চেষ্টা আমি করিয়াছি। আমি

মুমুক্ষু এক ব্যক্তিকে :

'আমাদের ভিতরে দশানন রাবণরূপ যে সকল রিপু রহিয়াছে রামের সাহায্যে তাহাদের পরাভূত করিতে হইবে। রামে যদি মতি থাকে, তাঁর শরণ যদি লই তবে জয় সুনিশ্চিত। আসল কথা, আত্মবিশ্বাস হারাইবেন না। জিহ্বার স্বাদ পরিহার করিবেন।

— ইয়ং ইণ্ডিয়া, ডিসেম্বর ২০, ১৯২৮

'আর যখন পারা যাইতেছে না, ভাসিয়া যাই যাই হইয়াছে তখন নতজানু হইয়া বসিবেন হাত-জোড় করিয়া চিৎকার করিয়া নাম করিবেন। রামনাম আমার অনন্য আশ্রয়। বাহ্য সহায় হিসাবে কটিস্নান ভাল।'—স্বেচ্ছাচার বনাম আত্মসংযম ; দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে।

*১৯২৫ সনে জানুয়ারী মাসে বারদৌলির নিকটে বেড়চিতে কপিলরাজ সম্মেলন হয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রধানদের বৈঠকে গান্ধী এই কথা বলেন।

জানি, এভাবে কাহারও কাছে গিয়া আমি দেখা দেই নাই। নশ্বর ক্ষীণজীবী এই ব্যক্তির উপর ভরসা করা একান্তই ভুল, নিতান্তই বাতুলতা। তাই না তাহাদের আমি একটি সহজ সুপরীক্ষিত অমোঘ মন্ত্রের সন্ধান দিয়াছি। সূর্য উদয়ের পূর্বে ভোরে এবং রাত্রে শোয়ার আগে প্রত্যহ তাহাদের আমি ভগবানের নাম লইতে বলিয়াছি, প্রতিজ্ঞা পালন করার শক্তি তাঁর কাছে যাচ্ঞা করিতে বলিয়াছি। অগণিত হিন্দু তাঁকে রামনামে জানে। ভয় পাইলে রামনাম করিতে হয় ইহা আমি বাল্যকালে শিখিয়াছিলাম। আপদে-বিপদে রামনাম করিয়া অশেষ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন এইরূপ অনেক বন্ধুর কথা আমি জানি। ধারলা এবং অস্পৃশ্যদেরও আমি রামনামের আশ্রয় লইতে বলিয়াছি। যাহাদের দৃষ্টি পর্দায় আচ্ছন্ন নয়, বিদ্যার অভিমানে যাহাদের বিশ্বাস শিথিল নয় এইরূপ পাঠকদের আমি রামনামের শরণ লইতে বলি। বিদ্যার দৌলতে জীবনের নানা ব্যাপারে আমরা পার হইতে পারি কিন্তু বিপদে ও প্রলোভনের মুখে বিদ্যা হইতে কোনই সহায়তা আমরা পাই না। বিশ্বাসই তখন একমাত্র কাণ্ডারী। রামকে (ভগবানকে) জীবনের সবক্ষেত্রে খণ্ডন করিয়া পরিত্রাণের নিমিত্তে যাহারা রামনাম করে রামনাম তাহাদের জন্য নয়। ভগবানে যাহাদের ভয়-ভক্তি আছে, আত্মসংযমের চেষ্টা যাহারা করে কিন্তু পারিয়া উঠে না রামনাম তাহাদের সহায়।

রামনাম ও আত্মোপলব্ধি

> 'রামনাম করিলে আসক্তি দূর হয়, চরিত্রে দৃঢ়তা আসে, বিপদে বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটে না। দরিদ্রতমদের সেবা না করিলে, তাহাদের সুখ-দুঃখের ভাগী না হইলে আত্মোপলব্ধি হইবার নয়, ইহা আমার বিশ্বাস।'

প্রশ্ন : "দেশের জন্য খড়গাছ না আগলাইয়া কেবল রামনাম করিলেই কি কোন মানুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে? কোন কোন ভগ্নীর ধারণা সংসারের কাজ ঠিকমত করার পরে কালেভদ্রে গরীব-দুঃখীর প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করিলেই হইল। বস্, তার বেশী কিছু করার নাই। তাই এই প্রশ্ন।"

উত্তর : ইহা কেবল নারী মনেরই ধর্ম ক্রিয়া বা ভাব নহে, অনেক পুরুষেরও। এই ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টায় আমাকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। কর্মের ফেরে পড়িতে নাই, প্রযত্ন মাত্রই ব্যর্থ এরূপ এক দার্শনিক মতবাদ আছে তা আমি জানি। এই দৃষ্টি, এই শিক্ষা কোনমতেই সমর্থন যোগ্য নহে, অবশ্য নৈষ্কর্ম্য ও চেষ্টার নিরর্থকতার অর্থ যদি আমি আমার

দৃষ্টি মত করি ত' সে আলাদা কথা। সবিনয়ে বলিব যে আত্মবিকাশের জন্যই চেষ্টার আবশ্যকতা রহিয়াছে। প্রযত্ন ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হওয়া চাই। জপ বলিয়াই জপের জন্য রামনাম বা তদ্‌বিধ নাম করার দরকার নাই, দরকার আত্মশুদ্ধির হেতু, প্রযত্নে সহায়তা লাভের নিমিত্তে এবং ভগবানের কাছ হইতে পথের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়ার প্রয়োজনে। সুতরাং জপ কস্মিনকালেও প্রযত্নের প্রতিকল্প—সাব্‌ষ্টিটিউট্‌—নহে। জপের কাজ প্রযত্নকে একাগ্র করা, ঠিক পথ ধরাইয়া দেওয়া। প্রযত্নমাত্রই যদি নিরর্থক হয় তবে পরিজনের ভাবনা ভাবাই বা কেন" আর কালেভদ্রে গরীবের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যই বা কেন? এই চেষ্টাতেই ত দেশ-সেবার বীজ বিদ্যমান। আর আমার দৃষ্টিতে দেশসেবা মানবসেবা হইতে অভিন্ন। নিঃস্বার্থ পরিজনসেবাও তাহাই: স্বার্থলেশশূন্য পরিজনসেবা হইতে মানুষ ক্রমে ক্রমে দেশসেবায় উদ্‌বুদ্ধ হয়। রামনাম করিলে আসক্তি নাশ হয়, চরিত্রে দৃঢ়তা আসে, বিপদে বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটে না। যাহারা নেহাৎ গরীব তাহাদের সেবা না করিলে, তাহাদের সুখদুঃখের ভাগী না হইলে আত্মোপলব্ধি হইবার নয়, ইহা আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস।

তাঁর শরণ লও

> 'তাঁর কৃপা লাভ করিবে ত তাঁর কাছে অন্তরের কপাট খুলিয়া ধর, একদম ফাঁপা বেণু হইয়া তাঁর হাতের মুরলী হও; আমার মতন পাপীর কি তিনি সহায় হইবেন এই সংশয় দূর কর। অগণিত শরণাগতকে যিনি সহায়তা করিয়াছেন তোমার প্রতি কি তিনি বিমুখ হইবেন?'

রাশি রাশি বহি পড়িয়া ছাত্রদের মগজ বিষয়বাহুল্যে গিজগিজ করিতেছে, আর তার ফলে তারা কী যে অধঃপাতে গিয়াছে তাহার প্রমাণ আমি পাই ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্রেরা যে পত্র লিখে তাহা হইতে। তাহাদের অনেকের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে, অনেকে একেবারে উন্মাদ হইয়াছে এবং অনেকে অসহায়ভাবে পাপ জীবন যাপন করিতেছে। "পাপে এমনি ডুবেছি যে শত চেষ্টা করেও সেই পঙ্ক থেকে উদ্ধার পাই নি। তাই আমাদের এই দশা" তাহাদের এই উক্তি যখন পড়ি তখন আমার অন্তর কাঁদে, সহানুভূতিতে কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। বেদনা-আতুর অন্তরে তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে "কি করলে এই পাপ থেকে নিস্তার পাব?" তাহাদিগকে আমি রামনাম করিতে, ভগবানকে প্রণিপাত করিতে, তাঁর কৃপা যাচ্ঞা করিতে বলিলে তাহারা আসিয়া

আমাকে বলে, "ভগবান কোথায় তা ত জানি না, প্রার্থনা কি তা ত বুঝি না"—এই অবস্থায় তাহারা আসিয়া ঠেকিয়াছে……

'নহায়হানের সহায় ভগবান' (নির্বলকে বল রাম) এই তামিল প্রবচন আমার অন্তরে গাঁথিয়া গিয়াছে। তাঁর কৃপা লাভ করিবে ত তাঁর কাছে অন্তরের কবাট খুলিয়া ধর, একদম ফাঁপা বেণু হইয়া তাঁর হাতের মুরলী হও; আমার মত পাপীর কি তিনি সহায় হইবেন এই সংশয় দূর কর। অগণিত শরণাগতের যিনি সহায় হইয়াছেন তোমার উপর কি তিনি বিমুখ হইবেন? ভগবান মুখ দেখিয়া লোকের বিচার করেন না। আপনি দেখিতে পাইবেন, আপনার কোন প্রার্থনাই বৃথা যায় নাই। মহাপাতকের প্রার্থনায়ও[১] তিনি সাড়া দেন ইহা আমার নিজ অভিজ্ঞতার কথা। এই আধ্যাত্মিক পরিস্রাবন-ক্রিয়ার ভিতর দিয়া আমার যাইতে হইয়াছে। ভগবানকে হৃদয়াসনে বসাইলে সব কিছু লাভ হয়।

জপের মহত্ত্ব

> 'প্রতিবারের আবৃত্তিতে বা জপে নূতন নূতন অর্থের বিকাশ হয়; জপের প্রতি ফেরে মানুষ ভগবানের অধিকতর নিকটে যায়, ইহা বাস্তব সত্য।'

'একই বস্তুর পুনঃপুনঃ আবৃত্তি আমার বিশ্রী লাগে। ধাতে আমি নেহাত সূক্ষ্ম যুক্তিবাদী, তাই বুঝি এমন হয়। কিন্তু কারণ যাই হোক পুনরাবৃত্তি আমার ভাল লাগে না। দৃষ্টান্তরূপে—Father, forgive them, they know not what they do' এই বাক্যটি ধরুন। এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে। বাদকের দিব্য তানমান সংযোগ সত্ত্বেও আমার মনে ইহা দাগ কাটে না, অন্তরে সাড়া জাগায় না।

১. কিন্তু কেবল মুখে আওড়াইলে বা কানে শুনিলেই হইল তাহা নয়। যে মন্ত্রপাঠে অন্তরের সায় নাই তাহা প্রার্থনা নয়, তোতার হরিনাম। যে রামনামে অন্তরে সাড়া না জাগে সে রামনাম বৃথা, শতবার জপিলেও বৃথা। প্রার্থনায় অন্তর ঢালিলেই হইল, কথায় তাহা নাইবা ফুটিল। তোতার আবৃত্তি অপেক্ষা তাহা ভাল। আকুল হৃদয়ের প্রতিধ্বনি তাহা হওয়া চাই। ক্ষুধায় কাতর মানুষ যেমন অতি আগ্রহে খায় আকুল হৃদয় মানুষ তেমন মহা ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে ডাকে। যে মানুষ প্রার্থনার অত্যাশ্চর্য শক্তির পরিচয় পাইয়াছে সে অনায়াসে দিনের পর দিন অনাহারে থাকিতে পারে কিন্তু প্রার্থনা বিনা মুহূর্তও থাকিতে পারে না, একথা আমি নিজের ও সহচরদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি কেন না প্রার্থনা বিনা শান্তি মিলে না। —ইয়ং ইণ্ডিয়া, জানুয়ারী, ২৩, ১৯৩০

ঈষৎ হাসিয়া গান্ধী বলেন, "কিন্তু আপনাদের গণিতশাস্ত্রেও পৌনঃপুনিক দশমিক রয়েছে।"

গণিতজ্ঞ বলেন, "আছে, তবে প্রতি আবর্তনে তার নূতন মান হয়।"

গান্ধী বলেন, "ঠিক তেমনি প্রতি আবৃত্তিতে বা জপে নূতন নূতন অর্থের বিকাশ হয়, জপের প্রতি ফেরে মানুষ ভগবানের আরও নিকটে যায়। ইহা বাস্তব সত্য। আর একথাও আপনাকে বলছি যে যার সঙ্গে আপনি কথা বলছেন সে ব্যক্তি তাত্ত্বিক নয়, জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যা অনুভব করছে সেই অভিজ্ঞতার কথাই এখানে ধরছে। আবার সেই উপলব্ধি এমনতর যে নিমেষের তরেও তা ভোলার উপায় নেই, ভোলা অপেক্ষা মরা শ্রেয় মনে হয়। আত্মার নিমিত্ত জপ অতি আবশ্যক।"

"একথা বেশ বুঝি। তবে সাধারণ লোকের কাছে তা প্রাণহীন অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়।"

"স্বীকার করি। তা, ভাল জিনিসেরও ত অপব্যবহার হয়। ভণ্ডামির অবকাশ বিস্তর রয়েছে। তবে ধর্মের ভেকও ভাল। আর একথাও ঠিক যে দশ-বিশ হাজার লোক ভণ্ডামি করে ত কোটি কোটি মানুষ তা থেকে শান্তি-সান্ত্বনা পায়। একে দালানের ভারা বলা যেতে পারে।"

পিয়ের সেরসল বলেন, "এই উপমার জের টেনে একথাও ত' বলা যায় যে দালান তৈরী হয়ে গেলে ভারা খুলে ফেলতে হয়।"

"হাঁ, এই দেহ যখন আর থাকবে না।"

"কেন?"

এই কথার উত্তরে উইলকিসন (তিনি অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা শুনিতেছিলেন) বলেন, "কেন না, আমাদের সৃষ্টির শেষ নাই।"

আর গান্ধীজী বলেন, "তার কারণ, পূর্ণতা লাভের সাধনা আমাদের চির সাধনা। এক ভগবানই পূর্ণ, মানুষ চিরকালই অপূর্ণ।"

(মহাদেব ভাই) হরিজন, মে, ২৫, ১৯৩৫

যোগাভ্যাস

'আমার ঘোর অন্ধকারে ইহা (রামনাম) সূর্যের ন্যায় আলোকপাত করিয়াছে। যীশুর নাম জপ করিয়া খ্রীস্টান ও আল্লার নাম জপ করিয়া মুসলমান ঠিক এইরূপ সান্ত্বনাই পাইতে পারে।'

"কোন যোগাভ্যাস আপনি করেন কি?" জনৈক পাদরী বন্ধুর এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন:

যোগাভ্যাস আমি কোন দিন করি নাই। অভ্যাসবশে চিরদিন আমি চলিয়াছি। ছোটবেলায় সেই অভ্যাস আমি আমার ধাত্রীর কাছ হইতে পাইয়াছিলাম। আমার ভূতের ভয় ছিল। সে (ধাত্রী) আমায় বলিত, 'ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। তবুও যদি ভয় করে ত রামনাম করবে।' ছোটবেলাকার ঐ উপদেশ আমার চিদাকাশে এক মস্ত বস্তু হইয়া রহিয়াছে। আমার ঘোর অন্ধকারে ইহা সূর্যের ন্যায় আলোকপাত করিয়াছে। যীশুর নাম জপ করিয়া খ্রীস্টান ও আল্লার নাম[১] জপ করিয়া মুসলমান ঠিক এইরূপ সান্ত্বনাই পাইতে পারে। এই সবেরই তাৎপর্য এক এবং সমান অবস্থায় তাহা সমান ফলদান করিয়া থাকে। তবে তাহা হওয়া চাই অন্তরের আকুতি, তোতার বুলি নয়।

১২৫ বছর কেন বাঁচিয়া থাকিতে চাই

> 'মৃত্যুতে সকল প্রযত্নের অবসান হয় না। যদি হইত তবে যে শাশ্বত বিধিকে আমরা ভগবান বলি তাহা পরিহাসের বস্তু হইত। রহস্যে-ঢাকা 'পরলোক'-এর রহস্য-ভেদের চেষ্টা না-ই করলাম। আমাদের বিশ্বাস থাকা চাই যে এই জন্মে যে মনুষ্য সৎ-জীবন যাপন করিবে পরজন্মে তাহার জীবন অধিক পূর্ণ ও অধিক উৎকৃষ্ট (সমৃদ্ধ) হইবে।'

"আপনি ১২৫ বছর বেঁচে থাকতে চান। কেন চান?" ইউনাইটেড প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া-র সাংবাদিক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন:

১৯৪২-এর ৮ই আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠকে বলিতেছিলাম ত হঠাৎ ১২৫ বছর বাঁচিয়া থাকার কথা আমার মনে উদিত হয়। উহার পূর্বে কথাচ্ছলে কোথাও এই ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকিব এমনটাও হইতে পারে। করিয়াছি কিনা তাহা আমার মনে নাই।

---

১. মুসলমানের আল্লা, খ্রীস্টানের গড্ ও হিন্দুর ঈশ্বর এই সবই সেই একের নাম। হিন্দু ভগবানকে নানা নামে ডাকে ত মুসলমানও তাঁকে নানা নামে ডাকে। এই সব নাম ব্যক্তিবাচক নয়, গুণবাচক: ঈশ্বর গুণাতীত, অবর্ণনীয় ও অপরিমেয়। গুণ আরোপ করিয়া ক্ষুদ্র মনুষ্য অপ্রতিম ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনার প্রয়াস করিয়াছে।

—হরিজন, আগস্ট ১২, ১৯৩৮

আমি সতত ঈশোপনিষদের অনুশীলন করি। ইহাতে মাত্র আঠারটি মন্ত্র আছে। এই উপনিষদের প্রথম দিকে বলা হইয়াছে, "সেবাকর্ম করতে করতেই মাত্র ১২০ বা ১২৫ বছর আয়ু কামনা করবে।" মূলে যে সংখ্যাবাচক শব্দ রহিয়াছে তার অনুবাদ 'শত' শব্দে করা হয়। কিন্তু সেই সময়েই আমি দেখিতে পাই যে কোন ভাষ্যে ঐ সংখ্যাকে ১২০ বা ১২৫ বৎসর বলিয়া ধরা হইয়াছে। বিধিনির্দিষ্ট কর্ম করার আগ্রহ যে আমার কতটা প্রবল তাহার নিদর্শনস্বরূপ ঐ বৈঠকে আমি সর্বোচ্চ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছিলাম। বিশ্বাস অনুসারে চলা আমার চিরদিনের অভ্যাস। সেই অভ্যাসবশে ঐ ইচ্ছা আমি ব্যক্ত করিয়াছিলাম।

তা ছাড়া, আমি প্রাকৃতিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি, মানুষ পূর্ণায়ু লাভ করিতে পারে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের দৃষ্টিতে দেখিলে সেই (পূর্ণায়ু লাভের) সম্ভাবনা যে আমার কম তাহা আমি জানি। কারণ জীবনের সর্বস্তরে প্রকৃতির নিয়ম মতন আমি চলি নাই। ১৯০৩ বা উহার কাছাকাছি সময় হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি ঐ নিয়ম মত চলিতে আরম্ভ করি। দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকে ব্রহ্মচর্য আমি লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। আমায় পূর্ণায়ু লাভের পক্ষে তাহা অন্তরায়।

সব কিছুর যেমন আমার প্রাকৃতিক চিকিৎসার ধারণারও তেমন ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। ঈশ্বরময় তথা অনাসক্ত মনুষ্য দীর্ঘজীবন লাভের বাধা অতিক্রম করিতে পারে ইহা আমার দীর্ঘ দিনের বিশ্বাস। ভূয়োদর্শন ও শাস্ত্রপাঠ হইতে এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হইয়াছি যে যে মানুষ অবিচল বিশ্বাসে অদৃশ্য শক্তির শরণ লয় ও আসক্তির ঊর্ধ্বে উঠে তাহার দেহে রূপান্তর ঘটে। চাইলাম ত পাইলামের মত বস্তু ইহা নয়। ইহার জন্য চাই অতন্দ্রিত সাবধানতা ও অখণ্ড সাধনা। ভগবানের কৃপা না হইলে সাবধানতা ও সাধনা সত্ত্বেও মানুষের প্রযত্ন নিষ্ফল হয়।

আসক্তি (আসক্তির অর্থ এখানে কামপ্রবৃত্তি নয়, যদ্যপি কামরিপু পূর্ণ বশে আনার ভাব ইহাতে রহিয়াছে) বশে আনা অধিকতর শক্ত ব্যাপার। তা যদি না হইবে তবে পূর্ণ অহিংসা ত সুলভ বস্তু হইত। অহিংসা যে কি তাহা আমি ভাল ভাবেই জানি এবং অহিংস হওয়ার চেষ্টাও আমি করি, তাহা হইলে কি হয়, আমার আসক্তি মরে নাই যদ্যপি নির্জীব হইয়াছে। উহাকে বাগ মানানোর ব্যাপারে আমার দেহ ও মনের অনেকটা শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে।

আসক্তিকে বশে আনাই মুখ্য কথা। বীতরাগ হওয়ার অর্থ হৃদয়হীন হওয়া নয়। জীব মাত্রকে যে মানুষ নিজের মতন দেখে অন্যের দুঃখে সে দুঃখ অনুভব করিবেই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার নির্বিকার থাকা চাই। এরূপ নির্লিপ্ত কর্মের ফল হাতে হাতে মিলে আর মিলেও বহুগুণ। প্রভাবও উহার দূরপ্রসারী। স্বভাব-ধর্মেই উহা পূর্ণ অহিংস। দুঃসাধ্য বলিয়া অধীর হইলে চলিবে না। ঠিক পথ আশ্রয় করিলে লক্ষ্য ক্রমশঃই নিকটবর্তী হয়। ধরুন, আমার ইচ্ছা—ইচ্ছা কেন বলি, আকাঙ্ক্ষা বলাই ঠিক হইবে—যে একশত বৎসর আমি বাঁচিয়া থাকি। তাহা হইলেও কালই যদি আমার মৃত্যু হয় তাহাতেই বা কি। তাতে আমার আক্ষেপও নাই, বিষাদও নাই। অকাল মৃত্যু হয় ত মহা দুঃখও আমার হইবে না।

এই কারণে আমার ঐ আকাঙ্ক্ষা শিথিল হইবে না অথবা দীর্ঘ জীবন লাভের প্রযত্নে ভাটা লাগিবে না। এদিকে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে মরণের জন্য অনুক্ষণ আমার প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিনা উদ্‌বেগে নিত্য কর্ম করিয়া যাইতে ইহা বলে। অতিরিক্ত প্রয়াসে আয়ু ক্ষয় হয়। মৃত্যুতে সকল প্রযত্নের অবসান হয় না। যদি হইত তবে যে শাশ্বত বিধিকে আমরা ভগবান বলি তাহা পরিহাসের বস্তু হইত। রহস্যে-ঢাকা 'পরলোক'-এর রহস্য-ভেদের চেষ্টা না-ই করিলাম। আমাদের বিশ্বাস থাকা চাই যে, এই জন্মে যে মনুষ্য সৎ-জীবন যাপন করিবে পরজন্মে তাহার জীবন অধিক পূর্ণ ও অধিক সমৃদ্ধ হইবে।

ডাক্তার অপেক্ষা হাতুড়ে ভাল

> 'ডাক্তারেরা নিজেদের বিদ্যা ফলায় ও ভয়ানক বেশী দক্ষিণা (ফী) নেয়। যে ওষুধ বানাইতে আনা-দুই-আনা লাগে তাহা তাহারা দুই টাকায় বেচে। ব্যামো সারিবে এই সরল বিশ্বাসে সাধারণ মানুষ তাহাদের কাছে গিয়া ঠকে। হাতুড়েরা জানে তাহারা হাতুড়ে; ডাক্তারদের মতন তাহারা লোকসেবার ভান করে না। অতএব বলিব কি, ডাক্তার অপেক্ষা হাতুড়ে বরং ভাল।'

এক সময়ে আমি ডাক্তারির খুব ভক্ত ছিলাম। সংকল্প করিয়াছিলাম, ডাক্তার হইয়া লোকসেবা করিব। এখন আমার সেই ভাব নাই। আমাদের সমাজে কেন যে চিকিৎসকেরা তেমন আদর-খাতির লাভ করে নাই তাহা আজ আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

ডাক্তারদের কাজে লাগাইয়া ইংরেজেরা এই দেশে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছে। একথা সুবিদিত যে ইংরেজ চিকিৎসকেরা চিকিৎসার বিনিময়ে এশিয়ার কোন কোন নৃপতির কাছ হইতে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করিয়াছিল।

ডাক্তারদের খপ্পরে পড়িয়া আমরা প্রায় মাথা খোয়াইয়াছি। সময় সময় আমার মনে হয়, বড় বড় খেতাবধারী ডাক্তারদের অপেক্ষা বরং হাতুড়েরাই ভাল। বিষয়টা তলাইয়া দেখা যাক: দেহ নীরোগ থাকে ইহা দেখাই বস্তুতপক্ষে ডাক্তারের পক্ষে কর্ম অথবা যথার্থ বলিলে তাহাও নয়। অসুখ হইলে তাহা দূর করা তাহাদের কাজ। অসুখ হয় কেন? অবহেলা বা অমিতাচার যে তাহার কারণ একথা সুনিশ্চিত। অতিরিক্ত খাই, অজীর্ণ হয় আর ডাক্তারের কাছে দৌড়াই। ডাক্তার ওষুধ দেয়, ভাল হই। আবার বেশী খাই এবং ফের তাহার বড়ি গিলি। প্রথমবারে যদি হজমী বড়ি না খাইতাম ত ভুগিয়া শিখিতাম এবং পুনরায় আর কখনও বেশী খাইতাম না। বাদ সাধিল ডাক্তার, অমিতাচারের পথ সে দেখাইল। শরীরের গ্লানি অবশ্যই কমিল কিন্তু মন দুর্বল হইল। অতএব যখন তখন ওষুধের শরণ লইলে মনের[১] ওপর কর্তৃত্ব লোপ পায়। কুকার্য করিলাম, ব্যামো হইল। ডাক্তার তাহা দূর করিল। তাহার ফল সম্ভবত এই হইবে যে আবারও আমি সেই পাপ করিব। ডাক্তার মাঝে না পড়িলে প্রকৃতি আপন কাজ করিত আর আমার মন আমার বশে আসিত; পাপ দূর হইত এবং আমি সুখী হইতাম।

হাসপাতাল হইতে পাপের বিস্তার ঘটে। দেহের যতটা যত্ন নিতে হয় লোকে ততটা নেয় না। পাপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইউরোপীয় ডাক্তারেরা সর্বাধিক দোষী। মনুষ্য-দেহের রক্ষার প্রয়োজনে অবশ্য করণীয় এই ভ্রান্ত ধারণা হইতে প্রতি বৎসর তাহারা সহস্র-সহস্র জন্তুর জীবন নাশ করে, সহস্র-সহস্র প্রাণীর

১. চিকিৎসাজীবিদের সহিত আমার কলহ মোটামুটি এই: চিকিৎসকেরা আত্মাকে আমলই দেন না। ক্ষণভঙ্গুর দেহ-যন্ত্রের মেরামতির প্রযত্নের তাঁহাদের অন্ত নাই। আত্মাকে আমল না দিয়া ডাক্তারেরা মানুষকে নিজেদের মুখাপেক্ষী করিয়া ফেলেন। ফলে মানুষের আত্ম-গৌরব-বোধ ম্লান হয়, আত্মসংযম ক্ষীণ হয়। আশার কথা, পাশ্চাত্যে এরূপ একটা মতবাদ দিন দিন পুষ্ট হইতেছে (হোক না তাহার গতি মন্দ) যাহা রোগমুক্তির কথায় আত্মার প্রভাবে বিশ্বাসী আর তাই ওষুধের শরণ লওয়ার চাইতে প্রকৃতির নিরাময় শক্তির আশ্রয় অধিকতর লইয়া থাকে। —ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১. ৬. ২৫.

জ্যান্ত শরীর ব্যবচ্ছেদ করে। কোনও ধর্মে এই কার্যের সমর্থন নাই। মানবদেহ রক্ষার অভিপ্রায়ে এভাবে জীবননাশ করা অন্যায় ইহা সকল ধর্মেরই কথা।

এই সব ডাক্তারেরা আমাদের সহজাত সংস্কারের উল্টা কাজ করে। প্রায় সকল ডাক্তারি ওষুধে চর্বি বা সুরাসার থাকে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই এই দুই বস্তু অতীব অপবিত্র। সভ্যতার ভানই করি, ধর্মের বাঁধকে কুসংস্কার বলিয়া নাকই সিঁটকাই, যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় সেবাই করি, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে ডাক্তারেরা আমাদের ভোগের পথ দেখায় আর তাহার ফলে আমাদের সংযম নষ্ট হইয়াছে এবং আমরা ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছি। ফলে আমরা দেশসেবার অযোগ্য হইয়া গিয়াছি। ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিদ্যার অধ্যয়নে পরাধীনতার বন্ধন আমাদের দৃঢ় হইতেছে।

কেন আমরা চিকিৎসা-বৃত্তি অবলম্বন করি তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। লোকসেবার জন্য করি কি? নিশ্চয়ই না। সম্মান ও অর্থ আহরণের অভিপ্রায়ে আমরা ডাক্তার হই। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে চিকিৎসাবৃত্তিতে প্রকৃত সেবাভাব নাই। ইহাতে মানুষের ক্ষতি হইতেছে।

আমার অভীপ্সা

> 'প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রতি অল্প বয়স হইতেই আমার পক্ষপাত··· তখন হইতেই প্রাকৃতিক চিকিৎসার উন্নতির কথা আমার জীবনের কাম্যবস্তু হইয়া রহিয়াছে।'

প্রাকৃতিক চিকিৎসার দিকে অল্প বয়স হইতেই আমার অতিশয় ঝোঁক। লণ্ডনে আমার শ্বাসনালীর ঝিল্লীপ্রদাহ—ব্রঙ্কাইটিস—হয়[১]। সে সময়েও আমি এলোপ্যাথি চিকিৎসা করাই নাই। প্রাকৃতিক চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন হইয়াছিলাম। শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলার ও ব্যায়ামের গুটিকয়েক প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে ও পথ্য বিচার করিয়া চলিতে তিনি বলেন। তাহাতে আমি সারিয়া উঠি। তাঁহাকে আমি পাঁচ শিলিং মাত্র ফী দিয়াছিলাম। তখন হইতে প্রাকৃতিক চিকিৎসার উন্নতির কথা আমার জীবনের কাম্য বস্তু হইয়া রহিয়াছে। লোকে তখন আমাকে বোকা মনে করিত। বস্তুতঃ আমি নিজেও নিজকে ঐ দৃষ্টিতেই দেখিতাম। পরিণত বয়সে নানা কাজের চাপে এই দিকে মন দেওয়ার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু পুণায় ভগবান আমায় সে সুযোগ দেন···।

১. ১৯১৪—১৫ সনের কথা। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দেশে ফেরার পূর্বে গোখলের নির্দেশে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গান্ধী লণ্ডনে যান।

স্বভাব চিকিৎসা

'অন্তরাত্মা ঢালিয়া রামনাম করিলে যে কোন অসুখ সারে ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। ভগবানের অনন্ত নাম। যে নামে যাহার রুচি সেই নামে সে তাঁকে ডাকিতে পারে।'

প্রাকৃতিক চিকিৎসা মানে মানুষের পক্ষে যে চিকিৎসা শোভন সেই চিকিৎসা। মানুষ বলিতে মানুষের দেহমাত্র বুঝায় না, তাহার মন ও আত্মাও বুঝায়। এরূপ যে জীব রামনামই তাহার পক্ষে একমাত্র শোভন চিকিৎসা। এই চিকিৎসা অব্যর্থ। রামবাণ শব্দ রামনাম হইতে আসিয়াছে। রামবাণ মানে অব্যর্থ ওষুধ। এই চিকিৎসাই যে মানুষের যোগ্য চিকিৎসা তাহার প্রমাণ প্রকৃতি হইতে মিলে। যে অসুখই হোক, অন্তরাত্মা ঢালিয়া রামনাম করিলে তাহা নিশ্চয় সারিবে। ঈশ্বরের অনন্ত নাম। যে নামে যাহার রুচি সেই নামে সে তাঁকে ডাকিতে পারে। ঈশ্বর-আল্লা-গড্ বলিতে একই[১] সত্তা বুঝায়। তাঁর নাম তোতার মত লইলে হইবে না; অন্তরাত্মা ঢালিয়া বিশ্বাসভরে ডাকা চাই। বিশ্বাস আছে কি নাই তাহার কতকটা প্রমাণ মিলিবে তদনুরূপ প্রযত্ন বা প্রযত্নের অভাব হইতে। সেই প্রযত্নের বা আচরণের স্বরূপ কি? যে পঞ্চভূতে এই দেহ গঠিত সেই পঞ্চভূতেই আরোগ্যের উপায় ও উপকরণ খুঁজিতে হইবে আর তুষ্ট থাকিতে হইবে। তবে রামনাম উহার মূল বস্তু। তা সত্ত্বেও যদি মৃত্যু আসে ত ঘাবড়াইবার কিছু নাই। উহা খুশী মনে বরণ করিতে হইবে। এই দেহকে অমর করার কোন ওষুধ আজও বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে পারে নাই। অমরত্ব আত্মার ধর্ম। অবিনাশী ত তাহা বটেই। তবুও দেহীর ধর্ম হইতেছে সেই নিষ্পাপ দ্যুতির দিব্য বাহন হওয়া।

এই কথা যদি ঠিক হয় তবে প্রাকৃতিক চিকিৎসার উপকরণের গণ্ডি স্বতঃই

---

১. ভগবানের সহস্র নাম। না, তাঁহাকে অনামা বলাই ঠিক হইবে। যে নামে পূজিতে বা ডাকিতে ভাল লাগে সে নামেই তাঁর পূজা করা চলে। কেহ তাঁকে বলে রাম, কেহ কৃষ্ণ, কেহ বা রহিম আবার কেহ বা বলে গড্। সবাই এক অরূপ সত্তার উপাসনা করে। তথাপি সকলের যেমন সব খাদ্য রোচে না তেমন সব নাম সকলের রোচে না। অনুষঙ্গ অনুসারে মানুষ নিজ নিজ প্রিয় নাম বাছিয়া লয়। আমাদের নিভৃততম ভাবও তাঁর অগোচর নহে, কেন না ভগবান সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ও সর্বশক্তিমান। অতএব আমাদের আকৃতির অনুপাতেই তিনি সাড়া দিয়া থাকেন। —ইয়ং ইণ্ডিয়া, সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯২৫

সংকীর্ণ হইয়া যায়। সে স্থলে বৃহৎ হাসপাতালের নানাবিধ অগণিত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের ও খ্যাতনামা চিকিৎসকের হাত হইতে লোক অব্যাহতি পাইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই সকল অলভ্য। তাই বহুর ভাগ্যে যাহা জোটে না, কতিপয় তাহা পাওয়ার জন্য লালায়িত হইবে কেন?

রামনাম অব্যর্থ ঔষধ

'রামনাম মামুলী হিতোপদেশ নহে। ইহা এমন এক বস্তু যাহা অনুভবে উপলব্ধি করিতে হয়। এই সাক্ষাৎ উপলব্ধি যাহার হইয়াছে সে-ই কেবল রামনামের ব্যবস্থা দিতে পারে। অন্য কাহারও সেই অধিকার নাই।'

১৯৪৬ সালের ৩রা মার্চের হরিজন-এ প্রাকৃতিক চিকিৎসা নামে আমার একটি লেখা বাহির হয়। তাহা পড়িয়া বৈদ্য শ্রীগণেশ শাস্ত্রী যোশী জানাইয়াছেন যে আয়ুর্বেদে একথার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে যে, যে কোন রোগের আরোগ্যের ব্যাপারে রামনাম সহায়ক। প্রাকৃতিক চিকিৎসাকে আয়ুর্বেদে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে আর প্রাকৃতিক চিকিৎসায় দেওয়া হইয়াছে রামনামকে প্রধান স্থান (পদ)। চরক বাগ্‌ভট্ট আদি অসামান্য প্রতিভাবান আচার্যগণের সময়ে ভগবানকে লোকে রামনামে নয় বিষ্ণু নামে জানিত। আশৈশব আমি তুলসীর ভক্ত। তাই ভগবানকে আমি বরাবর রামনামে আরাধনা করিয়া আসিয়াছি। ওঁকার হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দেশে ও সকল ভাষায় ভগবানের যত নাম আছে উহার যে কোন নাম জপুন না কেন ফল তাহার একই। বিধাতা ও বিধাতার বিধান অভিন্ন। অতএব তাঁর বিধান মানিয়া চলাই তাঁর সর্বোত্তম উপাসনা। যে মানুষ তাঁর বিধান ঠিক ঠিক মানিয়া চলে, মুখে নাম না নিলেও সে মানুষের চলে। অন্য কথায়, ভগবচ্চিন্তা যাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ হইয়া গিয়াছে সেই ব্যক্তি এমনই তদ্‌গতচিত্ত হয় যে ভগবানের বিধান বুঝিতে ও তদনুসারে চলিতে তাহার লেশমাত্রও চেষ্টা করিতে হয় না, শ্বাস-প্রশ্বাসের মতন অনায়াস গতিতেই তাহা ঘটিয়া থাকে। এরূপ মানুষের অন্য কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নাই।

তবেই প্রশ্ন উঠে, হাতের সামনে এরূপ অনুপম ওষুধ থাকিতে তৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত কম কেন? আর যাহারা তাহা জানে তাহারাই বা তাঁর নাম নেয় না কেন? আর নিলেও অন্তর হইতে না লইয়া তোতার মত নেয় কেন? পাখির বুলির মত নাম লই ত একথাই বুঝিতে হইবে যে তাঁর নাম লইলে যে সকল দুর্গতি দূর হয় এই উপলব্ধি আমাদের নাই।

এই উপলব্ধি আসিবেই বা কি করিয়া? ডাক্তার-বৈদ্য-হাকিম বা অন্য চিকিৎসকেরা এই মহৌষধের শরণ লইতে বলে না। ইহাতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। গঙ্গার পাবন ধারা যে গৃহে গৃহে বওয়ানো যায় একথা স্বীকার করিলে যে তাহারা বেকার হইবে, মানে তাহাদের রোজগারের পথ বন্ধ হইবে। অতএব ঠেকিয়াই অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া পাউডার বা মিকশ্চার তাহাদের চালাইতে হয়। ইহাতে ডাক্তারদের পেট ত ভরে বটেই আর অন্যদিকে ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় যে রোগীরাও যেন হাতে হাতে ফল পায়। 'অমুক ডাক্তারের ওষুধে ভাল হয়েছি'। কিছু লোকে এইরূপ বলিতে থাকিলে দেখিতে দেখিতে সেই ডাক্তারের পসার বাড়িয়া যায়।

তা ছাড়া একথাও মনে রাখিতে হইবে যে ডাক্তারদের নিজেদের যদি রামনামের অলৌকিক শক্তিতে আস্থা না থাকে তবে তাহারা রামনাম করিতে বলিলেও তাহার কোন ফল হইবে না। রামনাম মামুলী হিতোপদেশ নহে। ইহা এমন বস্তু যাহা অনুভবে উপলব্ধি করিতে হয়। এই সাক্ষাৎ উপলব্ধি যাহার হইয়াছে সে-ই কেবল রামনামের ব্যবস্থা দিতে পারে। অন্য কাহারও সেই অধিকার নাই। বৈদ্যরাজ চারটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া আমায় পাঠাইয়াছেন। তাহার মধ্যে চরক-এরটি সর্বাপেক্ষা সহজ ও উপযোগী। শ্লোকটি এই:

বিষ্ণুং সহস্রমূর্ধানং চরাচরপতিং বিভুম্।
স্তবন্নাম সহস্রেন জরাণ সর্বাণ ব্যাপোহতি ॥

ইহার তাৎপর্য এই যে বিষ্ণুর সহস্র নামের একটিও যে মানুষ তন্ময় হইয়া করে তাহার কোন ব্যাধিই থাকে না।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা কি

'প্রাকৃতিক চিকিৎসায় রোগের জড় মরিলে আমাদের জীবনের দিশা বদলায়, নূতন জীবন শুরু হয়। তখন আর রোগের বা অসুখের আশঙ্কা থাকে না। অতএব প্রাকৃতিক চিকিৎসা এক জীবনধারা, চিকিৎসা-প্রণালী নয়।'

গান্ধীজী বোম্বাইতে পাঁচ দিন ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির কাজে বেশীর ভাগ সময় তাঁহার ব্যয় হয়। উহার মধ্যেই সময় বাহির করিয়া তিনি তাঁহার নূতন সংকল্পের কথা অর্থাৎ গরীবদের সেবার নিমিত্তে প্রাকৃতিক চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলেন। সম্প্রতি কোন পত্রে সরদারকে তিনি লিখিয়াছেন,

"পঞ্চাশ বছরের পুরানো বাতিকে আমায় পাইয়াছে, সেই শখে বান ডাকিয়াছে।" অন্য কোন বন্ধুকে তিনি বলেন, "গরীবদের সেবা করিবার বা করার সবিশেষ যোগ্যতা ও পটুতা থাকা সত্ত্বেও গরীবদের সেবায় তাহা যদি ব্যবহার না করি ত লোকে আমায় বেকুব বলিবে।" আর তাই জীবন সন্ধ্যায়, ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে বহু কর্মভারের উপর আর এক কর্মভার তিনি কাঁধে লইলেন।

এই বাতিক কেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে, প্রাকৃতিক চিকিৎসা বলিতে তিনি কি বুঝেন এবং প্রাকৃতিক ও অন্যসব চিকিৎসা-প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা বিড়লা ভবনে জনৈক সাক্ষাৎকারীর সহিত তাঁহার যে কথা হয় তাহা হইতে স্পষ্ট হইবে:

"সাধারণ চিকিৎসায় রোগী যে ওষুধে রোগ সারিবে সেই ওষুধের জন্য ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার ওষুধ দেয়। কঠিন উপসর্গ দূর হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কর্তব্য শেষ হইয়া যায়। রোগীর বিষয়ে করিবার বা ভাবিবার আর কিছু তাহার থাকে না। রোগীকে প্রাকৃতিক চিকিৎসক 'আরোগ্য' বিক্রী করে না। তাহাকে সে সেই পথ দেখায় যে পথে চলিলে তাহার রোগ দূর হইবে এবং আর কখনও তাহা ফিরিয়া আসিবে না। রোগ কি তাহা নির্ধারণের দিকে সাধারণ ডাক্তার-বৈদ্যের নজর অধিক। প্রাকৃতিক চিকিৎসকের দৃষ্টি কি করিলে ও কিভাবে চলিলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকিবে সে-দিকে অধিক। সাধারণ ডাক্তারের ভাবনার যেখানে অন্ত প্রাকৃতিক চিকিৎসকের ভাবনার সেখানে আরম্ভ। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় রোগের জড় মরিলে আমাদের দিশা বদলায়, নূতন জীবন শুরু হয়। তখন আর রোগের বা অসুখের অবসর থাকে না। অতএব প্রাকৃতিক চিকিৎসা এক নূতন জীবনধারা, চিকিৎসা-প্রণালী নহে।"

—প্যারেলাল

প্রাকৃতিক চিকিৎসায় রামনাম

'আধ্যাত্মিক ব্যাধিতে মানুষ অনাদিকাল হইতে রামনাম-এর আশ্রয় লইয়া আসিয়াছে। ক্ষুদ্র ত বৃহতেরই অংশ। তাই ত আমি বলি যে শারীরিক ব্যাধিতেও রামনাম অব্যর্থ মহৌষধ।"

রাংটা ভবনে (বোম্বাই) প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী প্রাকৃতিক চিকিৎসার মর্ম, ক্ষেত্র ও প্রাকৃতিক চিকিৎসায় রামনামের স্থান যে কি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন:

প্রাকৃতিক চিকিৎসায় যে কোন রোগ সারে এমন দাবি কেহ করে না। কোন চিকিৎসায়ই তাহা সম্ভবপর নহে। তাহা যদি হইত ত আমরা সকলে অমর হইয়া যাইতাম। কিন্তু অসাধ্য রোগে অস্থির না হওয়ার, ধীরভাবে উহা উপেক্ষা করার শক্তি ইহা (রামনাম) হইতে মিলে। যাহা অগুনতি লোকের ভাগ্যে কখনও জুটিবে না হারাম জ্ঞানে তাহা বর্জন করার সংকল্প যদি করি তবে রোগমুক্তির জন্য আমীর গরীব কাহারও প্রকৃতির শরণ লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। প্রাকৃতিক চিকিৎসকের তূণে রামনাম অব্যর্থ শর। এই কথায় আপনারা অবাক হইবেন না। সম্প্রতি কোন প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক আমাকে লিখিয়াছেন, "সারাজীবন আমি ঔষধ ব্যবস্থা করে এসেছি। কিন্তু শারীরিক ব্যাধির নিরাময়ের জন্য আপনাকে রামনাম-এর ব্যবস্থা দিতে দেখে আমার মনে পড়ছে যে বাগভট্ট ও চরকও এই কথাই বলেছেন।"

আধ্যাত্মিক সংকটে (ব্যাধিতে) মানুষ অনাদিকাল হইতে রামনাম-এর আশ্রয় লইয়া আসিয়াছে। ক্ষুদ্র ত বৃহতেরই অংশ। তাই না আমি বলি যে শারীরিক ব্যাধিতেও রামনাম অব্যর্থ মহৌষধ। "আমাকে ডাক, তোমার অসুখ ভাল করে দেব" একথা প্রাকৃতিক চিকিৎসক রোগীকে কস্মিনকালেও বলে না। জীবদেহে রোগোচ্ছেদক এক সহজাত শক্তি বিদ্যমান। সেই শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া সেই শক্তিকে সক্রিয় করিয়া কিরূপে আমরা নিজেরাই রোগমুক্ত হইতে পারি প্রাকৃতিক চিকিৎসক সেই পথই-মাত্র দেখায়। এই সহজাত শক্তি যে কি তাহা যদি আমরা বুঝিতাম তবে আমাদের পরাধীনতা ত ঘুচিতই, অধিকন্তু আমাদের এই বাসভূমি নীরোগ ও বলিষ্ঠ মানুষের বাসভূমি হইত; আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা ঘুচিত, মহামারি দূর হইত।

কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও নহে যে রামনাম সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে অব্যর্থ। রামনামের শক্তি সীমাসাপেক্ষ, শর্তসাপেক্ষ। রামনাম তুকতাক নহে; রামনাম অভিচার নহে। কেহ অতিভোজন করিয়াছে। তাহার অজীর্ণ হইয়াছে। অতিভোজনের ভোগ না ভুগিয়া পুনরায় অতিভোজনের বাসনা হইতে সে যদি রামনাম করিয়া অজীর্ণ হইতে অব্যাহতি পাইতে চায় তবে বলিব রামনাম তাহার জন্য নয়: রামনাম সেখানে বেকার। রামনাম সদুদ্দেশ্য সিদ্ধির সাধন, অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধির সাধন নয়। তাহা যদি হইত তবে চোর ডাকাত হইত রামের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যাহাদের হৃদয় নির্মল, যাহারা শুচিশুদ্ধ হইতে ও থাকিতে চায়, রামনাম তাহাদের সহায়। রামনাম কস্মিনকালেও ভোগ-বাসনা চরিতার্থ

করিবার সাধন হইতে পারে না। অতিভোজনজনিত মন্দাগ্নির ঔষধ উপবাস, রামনাম নহে। উপবাসে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে পর প্রার্থনা ফলপ্রসূ হয়। প্রার্থনায় উপবাসের কষ্ট লাঘব হয়, উপবাস সহজ হয়। এদিকে ওষুধ গিলিলাম আর ওদিকে রামনাম করিলাম ইহা ত ব্যর্থ পরিহাস মাত্র। যে ডাক্তার নিজ বিদ্যা রোগীর পাপাচরণের কাজে নিয়োগ করে সে নিজে ডোবে আর রোগীকেও[১] ডোবায়। ভগবানের দেউলস্থানে নয়, ভোগের বাহন স্থানে মানুষ যদি দেহকে সর্বথা রক্ষণীয় বস্তু করিয়া তোলে এবং যে কোন ভাবে তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অজস্র অর্থ ব্যয় করে তবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর সর্বনাশের বিষয় আর কী হইতে পারে! ইহার বিপরীত চিত্র: রামনামে রোগ-নিরাময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মলিনতা দূর হয় আর তাই মানুষ উন্নত হয়। এখানেই, ঠিক এখানেই রামনামের সুবিধা ও অসুবিধা।

উরুলি-কাঞ্চন-এ

> 'অঙ্গহানি হলে তা ফিরিয়ে দেবার অলৌকিক শক্তি রামনামের নেই। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিকতর লোকাতীত কিছু ঘটাবার শক্তি রামনামের আছে: অঙ্গহানি হওয়া সত্ত্বেও অখণ্ড সন্তোষে দিন কাটাতে এবং দিন ফুরুলে বিনা কষ্টে বিনা ভয়ে মরতে তাহা শেখাতে পারে।'

বোম্বাই হইতে ফিরিয়া গান্ধীজী দিন কয়েকমাত্র পুণার প্রাকৃতিক চিকিৎসা-ভবনে ছিলেন। ২২শে বিকালে তিনি উরুলি-কাঞ্চনে যান। শোলাপুর-পুণা রেলপথে উরুলি-কাঞ্চন একটি ছোট স্টেশন। হাজার তিনেক লোকের এখানে বাস। ডাকঘর আছে। রেল-স্টেশন হইতে টেলিগ্রাম করা যায়। টেলিফোন নাই। ডাক বা অন্য দ্রুতগামী গাড়ী এখানে থামে না। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। বায়ু বলবর্ধক। পাশেই ছাউনি। সেখান হইতে পর্যাপ্ত জল পাওয়া যায়। আঙুর, কমলালেবু ও পেঁপে এখানে প্রচুর জন্মে।

কয়েকদিন পূর্বে এই গ্রামের জন কয়েক মুখ্য ব্যক্তি গান্ধীজীর সহিত পুণায় দেখা করেন এবং অনুরোধ জানান যে গরীবদের জন্য তাঁহার সংকল্পিত চিকিৎসা ভবন তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্বক তাঁহাদের গ্রামে স্থাপন করেন।

১. দেহের চিকিৎসক অপেক্ষা আত্মার চিকিৎসক আমাদের অধিকতর আবশ্যক। হাসপাতাল ও চিকিৎসকের সংখ্যাবৃদ্ধি সভ্যতার মানদণ্ড নহে। দৈহিক ভোগবৃত্তির প্রশ্রয় আমরা যত কম দিব ততই মঙ্গল। অন্য সকল দেশের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

আবশ্যক জমি দেওয়ার এবং সর্বভাবে প্রাকৃতিক-চিকিৎসা ট্রাস্টের সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দান করেন। তা ছাড়া দশ হাজার টাকা দিবেন একথাও বলেন। রেলের পূর্বতন ঠিকাদার শ্রীদাতার গান্ধীজীর অবস্থানের নিমিত্তে কিছুদিনের জন্য তার নিজ গৃহ ছাড়িয়া দেন

উরুলি-কাঞ্চনে গান্ধীজীর প্রথম দিন। সন্ধ্যার প্রার্থনায়, 'হে হরি, বিপদে তুমিই কাণ্ডারী' এই ভজন গীত হয়। এই পদের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন, "এই আশ্বাস সর্বব্যাপী। কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাধি দূর হবে এরূপ গণ্ডি এতে টানা হয় নি।" রামনাম করার রীত সম্বন্ধে তিনি বলেন, "আপনি যদি ক্রোধের বশ হন, আপনার আহার-নিদ্রা শরীর রক্ষার নিমিত্ত না হয়ে যদি ভোগবিলাসের নিমিত্ত হয় তবে জানবেন যে রামনাম কি তাহা আপনি উপলব্ধি করেন নি। আপনার রামনাম সেস্থলে তোতার বোল ছাড়া কিছুই নয়। রামনাম হতে লাভবান হতে চান ত হৃদয় ঢেলে ঐ নাম করতে হবে, জীবনের সর্ব কর্মে তা ফুটিয়ে তুলতে হবে।"

পরের দিন সকালবেলা ত্রিশজন রোগী আসে—ঐ প্রথম। তাহাদের পাঁচ-ছয় জনকে গান্ধীজী দেখেন। অসুখের প্রকৃতিভেদের কারণে যতটা অদল-বদল করা আবশ্যক ততটা বাদে প্রায় সকলের জন্যই মোটামুটি তিনি এক ব্যবস্থা দেন—রামনাম-জপ, আতপ-স্নান, মালিশ ও কটিস্নান। আর পথ্যরূপে ব্যবস্থা করেন—দুধ, ঘোল, ফল বা ফলের রস ইত্যাদি লঘু বিরেচক বস্তু। পর্যাপ্ত টাটকা নির্মল জল পান করার নির্দেশও দেন। ঐ দিন সন্ধ্যার প্রার্থনায় তিনি বলেন :

"যে কোন ব্যাধিই হোক, আধ্যাত্মিক অথবা শারীরিক, এই দুইয়ের মূল কারণ একই"—একথা অতীব সত্য। অতএব ব্যাধিমাত্রেরই উপশমের উপায়ও স্বভাবতঃ একই হবার কথা। শাস্ত্রও বলে—রোগোৎপত্তির কারণ যেমন এক রোগনিবৃত্তির পন্থাও তেমন এক। তাই ত আজ সকালে যাঁরা আমার কাছে এসেছিলেন তাঁদের আমি রামনাম জপ করতে বলেছি। অন্য যে ব্যবস্থা দিয়েছি তাও প্রায় একই রূপ। মনের মতো না হলে শাস্ত্র বচন উপেক্ষা করা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। মনকে স্তোক দিয়ে আমরা ধরে নিয়েছি যে, শাস্ত্র হল আত্মার পারলৌকিক কল্যাণের কথা আর ধর্ম হল যে পুণ্য পরলোকে কাজে লাগবে তা অর্জনের কথা। আমি বলি তাহা নয়। ধর্ম যদি এই জীবনের কাজে না এল তবে পরলোকে তা আমার দরকার নেই।

"শারীরিক অথবা মানসিক ব্যাধি হতে একেবারে মুক্ত কোন মনুষ্য বুঝি বা জগতে নাই। এমন কতকগুলি ব্যাধি আছে যার আদৌ কোন চিকিৎসা নেই। উদাহরণ স্বরূপ—কোন অঙ্গহানি হলে তা ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি রামনামের নেই। কিন্তু তাহা অপেক্ষা লোকাতীত কিছু ঘটাবার শক্তি রামনামের আছে: অঙ্গহানি হওয়া সত্ত্বেও অখণ্ড সন্তোষে[1] দিন কাটাতে ও দিন ফুরুলে বিনা কষ্টে বিনা ভয়ে মরতে তা শেখাতে পারে। মরতে ত হবেই দুই দিন আগে বা পরে তবে আর মৃত্যু কখন আসবে সেকথা ভেবে আকুল হতে যাই কেন?"

তৃতীয় দিনে রোগীর সংখ্যা তেতাল্লিশ হয়। সন্তুষ্ট হইয়া গান্ধীজী বলেন, "উত্তম লক্ষণ, যাদের জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসার আয়োজন তারা তার সুযোগ নিচ্ছে।" আশ্বাস দিয়া প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বলেন, কাজ ঠিক মতন চলিলে বছরে কমপক্ষে চার মাস তিনি উরুলি কাঞ্চনে থাকিবেন। তিনি আরও বলেন:

"প্রাকৃতিক চিকিৎসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধির অথবা বিরাট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই। সিম্প্লিসিটি ইজ্ দি এসেন্স অব ইউনিভারসেলিটি—সকলের তরে যাহা, বায়ুসম সুলভ তাহা। অগণিত মনুষ্যের কল্যাণকর কিছুর নিমিত্ত অশেষ পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা নাই। পাণ্ডিত্য অর্জন দুইচার জনের পক্ষেই মাত্র সম্ভব। অতএব উহার সুযোগ-সুবিধা একমাত্র ধনবানেরাই পেতে পারে। হাট নেই বাট নেই এমনতর ক্ষুদ্র অজ সাতলক্ষ গ্রাম নিয়েই না ভারতবর্ষ। এমনও অনেক গ্রাম আছে যেখানে কয়েক কুড়ি বা কয়েক শ' মাত্র লোকের বসতি। আমার বাসনা এমন কোন গাঁয়ে গিয়ে থাকি। এ হচ্ছে যথার্থ ভারত, আমার ভারত, যে ভারতের জন্য আমি বেঁচে আছি ও বেঁচে থাকতে চাই। উচ্চ খেতাবধারী ডাক্তারদের চিকিৎসার উপকরণ এবং হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি কস্মিনকালেও গরীবদের পক্ষে সুলভ হবে না। সহজলভ্য প্রাকৃতিক চিকিৎসা ও রামনামই তাদের একমাত্র ভরসা।"

তারপর প্রাকৃতিক চিকিৎসার তত্ত্ব-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন:

"বায়ু জল মাটি অগ্নি বা তেজ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে মানুষের দেহ

১. ভগবানকে ডাকিলে যে শান্তি-সন্তোষ মিলে অন্য কিছু হইতে তাহা মিলে না।

—প্রেস রিপোর্ট, ১০ই জানুয়ারী ১৯৪৬

গঠিত। আত্মা তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ু সর্বাপেক্ষ বেশী প্রয়োজনীয়। আহার বিনা মানুষ সপ্তাহ কয়েক টিকতে পারে। জল বিনা দিন কয়েক চলতে পারে। কিন্তু বায়ু না পেলে কয়েক মিনিটেই সব শেষ। তাই ত ভগবান বায়ু সর্বত্র সুলভ করে রেখেছেন। খাদ্যের বা জলের অভাব সময় বিশেষে হতে পারে কিন্তু বায়ুর অভাব কস্মিনকালে হয় না। কিন্তু তা হলে কি হয়। আমরা এমনই বেকুফ যে ভগবানের দেওয়া এই স্বাস্থ্যকর নির্মল বায়ু থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করি; বাইরে না ঘুমিয়ে আমরা ঘরে ঘুমাই আর তাও আবার দরজা-জানালা বন্ধ করে। চোরের ভয় থাকে ত দরজা বন্ধ করার কথা বুঝি। কিন্তু মানুষটা ঐ বন্ধ ঘরে ঘুমায় কেন!

"মুক্ত বাতাস পেতে হলে খোলা স্থানে শুতে হয়। কিন্তু খোলা জায়গা হলেই হল তাহা নয়। যে স্থানের বায়ু ধুলো-ময়লায় বিকৃত সে স্থানে শুয়ে লাভ নেই। শোয়ার জায়গা ধুলা-ময়লা-মুক্ত হওয়া চাই। ধুলা ও শীত থেকে বাঁচার জন্য অনেকে মুখ ঢেকে শোয়। ব্যামো থেকে তা আরও ভয়ানক। কেহ কেহ মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়। এই অভ্যাস বিশ্রী। মুখ শ্বাস নেওয়ার ইন্দ্রিয় নয়। শ্বাস নেওয়ার ইন্দ্রিয় নাক। ভিতরে প্রবেশ করার সময় বায়ু নাসাপথে পরিস্রুত, পরিশুদ্ধ ও ঈষৎ উষ্ণ হয়। তবে না তা ফুসফুসে ঢুকতে পায়।

"যেখানে সেখানে থুথু ফেললে, যত্রতত্র মলমূত্র-আবর্জনা নিক্ষেপ করলে মানবদ্রোহ ও প্রকৃতিবিরোধ করা হয়। মানবদেহ ভগবানের দেউল। দেব-মন্দিরে যে বায়ু প্রবেশ করে, যে মানুষ তাহা দূষিত করে সে দেব-মন্দিরকেই কলুষিত করে। রামনাম করা তার বৃথা।"

—প্যারেলাল

মহৌষধ

'রামনামে প্রার্থনা নিরাময়[১] ও সংকল্প অনাময়[২]-এর বাস ও ভাস আছে মানি। তা হইলেও এই দুই হইতে রামনাম একেবারেই আলাদা। রামনাম যে জাগ্রত সত্তার দ্যোতক নামজপ তাহারই প্রতীক। ভগবান অন্তরে রহিয়াছেন এই সাক্ষাৎ অনুভূতি যখন মানুষের জন্মে তখন শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন ব্যাধিই তাহার থাকে না।'

১. Faith-healing or cure—ওষুধ বিনা প্রার্থনা-মহিমায় আরোগ্য।

২. Chirstian Science—ঔষধের শরণ না লইয়া সংকল্প প্রভাবে রোগ প্রতিকার।

"আপনার প্রতিটি কথা মহা আগ্রহে আমি পাঠ করি। হরিজন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক নিঃশ্বাসে আগাগোড়া আমি পড়িয়া ফেলি। নইলে আমার স্বস্তি নাই। ফলে আমার মনে এই বিচিত্র অহংভাব জন্মিয়াছে—যাঁকে আমি পূজা করি, অশেষ শ্রদ্ধা করি, আমি তাঁকে যেমনটি দেখিতে চাই তিনি তেমন অনিন্দ্যসুন্দর কেন না হইবেন! অতএব আপনার লেখায় অযৌক্তিক (যদি নিঃসংশয়ে বুঝি অযৌক্তিক) কিছু যখন দেখিতে পাই তখন অস্বস্তি বোধ করি। রামনাম রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ উপায় প্রাকৃতিক চিকিৎসার এই যে নূতন ভাষ্য আপনি করিয়াছেন তাহাতে আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। পরমতসহিষ্ণুতার খাতিরে যুবকেরা আপনার মত বিশেষের বিরোধ করে না। সংক্ষেপে তাহাদের মনের ক্রিয়া এইরূপ:

'ইহা অনস্বীকার্য যে গান্ধীজী আমাদের অনেক কিছু দিয়াছেন, আমাদিগকে আশাতীত উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সর্বোপরি তাঁহার সাধনার ফলে স্বরাজ প্রায় আমাদের হাতে আসিয়াছে। অতএব তাঁহার রামনাম-বাই না হয় বরদাস্ত করা যাক।'

"প্রসঙ্গত ৩. ৩. ১৯৪৬-এর হরিজনের কথা উল্লেখ করিতেছি। তাহাতে আপনি বলিয়াছেন, 'হৃদয় ঢালিয়া রামনাম করা যে কোন অসুখের অব্যর্থ ঔষধ'। আপনি একথাও বলিয়াছেন, 'যে পঞ্চভূতে মনুষ্যদেহ গঠিত সেই মাটি, জল, আকাশ, তেজ ও বায়ু হইতে আরোগ্যের উপায় খুঁজিতে আর তাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এবং ৭. ৪. ১৯৪৬-এর হরিজনে আপনি বলিয়াছেন, একথা জোর দিয়াই বলিতে পারি যে শারীরিক ব্যাধিতেও রামনাম সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

"প্রাকৃতিক চিকিৎসায় আপনি যখন এই নতুন বিষয়টির অবতারণা করেন তখন প্রথমটায় আমার মনে হইয়াছিল যে আপনি সংকল্প-অনাময়ের অথবা প্রত্যয়-নিরাময়ের কথাই অন্যভাবে বলিয়াছিলেন মাত্র। যে কোন চিকিৎসায় এই দুইয়ের আবশ্যকতা আছে। উপরের তিন উদ্ধৃতির প্রথমটার ব্যাখ্যা আমি এই দৃষ্টিতে করিয়াছি। দ্বিতীয়টিতে আপনি কি বলিতে চাহিয়াছেন তা ঠিক ধরিতে পারি নাই। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের দৃষ্টিতে দেখা যায়, যে পঞ্চভূতের কথা আপনি বলিয়াছেন এবং যাহাতে আপনি চিকিৎসা নিবদ্ধ রাখিতে চান সেই পঞ্চভূত বাদ দিয়া কোন ঔষধই প্রস্তুত হইতে পারে না।

"বিশ্বাসের উপর জোর দেন ত সেখানে আপনার সহিত মত বিরোধের কথাই উঠে না। আমি সারিয়া উঠিব রোগীর এইরূপ বিশ্বাস ডাক্তারের সহায়।

রোগীর কাছ হইতে ডাক্তার ত তাহাই চায়। সেরেফ বিশ্বাসে 'আমাদের শারীরিক ব্যাধিও দূর হইবে' একথা গলাধঃকরণ করা যায় না। দুই বছর আগে আমার শিশুকন্যার শিশুবাত হইয়াছিল। আধুনিক চিকিৎসার গুণে চিরজীবনের পঙ্গুত্ব হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে। আড়াই বছরের শিশুকে রামনাম করিয়া বাত হইতে ভাল হওয়ার কথা যে বৃথা একথা আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন। কোন শিশুর মাকে তাহার রুগ্ন শিশুর আরোগ্যের জন্য শিশুর হইয়া নামজপ করার কথা বলিয়া দেখিতে পারেন।

"২৪শে মার্চের হরিজনে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপনি দেখাইয়াছেন যে চরকে আপনার কথার সমর্থন রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও আপনার ঐ কথা মানিয়া লইতে পারিতেছি না, কেননা আপনার কাছ হইতেই না শিক্ষালাভ করিয়াছি যে যাহাতে হৃদয় সায় দেয় না তাহা যতই প্রাচীন ও প্রামাণিক হোক গ্রহণ করার অযোগ্য।"

কোন যুবক শিক্ষক উপরের কথা আমাকে লিখিয়াছেন। ছাত্রদের মন পাইতে আমি চাই ত বটেই তবে যে কোন মূল্যে (শর্তে) নয়। কেবল ছাত্রদেরই নয় জগতের সব মানুষেরই মন আমি পাইতে চাই। সমগ্রের তুলনায় ছাত্র আর কয়জন। লোকসেবক কোন অবস্থায়ই ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের মনস্তুষ্টি করিবে না।

পত্রলেখক যাহাদের প্রতিনিধি সত্যই তাহারা যদি মনে করে যে আমার কর্মে ভারতবর্ষের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে তবে তাহাদের আমি বলিব যে কেবল পরমত-সহিষ্ণুতার খাতিরেই আমার তথা-কথিত খেয়াল বরদাস্ত করিলে হইবে না। তাহা অপেক্ষা আরও কিছু অধিক আমি তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করি। কেবল পরমত-সহিষ্ণুতায় না হইবে তাহাদের লাভ আর না হইবে আমার। তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে জন্মিতে পারে নিষ্ক্রিয়তার ও আমার মধ্যে মিথ্যা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব। হইলই বা খেয়াল, ভাল করিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া না দেখিয়া খেয়ালও যেন তাহারা উড়াইয়া না দেয়। খেয়ালী মানুষকে সব সময় উড়াইয়া দেওয়া যায় না। খেয়ালবশেই না কত লোক ইহার আগে ফাঁসি-মঞ্চে চড়িয়াছে। রামনামে প্রার্থনা নিরাময়-এর ও সংকল্প অনাময়-এর বাস ও ভাস আছে, মানি। তাহা হইলেও এই দুই হইতে রামনাম একেবারেই পৃথক। রামনাম যে জাগ্রত সত্তার দ্যোতক নামজপ তাহারই প্রতীক। ভগবান অন্তরে রহিয়াছেন এই সাক্ষাৎ অনুভূতি যখন মানুষের জন্মে তখন শারীরিক,

মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন ব্যাধি তাহার থাকে না। এমন লোক সংসারে দেখা যায় না বলিয়া আমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। যাহারা আদপে ভগবানই মানে না তাহাদের কাছে আমার কথা প্রলাপমাত্র।

রামনামের মূলে যে সত্য রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে কৃশ্চিয়ান-সায়েন্টিস্টদের[1] বা ফেত-কিউরারদের কিছু বলার থাকে ত তাঁহারা সে কথা বলিবেন। যুক্তিতর্কের দ্বারা যুবকদের আমি কতটা আর স্বমতে আনিতে পারিব। মধু যে কখনও চাখে নাই মধু খাইতে না দিয়া মধুর স্বাদ যে কি তাহা কখনও কি তাহাকে দেওয়া যায়? হৃদয় ঢালিয়া পাবন মন্ত্র জপ করার নিয়মের কথা এখানে আর না-ই বলিলাম।

রামনামে যাঁহাদের কিছুটা বিশ্বাস আছে তাঁহারা সশ্রদ্ধায় চরকের মত গ্রহণ করিবেন। শিশু মাতাপিতার উপর নির্ভরশীল অসহায় জীব। তাহাদের এই অসহায়তার কথা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে যে তাহাদের প্রতি মাতাপিতার

১. আলোচনার শেষদিন লর্ড লোথিয়ান কৃশ্চিয়ান সায়েন্স-এর কথা পাড়েন এবং তৎ সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত জানিতে চাহেন। লোথিয়ান বলেন, 'ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। আর এই অভেদ সম্বন্ধের উপলব্ধির অনুপাতেই মানুষ পাপ ও ব্যাধি হতে মুক্তি পায়। প্রত্যয়-নিরাময়ের ইহা মূল কথা। ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বরই স্বাস্থ্য ও ঈশ্বরই প্রেম।'

"আর বৈদ্যও বটেন" এই উক্তি লর্ড লোথিয়ানের কথায় ভরিয়া দিয়া গান্ধীজী বলেন, 'কৃশ্চিয়ান সায়েন্সের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই, তবে উহার অনুযায়ীদের অনেকের উপর আমার আস্থা নেই। বুদ্ধি এক আর অনুভূতি আর এক। ব্যাধি মানেই পাপ একথা আমি পুরাপুরি মানি। কাশি যে হয় সে পাপেরই ফল। রক্তের চাপ আমার বাড়ে। অতিরিক্ত শ্রম ও শ্রমজনিত ক্ষয়ের কারণে তাহা বাড়ে। কিন্তু বেশী খাটতে যাই কেন? মাত্রার অধিক শ্রম ও ব্যস্ত-সমস্ততা, রূপ তাহার যাহাই হোক, পাপ আর এও আমি ভাল করেই জানি যে ডাক্তারের সহায়তার প্রয়োজন আমার মোটেই ছিল না।

"কৃশ্চিয়ান সায়েন্টিস্টরা শরীরের ভালমন্দ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি যে কেন করে তা আমি ভেবে পাই না।"

লর্ড লোথিয়ান বলেন, "অসুখের মূলে পাপ একথা মানেন ত হল। গীতা পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ফল ত্যাগ করতে বলে। ঈশ্বরই জীবন, প্রেমও সে এবং স্বাস্থ্যও সে।"

গান্ধীজী, 'একথাই আমি একটু আগেই বলেছি। ভগবানই সত্য। তার অর্থ ভগবানই জীবন, তা ছাড়া এও আমি বলেছি যে সত্য ও প্রেম একই মুদ্রার দুই দিক। প্রেম লক্ষ্যে অর্থাৎ সত্যে পৌঁছানোর সিঁড়ি।'

—মহাদেব দেশাই (হরিজন, জানুয়ারী, ২৯. ১৯৩৮)

ও সমাজের দায়িত্ব কত অধিক। এমন মা-বাপের কথা আমি জানি যাহারা শিশু সন্তানের অসুখে বিচলিত না হইয়া তাহার আরোগ্যের জন্য ওষুধের শরণ না লইয়া রামনামের শরণ লইয়াছে।

পরিশেষে, পঞ্চমহাভূত সবকিছুর এমন কি ওষুধেরও মূল উপাদান লেখকের এই উক্তি হইতে তাঁহার অধীর অসংলগ্ন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উহার নিরসন মানসেই এই কথা লিখিতেছি।

আমার রাম

> 'আমার রাম, যে রামের জয়গান আমরা প্রার্থনায় করি সেই রাম ইতিহাসের রাম নহেন, সেই রাম অযোধ্যার রাজা দশরথতনয় রাম নহেন। সেই রাম অজ, নিত্য, অদ্বিতীয়। এক তাঁরই উপাসনা আমি করি। তাঁরই কৃপা আমি মাগি। আপনাদেরও তাঁর শরণ লইতে বলি। তাঁর কাছে সবাই সমান।'

দিল্লীর কোন প্রার্থনা-প্রবচনে রামধুন সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন:

"গীতা সংস্কৃতে রচিত। তাই গীতার শ্লোক সকলে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু রামধুনের আবৃত্তি সকলেই করিতে পারে। তালে তালে গাওয়া হয় ত রামধুন অপেক্ষা সহজে সমবেত-প্রার্থনা অন্য কিছু নাই।"

'অহিন্দু এরূপ প্রার্থনায় যোগ দিতে পারে কি?'—এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন:

"রাম তথা রামগুণ-গান নেহাতই হিন্দুদের ব্যাপার। সুতরাং তাহাতে মুসলমানেরা কি করে যোগ দেয় এরূপ কেহ বলে ত আমার হাসি পায়। মুসলমানের ঈশ্বর এক আর হিন্দু বা পারসী বা খ্রীস্টানের ঈশ্বর কি আর এক! তাহা ত নয়। সর্বশক্তিমান, সর্বত্রবিরাজমান ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। নানা মানুষে নানা নামে তাঁকে ডাকে। যে নামে আমরা অধিক অভ্যস্ত[১] সেই নামে আমরা তাঁকে ডাকি।

---

১. মাসিমপুর (নোয়াখালি)-এর প্রার্থনা-প্রবচনে গান্ধীজী বলেন:

"রামনাম খোদার বা ঈশ্বরের আর এক নাম। হিন্দুর, মুসলমানের, পারসীর তথা পৃথিবীতে যত ধর্মমত রহিয়াছে সেই সকলেরই ঈশ্বর যে এক একথা মুসলমান বন্ধুদের আমি উপলব্ধি করিতে বলি। সকল ধর্মের মর্যাদা আমার কাছে সমান। একই গাছের পাতায় যে ভেদ বিভিন্ন ধর্মে ততটুকু ভেদ, তার অধিক নহে।"

—প্রেস রিপোর্ট, জানুয়ারী ৮, ১৯৪৭

"আমার রাম, যে রামের জয়গান আমরা প্রার্থনায় করি সেই রাম ইতিহাসের রাম নহেন, সেই রাম অযোধ্যার রাজা দশরথতনয় রাম নহেন। সেই রাম অজ, নিত্য, অদ্বিতীয়। এক তাঁরই উপাসনা আমি করি, তাঁরই কৃপা আমি মাগি।[১] আপনাদেরও তাঁর শরণ লইতে বলি। তাঁর কাছে সবাই সমান। অতএব মুসলমানের তথা অন্য কোন ধর্মের লোকের তাঁর নাম লইতে কেন যে বাধিবে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তা ছাড়া রামনামেই ঈশ্বরকে ডাকিতে হইবে এমনও নয়। রামের বদলে মনে মনে আল্লা বা খোদা বলিতে পারেন। মনে মনে বলিলাম এইজন্য যে সে স্থলে প্রার্থনার তাল ভঙ্গ হইবে না।"

নিশ্চিত সহায়

নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, রামনামের মতন নিশ্চিত আশ্রয় অন্য কিছু নাই। একাগ্র হইয়া, মন-প্রাণ ঢালিয়া লইলে এই নাম মন্ত্রের মতো কুচিন্তা দূর করিয়া দেয়। কুভাব বিহনে কুকার্য ঘটে কি!'

কোন সজ্জন তিনটি অব্যর্থ সহায়ের কথা আমাকে পত্রে বলিয়াছেন। তাহার একটি আন্তর, অপর দুইটি বাহ্য। আন্তর আশ্রয়ের কথায় তিনি বলিয়াছেন:

"আত্মসংযমের তৃতীয় সাধন রামনাম। আসঙ্গলিপ্সাকে ঈশ্বরানুভূতির একাগ্র সাধনে রূপান্তর করার পক্ষে রামনাম অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ শক্তি আর কিছু নাই। সংগম-বাসনা প্রায় সকল মানুষেই বর্তমান। বস্তুতঃ কুণ্ডলিনী শক্তির স্বভাব বিকাশ ও পরিণতিরই তাহা এক রূপ। সৃষ্টির দিন হইতে প্রকৃতির সহিত মানুষ নিরন্তর যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তদ্রূপ কুণ্ডলিনী-শক্তি স্বভাব প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করিতে হইবে। কুণ্ডলিনী-শক্তি যাহাতে অধোগামী না হইয়া ঊর্ধ্বগামী হয় সেই প্রযত্ন আমাদের করিতে হইবে।

১. ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নাই একথা বলিতে চান বলুন। আপনি জানেন না যে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্বাস লওয়ার শক্তি পর্যন্ত আপনার নাই। ঈশ্বর আল্লা গড অহুর-মজদ যে নামে যাহার রুচি সে নামে তাঁকে ডাকুন। জীব অনন্ত, তাঁর নামও তেমনি অনন্ত। সে অদ্বিতীয়, অপ্রধান এবং এক। তাঁহা অপেক্ষা মহান্, তাঁহা অপেক্ষা প্রধান কিছু নাই। সে অকাল অরূপ অপাপবিদ্ধ। এই আমার রাম। এক সে-ই আমার নাথ ও বিভু।

—হরিজন, নভেম্বর ২৪, ১৯৪৬

ঊর্ধ্বগামী হইলে কুণ্ডলিনী-শক্তির গতি মস্তকাভিমুখী হয়। এই অবস্থায় যখন মনুষ্য পৌঁছে তখন ধীরে ধীরে তাহাতে এই বোধের উন্মেষ হয় যে সে নিজে এবং আশেপাশে যাহাদের সে দেখে সেই সবই ভগবানের বিভিন্ন রূপ।"

নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, রামনামের মতন নিশ্চিত আশ্রয় আর কিছু নাই। একাগ্র হইয়া, মনপ্রাণ ঢালিয়া লইলে এই নাম মন্ত্রের ন্যায় কুচিন্তা[১] দূর করিয়া দেয়। কুভাবনা বিহনে কুকর্ম ঘটে কি? মনে যে দুর্বল তাহার পক্ষে কোন বাহ্য সহায়ই সহায় নহে। শুদ্ধহৃদয় ব্যক্তির এই সবের দরকার নাই। তাই বলিয়া একথা মনে করিবেন না যে যাহার হৃদয় পবিত্র সে পবিত্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াও পবিত্র থাকিতে পারে। পবিত্র ব্যক্তি ভুলেও অনাচারের ধার মাড়াইবেন না। তাঁহার ভিতরের শুচিতা তাঁহার সকল কর্মে প্রতিবিম্বিত হইবে। গীতা বলে: যেমন ভাব তেমন লাভ। একথাই মিলটন অন্যভাবে বলিয়াছেন: মন চায় ত তাহা নরকে স্বর্গ এবং স্বর্গে নরক রচনা করিতে পারে।

আয়ুর্বেদ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা

> 'বস্তুতঃ রামনামে কুসংস্কারের নামগন্ধও নাই। রামনাম প্রকৃতির পরা-বিধান। এই মহৎ বিধান মানিয়া চলিলে মানুষ রোগ হইতে বাঁচে, অমান্য করিলে রোগে ভোগে। যে নিয়ম-পালনে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, সেই নিয়ম-পালনে নষ্ট স্বাস্থ্যও উদ্ধার হয়।'

আয়ুর্বেদাধ্যাপক ও বনস্পতিশাস্ত্রবিশারদ বৈদ্য বল্লভরাম লিখিতেছেন:

"অ্যালোপ্যাথির সহিত আয়ুর্বেদের জগাখিচুড়ি করাতে আয়ুর্বেদের মৌল তত্ত্বের সর্বনাশ হইতে বসিয়াছে। আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যবিধানের মূল আধার পঞ্চভূত। বায়ুর অপব্যবহারে বায়ু, তেজের অপব্যবহারে পিত্ত ও জলের

১. নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে অবাঞ্ছিত ভাবনা রুখিবার চাবিকাঠি আমাদের হাতেই রহিয়াছে। তবে সেই চাবিকাঠি প্রত্যেকের নিজের মতন খুঁজিয়া লইতে হয়। সাধু ও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে রহিয়াছে। তাহা হইতে আমরা পথের নিশানা পাইতে পারি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সেই পথ অভ্রান্ত এবং সকলের উপযোগী নাও হইতে পারে। কারণ পূর্ণতা তথা ভ্রান্তির অতীত অবস্থা ঈশ্বরের প্রসাদ বিনা লাভ হয় না। তাই না মুমুক্ষু ব্যক্তিরা নিজেদের তপস্যায় পূত ও পবিত্রতায় অভিমন্ত্রিত রামনামাদি মন্ত্র আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। অনন্তভাব হইতে তাঁর কৃপা ভিখারী না হইলে ভাবনা পূর্ণ বশে আসে না। —আত্মকথা, ৪র্থ ভাগ, অধ্যায় ২৫

অপব্যবহারে কফ জন্মে। আয়ুর্বেদের উন্নতি রোগের নিদান-নির্ণয়ের উপর নির্ভর করে। আয়ুর্বেদ মতে বায়ু, তেজ ও জলের যোগ্য ব্যবহার রোগমুক্তির উপায়। এখানে স্বভাবতঃই ধর্মের কথা আসিয়া যায়। কারণ ধর্মের আশ্রয় বিনা প্রকৃতির নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করা যায় না। পথ্যের (পথ্য বলিতে এখানে পথ্যের নিয়মন দ্বারা রোগমুক্তির কথা বুঝিতে হইবে) স্থান আয়ুর্বেদে অতীব প্রধান। এই কথার অর্থ এই যে প্রকৃতির নিয়ম ঠিকমত পালন না করিলে সুস্থ থাকা যায় না।" বাগভট্ট বলিয়াছেন :

"বিনা পথ্য বিচারে কিবা লাভ বল ভেষজে।
পথ্যাপথ্য বিচারে রোগ মরে বিনা ঔষধে॥"

রোগনিবারণের সর্বোত্তম ও সুলভতম পন্থা জানিতে চাহেন ত নিসংশয়ে বলিব যে রামময় পবিত্র জীবন যাপন করাই সেই পন্থা। একান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে রামনাম যে রোগমুক্তির অব্যর্থ উপায় সেকথা ডাক্তার হাকিম বৈদ্য কেহই বলে না। আধুনিক আয়ুর্বেদ গ্রন্থে রামনাম আমল পায় নাই। অবশ্য তুকতাক বা অভিচারের অঙ্গরূপে উহার ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে কুসংস্কারই প্রশ্রয় পায়। বস্তুতঃ রামনামে কুসংস্কারের নামগন্ধ নাই। রামনাম প্রকৃতির পরা-বিধান। এই মহৎ বিধান মানিয়া চলিলে মনুষ্য ব্যাধি হইতে বাঁচে, অমান্য করিলে রোগে ভোগে। যে বিধান অনুসরণ করিলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে সেই বিধান-পালনে নষ্ট স্বাস্থ্যের উদ্ধার হয়। যে মনুষ্য নিত্য রামনাম করে, পবিত্র জীবন যাপন করে তাহার তবে অসুখ হয় কেন? ইহা অতীব সঙ্গত প্রশ্ন। স্বভাবতঃই মানুষ অপূর্ণ। জ্ঞানী পুরুষেরা পূর্ণতা লাভের প্রযত্ন করেন কিন্তু পূর্ণতা কখনও লাভ করেন না। ঐ পথে চলিতে চলিতে অজানতে তাঁহারা হোঁচট খান। ভগবানের বিধির মূল সূত্র পবিত্র জীবন। আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের সীমা কোথায় তাহা সর্বাগ্রে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে সেই সীমা ছাড়াইয়া যাই না ত রোগ ডাকিয়া আনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে : যতটা খাদ্য দরকার ততটা খাইলে কাহারও অসুখ হওয়ার কথা নয়। প্রশ্ন উঠিবে—কাহার পক্ষে কি যে যোগ্য বা পরিমিত তাহার তাহা ঠিক করার উপায় কি? আরও এইরূপ নানা কূট প্রশ্ন উঠিতে পারে। আসল কথা প্রত্যেকেরই স্ব স্ব বৈদ্য হইতে হইবে। এবং আপন শক্তি-সামর্থ্যের মাত্রাও বুঝিয়া লইতে হইবে। যে মনুষ্য এইভাবে চলিবে সে অবশ্যই ১২৫ বৎসরের পরমায়ু লাভ করিবে।

বৈদ্য বল্লভরাম জানিতে চাহিয়াছেন, গৃহে-প্রস্তুত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঔষধ ও আচার-মোরব্বা ইত্যাদি প্রাকৃতিক চিকিৎসার অঙ্গরূপে গণ্য হইতে পারে কি-না। ডাক্তারদেরও দাবি, তাঁহারা উত্তম প্রাকৃতিক চিকিৎসক, কেন না তাঁহারা ত তত্ত্বানুসন্ধানলব্ধ ফলই ব্যবহার করেন। এইরূপে সবকিছুতেই গোজামিল দেওয়া যাইতে পারে। এই জিজ্ঞাসা ও এই দাবির প্রতিউত্তরে আমি বলিব যে রামনাম-এর উপরন্তু যে কোন কিছু প্রাকৃতিক চিকিৎসার বিরোধী। এই মূল নীতি হইতে যতটা সরিব প্রাকৃতিক চিকিৎসা হইতেও ততটাই দূরে যাইব। এই বিচার ও দৃষ্টি হইতে পঞ্চভূতের ব্যবহারেই আমি প্রাকৃতিক চিকিৎসার সীমারেখা টানিতেছি। অর্থলোভে নহে, শুদ্ধ সেবাবৃত্তি হইতে কোন বৈদ্য এই সীমা লঙ্ঘন করিয়া যদি আশেপাশে লভ্য অথবা অনায়াস-উৎপন্ন গাছ-গাছড়ার ব্যবহার করেন তবে উহাকে আমি প্রাকৃতিক চিকিৎসাই বলিব। কিন্তু তেমন বৈদ্য কোথায়। আজকাল ত সকলেই টাকা রোজগারে মত্ত। গবেষণায় তাহারা বিমুখ। তাহাদের লোভের হেতু এবং মানসিক নিষ্ক্রিয়তার কারণ আয়ুর্বেদের আজ এই দুর্দশা। নিজেদের দোষত্রুটি স্বীকার না করিয়া তাহারা সরকার ও নেতাদের উপর দোষ চাপায়। আপনাদের নিশ্চেষ্টতার কারণ পঙ্গু বনিয়া আয়ুর্বেদের নামে যাহারা কলঙ্ক লেপন করে সরকার তাহাদের কি সহায়তা করিতে পারে!

কাঞ্চন গাঁয়ে প্রাকৃতিক চিকিৎসা

> 'প্রাকৃতিক চিকিৎসা মানে আদর্শ জীবন-যাত্রার পদ্ধতি। অর্থাৎ কিভাবে আদর্শ জীবন যাপন করিতে হয় সেই শিক্ষায় শহর ও গ্রামবাসীদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। বলা বাহুল্য, রাম-নাম এই চিকিৎসার মূল আধার, মুখ্য অবলম্বন।'

উরুলি কাঞ্চনের লোকদের ডাকে আমি উরুলি কাঞ্চনে বসিয়াছি ও কাজ আরম্ভ করিয়াছি। উরুলি কাঞ্চনকে আমি ভারতের অগুনতি গাঁয়ের সামনে প্রাকৃতিক চিকিৎসার আদর্শরূপে খাড়া করিতে চাই।

কাঞ্চন হইতে সহকর্মীরা জানাইয়াছেন যে গ্রামবাসীরা প্রাকৃতিক চিকিৎসার তত্ত্ব ও উপকারিতা আস্তে আস্তে উপলব্ধি করিতেছে। সহকর্মীদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস আসিয়াছে,—এতটা পর্যন্ত যে, তাঁহারা আমাকে ভরসা দিয়াছেন যে জুন মাসের পূর্বে ওখানে যদি আমার যাওয়া সম্ভব না হয় সেই স্থলেও তাঁহারা

কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন কারণ গ্রামের লোকেরা নানা ভাবে সহায়তা করিতেছেন। গোটা গরমের দিন যদি মহাবলেশ্বর বা পাঁচগণিতে থাকি তবুও কাজ চলিয়া যাইবে এই আশ্বাসও তাঁহারা দিয়াছেন। আশায় আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে।

প্রাকৃতিক চিকিৎসার দুই অঙ্গ। ভগবানের নাম তথা রামনাম করিয়া আরোগ্যলাভের আগ্রহ লোকমনে সঞ্চার করা এক অঙ্গ। আর, ঠিক পথে অর্থাৎ স্বাস্থ্যের নিয়ম মানিয়া চলিলে যে রোগে পায় না এই কথা লোকের মনে গাঁথিয়া দেওয়া হইতেছে অপর অঙ্গ। জানিতে পাইয়াছি, গাঁয়ের লোকেরা সকলে মিলিয়া গাঁ সাফ-সুথরা রাখার কাজে লাগিয়াছেন। আমি মনে করি, পরিচ্ছন্নতার নিয়ম যদি ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজ যথাযথ মানিয়া চলে ও আহার-বিহার-ব্যায়ামে সংযমী হয় তবে কাহারও অসুখ হয় না। যে মনুষ্য ভিতরে-বাহিরে পবিত্র অসুখ তাহার কাছে ঘেঁষিতেও পারে না। আর কিছু না হোক, গাঁয়ের লোকে একথাটাই যদি বুঝে তবে ডাক্তার-বৈদ্য-হাকিমের কাছে তাঁহাদের দৌড়াইতে হইবে না।

কাঞ্চনগাঁয়ে গরু নাই বলিলেও চলে। ইহা দুঃখের কথা। গুটিকয়েক দুধালো মোষ আছে। আজ অবধি যে সকল পরীক্ষা-প্রয়োগের কথা অবগত হইয়াছি তাহা হইতে দেখা যায় যে স্বাস্থ্যের পক্ষে গাইয়ের দুধ মোষের দুধ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। বৈদ্যরা গরুর দুধকে প্রশস্ত মনে করেন। তাই আমার আগ্রহ এই যে কাঞ্চন গাঁয়ের লোকেরা একপাল গরু পুষিবেন। তাহা হইলে তাঁহারা গাইয়ের টাটকা দুধ খাইতে পাইবেন।

গৃহ যত তাড়াতাড়ি তৈরী হয় তত ভাল। প্রথমতঃ, কতদিন আমরা শ্রীদাতারের গৃহে থাকিব। দ্বিতীয়তঃ, (আর এই কথাই মুখ্য) যতদিন প্রয়োজনীয় ঘরদোর তৈরী না হইবে ততদিন রোগীদের ঠিকমত চিকিৎসা হইবার নহে। রোগী রাখার ব্যবস্থাও হওয়া আবশ্যক। কাঞ্চন আদর্শ গ্রাম হউক ইহা আমার সর্বক্ষণের কামনা। প্রাকৃতিক চিকিৎসা মানে জীবনযাত্রার আদর্শ পদ্ধতি। অর্থাৎ কিভাবে আদর্শ জীবন যাপন করিতে হয় সেই শিক্ষায় শহর ও গ্রামবাসীদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। বলা বাহুল্য, রামনাম এই চিকিৎসার মূল আধার মুখ্য অবলম্বন।

ডাক্তারে কি প্রয়োজন

'ডাক্তারেরা আমার পরীক্ষা করেন। কিন্তু ভগবানই আমার একমাত্র ভরসা। আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কর্তা তিনি। তাঁর ইচ্ছা হয় ত তিনি আমায় ১২৫ বছরের পরমায়ু দিবেন। আবার এই-ক্ষণেও আমার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে। বন্ধুরা তখন অবাক হইয়া ভাবিবেন—এ কী হইল!'

প্রশ্ন: ডাক্তারেরা আপনার শরীর পরীক্ষা করেন, রোগ-নির্ণয় করেন। এই কাজে বৈদ্যদের আপনি ডাকেন না কেন?

উত্তর: বৈদ্যদের মনুষ্যদেহের জ্ঞান ডাক্তারদের সমান নয়। ত্রিদোষতত্ত্বের অনুসরণে আয়ুর্বেদীরা রোগ-নির্ণয় করেন—তাহাও যদি ত্রিদোষতত্ত্বের মূল কথা তাঁহাদের জানা থাকিত। ডাক্তারদের গবেষণাকার্য নিরন্তর চলিতেছে। নিত্য নূতন আবিষ্কার[১] তাঁহারা করিয়া চলিয়াছেন। পৃথিবীতে কোন কিছুই স্থির নহে। স্থিরতা মৃত্যুর ধর্ম। এক ভগবানই স্থির অত্যদ্ভুত শুনাইবে তবুও ভগবানের বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে তিনি একেবারে স্থির ও গতিচঞ্চল।

সেকথা যাক, ডাক্তার ও বৈদ্য দুইই আমার বন্ধু। ডাক্তারেরা অনুক্ষণ আমায় ঘিরিয়া থাকেন। তাঁদের একজন আমার কন্যাসদৃশা। অথবা বলিব তাহারও অধিক। রক্তের সম্বন্ধে কন্যা পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে কিন্তু স্বেচ্ছায়

১. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রীদের সকলে না হইলেও অনেকে হাতুড়ে মাত্র। অথচ প্রগাঢ় বিদ্যার ভান তাঁহারা করেন। যে কোন অসুখ ভাল করার দাবি তাহারা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভুল হয় না এই দাবি পর্যন্ত তাঁহারা করেন। ঠিক এখানেই তাঁহাদের সহিত আমার ঝগড়া। বিনয়ের বালাই তাঁহাদের নাই। আয়ুর্বেদের গবেষণায় তাঁহারা বিমুখ (উদাসীন)। আয়ুর্বেদের অবলুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটনের আগ্রহ তাঁহাদের নাই। যেই অশেষ শক্তির আধার আয়ুর্বেদ নহে সেই অশেষ শক্তি তাঁহারা তাহাতে আরোপ করেন। এইভাবে আয়ুর্বেদকে তাঁহারা প্রগতিশীল মহৎ বিজ্ঞানে উন্নীত না করিয়া উহাকে বদ্ধজল কূপে পরিণত করিয়াছেন। পশ্চিমদেশের ভিষক্ ও শল্যচিকিৎসকগণ কত না চমকপ্রদ আবিষ্কার করিয়াছেন। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রীরা একটিও করিয়াছেন বলিয়া জানি না। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ বস্তুতঃ নাড়ী টিপিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া থাকেন। নাড়ী দেখিয়া উপাস্থিপ্রদাহের এপেণ্ডিসাইটিসের কথাও বলিতে পারেন এমন কথাও বহু কবিরাজকে বলিতে শুনিয়াছি। পুরাকালে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ-গণ যে কোন রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেন কি না তাহা বলার উপায় নাই। কিন্তু এখন যে এই দাবি একদম ভুয়া একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কবিরাজদের সপক্ষে একথাই মাত্র বলা যায় যে তাঁহারা কতকগুলি অতীব ফলপ্রদ ও শক্তিসম্পন্ন বনজ ও ধাতব ওষুধের কথা জানেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ রোগ অনুমান করিয়া সেই সব ওষুধের সফল প্রয়োগ করিয়া থাকেন

যে কন্যাপদ গ্রহণ করিয়াছে তাহার পক্ষে পিতাকে ত্যাগ করা কখনও সম্ভবপর নহে। ডাক্তারদের মতোই বৈদ্যরা রোগ-নির্ণয় করেন তবে তাঁহারা তাহা করেন আনাড়ির মতন। রোগ-নির্ণয়ের জন্য সময় সময় তাঁহারা রোগীকে ডাক্তারের কাছে যাইতে বলেন। কবিরাজেরা কতকগুলি ওষুধ জানেন। আর তাহাতে রোগও সারে।

কিন্তু কি ডাক্তার, কি বৈদ্য, কি হাকিম সকলেই টাকা রোজগারে মত্ত। সেবার ভাব[১] হইতে চিকিৎসাকর্ম অবলম্বন তাঁহারা করেন না। কেহ কেহ অবশ্য সেবার ভাব হইতে কাজ করেন। তাহাতে আমার কথা অসার প্রতিপন্ন হয় না। এক প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্পর্কেই বলা যায় যে ইহার মূলে নিঃস্বার্থ সেবার প্রেরণা বর্তমান। ইহাও আজকাল অর্থোপার্জনের বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এভাবে অর্থ পরমার্থের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ডাক্তারেরা আমায় পরীক্ষা করেন। কিন্তু ভগবানই আমার একমাত্র ভরসা। আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কর্তা তিনি। তাঁর ইচ্ছা হয়ত আমাকে ১২৫ বছরের পরমায়ু দিবেন। আবার এক মুহূর্তেও আমার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে। বন্ধুরা তখন বিস্ময়ে ভাবিবেন—এ কী হইল!

রামনাম নয় ত রামনামের ব্যঙ্গ

> 'সর্ব অবস্থায় সতর্ক থাকিতে হয়। সত্যের সাধকের কোন অবস্থায়ই অসতর্ক হওয়া চলে না। সদা সজাগ ও সাবধান না থাকিলে রামনাম-এর মতো মহৌষধও ব্যর্থ হইতে পারে, আর তাহার ফলে তাহা আর এক নূতন কুসংস্কার হইয়া দাঁড়াইতে পারে।'

প্রশ্ন: কোথায় আমরা আমাদের মহৎ পুরুষদের আচরণের অনুসরণ করিব, না ত তাঁহাদের মূর্তি গড়িয়া পূজা করিতে লাগিয়া যাই, এমনই আমরা নির্বোধ ও আহাম্মক। একথা আপনার অজানা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও সাম্প্রতিক কালের গান্ধী-মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামনাম-এর নামে ব্যাঙ্কের নামকরণকে (যেমন বারাণসীর রামনাম ব্যাঙ্ক)

১. এক সময় ছিল যখন চিকিৎসকেরা সমাজের সেবা করিতেন এবং ঐ সেবার বিনিময়ে সমাজ যাহা দিত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু এখন চিকিৎসকেরা ব্যবসায়ী হইয়াছেন, হইয়াছেন ভয়ের কারণ। যখন মানুষের হিতসাধন লক্ষ্য ছিল তখন উহা মহদ্‌বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

—ইয়ং ইণ্ডিয়া, নভেম্বর ২৪, ১৯২৭

বা নামাবলী ধারণকে রামনাম-এর ব্যঙ্গ বলা যাইতে পারে ; অবজ্ঞাও উহাকে বলা যাইতে পারে। এমতাবস্থায় রামনামকে সর্বরোগহর মহৌষধরূপে লোকের কাছে ধরিলে (যেমন আপনি ধরিতেছেন) কি বোকামির ও কপটাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না? হৃদয় ঢালিয়া রামনাম করিলে রামনাম মহৌষধের কাজ করিতে পারে কিন্তু আমি মনে করি তাহার আগে ধর্ম যে আসলে কি তাহা শেখানো আবশ্যক।

উত্তর: আপনার কথা ঠিক। এত কুসংস্কার আমাদের পাইয়া বসিয়াছে এবং এত সব কপটাচার চলিতেছে যে ভাল কাজ করিতেও লোক ভয় পায়। কিন্তু ভয়ে নিরস্ত হইলে সত্য যে ধামাচাপা পড়িবে। সত্য বলিয়া যাহা জানি নির্ভয়ে তাহা বলা আমার কর্তব্য। চারিদিক হইতে মিথ্যায় আমাদের এমনটা ঘিরিয়াছে যে তাহার ফেরে পড়িয়া আমরাও আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে পারি আর ভয় ত এখানেই। আলস্য ও মূর্খতার কারণ আমরা যেন ঐরূপ ভুল না করি। সর্ব অবস্থায় সতর্ক থাকা কর্তব্য। সত্যের সাধকের কোন অবস্থায়ই অসাবধান হওয়া চলে না। সর্বদা সজাগ ও সাবধান না থাকিলে রামনাম-এর মতো মহৌষধও ব্যর্থ হইতে পারে, আর তাহার ফলে তাহা আর এক নূতন কুসংস্কার হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা গরীবের চিকিৎসা

'প্রাকৃতিক চিকিৎসার আদ্যক্ষর, আসল বস্তু রামনাম। কিন্তু আধি-ব্যাধি হইতে বাঁচিতে হইলে হৃদয়ের গভীর হইতে রামনাম করা চাই।'

প্রশ্ন: গ্রামের গরীব লোকদের কমলালেবুর রস খাইয়া থাকিতে বলা কি নিষ্ঠুর পরিহাস নয়? পেটের ভাতই তাহাদের নাই। স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের পেটের ভাত কামাইবার জন্য সারাদিন তাহাদের খাটিতে হয়। জমি ও সন্তান তাহার বুকের মাংস। তাহার জন্য হেলায় সে প্রাণ দিতে পারে। ধনীদের প্রচুর অর্থ আছে। অবসরও তাহাদের অনেক। প্রাকৃতিক চিকিৎসার বিলাস তাই তাহাদের সাজে।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা দ্বারা সত্যই যদি গরীবদের সেবা আপনি করিতে চান তবে সর্বত্র গরীবদের উপযোগী প্রাকৃতিক চিকিৎসালয় স্থাপনের দিকে আপনার মন দিতে হইবে। ঐ সব চিকিৎসা ভবনে বিনা পয়সায় রোগীদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিছানার ব্যবস্থাও থাকা

চাই। রোগী দিনমজুর হইলে তাহার পুত্র-কন্যা-স্ত্রীর দিন চলার কথাও ভাবা আবশ্যক।

আপনি বলিয়াছেন যে প্রাকৃতিক চিকিৎসার মানে জীবনধারার পরিবর্তন। তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা কি প্রাকৃতিক চিকিৎসার অঙ্গীভূত নহে?

উত্তর: পত্রলেখকের অজ্ঞতা তাঁহার প্রশ্ন হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই সম্বন্ধে যে কি বলিয়াছি তাহা তিনি পড়িয়াও দেখেন নাই। প্রাকৃতিক চিকিৎসা সেই চিকিৎসা যাহা হইতে অধিক সহজ ও সুলভ[১] আর কিছু হইতে পারে না। গাঁয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই ত এই চিকিৎসার লক্ষ্য। এমন সব উপকরণ ও সরঞ্জাম ব্যবহার করা হইবে যাহা গাঁয়ের লোকে যোগাড় করিতে পারিবে। প্রাকৃতিক চিকিৎসা মানে ভালোর দিকে জীবনের মোড় ঘুরানো, স্বাস্থ্যের নিয়ম মানিয়া চলা। প্রাকৃতিক চিকিৎসার হাসপাতাল হইতে পয়সায় বা বিনা পয়সায় ওষুধ লওয়ার কথা নাই। হাসপাতাল হইতে অমনি ওষুধ লওয়ার অর্থ দান গ্রহণ করা। প্রাকৃতিক চিকিৎসার শরণ লইলে দান লওয়ার কথাই ওঠে না। স্বাবলম্বনে আত্মমর্যাদা বাড়ে। এই চিকিৎসায় রোগী শরীর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দিয়া রোগমুক্ত হওয়ার প্রযত্ন করে এবং ভবিষ্যতে আর না হয় সেদিকে সাবধান হয়।

প্রাকৃতিক চিকিৎসার আত্মক্ষর, আসল বস্তু রামনাম। কিন্তু আধিব্যাধি হইতে বাঁচিতে চাহিলে হৃদয়ের গভীর হইতে রামনাম করা চাই। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় কমলালেবুর রস অবশ্যই চাই এমন কোন কথা নাই। যোগ্য পথ্য চাই, সুষম খাদ্য দরকার—বস্ এইমাত্র। গ্রামে এখন কিছু বলিতে কিছু নাই—একদম উজাড়। পর্যাপ্ত শাক-সবজি, ফলমূল, দুধ উৎপাদন করা প্রাকৃতিক চিকিৎসার এক অঙ্গ। তাহার জন্য যে সময় ব্যয় হইবে তাহাকে অপচয় মনে করা ভুল হইবে। ইহাতে গ্রামবাসীরা ত লাভবান হইবেই আর অন্তে সমগ্র ভারতবর্ষও।

কার্যকরী প্রাকৃতিক চিকিৎসাগৃহ গ্রামে ও শহরে সংগঠন করিতে হইবে

১. সাধারণের ধারণা এই যে প্রাকৃতিক চিকিৎসা কবিরাজী বা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। লোকের এই ধারণা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে আমি এইদিকে ফেল হইয়াছি একথা স্বীকার করা ছাড়া আমার পথ থাকিবে না। কিন্তু আমি মনে করি যে কবিরাজী ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা হইতে এই চিকিৎসার ব্যয় বহুগুণ কম। অভিজ্ঞতাও আমার তাহাই। —হরিজন, ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৯৪৭

এই বিষয়ে সংশয় নাই। ভগবান চান ত তাহা হইবেও। যে যাহার কর্তব্য করিলেই হইল, বাকীটা দেখিবেন ভগবান।

রাম কে

'যত নামে মানুষ ভগবানকে ডাকে, যতরূপে মানুষ তাঁকে দেখে সেই সবই আমার কাছে ঐ অরূপ ও সর্বত্র বিরাজমান রামের প্রতীক। তাই দশরথতনয় ও সীতাপতি বলিয়া বর্ণিত রাম-কে আমি সর্বশক্তিমান সত্তা বলিয়া গণনা করি। তাঁর নাম হৃদয়ে গাঁথিয়া গেলে যে কোন ব্যাধি—নৈতিক মানসিক কি শারীরিক—দূর হইয়া যায়।'

প্রশ্ন: আপনি যে রাম-এর কথা বলেন সেই রাম দশরথ পুত্র রাম নহেন, সেই রাম বিশ্বপতি রাম এই কথা আপনি বহুবার বলিয়াছেন। কিন্তু আপনার প্রার্থনায় যে রামধুন গাওয়া হয় তাতে 'সীতারাম', 'রাজারাম' ইত্যাদি পদ রহিয়াছে এবং রামধুনের পরিসমাপ্তি হয় 'জয়রাম', 'সীতারাম'-এর ঘোষ দ্বারা। এই রাম যদি দশরথ তনয় রাম নহেন ত এই রাম কোন্ রাম?

উত্তর: এইরূপ প্রশ্নের উত্তর আগেও দিয়াছি। কিন্তু এই প্রশ্নটির একটু বিশেষত্ব আছে। তাই উত্তর দেওয়া আবশ্যক। রামধুনে 'রাজারাম' 'সীতারাম' পদ অবশ্যই আবৃত্তি করা হয়। এই 'রাম আর দশরথপুত্র 'রাম' কি এক—এই প্রশ্নের উত্তর তুলসীদাস দিয়াছেন। তবু আমি যে দৃষ্টিতে দেখি তাহা এখানে ধরিতেছি। রাম-এর চাইতে নাম বড়। বিশাল রত্নাকরের মত হিন্দুধর্ম রত্নগর্ভা। যত গভীরে ডুবিবেন তত রত্ন পাইবেন। হিন্দুধর্মে ভগবানের অনন্ত নাম। একথা ঠিক যে কোটি কোটি মানুষ রাম ও কৃষ্ণকে ইতিহাসের পুরুষ বলিয়া জানে। দশরথের গৃহে রামরূপে ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁর আরাধনা করিলে মুক্তি মিলে সত্যসত্যই লোকে এরূপ মনে করে। কৃষ্ণের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। ইতিহাস কল্পনা ও সত্য এখানে এমনই বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে যে ইহাদের একটি হইতে অন্যটি পৃথক করা একান্তই অসম্ভব। যত নামে মানুষ ভগবানকে ডাকে, যত রূপে মানুষ তাঁকে দেখে সেই সবই আমার কাছে ঐ অরূপ ও সর্বত্র বিরাজমান রাম-এর প্রতীক। অতএব দশরথতনয় ও সীতাপতি বলিয়া বর্ণিত রাম-কে আমি সর্বশক্তিমান সত্তা বলিয়া মানি। তাঁর নাম হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেলে যে কোন মানসিক, আধ্যাত্মিক তথা শারীরিক ব্যাধি দূর হইয়া যায়।

প্রাকৃতিক চিকিৎসাও পশ্চিম হইতে !

'সব কিছুর জন্য পাশ্চাত্যের দিকে তাকানোর স্বভাব আমাদের বদলাইতে হইবে। স্বভাব নিরাময়ের জন্য আমরা পাশ্চাত্যের শরণ লই ত সেই প্রাকৃতিক চিকিৎসা আমাদের বিশেষ কাছে আসিবে না।'

ডাঃ মেহতার চিকিৎসা-নিকেতন সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন আমি পাইয়াছি। তন্মধ্যে যে দুইটি উল্লেখযোগ্য তাহা এইরূপ :

"নিকেতনকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত, অধিকতর আধুনিক ও অধিকতর কার্যকরী করার নিমিত্ত উচ্চতর প্রাকৃতিক চিকিৎসা আয়ত্ত করার জন্য এক বা একাধিক যোগ্য উৎসাহী প্রাকৃতিক চিকিৎসককে বিদেশে পাঠানো বাঞ্ছনীয় নয় কি? বিশেষজ্ঞ হইয়া দেশে ফিরিয়া তাঁহারা এই দেশের উপযোগী প্রাকৃতিক চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া উহাকে লোকপ্রিয় ও স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারিবেন। এই বিষয়ে আপনি কি বলেন?

"আমাদের গ্রামে গ্রামে সহজ, সুলভ ও বাহুল্য-বর্জিত, প্রাকৃতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে আপনি চেষ্টা করিতেছেন। কুহ্নে, জাস্ট, নেপ প্রভৃতি যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন আপনি তা অনুমোদন করেন কি? গ্রামের পক্ষে কি ঐ সব পদ্ধতি লাভদায়ক ও উপযোগী হইবে?"

ন্যাসীরা (ট্রাস্টীরা) মনে করেন যে পুণার আরোগ্য-নিকেতন দ্বারা গ্রামের লাভ হইবে না। তাই তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষামূলক-ভাবে উরুলি-কাঞ্চনে একটি আরোগ্যভবন খোলা হইয়াছে। আয়তন ও অয়োজনে তাহা ছোট। কিন্তু কাজ আশানুরূপ ভালভাবে চলিতেছে। বলার মতন, দেখার মতন এখনও কিছু হয় নাই। যতটা জায়গা দরকার ততটা জায়গা যোগাড় হয় নাই। ঘর-দুয়ার তৈরী হয় নাই।

এবার আসল কথায় আসি। সব কিছুর জন্য পাশ্চাত্যের দিকে তাকানোর স্বভাব আমাদের বদলাইতে হইবে। স্বভাব নিরাময়ের জন্য আমরা পশ্চিমের শরণ লই ত সেই প্রাকৃতিক চিকিৎসা আমাদের বিশেষ কাজে আসিবে না। নিজেদের ঘরেই আমরা প্রাকৃতিক চিকিৎসার আচরণ করিতে পারি। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এই চিকিৎসায় চিরকাল দরকার হইবে না। ইহা এমন সহজ যে, যে কেহ শিখিতে পারে। রামনাম জপ ও ধ্যান শেখার জন্য যদি ইউরোপে যাইতে হয় তবেই হইয়াছে! আর রামনামই প্রাকৃতিক চিকিৎসার (অবশ্য যে প্রাকৃতিক চিকিৎসার ছবি আমার চোখের সামনে ভাসে) মূল

কথা। এই কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে রামনাম-এর জপ শেখার জন্য সমুদ্র-যাত্রার আবশ্যকতা নাই। যেমন নাই মাটি, জল, আকাশ, সূর্য ও বাতাসের ব্যবহার-বিধি শেখার জন্য সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার। প্রাকৃতিক নিরাময়ের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার সব কিছুই গ্রামে সুলভ। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে গাছ-গাছড়া ব্যবহার করিতে হইলে গ্রামে পাওয়া যায় এরূপ গাছ-গাছড়া ব্যবহার করিতে হইবে। এইরূপ ওষধির পরিচয় আয়ুর্বেদ-চিকিৎসকদের আছে। আয়ুর্বেদ-চিকিৎসকদের দুই চার জন বিবেকহীন চিকিৎসককে বিদেশে পাঠাইলে কি তাহারা ভাল মানুষ হইয়া ফিরিবে, না তাহারা ভাল সেবক হইবে? তাহা ত নয়। শারীর-সংস্থান ও শারীরবৃত্ত পাশ্চাত্যের দান। চিকিৎসক মাত্রেরই এই দুইয়ের জ্ঞান অবশ্য থাকা চাই। তাহা শেখার সুযোগ দেশে যথেষ্ট আছে। পশ্চিমে যে সব প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে তাহার ছটা বস্তুতঃ সারা বিশ্বে ছড়াইয়া গিয়াছে। তাই তাহা শেখার সুযোগ সর্বত্র রহিয়াছে। এইখানে বলা যাইতে পারে যে প্রাকৃতিক চিকিৎসায় শারীর-বিদ্যা ও শারীরবৃত্তের চর্চা অপরিহার্য নহে।

কুহ্নে, জাস্ট, ফাদার নেপ প্রভৃতির পুস্তক লোকহিতার্থে সকলের উপযোগী সহজ ভাষায় রচিত। এই সব বই পড়া আমাদের কর্তব্য। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক চিকিৎসক মাত্রেরই এই সব বহির পরিচয় আছে। প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রবর্তন গ্রামে এখনও হয় নাই। বিষয়টা আমরা তলাইয়া দেখি নাই, দেখিলে বুঝিতে পারিতাম যে অগণিত দেশবাসীর স্বাস্থ্যের দিক হইতে এই চিকিৎসা অতীব উপযোগী ও আবশ্যক। এই দিকে সবে ভাবনা শুরু হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত কি হইবে বলা কঠিন। ত্যাগ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা বিনা কোন ভাল কাজ, কোন জনহিতকর কাজ হয় না। ইহার সাফল্যের জন্যও তেমন ত্যাগ ও নিষ্ঠা চাই। পশ্চিমের দিকে না তাকাইয়া নিজেদের অন্তর আমাদের খুঁজিতে হইবে।

প্রত্যয়-নিরাময় ও রামনাম

'প্রত্যয়-নিরাময়ের বা ফেত-কিউর-এর কথা প্রসঙ্গে আপদে-বিপদে যাঁর নাম করিলে সাক্ষাৎ সান্ত্বনা মিলে বন্ধু সেই জাগ্রত ভগবানকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। যাহাকে তিনি প্রত্যয়-নিরাময় বলিয়াছেন, বুঝিতে যদি আমার ভুল না হইয়া থাকে ত তাহাকে আমি তমো-

নিরাময় বলিব। ভগবানের নাম মানবমনের কল্পনামাত্র নয়। অন্তর ঢালিয়া ঐ নাম করা চাই। বিধাতা ও তাঁর বিধানে জলন্ত বিশ্বাস থাকিলে অন্য কোন কিছুর সহায়তা বিনা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা যায়।'

বন্ধুর সূক্ষ্ম ব্যঙ্গটা এই :

"১৭ই মার্চ ১৯৪৬ সনের হরিজন-এ 'পাপ-স্বীকার ও নিরাময়'[১] নামক লেখা পড়িয়া আমার মনে এই কৌতূহল প্রশ্ন জাগিয়াছে—লোকে যাহাকে 'ফেত্‌-কিওর' বলে তাহার সহিত আপনার প্রাকৃতিক চিকিৎসার বুঝি বা নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে? বিশ্বাস আরোগ্যের সহায়ক অতএব তাহা চিকিৎসারই অঙ্গ। বসন্ত, শূল ইত্যাদি কতকগুলি অসুখের প্রত্যয় ছাড়া চিকিৎসা নাই। চিকিৎসা নাই বলিতেছি এই হেতু যে বসন্ত হইলে, আপনি বোধ হয় জানেন রোগীকে কোন ওষুধ দেওয়া হয় না—অন্ততঃ দক্ষিণ ভারতে ত নয়ই। কাহারও বসন্ত হইলে বলা হয়, অমুকের মায়ের দয়া হইয়াছে—সম্ভবতঃ একথাও আপনি জানেন। আমরা মরিঅম্মা মার পূজা দিয়া থাকি। অবাক হইতে হয়, বেশীর ভাগ রোগী ভাল হইয়া ওঠে। পুরাতন শূলে লোকে তিরুপতি দেবতার কাছে মানত করে। আরোগ্য-স্থানের পরে মানত পুরা করে। আমার মার শূল ছিল। তিরুপতির কাছে মানত করিয়া মা রোগমুক্ত হন।

"এই সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি কি, জানাইলে বাধিত হইব। এমন যে প্রাকৃতিক চিকিৎসা লোকে তাহার শরণ লয় না কেন এই প্রশ্ন করার লোভ হইতেছে। উহার শরণ লইলে মানুষের বারবার ডাক্তারের কাছে দৌড়াইতে হয় না; পয়সাও খরচ করিতে হয় না। চসর বলেন—ডাক্তার ও ওষুধবিক্রেতা এই দুইয়ে মিলিয়া রোগীকে চিররোগী করিয়া রাখার ফন্দি আঁটিয়াছে। এই অবস্থা আকস্মিক নয়, হইয়া দাঁড়াইয়াছে চলিত ব্যাপার।"

লেখক যে দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রাকৃতিক চিকিৎসার দৃষ্টান্ত নয়। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় রামনাম আমি জুড়িয়াছি : অসুখ সারার

---

১. প্রাসঙ্গিক নিবন্ধে গান্ধীজী বলিয়াছেন :

প্রাকৃতিক চিকিৎসার অর্থ জীবন-ধারার পরিবর্তন সাধন। জীবনের মোড় ঘোরানোর জন্য প্রযত্ন আবশ্যক। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় ওষুধের স্থান নাই। এই চিকিৎসা গৃহে বা গৃহের পরিবেশে হওয়া চাই। তবেই কেবল তাহা হইতে ফল মিলে। চিকিৎসকের ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়া দরকার। মনুষ্য-স্বভাবের জ্ঞানও তাহার থাকা আবশ্যক।

যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন তাহা রামনামে ঘটে নাই। ঐ দৃষ্টান্ত হইতে একথাই সপ্রমাণ হয় যে প্রকৃতিধর্মেই অনেক অসুখ বিনা ওষুধে সারে। ভারতীয় জীবন কুসংস্কারে যে কিরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছে এই দুই দৃষ্টান্ত হইতে তাহা সুস্পষ্ট হইতেছে। প্রাকৃতিক চিকিৎসার যাহা প্রাণ সেই রামনাম তমোঘ্ন—কুসংস্কারনাশক। বিবেকহীন লোকে অন্য বস্তুর ও চিকিৎসার যেমন অপব্যবহার করিয়া থাকে রামনামেরও তেমন অপব্যবহার তাহাদের হাতে হইবে। তোতা-পাখির মতন আওড়াইলে রামনামে রোগ সারিতে পারে না। যাহাকে বন্ধু 'প্রত্যয় নিরাময়' বলিয়াছেন বুঝিতে যদি আমার ভুল না হইয়া থাকে ত বলিব তাহা প্রত্যয় নিরাময় নহে তাহা তমোনিরাময়। উহার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি জাগ্রত ভগবানের ও তাঁর জাগ্রত নামের বিদ্রূপ করিয়াছেন। ভগবানের নাম মানব-মনের কল্পনামাত্র নহে। অন্তরের গভীর হইতে ঐ নাম করা চাই। বিধাতা ও তাঁর বিধানে জলন্ত বিশ্বাস থাকিলে অন্য কোন কিছুর সহায়তা বিনা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা যায়। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ শরীর—এই সেই ঐশ বিধি। যাহার চিত্ত পূর্ণ শুদ্ধ নহে তাহার হৃদয় পূর্ণ নির্মল নহে। স্টেথস্কোপে দেখা হৃদয়ের কথা আমি বলিতেছি না, বলিতেছি যে হৃদয়ে ভগবানের নিবাস সেই হৃদয়ের কথা। আত্মজ্ঞানীরা বলেন যে ঈশ্বরোপলব্ধি হইতে মনে কুভাবনার, অবান্তর চিন্তার অবকাশ থাকে না। মনের মালিন্য নাশ হইলে দেহে রোগ প্রবেশের পথ বন্ধ হয়। এইরূপ চিত্তশুদ্ধি সহজ কথা নয়। কাজটা কঠিন একথা সম্যক বুঝিয়াই স্বাস্থ্যান্বেষণে ব্রতী হইতে হইবে। প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভের ইহা প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ তদনুরূপ প্রয়াস। জীবনধারার আমূল পরিবর্তন যখন ঘটে তখন মানুষ বিধাতার বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে থাকে। এই সব বিধান লইয়া খেলা করিলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় না। যাহার চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়াছে রামনাম না নিলেও তাহার চলে একথা মনে করা ভুল হইবে। বরং একথাই আমি বলিব যে রামনাম ছাড়া চিত্তশুদ্ধির অন্য কোন পথ আমার জানা নাই। সর্বদেশের ও সর্ব্বকালের ঋষিরা এই পথেই চলিয়াছেন তাঁহারা কুসংস্কারগ্রস্ত বা ভণ্ড ছিলেন তাহা নয়, ছিলেন ভক্ত।

ক্রীশ্চিয়ান সায়েন্স একে বলিতে চান বলিতে পারেন তাহাতে আমার কিছু বলার নাই। রামনাম-এর প্রবর্তক আমি নহি। খ্রীস্ট-অব্দ প্রচলনের অনেক পূর্ব হইতেই সম্ভবতঃ লোকে ইহা জানিত।

যে সব রোগের অস্ত্রোপচারই একমাত্র চিকিৎসা তাহা রামনামে সারে কিনা

একথা কোন ব্যক্তি জানিতে চাহিয়াছেন। না, কস্মিনকালেও না। দুর্ঘটনায় যে অঙ্গহানি হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দেওয়ার শক্তি রামনামের নাই। অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রক্রিয়া অনাবশ্যক। যেখানে প্রয়োজন সেখানে করাইতেই হইবে। কিন্তু ভগবানের ভক্ত অঙ্গহানি হইলেও মনের শান্তি হারায় না। রামনাম হাতুড়ের এটা-ওটা চিকিৎসাও নহে অথবা জোড়াতাড়াও নহে।

প্রকৃতির বিধান

> 'স্বাস্থ্যের বিবিধ নিয়মের সম্বন্ধে আমি যাহা জানি তাহার বিশদ আলোচনা আমি অনেকদিন হইতে করিয়া আসিতেছি। যে খাদ্য একের পক্ষে সুষম ও পরিমিত অন্যের পক্ষে তাহা অষম ও অপরিমিত হইতে পারে। কোন্ আহার কাহার পক্ষে সুষম ও পরিমিত তাহা উপযুক্ত পড়াশোনা ও পরীক্ষা-প্রয়োগ দ্বারা যে যাহার মতন ঠিক করিয়া লইবেন। ইহাই সর্বোত্তম পন্থা।'

প্রশ্ন: আপনার কথামত আমি রামনাম জপ করিতেছি। আস্তে আস্তে শরীর ভাল হইতেছে। এখানে বলা আবশ্যক যে রামনামের সহিত যক্ষ্মার ডাক্তারি চিকিৎসাও চলিতেছে। আপনি বলিয়াছেন যে পরিমিত মাত্রায় সুষম আহার গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে ও দীর্ঘায়ু লাভ হয়। পঁচিশ বছর এইরূপ সংযত আহার আমি করিয়া আসিয়াছি। তবুও আমার যক্ষ্মা হইল কেন? আপনি কি বলিবেন যে এই জন্মের বা পূর্বজন্মের কোন পাপের কারণ আমার এই কষ্ট ভুগিতে হইতেছে?

আপনি বলেন, মানুষ ১২৫ বৎসরের পরমায়ু পাইতে পারে। তাহা যদি হইবে তবে আপনার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ মহাদেব ভাই চলিয়া গেলেন কেন? মহাদেব ভাই সুষম ও পরিমিত আহারের বিধি ত লঙ্ঘন করেন নাই। ভগবান জ্ঞানে মহাদেব ভাই আপনার সেবা করিতেন। রক্তের চাপে তাঁহার মৃত্যু হইল কেন? অবতাররূপে গণ্য রামকৃষ্ণ পরমহংসই বা কেন যক্ষ্মার মতোই চিকিৎসার অসাধ্য কর্কটরোগে দেহ ত্যাগ করিলেন? ব্যাধি তিনি ধূলার মতন ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেন না কেন?

উত্তর: স্বাস্থ্যের নানা নিয়মের বিষয়ে আমি যাহা জানি তাহার বিশদ আলোচনা অনেকদিন হইতে আমি করিয়া আসিতেছি। যে খাদ্য একের পক্ষে সুষম ও পরিমিত অন্যের পক্ষে তা অষম ও অপরিমিত হইতে পারে।

কোন্ আহার কাহার পক্ষে সুষম ও পরিমিত তাহা উপযুক্ত পড়াশোনা ও পরীক্ষা-প্রয়োগ দ্বারা যে যাহার মতন ঠিক করিয়া লইবেন। ইহাই সর্বোত্তম পন্থা। তাহার অর্থ এই নয় যে ব্যক্তির (ব্যষ্টির) ভুল হয় না বা ব্যষ্টি পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। মানুষের জ্ঞান অপূর্ণ বলিয়া মনুষ্য শরীরকে পরীক্ষাগারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অন্যান্যের অনুভব ও অভিজ্ঞতা হইতে পথের দিশা ঠিক করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। বিফল যদি হই ত তাহার জন্য অন্য কাহাকেও বা নিজেকে যেন দোষ না দিই। অন্যের খুঁত ধরিতে যেন ব্যস্ত না হই এবং ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখার পরে কোন নিয়ম সম্পর্কে যদি আমাদের স্থির বিশ্বাস জন্মে যে ইহা ঠিক নহে তবেই কেবল তাহা যেন আমরা পরিত্যাগ করি এবং যাহা আমাদের যাচাইতে উৎরায় তাহা লোকের সামনে ধরি।

এবার আপনার অসুখের কথায় আসি। আপনার অসুখের মূলে নানা কারণ থাকিতে পারে। পঞ্চভূতের[১] ঠিক ঠিক ব্যবহার আপনি করিয়াছেন একথা জোর করিয়া বলা চলে কি? আমার জানা প্রাকৃতিক নিয়মে যতদিন আমার বিশ্বাস অটল থাকিবে ততদিন একথাই আমি বলিব যে কোথাও না কোথাও আপনার কিছু ভুলচুক হইয়া থাকিবে। মহাদেব ভাই ও পরমহংসদেবের বেলায় প্রাকৃতিক নিয়ম ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে একথা না বলিয়া, তাঁহারা কোথাও কোন কিছু ভুল করিয়াছিলেন বলাই অধিক সঙ্গত হইবে। এই সব নিয়মের কর্তা আমি নহি। তত্ত্বদর্শীরা বলেন, এই সব বিধির বিধান। এই সব বিধি আমি মানি ও সেই অনুসারে চলি। শত হইলেও মানুষ অপূর্ণ। তাই সত্যের সবটা তাহার কাছে ধরা পড়িবে ইহা সম্ভব নহে। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকদের এসবে বিশ্বাস নাই বা অবজ্ঞায় তাহারা এসব উড়াইয়া দেয় তাতে কিছু আসে যায় না। মহাদেব ভাই ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে লেশমাত্রও তাঁহাদের মহত্ব কমে না, কমিতে পারে না।

প্রাকৃতিক নিরাময় বনাম আধুনিক চিকিৎসা

'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও যে ভাবে চলিলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে সেভাবে চলা, ইহাই মুখ্য বস্তু। বস্, তাহাই যথেষ্ট। এই কৌশল যথাযথ অধিগত হইলে অসুখ হওয়ার কথা নয়। যদি হয় তবে অসুখ দূর করার জন্য প্রকৃতির নিয়মের শরণ লইতে হইবে। কিন্তু

১. মাটি জল ব্যোম অগ্নি বায়ু।

একথা মনে রাখিতে হইবে যে রোগ-নিরাময়ের শ্রেষ্ঠ উপায় রামনাম।'

প্রশ্ন: আপনি যে প্রাকৃতিক চিকিৎসার কথা বলেন উহাতে:

১. রোগ-নির্ণয়ের জন্য অণুবীক্ষণের, রঞ্জনরশ্মির ও অনুরূপ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রসঙ্গ আছে কি?

২. ম্যালেরিয়ায় কুইনিন, আমাশয়ে এমেটিন, নিউমোনিয়ায় পেনিসিলিনের মতো বিশেষ ঔষধের (যাহাতে শতে পঁচাত্তর জন রোগী সারিয়া উঠে) ব্যবহার হয় কি?

৩. ব্যষ্টি ও সমষ্টি পরিচ্ছন্নতার, স্বাস্থ্য বিদ্যার, পরিবেশ শুদ্ধ রাখার ও রোগ-প্রতিরোধ ইত্যাদি শিক্ষার কথা আছে কি?

উত্তর: আমার প্রাকৃতিক চিকিৎসা কেবল গ্রামবাসীদের নিমিত্ত। অতএব অণুবীক্ষণের, রঞ্জনরশ্মির বা তদনুরূপ যন্ত্রপাতির দরকার তাহাতে নাই। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় কুইনিন, এমেটিন, পেনিসিলিন-এর মতন ঔষধের স্থান নাই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও যে ভাবে চলিলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে সেভাবে চলা এই চিকিৎসার মুখ্য কথা। বস, আর কিছুর আবশ্যকতা নাই। এই কৌশল যথাযথ অধিগত হইলে অসুখ হওয়ার কথা নয়। আর যদি হয় তবে রোগ-নিরাময়ের জন্য প্রকৃতির শরণ লইতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, রোগমুক্তির পক্ষে রামনাম শ্রেষ্ঠ উপায়। রামনাম সহায়ে রোগ-মুক্ত হওয়ার পথ মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ধরিবে না। ইহার প্রতি রোগীর মনে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সঞ্চার করিতে হইলে চিকিৎসককে রামনামের মহিমার জীবন্ত প্রতিমূর্তি হইতে হইবে। ইতিমধ্যে মাটি, জল, আকাশ, তেজ ও বায়ু এই পঞ্চভূত হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহার সুযোগ লইতে হইবে। আমার মতে ইহার অতিরিক্ত কোন কিছুর স্থান প্রাকৃতিক চিকিৎসায় নাই। তাই না, কি ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে হয়, স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিতে হয় এবং অসুখ হইলে কি ভাবে পঞ্চভূতের সহায়তায় রোগমুক্ত হইতে হয় তাহার পরীক্ষা-প্রয়োগ আমি উরুলি-কাঞ্চনে চালাইতেছি। আশপাশে যে গাছ-গাছড়া পাওয়া যায় তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্যোপযোগী সুষম খাদ্য প্রাকৃতিক চিকিৎসার অপরিহার্য অঙ্গ।

রামনাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি

'অন্য সকল শক্তির ন্যায় আধ্যাত্মিক শক্তিও মানুষের সেবার নিমিত্ত। আধ্যাত্মিক সঙ্কটে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ এই শক্তির শরণ লইয়াছে এবং অল্লাধিক ফলও প্রাপ্ত হইয়াছে। সে কথা থাক। শারীরিক ব্যাধি নিবারণের ও নিরাময়ের পক্ষেও যদি ইহা আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় তবে ইহার আশ্রয় না লওয়া নেহাত বোকামি।'

জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন :

"আপনি বলিয়াছেন যে রামনাম করিলে ম্যালেরিয়া সারিতে পারে। কিন্তু আমি ভাবিয়া পাই না শারীরিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তির উপর কি করিয়া ভরসা রাখা চলে। তা ছাড়া আর একটা খটকাও মনে আছে : আশপাশে যখন মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট চলিতেছে তখন ভাল হওয়ার বা মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়াই বা কি লাভ! না, আজিকার অবস্থায় সেই অধিকারই আমার আছে? রামনামের মহিমা যেদিন বুঝিব সেইদিন হইতে দুর্দশাগ্রস্তদের অকথ্য দুঃখ দূর করার প্রেরণা হইতে প্রার্থনা করিব। নচেৎ স্বার্থপরতার গ্লানি আমার বাড়িয়া যাইবে, নিজের কাছে নিজে আরও ছোট হইয়া যাইব।"

আমার বিশ্বাস পত্রলেখক সত্যের অকপট সাধক। তাঁহার মনে যে খটকা বাধিয়াছে অন্য অনেকের মনেও তেমন খটকা আছে। তাই তাঁহার সংশয়ের কথা প্রকাশ্যে আলোচনা করিতেছি।

অন্য সকল শক্তির ন্যায় আধ্যাত্মিক শক্তিও মানুষের সেবার নিমিত্তে। আধ্যাত্মিক সঙ্কটে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ এই শক্তির শরণ লইয়াছে এবং অল্লাধিক ফলও প্রাপ্ত হইয়াছে। সে কথা থাক। উহাকে আমি নজির করিতেছি না। শারীরিক ব্যাধি-নিরাময়ের পক্ষেও যদি এই শক্তি ফলপ্রদ হয় তবে ইহার আশ্রয় না লওয়া আহাম্মকির একশেষ বই কি! মানুষ স্থূল-শরীরই-মাত্র নহে, সূক্ষ্ম শরীরও বটে। স্থূল ও সূক্ষ্মের তাহা সমবায়। একের ক্রিয়ার প্রভাব অন্যের উপর হয়। লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে কুইনিন সুলভ নহে তাহা সত্ত্বেও যদি আপনি কুইনিন ব্যবহারে ম্যালেরিয়ামুক্ত হইতে পারেন তবে লক্ষ লক্ষ লোকে অজ্ঞানতা নিবন্ধন আত্মিক শক্তির সুযোগ নেয় না বলিয়া আপনি সেই শক্তির সুযোগ লইবেন না ইহা কোন কাজের কথা নয়।

অজ্ঞতার বা একগুয়েমির কারণ অগণিত মানুষ অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং রোগ টানিয়া আনে বলিয়া আপনারও কি নোংরা থাকিতে ও রোগ টানিয়া আনিতে হইবে? সর্বজন-হিতৈষণার ভুল ধারণা হইতে পরিচ্ছন্নতা বর্জন করিয়া তাহাদের মতন নোংরা থাকিতে লাগিয়া যান ত আপনি অসুস্থ হইয়া পড়িবেন। আর সেই স্থলে যে বহুজনের সেবার আকাঙ্ক্ষা আপনার হৃদয়ে সেই বহুজনের সেবা করার সুযোগ হইতেই ত আপনি বঞ্চিত হইবেন। শারীরিক সুস্থতা ও স্বচ্ছতার বিষয়ে উদাসীন হওয়া হানিকর ত বটেই, আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও স্বচ্ছতার বিষয়ে উদাসীনতা আরও অধিক হানিকর। সর্বভাবে শুচি ও সুস্থ থাকার নাম মুক্তি—ইহার কমও নয়, বেশীও নয়। আপনি রামনাম করিলে অন্যের যদি রামনামে রুচি জন্মে, রামনাম করিয়া আপনি নীরোগ আছেন ইহা দেখিয়া অন্যের যদি রামনামে মতি আসে তবে আপনি সেই রামনামের শরণ লইবেন না কেন? পক্ষান্তরে জিনিসটা উল্টা করিয়া দেখিলে বলা যাইতে পারে যে অগণিত লোকের ভাগ্যে পেনিসিলিন জোটে না একথা নিশ্চিত জানিয়াও আপনি যখন পেনিসিলিন ব্যবহার করেন তখন আপনি নিতান্তই স্বার্থপরের মতো কাজ করেন।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে লেখকের যুক্তিধারা অসম্বদ্ধ।

কিন্তু আসল কথা এই যে রামনামের উপলব্ধি, রামনামে রুচি কুইনিনের বড়ি গেলার মতন সহজ জিনিস নয়। তাহার জন্য অশেষ প্রযত্ন আবশ্যক হয়। কুইনিন সহজে মিলে, দোকানে পয়সা ফেলিলেই হইল। যে অগণিত লোকের কথা ভাবিয়া পত্রলেখক রামকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছেন না, আমি বলিব যে ঠিক তাহাদের হিতার্থেই রামনাম তাঁহার হৃদয়ে ধারণ করা কর্তব্য।

কঠিন রোগ

> 'রামনাম কখনও ব্যর্থ হয় না। নিষ্ফল যদি হয় ত সে আমাদের অক্ষমতার কারণ। বিফলতার কারণ আমাদের অন্তরে খুঁজিতে হইবে।'

মাস কয়েক পরে সেবাগ্রামে ফিরিয়া দেখি একজন কর্মীর মাথা খারাপ হইয়াছে। প্রথম যখন আসেন তখনই তিনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। ইহা তাঁহার দ্বিতীয় আক্রমণ। তাঁহাকে সামলানো দায় হইয়া উঠে, কোন ব্যবস্থা না করিলে নয়। ওয়ার্ধার সিভিল সার্জনকে ডাকা হইল। তিনি বলেন, জেল-হাসপাতালে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন,

অন্য হাসপাতালে রাখা যাইবে না। তাই তাঁহার নিজের এবং প্রতিষ্ঠানের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আটক করিতে হইল। গান্ধীজীর পক্ষে জিনিসটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো হইল। কিন্তু উপায়ও কিছু ছিল না। তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা আশ্রমের লোকদের কাছে এই কথায় তিনি ব্যক্ত করেন, "সে ভাল কর্মী। ভাল হওয়ার পরে গত-বছর সে বাগানের ভার লইয়াছিল। হাসপাতালের হিসাবও সে রাখিত। খুব খাটিত। কাজে সে আনন্দ পাইত। তাহার ম্যালেরিয়া হয়। ইন্‌জেকসনে আশু কাজ হয় বলিয়া ইন্‌জেকসন দেওয়া হয়। তাহার বিশ্বাস ইন্‌জেকসনে মাথা খারাপ হইয়াছে। সকালবেলা ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি ত দেখিলাম সে চীৎকার করিতেছে, হাত ছুড়িতেছে, এদিক-ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তার কাছে গেলাম। সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। সে শান্ত হইল। কিন্তু ছাড়িয়া আসিতেই আবার অশান্ত হইল। সময় সময় সে লোককে মারধর করে। কথা শুনে না। তাই তাকে জেলে পাঠাইতে হইয়াছে।

"মহা দুঃখের ব্যাপার, আশ্রমের এক জনকে জেলে পাঠাইতে হইল। আমার অন্তরে অতিশয় চোট লাগিয়াছে। আমাকে লোকে বলিতে পারে—আপনি না বলেন যে রামনামে সব রোগ সারে। তবে এই কি হইল! এই ব্যর্থতার পরেও আমি বলিব যে রামনামে আমার বিশ্বাস আগের মতই অটল আছে। রামনাম ব্যর্থ হইতে পারে না। ব্যর্থ যদি হয় ত আমাদের অক্ষমতার কারণ হয়। ব্যর্থতার কারণ আমাদের অন্তরে খুঁজিতে হইবে।"

—প্যারেলাল

দশরথতনয় রাম

'রামকে যে দশরথের পুত্ররূপে দেখে তাহার কাছে রাম বিভু নহেন, হইতেও পারেন না। কিন্তু যে মানুষ রামকে ভগবানরূপে দেখে তাহার কাছে রাম সর্বত্র বিরাজমান বিভু; রামের পিতাও তাহার কাছে সর্বত্র বিরাজমান বিভু। পিতা-পুত্র তাহার কাছে এক।'

কোন আর্যসমাজী এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন :

"রামকে আপনি অমর মনে করেন। ভাল, রাম যদি অমরই হইবেন তবে কি তিনি দশরথপুত্র কখনও হইতে পারেন, না সীতাপতি! প্রায়ই আমি আপনার প্রার্থনায় যাই। কিন্তু মনে এই সংশয় আছে বলিয়া রামধুন

আবৃত্তি করিতে বাধে। এইজন্য আমি বেদনা বোধ করি, কেননা সবাইকে আপনি রামধুনে যোগ দিতে বলেন। আর আপনার অনুরোধ সঙ্গতও বটে। রামধুনকে এরূপ রূপ দেওয়া যায়না কি যাহাতে সকলে তাহাতে যোগ দিতে পারে।"

'সবাই' বলিতে যে আমি কি বুঝি তাহা আমি ইতিপূর্বে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। 'সকল' বা 'সবাই' বলিতে আমি তাহাদের কথাই বলি যাহারা মনেপ্রাণে ও সমতালে এই নাম করিতে পারেন। অন্য সকলে মৌন থাকিবেন। কিন্তু ইহা ত তুচ্ছ কথা। আসল কথা— দশরথপুত্রকে অমর বলা যায় কি? এই প্রশ্ন স্বয়ং তুলসীদাস করিয়াছেন এবং তাহার উত্তরও তিনি দিয়েছেন। উত্তরটা বস্তুতঃ বিচারে টেকে না আর বুদ্ধিও তাতে তৃপ্ত হয় না। অন্তর দিয়া অন্তরের কথা বুঝার ইহা ব্যাপার। শুরুতে সীতাপতি রামের আরাধনাই আমি করিতাম কিন্তু আমার জ্ঞান যখন পরিপক্ক ও উপলব্ধি গভীর হয় তখন রাম আমার কাছে অমর হইয়া যান আর তাঁকে বিভুরূপে দেখিতে পাই। এ কথার অর্থ এই নয় যে রাম আর এখন আমার কাছে সীতাপতি নহেন। তবে একথা সত্য যে আমার অন্তরদৃষ্টির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সীতাপতির অর্থও সম্প্রসারিত হইতে থাকে। বিশ্বের বিকাশের ধারাও ইহাই। রামকে যে মানুষ কেবল দশরথের পুত্ররূপেই দেখে তাহার কাছে রাম কখনও বিভু হইতে পারেন না। কিন্তু রামকে যে মানুষ ভগবানরূপে দেখে তাহার কাছে রাম সর্বত্র বিরাজমান বিভু; রামের পিতাও তাহার কাছে সর্বত্র বিরাজমান বিভু। তাহার কাছে পিতা-পুত্র এক। বলিতে পারেন, এই সবই কল্পনা। এই মন্তব্যের জবাবে একথাই মাত্র বলিব যে, যাহার যেমন মতি তাহার তেমন গতি (যেমন ভাব তেমন লাভ)। সকল ধর্ম যদি মূলতঃ এক হয় তবে উহাদের সমন্বয় করিয়া লইতে হয়। আজ বিভিন্ন ধর্মকে আমরা আলাদা আলাদা করিয়া দেখি। তাই না এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোককে হত্যা করে। আর ধর্মে বিতৃষ্ণা জন্মিলে লোকে নাস্তিক হয়। তখন ক্ষুদ্র 'আমি' ছাড়া তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—ভগবানও না। কিন্তু সত্যের উপলব্ধিতে ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধি দূর হয় আর ভগবান তখন হন সর্বেসর্বা। রাম তখন দশরথপুত্র. সীতাপতি এবং ভরত-লক্ষ্মণ-ভ্রাতা বটেন আবার নহেনও। এবং এই সব সত্ত্বেও সে ঈশ্বর, অজ ও শাশ্বত। তাই রামকে দশরথপুত্র মনে না করা সত্ত্বেও যাহারা প্রার্থনায় যোগ দেন তাহাদের

প্রতি আমি অশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। এই যে রামতত্ত্ব তাহা যুক্তির অতীত। আমার বিশ্বাসের কথা পাঠকের কাছে ধরিলাম। পাঠকেরা উহার মূল্য নির্ধারণ করিবেন।

রামনাম ও ভুকতাক

'রামনাম' বলিতে আমি যাহা বুঝি তাহার সঙ্গে তন্ত্রমন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। আমি বলিয়াছি যে হৃদয় ঢালিয়া রামনাম করিলে এক অপরিমেয় শক্তির সহায়তা মিলে। তাহার তুলনায় আণবিক বোমা একেবারেই তুচ্ছ। যে কোন দুঃখ দূর করার সামর্থ্য এই শক্তির আছে।

প্রশ্ন: আমার ভাগিনার অসুখ হয়। তাহার অভিভাবকেরা ডাক্তার-বৈদ্যের কাছে না গিয়া রোগ-নিরাময়ের জন্য ঝাড়-ফুঁকের শরণ লয়। তাহার ফল হইয়াছিল একথা বলা যায় না। আপনার মা তেমন কিছু করিয়া থাকিবেন। আপনি এখন রামনাম-এর কথা বলেন। তাহা তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়-ফুঁকের শামিলই নহে কি ?

উত্তর: কোন না কোন আকারে এই প্রশ্নের উত্তর আমি ইহার পূর্বে দিয়াছি। তাহা হইলেও এই প্রশ্নের আলোচনা আবার করা সঙ্গত মনে হইতেছে। যতদূর মনে আছে আমার মা আমাকে ওষুধ খাওয়াইয়াছিলেন। তবে তন্ত্রে-মন্ত্রে ও মাদুলি-কবচে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ঐসবে আমার বিশ্বাস নাই। তাই বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে রামনাম হৃদয় ঢালিয়া করিলে এক অপরিমেয় শক্তির সহায়তা মিলে। তাহার তুলনায় আণবিক বোমাও তুচ্ছ। যে কোন দুঃখ দূর করার সামর্থ্য এই শক্তির আছে। একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে হৃদয় ঢালিয়া রামনাম করার কথা বলা সহজ, করা সহজ নয়। তা হোক, রামনাম অপেক্ষা মহান্ সম্পদ মানুষের আর নাই।

রামনাম সম্বন্ধে

'রামনাম অব্যর্থ ঔষধ। আপনারা বলতে পারেন, রামনামে আপনাদের বিশ্বাস নেই। আপনারা জানেন না যে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্বাস নেওয়া, শ্বাস ফেলার শক্তি পর্যন্ত আমাদের নাই। ঈশ্বর, আল্লা, গড্, অহুর মজ্‌দ যে কোন নামে তাঁকে ডাকতে

পারেন। অগুনতি জীবের মতই অনন্ত তাঁর নাম। এক সে-ই অদ্বিতীয়; এক সে-ই মহৎ। তাঁর অপেক্ষা মহান্ কিছু নাই। অনাদি, অরূপ, নিষ্কলঙ্ক—আমার রামের স্বরূপ এই। এক সে-ই আমার পরমেশ্বর, সে-ই আমার বিভু।'

লাকসাম[১]-এ একটি উদ্‌বাস্তু শিবিরের উদ্‌বাস্তুদের উদ্দেশ্যে স্টেশনে সমবেত দর্শনার্থীদের গান্ধীজী বলেন :

"আপনাদের একজন হয়ে থাকব বলে আমি এই অঞ্চলে এসেছি। এটা আপন প্রদেশ, ওটা ভিন-প্রদেশ এইভাব আমাতে নেই। আমি ভারতের লোক, তাই গুজরাটী আর তাই আমি বাঙ্গালীও। আমি স্থির করেছি এখানে থাকব আর প্রয়োজন হলে এখানেই মরব। শান্তি যত দিন ফিরে না আসছে, হিন্দু মেয়ে একাকী যতদিন না নির্ভয়ে মুসলমানদের মধ্যে চলাফেরা করতে পারছে ততদিন এই অঞ্চল আমি ছেড়ে যাব না।

"আপনারা ভয় দূর করুন। আপনাদের নির্ভীকতায় আমার কাজ সহজ হবে। কিসে সেই অঘটন ঘটবে তা বলি। রামনাম সেই অব্যর্থ-মন্ত্র। বলতে পারেন, রামনামে আপনাদের বিশ্বাস নেই। আপনারা জানেন না যে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্বাস নেওয়া, শ্বাস ফেলার শক্তি পর্যন্ত আমাদের নেই। ঈশ্বর, আল্লা, গড্, অহুর মজ্‌দ যে কোন নামে তাঁকে ডাকতে পারেন। অগুনতি জীবের মতন অনন্ত তাঁর নাম। এক সে-ই অদ্বিতীয়, এক সে-ই মহৎ। তাঁর অপেক্ষা মহান্ কিছু নাই। অনাদি, অরূপ, নিষ্কলঙ্ক—আমার রামের স্বরূপ এই। এক সে-ই আমার পরমেশ্বর, সে-ই আমার বিভু।"

শৈশবের ভীরুতার কথা, ছায়া দেখিয়া ভয় পাওয়ার কথা, 'রামনামে ভূত পালায়' ধাত্রী রম্ভার এই উপদেশের কথা আবেগভরে উল্লেখ করিয়া পুনরায় তিনি বলেন :—

"রম্ভা আমায় বলত, 'যখন ভয় পাবে রামনাম করবে, ভয় দূর হয়ে যাবে।' তখন থেকে আমি রামনামের শরণ নিয়েছি। তা আমাকে বরাবর রক্ষা করছে।"

"পবিত্র হৃদয়ে তাঁর নিত্য বাস। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বাংলায় অর্চিত, ভক্তশ্রেষ্ঠ তুলসীদাস তেমন কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত পূজিত।

---

[১] লাকসাম—ত্রিপুরা জেলার এক রেল-জংশন। ওখান হইতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও চাঁদপুরের দিকে রেল লাইন গিয়াছে।

তুলসীদাস তাঁর অমর কাব্য রামায়ণে রামনাম-মন্ত্র দিয়ে গেছেন। সেই নামে আপনাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকে ত জগতের কোন কিছুর, আমীর গরীব কারো ভয় আপনাদের থাকবে না। 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে—আপনাদের প্রাণ ওড়ার মত হয় কেন! ইস্‌লামের আল্লা নির্দোষ লোকের রক্ষক। পূর্ববঙ্গে যা ঘটেছে তার সমর্থন পয়গম্বর মহম্মদের প্রবর্তিত ইস্‌লামে নেই।

"ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করেন ত কার সাধ্য আপনাদের স্ত্রীকন্যার সম্মান-হানি করে। তাই আপনাদের আমি মুসলমানদের ভয় দূর করতে বলি। রামনামের মহিমায় যদি আপনারা বিশ্বাসী হন তবে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যাবেন না। যেখানে আপনারা জন্মেছেন, যেখানে আপনারা বড় হয়েছেন সেই স্থান ত্যাগ করা আপনাদের উচিত নয়। প্রয়োজন হলে আত্মসম্মান রক্ষার নিমিত্তে নরনারী আপনারা বীরের মতো মৃত্যুবরণ করবেন। বিপদের সম্মুখীন না হয়ে পালিয়ে যাওয়া মানুষের মনুষ্যত্বে, ভগবানের অস্তিত্বে এবং আত্ম-বিশ্বাসে ভরসা হারানোর মতোই ব্যাপার। এমন আশ্রয়হীন হওয়ার চাইতে জলে ডুবে মরাও ভাল।

"কেন আপনারা মনে করেন যে পুলিশ ও সৈন্য আপনাদের একমাত্র রক্ষক?" 'সৈন্যদের রক্ষাকর্তা কে' একথা তাদের জিজ্ঞাসা করেন ত তাঁরা বলবেন—ভগবান। তাই সৈন্যরা যাঁর শরণ নেয় তাঁর শরণ নিতে আপনাদের আমি বলি এবং পুলিশের বড় কর্তা সামসুদ্দিন সাহেবকে সাহসে বুক বেঁধে আপনারা বলুন, পুলিশ ও সৈন্যে আমাদের দরকার নেই, তাদের আপনি সরিয়ে নিন।"

নৈসর্গিক চিকিৎসায় ঈশ্বরের স্থান

'ঈশ্বরের যে গোলাম তার অসুখ হওয়ার কথা নয়। অসুখ হয় ত ঈশ্বরে সব সঁপে সে নিশ্চিন্ত থাকে এবং দিন ফুরুলে শান্তিতে চোখ বোজে।'

…প্রাকৃতিক চিকিৎসায় আমায় পাইয়া বসিয়াছে। তাই তাহাকে আমি বলি:

"তুমি বলেছ যে সুস্থ থাকার, নিজে পরিচ্ছন্ন থাকার ও প্রতিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা সর্বাগ্রে তোমরা ছোটদের দিচ্ছ। উত্তম তা-ই ত চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূল কথা। অগণিত গ্রামবাসীর জন্যই না আমাদের এই শিক্ষা

পরিকল্পনা; তাদের হিতসাধনই না আমাদের লক্ষ্য! প্রকৃতির কোলে বাস করিয়াও তারা প্রকৃতির বিধানের খবর রাখে না। যেটুকু বা জানে, পালন করে না। গ্রামবাসীদের দুঃখ দৈন্য দেখার ফলেই না নয়ী তালিমের প্রেরণা আমাদের এসেছে! তাই বইয়ের পাতা থেকে নয়ী তালিম সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু শেখার নেই। এ পর্যন্ত যা শিখেছি প্রকৃতির পাতা থেকেই শিখেছি। গ্রামের উপযোগী চিকিৎসা-পদ্ধতির তালিম প্রকৃতির কাছ হতেই আমাদের নিতে হবে। শারীর-বিদ্যার, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের ও পুষ্টি-তত্ত্বের গোড়ার কথা জানা ও সেইমত চলা প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রাণবস্তু। তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে প্রত্যেকেই আমরা স্ব-স্ব চিকিৎসক। যে মানুষ খাওয়ার জন্য খায় না, খায় জীবন রক্ষার জন্য, মাটি জল আকাশ তেজ ও বায়ু এই পঞ্চভূতের পরিচয় যার ঘনিষ্ঠ এবং যে মানুষ বিশ্ববিধাতার গোলাম তার অসুখ হওয়ার কথা নয়। যদি হয় ঈশ্বরে সব কিছু সঁপিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকে এবং দিন ফুরুলে শান্তিতে চোখ বোজে? গ্রামের খেত-খামারে যে গাছ-গাছড়া মিলে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। কোটি কোটি লোকের জীবন এইভাবে কাটে। আর এইভাবে নিঃশব্দে তারা মরে। ডাক্তার দেখা ত দূরে থাক, অনেকে ডাক্তারের কথাও শোনে নাই। চিন্তায় ও দৃষ্টিতে আমাদের গেঁয়ো হতে হবে। আমাদের কাছে গাঁয়ের শিশু আসে, বুড়ো আসে। জীবন কিভাবে যাপন করা উচিত তা তাদের শেখাতে হবে। ডাক্তারেরা বলেন যে শতে নিরানব্বই জন অসুখে ভোগে নোংরা থাকে বলে, অখাদ্য-কুখাদ্য খায় বলে, পেট ভরে খেতে পায় না বলে। এই নিরানব্বই জনকে আমরা যদি জীবন-যাপনের ঠিক পথ দেখাতে পারি তবে বাকী একজনের কথা না ভাবলেও চলবে। এই একজনের জন্য ডাঃ সুশীলা নায়ারের মতন পরহিতব্রতা ডাক্তার আছেন। ঐ জন কয়েকের জন্য আমাদের না ভাবলেও চলবে। নির্মল জল, নির্মল বায়ু ও শুদ্ধ মাটির যে গুণ কি তা আমরা জানি না। ব্যোম ও সূর্যের অপরিসীম শক্তির জ্ঞানও আমাদের নেই। পঞ্চভূতের নিপুণ ব্যবহার যদি লোককে আমরা শেখাতে পারি, যোগ্য সুষম ও পরিমিত খাদ্যের দিকে লোকের মন যদি ঘোরাতে পারি তবে অতীব আনন্দে বলতে পারব যে জন্ম জন্মান্তরের মহৎ সেবা আমরা করেছি। এই জ্ঞান আহরণের জন্য ডিগ্রির প্রয়োজন নেই। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করারও আবশ্যকতা নেই। এরজন্য চাই ভগবানে জ্বলন্ত বিশ্বাস, সেবাভাব ও পঞ্চভূতের প্রয়োগ-কৌশল এবং পথ্যাপথ্যের বিচার। স্কুল কলেজে সময় নষ্ট না করে তা শেখা যায়।

গণের ওষুধ

'ভারতের অগুনতি মানুষের এক অংশ যাঁকে রাম নামে ও অপর অংশ যাঁকে আল্লা নামে ডাকে, অন্তর হইতে তাঁর শরণ লওয়াই আধি-ব্যাধি হইতে বাঁচার সর্বোত্তম পথ।'

প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রতি গান্ধীজীর পক্ষপাতিত্বের কথা সুবিদিত। প্রথম জীবনে অ্যালোপ্যাথী চিকিৎসকের যে অভিজ্ঞতা তাঁহার হইয়াছিল তাহা মোটেই সুখের ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার সহধর্মিণীর বিষম স্ত্রীরোগ হয়। ডাক্তার মাংসের সুরুয়া ব্যবস্থা করেন ও বলেন যে তাহা ছাড়া তাঁহাকে বাঁচানো যাইবে না। গান্ধীজী নিষ্ঠাবান নিরামিষাশী। তাই জীবন থাকুক কি যাউক ঐ ব্যবস্থা মত চলা সম্ভব ছিল না। ডাক্তার নারাজ হইলেন, চিকিৎসা বন্ধ করিলেন। কেবল বিশ্রাম ও প্রাকৃতিক চিকিৎসায় কস্তুরবা সারিয়া উঠেন। এইরূপ আরও গুটিকয়েক অভিজ্ঞতা হইতে প্রাকৃতিক চিকিৎসার উপর তাঁহার অনুরাগ জন্মে।

গান্ধীজীর জীবন গণজীবনের সহিত ওতপ্রোত। তাহাদের জন্যই তাঁহার জীবনধারণ। তাই এই দেশের খ্যাতনামা প্রাকৃতিক চিকিৎসকগণ প্রাকৃতিক চিকিৎসাকে ব্যবসায়ের রূপ দিয়াছেন দেখিয়া গান্ধীজী অন্তরে ব্যথা অনুভব করেন। দিনকয়েক পূর্বে পশ্চিমের কোন প্রাকৃতিক চিকিৎসককে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন:

"একথা জেনে আপনি সুখী হবেন যে কুহ্নের 'নিউ সায়েন্স অব হিলিং' ও জাস্টের 'রিটার্ন টু নেচার' পড়ে প্রাকৃতিক চিকিৎসার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। সে চল্লিশ বছর আগেকার কথা। 'রিটার্ন টু নেচার' বলতে কি বোঝায় তা আমি ঠিক বুঝি নাই একথা স্বীকার করতে আমার সঙ্কোচ নেই। বুঝবার আগ্রহের অভাব এর কারণ নয়, কারণ অজ্ঞতা। ভারতের অগুনতি গরীব লোকের উপযোগী কোন প্রাকৃতিক চিকিৎসা-পদ্ধতির উদ্ভাবন ও বিকাশ-চেষ্টা আমি করছি। মাটি জল আলো বায়ু ও মহাব্যোমের[১] ব্যবহার দ্বারা রোগ-নিরাময়ের কথা আমি লোককে বলছি।"

১. কিরূপে জলাশয়ের জল শুদ্ধ রাখা যেতে পারে, কি করে শরীর পরিচ্ছন্ন রাখা যেতে পারে, যে মাটিতে আমাদের দেহ গঠিত তা থেকে কিরূপে লাভবান হওয়া যেতে পারে, মাথার ওপর যে অসীম আকাশ রয়েছে তা থেকে কিভাবে সঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করা যেতে পারে, সূর্য-কিরণ থেকে কি করে আমরা অশেষ উপকার পেতে পারি এই পাদ—

ইহা হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে ভারতের অগণিত মানুষের এক ভাগ যাঁহাকে রাম[২] বলিয়া ও অন্য ভাগ আল্লা বলিয়া ডাকে মনেপ্রাণে তাঁহার শরণ লওয়াই আধি-ব্যাধি হইতে বাঁচার সর্বোত্তম পথ। কিন্তু প্রকৃতির বিধানের মর্ম বুঝিয়া তদনুসারে চলিলেই কেবল মনপ্রাণ ঢালিয়া তাঁর নাম করা যায়। ইহা হইতে একথাই স্পষ্ট হইতেছে যে রোগমুক্তি অপেক্ষা রোগ-প্রতিষেধই প্রশস্ততর পথ। অতএব স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনের কথা, দেহ পরিষ্কার, মন নির্মল ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার কথা লোককে বিশেষ জোর দিয়া বলা দরকার।

সম্প্রতি মনু গান্ধী অসুস্থ হইলে গান্ধীজী কয়েকজন প্রাকৃতিক চিকিৎসকের অভিমত জানিতে চাহেন। তাঁহাদের কেহ কেহ জোর দিয়া বলিয়াছিলেন যে মনু গান্ধীর অসুখ উপাস্থি-প্রদাহ বা এপেণ্ডিসাইটিস নহে। অস্ত্রোপচার করিতে না হইলে গান্ধীজী সুখী হইতেন, অস্ত্রোপচারে রাজী হইতেন না। অস্ত্রোপচার ছাড়া পথ নাই ডাক্তারদের এই কথার পরে অস্ত্রোপচারে তিনি মত দেন। পাটনার কর্নেল ভার্গব অস্ত্রোপচার করেন। উপাস্থি কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। অস্ত্রোপচারের পরের দিন কয়েকজন প্রাকৃতিক চিকিৎসককে তিনি চিঠি দেন। তাহাতে তাঁহাদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।

কোন পত্রে আমাকে (নিবন্ধ-লেখককে) তিনি বলেন, 'আমার অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। মনুর অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। তাঁর চরণে মিনতি এর বেশী নাকাল তিনি আমায় না করেন। জীবনের মায়া কাটানো শক্ত।'

দিল্লী গেলে গান্ধীজী আমায় বলেন, 'প্রাকৃতিক চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া গণের অন্য আশ্রয় নেই। তবে অসুবিধাও এর আছে একথা বোঝা দরকার'।

নম্রতা, কঠোর শ্রম ও গরীবের সেবার ঐকান্তিক আগ্রহ—ইহাই গান্ধীজীর

পরিক্রমার সুযোগে সেই শিক্ষাই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি আপনাদের কাছে ধরার চেষ্টা করব। অন্য কথায়, আমাদের আশেপাশে যে সব বস্তু রয়েছে তা থেকে কিভাবে আমাদের এই দরিদ্র দেশকে স্বর্ণভূমি করা যায় সেই চেষ্টাই আমি করব। যেরূপ সেবার আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে সেইরূপ সেবা করার উপযোগী ভগবান আমায় করুন আপনারা তেমন প্রার্থনা তাঁর কাছে করবেন।

২. ভারতের অসংখ্য মানুষ ভগবানের কথা জানে না তাহা নয়, জানে। তবে রাম বলিলে তাঁহাদের মনে যে আবেগের সঞ্চার হয় ভগবান বলিলে সেই ভাবের সঞ্চার হয় না।

হরিজন, দ্বাদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৮৯

শিক্ষার মূল কথা। প্রাকৃতিক বা অন্য চিকিৎসায় অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি আপন চিকিৎসা-পদ্ধতির বড়াই করিলে গান্ধীজী বিরক্ত হন্। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির তিনি প্রশংসক। তাহাদের পূর্বাচার্যগণ যে কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহার গুণগান তিনি করিয়া থাকেন।

কিন্তু সাধারণতঃ যে লোভ ও অহমিকা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় তাহাতে তিনি পীড়া বোধ করেন। দিন কয়েক পূর্বে কোন প্রাকৃতিক চিকিৎসক বন্ধুকে তিনি লিখেন, "আপনার উৎসাহ দেখে আমার ভাল লাগে। তবে মনে রাখতে হবে যে অন্ধ উৎসাহে প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রসার ভারতে হবে না আর আমার সমর্থনেও উহার কোন সুসার হবে না, কেন না আমি জানি এদিকে আমি অজ্ঞ। তা ছাড়া আমার সমর্থনের দিকে তাকিয়ে থাকাটাই নিষ্ক্রিয়তার লক্ষণ।

"নিজের ত্রুটি সম্পর্কে আপনারা যদি সজাগই হবেন তবে শারীর-সংস্থান বিদ্যার অনুশীলনে আপনারা বিমুখ কেন? শারীরবৃত্তের সূক্ষ্ম জ্ঞান আপনাদের আছে কি? অ্যালোপ্যাথীর অনুগামীরা বহুবৎসর ব্যাপী কঠোর সাধনায় যে জ্ঞানভাণ্ডার খুলে ধরেছেন তার অনুশীলন যদি আপনারা করতেন তবে ত এই ভুল আপনাদের হত না। অ্যালোপ্যাথীর সুনাম ও প্রভাব আজ বিশ্বব্যাপী। অ্যালোপ্যাথীর এই প্রভাবের মূলে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা নয়। তাঁরা যাকে নিখুঁত বিজ্ঞান বলেন (আমার মতে তাঁদের এই দাবি অমূলক) তার বেদীতে তাঁরা যে আত্ম-বলিদান করেছেন তাহাই অ্যালোপ্যাথীর জগতজোড়া খ্যাতির কারণ। আধুনিক প্রাকৃতিক চিকিৎসকদের কোনই ত্যাগ নেই। তাঁরা মনে করেন যে অল্পে খুশী, সহজ-বিশ্বাসী জনসাধারণের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নিজেদের পসার-বৃদ্ধির অধিকার তাঁদের আছে। অ্যালোপ্যাথীর গুণকীর্তন আমি করছি না। উহার সহিত আমার মৌল দৃষ্টিভেদ রয়েছে। কোনমতে ডিগ্রী লাভ করে ও সেই আধাহজম বিদ্যার পসরা সাজিয়ে টেঁক ভারি করার দিকেই ডাক্তারদের সবটা দৃষ্টি।"

প্রার্থনার পরে একদিন তিনি বলেন, "ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা দেশের জন্য কি করছেন তা জানতে আমার কৌতূহল হয়। রোগ বিশেষের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হওয়ার অধীর আগ্রহে তাঁরা বিদেশে যান, দেখতে পাই। ভারতের সাতলক্ষ গ্রামের দিকে তাঁদের আমি নজর দিতে বলি। তখন তাঁরা দেখতে পাবেন যে কি নারী কি পুরুষ সকল ডাক্তারের জন্যই ক্ষেত্র প্রস্তুত রয়েছে। তবে পশ্চিমের

চিকিৎসা সেখানে চলবে না। গ্রাম্য-পদ্ধতি সেখানে অনুসরণ করতে হবে। গ্রামে বসলে দেশীয় পদ্ধতি সমূহের কোন একটি অবলম্বনে চিকিৎসা করতে হবে। বিদেশ থেকে ওষুধ আনার প্রয়োজন নেই। গ্রামে ভেষজের অভাব নেই। ওষুধ ব্যবস্থা করা গোড়ার কথা নয়, আসল কাজ সুস্থ থাকার পথ দেখানো।"

—প্যারেলাল

নয়াদিল্লী, জুন ৫, ১৯৪৭

ভগবান কে ও কোথায়

'...উরুলি-কাঞ্চনে রামনামের মহিমা আমি নিবিড়ভাবে অনুভব করি'...আমি নিঃসংশয়ে বলিব যে রাম নাম সকল দুঃখের অব্যর্থ মহৌষধ।'

শুচি-শুদ্ধ জীবন-যাপন করিলে, ব্রহ্মোপলব্ধির তথা ঈশ্বরোপলব্ধির পথ সুগম হয়। আমি এইরূপ পবিত্র জীবন-যাপনকে ব্রহ্মচর্য বলি। ঈশ্বর কে ও তাঁর স্বরূপ কি এই প্রশ্ন এখানে স্বভাবতঃই উঠিবে। এই প্রশ্নের উত্তর জানা থাকিলে ঈশ্বরোপলব্ধির পথ খুঁজিয়া পাইতে দেরী হয় না।

ঈশ্বর দেহধারী নহেন। ভগবান সময় সময় দেহধারণ করেন এই কথা অংশতঃমাত্র সত্য। তাহার অর্থ এই যে দেহধারীর পক্ষে যতটা ভাগবত জীবন যাপন করা সম্ভবপর এরূপ মনুষ্য ততটা ভগবত জীবন যাপন করেন। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান তাই মনুষ্যমাত্রেই ঈশ্বর বিদ্যমান। এই দৃষ্টিতে দেখিলে যে কোন মনুষ্যকে ভগবানের অবতার বলা চলে। কিন্তু একথায় সার নাই। রাম ও কৃষ্ণে আমরা ঈশ্বরের বিভূতি আরোপ করি। তাই রাম ও কৃষ্ণকে লোকে অবতাররূপে পূজা করে। রাম ও কৃষ্ণ বস্তুতঃ মানুষের মনের সৃষ্টি। রাম ও কৃষ্ণ দেহে বিদ্যমান ছিলেন কি-না এই সংশয়প্রশ্ন তুলিতে পারি। তাহা সত্ত্বেও মানুষের হৃদয় হইতে তাঁহাদের আসন টলিবার নয়। রাম ও কৃষ্ণকে ইতিহাসের ব্যক্তি বলিলে অনেক সময় অসুবিধায় পড়িতে হয় এবং সেই সব অসুবিধা খণ্ডন করিবার জন্য যুক্তিতর্কের শরণ লইতে হয়।

ভগবানই শক্তি, আসলে এই না কথা। জীবনের আদি কারণ সে। সে পবিত্র, পাপরহিত, চেতন, অবিনশ্বর। অতীব বিস্ময়ের কথা সর্বত্র বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাঁর শরণ লয় না, তাঁর সান্নিধ্যের সুযোগ লইয়া আত্মবিকাশ করে না।

তড়িৎ অতি বলবান শক্তি। সকলে তাহা কাজে লাগাইতে পারে না।

তাহা উৎপাদনের কতকগুলি ধরাবাঁধা নিয়ম আছে, তাহা আয়ত্ত করিতে হয়। তড়িৎ জড় শক্তি। কঠোর অধ্যবসায়ে সেই সব বিষয় আয়ত্ত করিলেই না বিজলীকে কাজে লাগানো যায়। প্রাণশক্তির উপলব্ধি তথা ঈশ্বরোপলব্ধির পথও ঠিক ঐ বিধির বিধানের জ্ঞান ও তদনুসারে চলা। কিন্তু একথা বলাই বাহুল্য যে ঈশ্বরের বিধি বুঝার জন্য আর সে অনুসারে চলার জন্য বহুগুণ বেশী কঠোর তপ করিতে হয়। ঐ বিধি বা নিয়মসমূহকে সংক্ষেপে ব্রহ্মচর্য আখ্যা দেওয়া যায়। রামনাম ব্রহ্মচর্য সাধনার সহজ পথ। আপন অভিজ্ঞতা হইতে একথা আমি বলিতেছি। তুলসীদাসের মত ভক্ত মহাপুরুষেরা এই শ্রেষ্ঠ পথ আমাদের দেখাইয়াছেন। একথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে উরুলি কাঞ্চনে রামনামের মহিমা আমি নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করি। এখানে আমি দৃঢ়তার সহিত বলি যে রামনাম সকল আধি-ব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ। রামনাম-রূপ শক্তির সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিলে বাহ্য কোন কিছুর বিশেষ সহায়তা ব্যতিরেকে মহা আশ্চর্য ফললাভ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মচর্যের সহায় বলিয়া শাস্ত্রে যে সব যমনিয়মের কথা বলা হইয়াছে, আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে অন্তরঢালা আকুল রামনামের কাছে সেই সব একেবারেই তুচ্ছ। অন্তর ঢালিয়া করিলেই কেবল রামনামের অতুলনীয় মহিমার ও অপরিসীম শক্তির পরিচয় মিলে। একাগ্রমনে এই অতুলনীয় ও অব্যর্থ উপায়ের শরণ লইলে দেখা যাইবে যে উদ্দেশ্য ও উপায় এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান বড় একটা নাই। তবেই দেখা যাইতেছে যে একাদশব্রত ঈশ্বরোপলব্ধির সোপান মাত্র। এই একাদশ ব্রতের সত্য হইতেছে উপায় আর রামনামে অভিহিত ঈশ্বর হইতেছেন উদ্দেশ্য। রামনামই উপায় আর সত্যই উদ্দেশ্য একথাও কি সমান ঠিক নহে।

কিন্তু যেখানে আরম্ভ করিয়াছিলাম সেখানে ফিরিয়া যাই। কামবাসনাকে পুরাপুরি বশ মানানোকে সাধারণতঃ লোকে ব্রহ্মচর্য কহে। কাম জয় করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় রামনাম। রামনামের মহিমা যে কি তাহা দেখাইবার মতন নিশ্চিত প্রমাণ আছে। মাসকয়েক পূর্বে সে কথার আলোচনা আমি করিয়াছি।

ভক্তের প্রহরী ভগবান রাম

"মুখে রামনামের বুলি আর কাজে ডাক্তারের গুলি এই দুই একসঙ্গে চলে না।"

রামময় ব্যক্তিকে চিনিবার উপায় কি? সেই উপায় জানা না থাকিলে

রামনাম সম্বন্ধে ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই আছে। কিছুটা ভুল ধারণা ত আছেই। অনেকে মালা ফেরায়, কপালে তিলক কাটে এবং হরবোলার মতন তাঁর নাম করে। নানারূপ ভণ্ডামি চলিতেছে। রামনাম করার উপর জোর দিয়া ঐ ভণ্ডামির আমি প্রশ্রয় দিতেছি কেহ একথা বলেন ত খুবই বলিতে পারেন। ইহার ফল ভাল হইবে না এই ভয়ে নিরস্ত হওয়া উচিত কি? ভয়ে নিরস্ত হইতে নাই; পরিণাম তাহার ক্ষতিকারক। মৌন গুপ্ত চেতনকে জাগ্রত, বলিষ্ঠ ও সক্রিয় করার জন্য দীর্ঘকালের ঐকান্তিক প্রযত্ন আবশ্যক। এরূপ স্বভাব মৌন যেথায় চোখে ধরা পড়ে না সেথায় রামময় ব্যক্তিকে লক্ষণ দিয়া বুঝিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে।

গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের সহিত রামভক্তের তুলনা করা যাইতে পারে। তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে প্রকৃত ভগবদ্ ভক্তের জীবন পঞ্চভূতাশ্রয়ী। এরূপ ব্যক্তির অসুখ হওয়ার কথা নয়। যদি বা হয় পঞ্চভূতের সহায়ে সে সারিয়া উঠিবে। যেনতেনপ্রকারেণ রোগমুক্ত হওয়ার আগ্রহ অন্তরপুরুষের নাই। দেহসর্বস্ব মানুষ শরীর জিয়াইয়া রাখিবার নিমিত্তে না করে এমন কিছু নাই। দেহকোশে থাকিলেও আত্মা দেহ হইতে পৃথক। 'দেহ মর, আত্মা অমর এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে পঞ্চভূতে কাজ না হইলে সে ঘাবড়াইবে না আর হায়-হুতাশও করিবে না। উল্টা, মৃত্যু আসে ত তাহা সে বরণ করিবে। বৈদ্যের শরণ সে লইবে না, নিজেই সে নিজের চিকিৎসক হইবে। অন্তরাত্মা তাহার সর্বকর্মের সাক্ষী এই উপলব্ধি হইতে সে সকল কর্ম করিবে এবং অন্তরাত্মায় কোনও রূপে আঁচ না লাগে এই হইবে তাহার সর্বক্ষণের প্রযত্ন। এরূপ ব্যক্তির কাছে ভগবানের নাম শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় একান্ত সহজ ক্রিয়া। তাহার দেহ যখন ঘুমে বিবশ তখনও তাহার রাম জাগ্রত। রাম তাহার সর্ব-কর্মের সাক্ষী। দেহের নাশকে ভক্ত সত্যকার মৃত্যু বলিয়া গণনা করে না, তাঁর (রামের) পাবন সঙ্গ হারানোকে সে সত্যিকার মৃত্যু মনে করে।

জীবনকে রামময় করার পক্ষে পঞ্চভূত হইতে যে-যে সহায়তা মিলে তাহা সে লয়। তাহার অর্থ মাটি জল সূর্য ও আকাশ হইতে যে সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে সেই সহায়তার সদ্ব্যবহার সে করে অর্থাৎ আরোগ্যের সহজতম ও সুলভতম পন্থা সে ধরে। এই সাহায্য তাহার কাছে রামনামের অনুপূরক নহে। তাহার কাছে তাহা রামনামে তন্ময় হওয়ার সাধন। বাস্তবপক্ষে রামনামের ঠেক্‌নার দরকার নাই। কিন্তু মুখে রামনামের বুলি আর কাজে ডাক্তারের গুলি এই দুই এক সঙ্গে চলে না।

রামনাম সম্পর্কে আমার উক্তি পাঠ করিয়া কোন তত্ত্ববিদ্ বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন যে রামনামের প্রভাব এলকেমির মতন—কিমিয়ার মতন—শরীরে রূপান্তর ঘটায়। বীর্যরক্ষণকে শাস্ত্র সঞ্চিত মূলধনের সহিত তুলনা করিয়াছে। বীর্যসমাহরণ করিয়া উহাকে ক্রমবর্ধমান আধ্যাত্মিক নির্ঝরে রূপান্তর করার শক্তি একমাত্র রামনামেরই আছে।

রক্ত বিনা শরীরের চলে না। তদ্রূপ অনাবিল অবিমিশ্র প্রত্যয় ব্যতিরেকে আত্মার চলে না। বিশ্বাসজাত এই শক্তিতে ক্ষয়প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের জীর্ণোদ্ধার করার সামর্থ্য রহিয়াছে। তাই ত বলা হয়—জীবন রামময় হইলে নবজীবন লাভ হয়। নরনারী, যুবকবৃদ্ধ সকলের পক্ষেই (সম্বন্ধে) এই কথা খাটে।

পশ্চিমেও এই বিশ্বাস দেখা যায়। তাহার আভাস পাওয়া যায় ক্রিশ্চিয়ন সায়েন্সে। যুগযুগান্তর হইতে পুরুষানুক্রমে যে বিশ্বাস এই দেশে চলিয়া আসিয়াছে তাহার সমর্থনে বিদেশী নজিরের দরকার নাই।

হরিদ্বার, জুন ২১, ১৯৪৭

আসল ডাক্তার রাম

'যথার্থ ডাক্তার রাম। আমার সেবায় যতদিন তাঁর দরকার ততদিন তিনি আমায় রাখবেন। কাজ ফুরুলে তিনি নিয়ে নেবেন।'

আমকি[১]-তে ছাগদুগ্ধ মিলিল না। বাপুকে সেকথা বলিলাম। বাপু বলিলেন, "মিলেনি ত হয়েছে কি। নারকেলের দুধে-ই চলবে। ঘি-র কাজ তাজা (টাটকা) নারকেল তেলে চালাবে।"

নারিকেলের দুধ কেমন করিয়া তৈরী করিতে হয় বাপু তা বলিয়া দিলেন। বাপু সাধারণতঃ আধসের ছাগদুগ্ধ খাইতেন। সেই পরিমাণ নারিকেল দুধ বাপু খাইলেন। কিন্তু তাহা সহ্য হইল না। উদরাময় হইল। বারবার ভেদ হইতে লাগিল। লক্ষ্য করিলাম, বাপু দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন। বিকালে কুটিরে ফিরিবার সময় তাঁহার মাথা-ঘুরনি আরম্ভ হয়। ভয় হইল, বুঝিবা পড়িয়া যাইবেন। শরীর দুর্বল হইলে যে তিনি ঘনঘন হাই তুলিতেন, তাঁহার শরীরে ঘাম দেখা দিত ও হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিত একথা আমি জানিতাম। হাই তুলিতে দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে বাপুর মাথা-ঘুরনি হইয়া থাকিবে। পরক্ষণে নিজ ভুল বুঝিতে পারিলাম। দেখিলাম, আমার উপর ভর করিয়া

[১] আমকি নোয়াখালি জেলার একটি গ্রাম।

যখন চলিতেছিলেন তখন তাঁহার শরীর প্রায় অবশ হইয়া আসিয়াছে। বাপুর মাথা কাঁধে বিন্যাস করিয়া চিৎকার করিয়া নির্মলবাবুকে ডাকিলাম। দুইজনে ধরিয়া বাপুকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। মনে হইল, ডাঃ সুশীলা নায়ারকে খবর দেওয়া উচিত। কাছেই এক গ্রামে তখন তিনি কাজ করিতেন। তাঁহাকে যদি খবর না দেই আর বাপুর অবস্থা খারাপ হয় তবে আহাম্মক বনিতে হইবে। এই ছিল আমার মনের ক্রিয়া। 'শীঘ্র আসুন' এই কথা লেখা চিরকুট তাঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়ার কথা নির্মল বাবুকে বলিতে যাইতেছিলাম ত বাপুর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং বাপু বলিলেন, "মনুদি (আদরে এই সম্বোধন করিতেন) নির্মলবাবুকে ডেকো না। তাহা ভাল লাগছে না। কচি বয়স তাই তোমায় ক্ষমা করছি। এমন অবস্থায় রামনাম করবে এটাই তোমা থেকে প্রত্যাশা করি। তাঁর নামই অন্তর থেকে করছিলাম। ভয়ে নির্মলবাবুর শরণ না নিয়ে রামের শরণ নিলে খুশী হতাম। সুশীলাকে খবর দিও না। আসল ডাক্তার রাম। আমার সেবায় যতদিন তাঁর দরকার ততদিন তিনি আমায় রাখবেন। কাজ ফুরুলে তুলে নেবেন।"

এই কথায় ভয় পাইলাম। নির্মলবাবুর হাত হইতে চিরকুটটা ছোঁ মারিয়া লইলাম, ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। বাপু তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'দেখছি, সুশীলাকে চিঠি পাঠাতে যাচ্ছিলে। ভগবান আজ আমাদের দুইজনকে বাঁচিয়েছেন। পত্র পাওয়া মাত্র সুশীলা এখানে নিজ কাজ ফেলে ছুটে আসত। সে অবস্থায় নিজের উপর ও তোমার উপর আমার রাগ হত। রামনামে আমার অটল ভক্তি থাকে ত এই অসুখে আমি মরব না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। অন্যের পক্ষেও একথা সত্য। ভুল করলে তার ফল ভুগতে হয়, এই ভাব হতে যাতনা সইছি। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রামনাম করা চাই। তবে তোতা পাখীর মত নয়। করতে হয় অন্তর ঢেলে যেমন করেছিলেন ভক্ত হনুমান। সীতা তাঁকে মুক্তার হার দেন। হনুমান একটি একটি করে মুক্তা ভাঙ্গেন আর দেখেন তার ভিতরে রামনাম আছে কি নাই। এ কাহিনী সত্য কি কল্পিত তার বিচার নিরর্থক। হনুমানের শরীরে যে শক্তি ছিল তা আমাদের না থাকতে পারে কিন্তু অন্তরে ত তাঁর মতন একনিষ্ঠ আমরা অবশ্যই হতে পারি। মনেপ্রাণে চেষ্টা করে যদি ততটা না পারি ত আপসোসের কিছু নেই। গীতা বলে—চেষ্টা করো, ফল ভগবানের হাতে ছাড়ো। তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। ব্যামোকে (তা যারই হোক, তোমার,

আমার বা অন্য কারো) যে আমি কোন্ চোখে দেখি তা এ থেকে বুঝতে পাচ্ছ।'

ঐ দিনই কোন রুগ্ন মহিলাকে বাপু লিখেন, "জগতে একটা মাত্রই ওষুধ রয়েছে। রামনাম সে ওষুধ। কিন্তু রামনামের আনুষঙ্গিক নিয়মাদি যথাযথ পালন করলেই কেবল রামনামের ফল ফলে। অন্যথায় নয়। কিন্তু সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আছে কি?"

এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৯৪৭ সনের ৩০শে জানুয়ারী। ঠিক এক বছর পরে ঐ দিনে রামনাম করিয়া তিনি অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করেন।

—মনু গান্ধী ('বাপু মাই মাদার' পুস্তক হইতে)

প্রার্থনা-প্রবচন থেকে

রামনাম করার রীতি-পদ্ধতি :

"প্রাকৃতিক চিকিৎসার বিষয়ে দুই একটি কথা বলব। ডাক্তারেরা শিশিতে ওষুধ দেন। প্রাকৃতিক চিকিৎসা তেমন চিকিৎসা নয়। বস্তুতঃ প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করার নাম প্রাকৃতিক চিকিৎসা। রামনাম প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রাণস্বরূপ। কথাটা শুনে হয়ত হাসবেন। তবুও বলব যে আত্মশুদ্ধির তাহা সোপান ও আধ্যাত্মিক শক্তির তাহা প্রস্রবন। অসুখ থেকে রামনাম করে মনুষ্য আরোগ্য লাভ করতে পারে এ বিষয়ে আমার কোনই সংশয় নেই। কিন্তু রামনাম করারও রীতি আছে, পদ্ধতি আছে। কেউ রাক্ষসের মতো খেল আর তারপর মুখে 'রাম' 'রাম' বলল। সেস্থলে যদি তার উদরাময় হয় তবে গান্ধীকে দোষ দেওয়া যাবে না। রামনাম করার নিয়ম আছে। হার্তে লুটতরাজ করলাম আর মুখে রামনাম নিলাম—এভাবে কি মোক্ষ মিলে! আত্মশুদ্ধির নিমিত্তে যারা যমনিয়ম পালন করতে আগ্রহশীল রামনাম তাদেরই জন্য। ব্যারিস্টারি যখন করতাম তখনও প্রাকৃতিক চিকিৎসার অনুশীলন করতাম। কিন্তু উহা যে কোটি কোটি নিরন্ন গ্রামবাসীর সেবার বাহন হতে পারে সেই জ্ঞান তখন ছিল না, শেষ জীবনে হয়েছে।" বোম্বাই, মার্চ ১৫, ১৯৪৬

রামনাম মহা ফলপ্রদ ঔষধ

উরুলি-কাঞ্চনে প্রার্থনা-প্রবচনে গান্ধীজী বলেন :

"শারীরিক ব্যাধিই বলুন আর মানসিক ব্যাধিই বলুন, সর্ববিধ ব্যাধি দূর করার পক্ষে রামনাম মহা ফলপ্রদ ঔষধ। কোথায় সেই ডাক্তার, কোথায়

সেই বৈদ্য যিনি বলবেন তাঁর ওষুধে অসুখ সারবেই? কিন্তু তাঁর শরণ নিলে সে আপনার দুঃখতাপ নিশ্চয় হরণ করবেন। তবে প্রার্থনা থেকে ফল পেতে চান ত অন্তর ঢেলে তাঁর নাম করতে হবে। ঐ পথেই কেবল শান্তি ও সন্তোষ লাভ হবে।

"এ ছাড়া আরও কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা আবশ্যক—যোগ্য আহার, পরিমিত নিদ্রা, ক্রোধ-সংবরণ ইত্যাদি। সর্বোপরি, প্রকৃতির সহিত আমাদের গাঁট-ছড়া বাঁধতে হবে, তার নিয়ম মেনে চলতে হবে।"

হরিজন, মার্চ ২২, ১৯৪৬

রামনাম মানে স্বভাবসম্মত জীবন

"আমার মনে হচ্ছে, এতদিন যাহা বন্ধুদের ও ঘনিষ্ঠ সহচরদের দিয়ে এসেছি এবার তাহা জনগণকে তথা গরীব গ্রামবাসীদের দেওয়ার সময় এসেছে।

ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য শতসহস্র উপচার এখন আবশ্যক। তাই তাহা বহু ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে। ডাক্তার ডাকার সঙ্গতি যাদের আছে তারা ডাক্তার ডাকে। সাধারণ লোকের অবোধ্য ভাষায় ডাক্তারেরা ব্যবস্থাপত্র—প্রেসক্রিপ্‌শন লেখেন। তা নিয়ে তারা ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ কেনে; মনে করে তা খেলে তাদের অসুখ সারবে। চিকিৎসার এই ব্যর্থতার দিকটা না হয় না-ই দেখলাম। তবে কথা হচ্ছে তা-ই বা ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

সকল ব্যাধি সারাবার মতো কোন ওষুধ জগতে নেই। কিন্তু রোগ দূর করতে না পারলেও রোগ-যাতনা বীরের মতো সইবার ধৈর্য ও শক্তি রামনাম আমাদের দেয়। রামনাম মানে প্রকৃতির অনুসারী সঙ্গত জীবন-যাপন। তাই না জীবন-সন্ধ্যায় প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রসারের চেষ্টায় আমি রত হয়েছি, অনেক বোঝার উপর আর এক বোঝা কাঁধে নিয়েছি।"

নয়াদিল্লী, এপ্রিল ১৯, ১৯৪৩

প্রস্তুতি আবশ্যক

"নরনারী উভয় শ্রেণীর অনেকে আপনারা জানিয়েছেন যে চিত্ত একাগ্র করে প্রার্থনায় যোগ দিতে আপনারা অশেষ প্রযত্ন করেন, তবুও ঠিক পেরে ওঠেন না। আপনাদের আমি বলছি, ধৈর্য হারাবেন না। ধৈর্য ধরে রামনাম করতে থাকুন। ডাক্তার হতে হলে জীবনের প্রথম ষোল বৎসর কঠোর অধ্যয়ন করতে হয়। রামময়—নামময়—হওয়ার জন্য তাহা অপেক্ষা কত অধিক সময় ও সাধনা না প্রয়োজন।"

নয়াদিল্লী, এপ্রিল ২০, ১৯৪৬

শুচিতা আন্তর ও বাহ্য

"রামনাম করে যে মনুষ্য শুচি হয়েছে বাইরে সে কখনও নোংরা হতে পারে না। তা তার কাছে অসহ্য। অগুনতি জনগণ যদি অন্তর হতে রামনাম করে তবে দাঙ্গা-ফেসাদের মত সমাজ-ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। শারীরিক অসুখ থেকেও তারা বাঁচবে। ধরাধাম তখন স্বর্গধাম হবে।

নয়াদিল্লী, এপ্রিল ২১, ১৯৪৬

রামনামের অপব্যবহার

প্রার্থনার পরে প্রাকৃতিক চিকিৎসার তথা রামনামের প্রভাবে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিরাময় হয় এই কথার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন :

"কোন পত্রপ্রেরক আমায় লিখেছেন যে এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষও দেখা যায় যারা মনে করে যে নামাবলী ধারণ করলে রামনামের স্পর্শে অন্তরে রামনাম অঙ্কিত হয়ে যায়। তিনি আরও জানিয়েছেন যে এরূপ মানুষও আছে যারা তাদের হৃদয়ে রামনাম প্রবেশ করেছে লোককে একথা বলবার আগ্রহে কাগজে তিল সমান কুটি কুটি অক্ষরে কোটিবার রামনাম লিখে তা গিলে থাকে।

কিছু লোকে মনে করেন যে আমি আত্ম-ছলনার পাকে পাক খাচ্ছি এবং অন্যকেও সেই আবর্তে টানছি। তাঁদের দৃষ্টিতে এর ফল এই দাঁড়াচ্ছে যে এই দেশের শতগণ্ডা কুসংস্কারে আর একটি কুসংস্কার জুড়ে দেওয়ার নিমিত্ত আমি হচ্ছি। এই সমালোচনার কোন জবাব আমার নেই। নিজ মনে একথাই কেবল ভাবি যে সত্যের নামে মানুষ ভণ্ডামি ও কপটাচার করে ত কি ! লোকে আমার কথা ভুল বুঝতে পারে অথবা আমার কথার অপব্যবহার করতে পারে এই ভয়ে সত্য বলে যা জানি তার প্রচার হতে নিরস্ত হতে পারি না। সত্যের সম্যক্ দর্শন অথবা উপলব্ধি এই জগতে কারো নেই। একমাত্র ভগবানই ঐ ঐশ্বর্যের অধিকারী। সত্যের আপেক্ষিক জ্ঞানের অধিক কিছু আমাদের নেই। তাই যতটা তা-র দেখতে পাই ততটাই মাত্র তার আচরণ করতে পারি। সত্যের এরূপ অনুসরণে অন্য কারো বিপথে চলার ভয় নেই।

নয়াদিল্লী, মে ২৪, ১৯৪৬

রামনাম করার অধিকার

যে ভাবে করিলে রামনামে মানুষের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক তিন তাপ দূর হয় গান্ধীজী আজ সেই কথার আলোচনা করেন। তিনি বলেন:

"আসল কথা এই যে রামনাম হৃদয় ঢেলে করা চাই। এর অর্থ? কথাটা বিশদ করছি। মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির তুলনায় শারীরিক ব্যাধি নগণ্য। তা সত্ত্বেও শারীরিক ব্যাধি থেকে মুক্ত হবার জন্য মানুষ কত চেষ্টাই না করে। যাই করি না কেন, এই দেহ চিরকাল টিকবার নয়; স্বভাবধর্মেই তা নশ্বর। তথাপি অন্তরাত্মার দিকে মানুষের নজর নেই, দেহ নিয়ে অনুক্ষণ ব্যস্ত। রামনামে বিশ্বাসী মনুষ্য দেহের পূজায় মত্ত হয় না। দেহ তার কাছে ভগবানের সেবার যোগ্য বাহন। দেহকে ভগবানের সেবার যোগ্য বাহন করার পক্ষে রামনাম সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

"রামময় হওয়ার জন্য অসীম ধৈর্যের আবশ্যক। জন্ম-জন্মান্তরও তার জন্য লাগতে পারে। তবুও তাহা করবার মতো কাজ। জন্ম-জন্মান্তরের প্রযত্নে সিদ্ধি লাভ হবে তারও নিশ্চয়তা নেই। ভগবানের কৃপায়ই কেবল সিদ্ধিলাভ হতে পারে।"

"যে মনুষ্য সত্যপরায়ণ নয়, অকপট-হৃদয় নয়, ভিতরে-বাহিরে শুদ্ধ-পবিত্র নয়, হৃদয় ঢেলে রামনাম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সান্ধ্য প্রার্থনায় আমরা প্রত্যহ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ আবৃত্তি করে থাকি। ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশ মানাতে পারে ত এবং এই দেহ সেবার সাধন এই ভাব হতে দেহকে লোকসেবার উপযোগী রাখার নিমিত্তেই কেবল আহার-পান, বিহার-বিশ্রাম করে ত যে কেউ স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করতে পারে। ইন্দ্রিয়ের ওপর যার অঙ্কুশ নেই, সিন্ধুকের মতো দরজা-জানালা-বন্ধ ঘরে যার ঘুমোতে বাধে না, দুর্গন্ধ হাওয়া শ্বাসে নিতে ও নোংরা জল খেতে যার আটকায় না বৃথাই তার রামনাম নেওয়া।

"রামনাম করার মতো শুদ্ধ-পবিত্র আপনারা নন এরূপ মনে করে রামনাম করতে যেন আপনারা বিরত হবেন না। একথা মনে রাখবেন যে পবিত্রতা লাভের পথও রামনাম। অন্তর থেকে যে মনুষ্য রামনাম করে যম-নিয়ম পালন ও আত্ম-সংযম-সাধন তার পক্ষে সহজ সাধ্য হয়। স্বাস্থ্য ও শরীর-তত্ত্বের নিয়ম মেনে সে চলবে; ঐ সকল হবে তার কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো অনায়াস ক্রিয়া। তার জীবনের গতি হবে স্বচ্ছন্দ। কারো মনে সে ব্যথা দেবে না। অন্যের কষ্ট দূর করার জন্য নিজে কষ্ট বরণ করা হবে তার

সহজবৃত্তি; ঐরূপ কষ্ট বরণ করে সে পারে অপার আনন্দ। অতএব ধৈর্য-সহকারে জাগ্রত অবস্থায় রামনাম করতে আপনারা কখনও ভুলবেন না। তা হলে এমন এক সময় আসবে যখন ঘুমের অবস্থাও সুপ্ত-চেতনায় রামনাম গুঞ্জরিত হতে থাকবে, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহে শরীর-মন-আত্মার পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হবে। নয়াদিল্লী, জুন ২৫, ১৯৪৬

কথা অপেক্ষা মননের শক্তি অধিক

প্রার্থনার অন্তে গান্ধীজী বলেন:

আমার সঙ্গে রামনাম করার জন্য আপনারা প্রার্থনায় যোগ দেন। অথবা একথা বলাই সঙ্গত হবে যে রামনাম কিরূপে করতে হয় তাহা শেখার জন্য আপনারা প্রত্যহ প্রার্থনায় আসেন। কিন্তু রামনাম এমন বস্তু যাহা কথায় শেখানো যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুখে উচ্চারিত বচন থেকে মৌন চিন্তনের শক্তি অধিক। শুভ চিন্তনের প্রভাব জগৎ-প্রসারী। শুভ চিন্তন কখনও বৃথা যায় না। কথায় ধরতে অথবা কার্যে রূপ দিতে গেলে শুভ চিন্তনের পূর্ণতার হানি ঘটে। চিন্তনকে কথায় অথবা কার্যে যথাযথ রূপ দেওয়ার শক্তি জগতে কারো নেই।

"তা বলে এও নয় যে মনুষ্য চির মৌন অবলম্বন করবে। সূত্রেই তা সম্ভব, কার্যে নয়। যে সকল যমনিয়ম পালন করলে মৌন চিন্তন কার্যকর হয় সে সব অতীব কঠিন। অন্ততঃ নিজের কথায় বলতে পারি, তেমন দাবি আমি করি না, কেন না ভাবনার সেই উৎকটতা আমার নেই, চিন্তনের ওপর সেই অঙ্কুশ আজও আমার লাভ হয় নি। অকেজো বা অবান্তর চিন্তা মনে আসে না তা নয়। অপরিসীম অধ্যবসায় ও তপস্যায়ই মাত্র সেই অবস্থার প্রাপ্তি ঘটে।

"কাল বলেছি, রামনামের শক্তি অসীম। যথার্থ কথা, অতিশয়োক্তি তা নয়। কিন্তু এই শক্তির আভাস পেতে হলে নিষ্পাপ হৃদয় হতে এই নাম উৎসারিত হওয়া চাই। সেই অবস্থায় পৌঁছবার প্রযত্ন আমি করছি। সেই অবস্থার ছবি আমার মানসগোচর হয়েছে কিন্তু কার্যে পুরাপুরি সাকার হয় নি। সেই স্থিতি যখন লাভ হবে তখন রামনাম করারও প্রয়োজন থাকবে না।*

*এক সময় আসবে যখন রামনাম উপাধি তথা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। সেই দিনের প্রতীক্ষায় আমি রয়েছি। সেই অবস্থায় রামনাম বাক্যাতীত হয়ে যায়। তখন রামনাম করার আবশ্যকতা থাকে না।

"আমি যখন এখান থেকে চলে যাব, আশা করি, তখনও আপনারা নিজেদের ঘরে নিজেদের মতো অথবা অন্য দশজনের সহিত মিলিত হয়ে রামনাম করবেন। সমবেত প্রার্থনায় একে অন্যের প্রভাব অজানতে একে অন্যতে সঞ্চারিত হয়ে অভীষ্ট লাভে সহায়ক হয়। এখানেই সমবেত প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া, আগষ্ট ১৪, ১৯২৪

রামনাম অমূল্য সম্পদ, অক্ষয় ভাণ্ডার

রামনামে অসুখ দূর করার শক্তি রহিয়াছে এই কথার উল্লেখ করিয়া আজিকার প্রার্থনার পরে গান্ধীজী বলেন:

"রামনাম কতিপয়ের জন্য নয়, রামনাম সকলের তরে। রামনাম যে করে তার ভাণ্ডার অক্ষয় দিব্য ধনে পূর্ণ হয়। যতই নেবেন, ততই তা বাড়বে। তা অক্ষয় ও অনন্ত। উপনিষদে বলা হয়েছে:

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়
পূর্ণামেবাবশিষ্যতে।

পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে পূর্ণ ই থাকে অবশেষ।

কিন্তু ইহা শর্ত নিরপেক্ষ নয়। অন্তর ঢেলে তাঁর নাম করতে হয় এ হচ্ছে সেই শর্ত। কুভাবের উদ্রেক হয়েছে, আসঙ্গ-লিপ্সা জ্বালাতন করছে বা লোভ উৎপাত করছে? রামনাম নিন। এই সব থেকে বাঁচাতে তাহা অপেক্ষা মহামন্ত্র আর কিছু নেই। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্য নিচ্ছি। ধরুন অসৎ পথে সহজে প্রচুর অর্থ আহরণের লোভ আপনার জন্মেছে। রামনামে যদি আপনার আস্থা থাকে ত তখন আপনার মনের ক্রিয়া হবে এই; পুত্রপরিবারের জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে যাই কেন! তা ত তারা উড়িয়ে দিতে পারে। তার বদলে শিক্ষা ও সদাচরণরূপ চরিত্রসম্পদ তাদের দিই না কেন। তা দিয়ে তারা সৎপথে শরীর-শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। নিরন্তর রামনাম করলে আপনাদের ভ্রম-ভ্রান্তি ও বৃথা আসক্তি দূর হবে এবং এই দিব্য দৃষ্টি লাভ হবে যে যেই নামে ভববন্ধন ঘোচে, জন্ম মৃত্যুর ফের হতে মনুষ্য বাঁচে সেই অমূল্য ধন প্রিয়-পরিজনকে না দিয়ে তাদের জন্য রাশীকৃত অর্থ রেখে যাওয়ার জন্য বোকার মত এই কি হুটোপাটি আমি করছি! এই উপলব্ধিজাত আনন্দে বিভোর হয়ে তখন আপনি পুত্রপরিবারকে বলবেন, 'দেখ, যে ধনের পিছনে ছুটছিলাম তা অপেক্ষা অনন্তগুণ মূল্যবান ধন তোমাদের জন্য এনেছি।' সংশয়ে তারা বলবে,

'দেখি, কি এনেছ'। তার উত্তরে আপনি বলবেন, "সকল ধনের যা সেরা ধন যাতে সকল ধনের আকাঙ্ক্ষা মেটে সেই নাম-ধন এনেছি। আমার হৃদয় সেই ধনের আকর।"

মুশৌরি, জুন ২, ১৯৪৬

সকল প্রার্থনার সারাৎসার

সান্ধ্য প্রার্থনার অন্তে গান্ধীজী বলেন :

"আশা করি, আপনারা নিজ বাড়ীতে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনা করবেন। সংস্কৃত শ্লোক শিখতে না চান, না-ই শিখলেন। রামধুনই যথেষ্ট। ভগবানকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করাই সকল প্রার্থনার সারাৎসার। তা করেন ত নিজের, সমাজের ও জগতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ আপনি সাধন করবেন।"

মুশৌরি, জুন ৮, ১৯৪৬

নিছক কপটাচার

"মুখে রামনাম আর কাজে রাবণের আচরণ—ইহা নিরর্থকমাত্র নয়, অতীব মারাত্মক। ইহা নিছক কপটাচার। আত্মপ্রবঞ্চনা করতে পারি, জগতের চোখেও ধুলা দিতে পারি কিন্তু বিধাতা-পুরুষকে ঠকাবার উপায় নেই।"

নয়াদিল্লী, জুন ১৮, ১৯৪৬

নামামৃত

প্রার্থনায় গীত মীরাবাঈ-এর ভজনের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন :

"ভক্ত এই ভজনে বলছেন—হে মোর চিত্তচকোর, নামামৃত পান করে তুই বিভোর হ'। পার্থিব আহার-পানে অরুচি আসে; অধিক খেলে অসুখ হয়। কিন্তু নামামৃত পানে অরুচি হয় না, অসুখও হয় না। যতই পান করবেন ততই পান করবার তৃষ্ণা বাড়বে। তবে নাম তন্ময় হয়ে করতে হয়। সে অবস্থায় সকল ভুলভ্রান্তি, সকল আসক্তি, সকল রতিবাসনা, সকল ঈর্ষা দূর হয়ে যায়। তার জন্য চাই নিরন্তর অধ্যবসায়, চাই ধৈর্য। এরূপ সাধনায় সিদ্ধি লাভ সুনিশ্চিত।"

নয়াদিল্লী, জুন ১৮, ১৯৪৬

বিশ্বাসে অঘটন ঘটে

"ভগবানের শরণ যে নেয় সে কখনও হতাশ হয় না কারণ সে জানে, কালের কর্তা বিশ্ববিধাতা সব কিছু যথাকালে করেন। তাই বিশ্বাসভরে ধৈর্য ধারণ করে সে অপেক্ষা করে।"

গজেন্দ্র ও গ্রহের রূপক অবলম্বনে উপরের উক্তি বিশদ করিয়া গান্ধীজী বলেন :

"গজরাজ নদীতে জল খেতে গেলে কুমীর আচম্বিতে তাকে ধরে ফেলে, টেনে নেয়। যতই গজরাজ দাপাদাপি করতে থাকে ততই সে ডুবতে থাকে। আর সে পারে না, আপন শক্তিতে কুলুচ্ছে না দেখে সে ভগবানের শরণ নেয়। দ্বারিকানাথ নিমেষে তাকে রক্ষা করেন।

"এই রূপকের তাৎপর্য এই যে ভক্তের বিপদে ভগবান পাশে এসে দাঁড়ান। কিন্তু তার জন্য চাই জ্বলন্ত বিশ্বাস ও অনন্য আত্মসমর্পণ। কর্তব্য করার পরে ভগবান যা-ই দেন, সুখ কি দুঃখ, ভাল কি মন্দ তা নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হওয়াতেই আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা। ভক্তের হতে হবে জনকের মতো। প্রজারা এসে জনককে খবর দেয় রাজধানীতে আগুন লেগেছে। জনক সহজভাবে বলেন, 'আমার কিছু করবার নেই।'

"কর্তব্য সম্পাদনে তিনি সদা অবহিত ছিলেন, কভু উদাসীন ছিলেন না। তা থেকে তাঁর ঐ সমর্পণের ভাব ও স্থিরবুদ্ধির উদয় হয়েছিল। কর্তব্য করে সব কিছু আপনারা ভগবানে সমর্পণ করবেন।"

"কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর ভক্তকে দুর্দৈব হতে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। তবু যদি আপদ আসে সে স্থলে ভক্ত অদৃষ্টের দোষ দেবে না আর ভগবানকেও দায়ী করবে না। বরং অনুদ্বিগ্ন মনে সে তা ধীরভাবে সহ্য করবে এবং সানন্দে তাঁর বিধান মাথা পেতে নেবে।"

নয়াদিল্লী, জুন ২০, ১৯৪৬

রামনামের তাৎপর্য

রামনামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া আজ সন্ধ্যায় গান্ধীজী বলেন :

"ভগবান দেহধারী নন। ভগবান সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। যে মনুষ্যের (নর কি নারী) হৃদয়ে ভগবান অধিষ্ঠিত সেই মনুষ্যে পরমাশ্চর্য শক্তি পরিলক্ষিত হয়। সেই শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তড়িতের ন্যায় সক্রিয় তথাপি তড়িত অপেক্ষা শত সহস্র গুণ সূক্ষ্ম।

"আমি কি এক ধরনের কুসংস্কার সৃষ্টি করছি? নয় ত। রামনাম বলেই রামনামের কোন গূঢ় মাহাত্ম্য নেই। রামনাম ভূতের ভেলকি নয়। রামনাম যে সকল বস্তুর প্রতীক সে সকল সমেত রামনাম করা চাই। অক্লান্ত গবেষণার সারভূত গাণিতিক সূত্রের সহিত রামনামের তুলনা করাই বরং ঠিক হবে। তোতাপাখীর মতো কপচালে রামনাম হতে শক্তি মিলে না। অতএব রামনাম

যে কি বস্তু তাহা উপলব্ধি করা চাই এবং যে সব বস্তু রামনামের অনুষঙ্গ সে সব পালন করা চাই। ভগবানের নাম করার জন্য ভাগবত জীবন যাপন করা চাই। পুণা, জুলাই ২, ১৯৪৬

আন্তর-বাহ্য পবিত্রতা

আজিকার প্রার্থনা-সভায় যেখানে তিনি আছেন সেই হরিজন বস্তির নোংরা পরিবেশের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন :

"আমি ভেবে পাই না স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থার দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত সেই পৌর-প্রতিষ্ঠান ও সেই পি. ডব্লু. ডি. থাকতে এই স্থানটা এমন নোংরা কি করে থাকে। থাকব বলে এই স্থানটা আমি বেছে নিয়েছি ও এখানে আছি। তবুও যদি এই দুই সংস্থা স্থানটা স্বাস্থ্যোপযোগী করে না তোলে তবে আমার এই স্থানে থাকার সার্থকতা কোথায় ?"

"এই সবের প্রার্থনার সহিত সম্বন্ধ কি ? যে মনুষ্য বাহ্য পরিচ্ছন্নতার নিয়ম লঙ্ঘন করে আন্তর মলিনতা থেকে মুক্ত হবার প্রার্থনা করা তার সাজে না। অলস কৌতুহলবশে যদি আপনারা প্রার্থনায় যোগ দেন ত বলব আপনারা পাপ করছেন। প্রার্থনার টানে আসেন ত ভিতরে বাইরে পবিত্র হওয়ার নিমিত্তে প্রার্থনা করা চাই। বচন এক আর আচরণ আর এক এ ত কপটাচার। ভগবানকে ঠকানোর সাধ্য কারো নেই কেন না ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বত্র-বিদ্যমান।

"স্থানটা ধুলা-ময়লায়, আবর্জনায় ভরতি। আঁস্তাকুড় বলাও চলে। ডাঃ দিনশা মেহতা বলেছেন যে, পায়খানা এমন নোংরা যে তা ব্যবহার করা যায় না। স্থানটায় এত মাছি যে ডাঃ মেহতার সদা ভয় ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণে বুঝি বা আমি মরে যাব। এদিকে আমার নিজের কোন উদ্বেগ নেই। দুইজন ডাক্তার আমায় দেখাশোনা করেন। কিন্তু আমার ভরসা তাঁদের উপর নয়। আমার ভরসা একমাত্র ভগবান। আমার শরীরের ভাবনা ভাববেন ভগবান। কিন্তু আমার সহচরদের সেই নির্ভরতা নেই।" বোম্বাই, জুলাই ৬, ১৯৪৬

মহৌষধ

প্রার্থনার পরে গান্ধীজী বলেন :

"আমার কাশি সারছে না দেখে নানা স্থান থেকে বন্ধুরা উদ্বিগ্ন হয়ে পত্র লিখছেন, তার করছেন। আমার কথা যেমন তাঁদের কাছে পৌছায়, কাশিও তেমন পৌছায়। সন্ধ্যায় ও খোলা হাওয়ায় কাশি বেড়ে যায়। গত চার

দিন ততটা কষ্ট পাই নি। মনে হচ্ছে, শীঘ্র একদম সেরে যাবে। ওষুধ খাই নি বলে কাশি এখনও চলছে। ডাঃ সুশীলা বলে, পেনিসিলিন-বড়ি খেলে তিন দিনে সেরে যেত। খাই নি বলে তিন সপ্তাহ লাগবে। পেনিসিলিনের নিরাময় শক্তিতে আমার বিশ্বাস নেই তা নয়। কিন্তু এই কথাও মানি যে রামনাম-এর তুল্য সর্বরোগহর মহৌষধ আর কিছু নেই। আগুনের হলকায় চার দিক থেকে আজ আমি বেষ্টিত। তাই ভগবানে বিশ্বাস এখন আমার পক্ষে আরও অধিক আবশ্যক। এক ভগবানই এই আগুন নিবাতে পারেন। আমাকে দিয়ে কাজ করানোর থাকে ত আমায় তিনি রাখবেন, নয়ত নিয়ে নিবেন।

"একটু আগে যে ভজন আপনারা শুনেছেন তাতে কবি আমাদের রামনাম আঁকড়ে ধরে থাকতে বলেছেন। মানুষের একমাত্র আশ্রয় ভগবান। তাই ত এই বিপদের সময়ে ভগবানের হাতে নিজেকে আমি ষোল আনা সমর্পণ করতে চাচ্ছি। অতএব শারীরিক কষ্ট নিবারণের জন্য ডাক্তারের বড়ি আমি খাব না।"

নয়াদিল্লী, অক্টোবর ১৪, ১৯৪৭

পূর্ব দিন

২৯-১-১৯৪৮, এন. ডি.

প্রিয় কিশোরলাল,

প্রার্থনার পরেকার সময়টা আজ আমি নানা ব্যক্তিকে পত্র লিখে কাটাচ্ছি। শঙ্কর-ভাইয়ের মেয়ের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে ভাল করেছেন। তাঁকে আজ পত্র দিলাম। ওখানে (সেবাগ্রামে) যাচ্ছি ইহা সুনিশ্চিত। যদি বুঝি যে এখানকার কাজ (করব নয় মরব পণ) নিষ্পন্ন হয়েছে তবে এখানে থাকার প্রয়োজন হবে না। এখানকার সহকর্মী এই বিষয়ে কি মনে করেন তার উপর সব নির্ভর করছে। সম্ভবতঃ আগামী কাল নির্ণয় করা যাবে। যাব দুই উদ্দেশ্যে—এক বিভিন্ন গঠন সংস্থাগুলিকে একসূত্রে গাঁথার প্রচেষ্টা, আর—দুই, [illegible] বার্ষিক দিবস পালন। শরীরে বল আশানুরূপ ফিরে আসছে। মূত্রাশয় ও যকৃৎ দুইই এবার আক্রান্ত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, রামনামে বিশ্বাসের শৈথিল্যহেতু এমনটা হয়েছিল।

আপনারা উভয়ে আশীর্বাদ জানবেন।

—বাপু

[জ্ঞাতব্য: শ্রীশঙ্করণজী সেবাগ্রামের হিন্দুস্থানী তালীমী সঙ্ঘের অন্যতম শিক্ষক।]

"রাম! রাম!"

স্বেচ্ছাসেবক রক্ষিত গলি দিয়া গান্ধীজী প্রার্থনাসভায় যাইতেছিলেন। প্রার্থনায় যোগ দিতে আগত জনতার নমস্কারের প্রতিনমস্কার করার নিমিত্তে বালিকাদ্বয়ের কাঁধ হইতে গান্ধীজী হাত তুলিয়া লন। অকস্মাৎ এক জন লোক দক্ষিণের সারি গায়ের জোরে ভেদ করিয়া ঢুকিয়া পড়ে। গান্ধীজীর পাদস্পর্শ করিতে আসিতেছে ভাবিয়া—এখন এদিকে নয়, পথ ছাড়ুন, এমনিই ত বিলম্ব হয়ে গেছে—এরূপ কিছু বলিয়া বেচারী মনু গান্ধী প্রতিবাদ জানান এবং লোকটাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় তাহার হাত ধরেন। সে সজোরে ধাক্কা দিয়া মনুকে সরাইয়া দেয়। ধাক্কার ঝাঁকুনিতে মনুর হাত হইতে আশ্রম-ভজনাবলী, বাপুর পিকদান ও মালা ছিটকিয়া পড়িয়া যায়। বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলি তুলিবার জন্য মনু ঝুঁকিয়াছেন ত লোকটা বাপুর সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, যতটা ব্যবধান হইতে সোজা গুলি চালানো যায় তাহা অপেক্ষাও অধিক নিকটে। বস্তুতঃ এত নিকটে যে পিস্তল হইতে নির্গত একটা গুলি পরে বাপুর বস্ত্রের ভাঁজে আটকিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। সাত-ঘরা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল হইতে অতি দ্রুত তিনটা গুলি পরপর নিক্ষিপ্ত হয়। প্রথম গুলি বাপুর নাভির আড়াই ইঞ্চি উপরে ও মেরুদণ্ড হইতে সাড়ে তিন ইঞ্চি ব্যবধানে উদরের দক্ষিণ পাশে প্রবিষ্ট হয়; দ্বিতীয় গুলি মেরুদণ্ডের এক ইঞ্চি দক্ষিণে সপ্তম পাঁজরের অন্তর্বর্তী স্থান ভেদ করিয়া চলিয়া যায় আর তৃতীয় গুলি বোঁটার এক ইঞ্চি উপরে ও শিরদাঁড়ার চার ইঞ্চি দূরে বুকের ডানদিকে বিদ্ধ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় গুলি সরাসরি দেহ ভেদ করিয়া পিঠ চিরিয়া বাহির হইয়া যায়। তৃতীয় গুলি ফুসফুসে আটকিয়া থাকে। প্রথম গুলির পরে যে পা শূন্যে ছিল তাহা ভূমিতে নামিয়া আসে। দ্বিতীয় গুলি যখন চলে তখনও বাপু দুই পায়ে খাড়া, পরে দেহ লুটাইয়া পড়ে। অন্তিম শব্দ নিঃসৃত হয় তাঁর মুখ হইতে—'রাম রাম্'।

হরিজন, ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৯৪৮

আমার ধর্ম

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার ধর্ম

ধর্ম বলতে আমার কাছে আনুষ্ঠানিক ধর্ম বা প্রচলিত কোন ধর্মমত বোঝায় না। আমার কাছে ধর্মের অর্থ সকল ধর্মমতের সার, এগুলির ঘনীভূত তত্ত্ব-দর্শন। সকল ধর্মমতের অন্তর্নিহিত এই সত্য আমাদেরকে আমাদের স্রষ্টার মুখোমুখি নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়।

(জোসেফ ডোক লিখিত "এম. কে. গান্ধী", পৃষ্ঠা ৭)

আমাদের সমস্ত কার্যকলাপে ধর্ম পরিব্যাপ্ত থাকবে। এখানে ধর্ম বলতে কোন সম্প্রদায় বিশেষের আনুষ্ঠানিক আচার ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে না। ধর্মের অর্থ এই বিশ্বাস যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক নৈতিক শক্তি দ্বারা সুব্যবস্থিতভাবে সঞ্চালিত। এ শক্তি অদৃশ্য বলে কম সত্য নয়। এই ধর্ম হিন্দু ইসলাম ও খ্রীস্টান ইত্যাদি সকল ধর্মমতকে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বসঞ্চারী। তবে এ ধর্ম কোন ধর্মমতকেই নস্যাৎ করে না। আমার এই ধর্ম সকল ধর্মমতের মধ্যে সুসঙ্গতি স্থাপন করে, ওদের বাস্তবনিষ্ঠ করে তোলে।

(হরিজন, ১০-২-১৯৪০, পৃষ্ঠা ৪৪৫)

ধর্ম বলতে আমি কি বুঝি তা বুঝিয়ে বলছি। ধর্ম বলতে আমি হিন্দু ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করছি না, যদিও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে হিন্দু ধর্মকে আমি অন্যান্য যাবতীয় ধর্মমতের তুলনায় সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান জ্ঞান করি। আমার ধর্ম হিন্দুত্বের ঊর্ধ্বে, এ ধর্ম মানুষের মূলীভূত প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে এবং অন্তরাত্মার সত্যের সঙ্গে মানুষকে বন্ধনপূর্বক নিত্য তার শুদ্ধি সাধন করে। এ ধর্ম মানব-প্রকৃতির শাশ্বত অঙ্গ এবং সম্পূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য যে কোন মূল্য দিতে পরাঙ্মুখ হয় না। এই ধর্মের কারণ আত্মজ্ঞান না হওয়া অবধি স্রষ্টাকে না জানা পর্যন্ত, স্রষ্টা ও সৃষ্টির পারস্পরিক সম্বন্ধের স্বরূপ জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত আত্মা কিছুতেই শান্তি পায় না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৫-১৯২০, পৃষ্ঠা ২)

ধর্ম ছাড়া কোন মানুষ জীবিত থাকতে পারে না। যুক্তিগর্বস্ফীত অনেকে বলে থাকেন যে ধর্মের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্বন্ধ নেই। এ জাতীয় উক্তি সেই রকম যেন একজন বলছে যে সে নিশ্বাস নেয় বটে, কিন্তু তার নাক নেই। যুক্তি, সহজবৃত্তি বা সংস্কার—যে কোন দিক থেকেই হক না কেন, মানুষ ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্বীকার করে নেয়। কট্টর অজ্ঞাবাদী বা

নাস্তিকও নৈতিক আদর্শের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং এইসব আদর্শ পালন করা ভাল এবং না করা খারাপ বলে মনে করে। বিখ্যাত নাস্তিক ব্রাডল (Bradlaugh) অন্তরের নিগূঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করার উপর জোর দিতেন। এই ভাবে সত্য কথনের জন্য তাঁকে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি এতে আনন্দ পেতেন এবং বলতেন যে সত্য স্বয়ং নিজের পুরস্কার। সত্যাচরণের দ্বারা উপলব্ধ আনন্দের সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। আর এই আনন্দ মোটেই ঐহিক নয়; এর উৎস হচ্ছে ঐশ্বরিক। সেই জন্যই আমি বলেছি যে কোন মানুষ ধর্মের নিন্দা করলেও তার অস্তিত্ব কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ নয়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১-১৯৩০, পৃষ্ঠা ২৫)

নৈতিকতার প্রমুখ স্থান

যে ধর্ম যুক্তি অনুসারী নয় এবং যার সঙ্গে নৈতিকতার বিরোধ, সে রকম ধর্মকে আমি স্বীকার করি না। অনৈতিক না হলে অযৌক্তিক ধর্মীয় ভাবালুতা বরদাস্ত করতেও আমি রাজি। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৭-১৯২০, পৃষ্ঠা ৪)

নৈতিক আধারচ্যুত হলে আর আমরা ধর্মাশ্রয়ী থাকতে পারি না। ধর্ম নৈতিকতারও উর্ধ্বে উঠবে—এমন কখনও হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ মিথ্যাচারী নিষ্ঠুর এবং ব্যভিচারী মানুষ ঈশ্বরোপাসক হতে পারে না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-১১-১৯২১ পৃষ্ঠা, ৩৮৫)

যে ধর্ম বাস্তব সমস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেয় না এবং তার সমাধানে সহায়তা করে না, তা মোটেই ধর্ম পদবাচ্য নয়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-৫-১৯২৫, পৃষ্ঠা ১৬৪)

ধর্মাশ্রয়ী মানুষের প্রতিটি কাজের উৎস হচ্ছে তার ধর্ম। কারণ ধর্মের অর্থ ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্তি। এর অর্থ হল এই যে ভগবান মানুষের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্তা। (হরিজন, ২-৩-১৯৩৪, পৃষ্ঠা ২৩)

বাড়ীতে

আমার বাবা রাগী-প্রকৃতির হলেও নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত, সত্যনিষ্ঠ, সাহসী এবং উদার স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন।

তিনি খুব একটা ধর্মশাস্ত্রের চর্চা করেননি বটে; কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু যে ভাবে প্রায়ই মন্দিরে গিয়ে ধর্মালোচনা ইত্যাদি শুনে একটা মোটামুটি ধর্মীয়

সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হন, তিনিও তাঁদের মত ছিলেন। আমাদের পরিবারের এক ব্রাহ্মণ বন্ধুর প্রভাবে পড়ে জীবনের শেষ দিকে তিনি গীতাপাঠ শুরু করেন এবং রোজ পূজা করার সময় তিনি গীতার কয়েকটি শ্লোক উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতেন।

আমার মা আমার মনে ধর্মপরায়ণতার স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তিনি অত্যন্ত সাধ্বী ছিলেন। প্রত্যহ পূজা না করে খাবার কথা তাঁর কাছে অকল্পনীয় ছিল। হাবেলী অর্থাৎ বৈষ্ণব মন্দিরে যাওয়া তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। আমার জ্ঞানতঃ তাঁকে কোন বছর চাতুর্মাস* ব্রত থেকে বিরত থাকতে দেখিনি। তিনি কঠোরতম ব্রত গ্রহণ করে অবলীলাক্রমে তা পালন করতেন। অসুস্থতা কখনও এ ব্যাপারে শৈথিল্যের কারণ হয়নি। আমার মনে পড়ে যে চান্দ্রায়ণ** ব্রতের সময় তিনি একবার অসুখে পড়েছিলেন; কিন্তু তার জন্য ব্রতের নিয়ম পালনে কোন ইতর বিশেষ হয়নি। পর পর দুই তিনটি উপবাস করা তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। চাতুর্মাসের সময় এক বেলা খেয়ে থাকা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি একবার চাতুর্মাসের সময় একদিন অন্তর একদিন নির্জলা উপবাস করা শুরু করেন। আর এক চাতুর্মাসের সময় সূর্য না দেখলে খাবেন না বলে সঙ্কল্প করেন। আমরা, বাড়ীর ছেলেরা তখন সূর্য দেখে মাকে খবর দেবার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সকলেই জানেন যে ঘোর বর্ষাকালে সূর্যদেব কোন কোন দিন মুখই দেখান না। আমার মনে পড়ে এই রকম হঠাৎ কোন দিন সূর্য দেখতে পেলে আমরা ছুটে গিয়ে মাকে খবর দিতাম। নিজের চোখে সূর্য দর্শন করার জন্য তিনি হয়ত দ্রুতপদে বাইরে এসে দেখেন যে চঞ্চল সূর্য আবার আত্মগোপন করেছে। সুতরাং সে দিনকার মত তাঁর খাওয়ার পাট মুলতবী থাকত। তিনি কিন্তু প্রসন্নভাবেই বলতেন, "তাতে কি হয়েছে? ভগবানের ইচ্ছা নয় যে আজ আমি খাই।" এরপর তিনি তাঁর সংসারের নিত্যকার কর্মে ফিরে যেতেন।

(আত্মকথা, ১৯৪৮ [সং], পৃষ্ঠা ১২-১৩)

বিদ্যালয়ে

ছয় বা সাত বছর বয়স থেকে ষোল বছর পর্যন্ত আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম এবং এই কয় বৎসরে ধর্ম ছাড়া এক রকম আর সব বিষয়ই আমাকে

* চাতুর্মাসের অর্থ বর্ষার চারমাস একরকম উপবাস করে কাটানো।

** এই ব্রতে চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি অনুযায়ী আহারের পরিমাণ কম বেশী করা হয়।

পড়ান হয়েছিল। আমাকে বলতেই হবে যে বিনা আয়াসে শিক্ষকেরা আমাকে যা দিতে পারতেন, তা দেননি। তা সত্ত্বেও আমার চতুর্দিকের পরিবেশ থেকে আমি ইতস্ততঃ যা পেয়েছি, গ্রহণ করেছি। 'ধর্ম' শব্দটি এখানে আমি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি। এখানে ধর্ম বলতে আমার উদ্দেশ্য আত্মোপলব্ধি বা নিজেকে জানা।

জাতে বৈষ্ণব হবার জন্য মাঝে মাঝে আমাকে হাবেলীতে যেতে হত। তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ইচ্ছা কখনও আমার মনে জাগেনি। হাবেলীর জাঁক-জমক আঁমার ভাল লাগত না। তা ছাড়া হাবেলীর সঙ্গে নানা রকম অনাচার জড়িয়ে আছে বলে আমি লোকপরম্পরায় শুনতাম এবং তাই ওর প্রতি আকর্ষণ ছিল না। সুতরাং হাবেলী থেকে আমি কিছুই পেলাম না।

কিন্তু হাবেলীর লোকসান পুষিয়ে দিল আমার ধাই-মা। আমাদের বাড়ীর এই পুরাতন পরিচারিকাটির স্নেহের কথা আজও আমার মনে পড়ে। ছেলেবেলা থেকেই আমি ভূত-প্রেতকে ভীষণ ভয় করতাম। আমার ধাই-মা রম্ভা এই ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটা উপায় বলে দিল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, কেবল রামনাম জপ করা। রম্ভার নিদানের চেয়ে তার উপরই আমার বিশ্বাস ছিল বেশী। সুতরাং সেই শিশুকালেই ভূত-প্রেতের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি রামনাম জপ করতাম। এ ব্যাপার অবশ্য বেশী দিন চলেনি; কিন্তু শৈশবে যে ভাল বীজ বপন করা হয়, তা বৃথা যায়নি। আমার মনে হয় সেই মহীয়সী মহিলা রম্ভা আমার মনে যে বীজ বপন করেছিল, তার জন্য রামনাম আজ আমার কাছে এক অব্যর্থ নিদান।

অবশ্য বাবার কাছে বসে যে রামায়ণ পাঠ করতাম তার প্রভাব আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে বসে যায়। অসুস্থ হয়ে বাবা একবার পোরবন্দরে ছিলেন। সেখানে নিত্য সন্ধ্যায় তিনি রামায়ণ শুনতেন। সুকণ্ঠ কথক মহাশয় রামচন্দ্রের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি দোঁহা এবং চৌপাই গেয়ে তার ব্যাখ্যা করার সময় একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকেও সঙ্গে সঙ্গে মাতিয়ে তুলতেন। আমার বয়স তখন বছর তের ছিল; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ে যে ঐ বয়সেই আমি রামায়ণ পাঠ শোনার সময় মহানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। এইভাবে রামায়ণের প্রতি আমার গভীর আকর্ষণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আজ আমি তুলসী রামায়ণকে জগতের শ্রেষ্ঠতম ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ বলে বিবেচনা করি।

এর কয়েক মাস পরে আমরা রাজকোটে এলাম। এখানে অবশ্য রামায়ণ পাঠ হত না। কিন্তু প্রত্যেক একাদশীতে ভাগবত পাঠ হত। কখনও কখনও আমি পাঠ শুনতে যেতাম। তবে কথক মহাশয়ের পাঠভঙ্গী আমার মনে উদ্দীপনা জাগাতে পারেনি। আজ কিন্তু আমি জানি যে ভাগবতের ভিতর ধর্মীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমি গুজরাতী ভাগবত পড়েছি। তবে একুশ দিনের উপবাসের সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কণ্ঠে মূল ভাগবতের অংশবিশেষের আবৃত্তি শুনে মনে হয়েছিল যে হায়, ছেলেবেলায় যদি মালব্যজীর মত কোন ভক্তের কণ্ঠে ভাগবতের আবৃত্তি শুনতে পেতাম তাহলে তখন থেকেই আমার মনে ভাগবতের প্রতি আকর্ষণ জন্মাত। শৈশবে যা শোনা যায় তার প্রভাব মনে গভীরভাবে দাগ কেটে বসে যায়। তাই চিরকালই আমার আপসোস রয়ে গেছে যে ছেলেবেলায় এই জাতীয় সদ্‌গ্রন্থ পাঠ শোনার বিশেষ সুযোগ আমি পাইনি।

তবে রাজকোটে আমি হিন্দুধর্মের সকল শাখা এবং অন্যান্য সম্বন্ধিত ধর্মের প্রতি সহনশীলতার মনোবৃত্তি গড়ে তোলার প্রথম পাঠ পাই। কারণ আমার মা-বাবা বৈষ্ণব হাবেলীতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিব ও রামের মন্দিরেও যেতেন এবং আমাদের মত বাড়ীর ছেলেপিলেদেরও সেখানে পাঠাতেন। আর জৈন সাধুরাও প্রায় বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং এমন কি প্রচলিত প্রথার ব্যত্যয় করে আমাদের মত জৈন সমাজ বহির্ভূত লোকেদের বাড়ীতে আহার গ্রহণ করতেন। বাবার সঙ্গে তাঁরা ইহলোক সম্বন্ধীয় নানারকম আলোচনাও করতেন।

এ ছাড়া বাবার মুসলমান এবং পার্শী বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে নিজেদের ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করতেন ও বাবা সর্বদাই শ্রদ্ধাসহকারে এবং এমন কি আগ্রহপূর্বক তাঁদের ধর্মের কথা শুনতেন। আমি বাবার সেবা করতাম বলে অনেক সময় ঐ সব আলোচনা শুনবার সুযোগ হত। এই সব কারণে আমার ভিতর সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

খ্রীস্টীয় ধর্ম সম্বন্ধেই সে সময় একমাত্র ব্যতিক্রম হয়। ঐ ধর্মের প্রতি আমার মনে কেমন একটা বিরূপতার ভাব গড়ে ওঠে। এর একটা কারণও অবশ্য ছিল। খ্রীস্টান পাদ্রীরা সে যুগে হাই স্কুলের কাছে রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে হিন্দু ও হিন্দুর দেব-দেবীর প্রতি যত রকম সম্ভব কটুকাটব্য করতেন। আমি এটা সহ্য করতে পারতাম না। তাঁদের ঐ সব কথা আমি অবশ্য একবারই

দাঁড়িয়ে থেকে শুনেছিলাম ; তবে দ্বিতীয় বার ঐসব কথা শুনতে না যাবার পক্ষে ঐ একবারের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। ঐ সময় জনৈক বিশিষ্ট হিন্দু খ্রীস্টান হয়ে গেছেন বলে খবর পাওয়া গেল। শহরের সর্বত্র এই কথার আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠল যে ধর্মান্তর করণের সময় তাঁকে গোমাংস ও মদ্য গ্রহণ করতে হয় এবং খ্রীস্টান হবার পর তিনি দেশী পোশাক বর্জন করে হ্যাট ও অন্যান্য ইউরোপীয় পরিচ্ছদে শোভিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সব ব্যাপারে আমার মনে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। আমার মনে হল যে, যে ধর্ম মানুষকে গোমাংস খেতে ও মদ্য পান করতে বাধ্য করে এবং যে ধর্মের কারণ স্বজাতীয় পোশাক বর্জন করতে হয়, তা মোটেই ধর্ম আখ্যার যোগ্য নয়। আমি এও শুনতে পেলাম যে ধর্মান্তরিত ভদ্রলোকটি ইতিমধ্যে তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্ম আচার ব্যবহার ও দেশের নিন্দা করা শুরু করেছেন। এই সব কারণে আমার মনে খ্রীস্টীয় ধর্মের প্রতি বিরূপতা জন্মে।

তবে অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি সহনশীল হবার শিক্ষা পাচ্ছিলাম বলার অর্থ এই নয় যে আমার ভিতর জলন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছিল।

অবশ্য আমার মধ্যে একটা বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছিল। আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল যে, সব কিছুর মূলে রয়েছে নৈতিকতা আর নৈতিকতার আধার হচ্ছে সত্য। সুতরাং সত্য আমার এক মাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠল। আমার ভিতর নিত্য প্রতি দিন সত্যের স্বরূপ বিকশিত হতে লাগল এবং সত্যের সংজ্ঞার্থের পরিধিও আমি ক্রমশঃ বাড়িয়ে চললাম।

এই ভাবে একটি গুজরাতী নীতিমূলক কবিতা আমার হৃদয় মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এর শিক্ষা—ভাল দিয়ে মন্দের প্রতিকার কর—আমার ধ্রুবতারার মত হয়ে উঠল। কবিতাটি আমাকে এমন ভাবে পেয়ে বসল যে আমি এর বক্তব্য নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিলাম। নীচে সেই অতীব চমৎকার (আমার পক্ষে) পঙ্‌ক্তিগুলি উদ্ধৃত করছি :

যে তোমারে দিয়াছে তৃষ্ণার জল।
ক্ষুধা তার নিবারিতে দাও মিষ্টফল॥
সস্নেহ বচনে তোমা সম্ভাষে যে জন।
তাঁহারে প্রণতি কর দিয়া প্রাণ-মন॥
যে দিল তোমারে শুধু কানা এক কড়ি।
দাও তার দুই হাত স্বর্ণ দিয়া ভরি॥

তোমার জীবন যদি করে কেউ ত্রাণ।
তুমি কি বধিতে পার আর কারও প্রাণ ?
সুবিজ্ঞ জনের সদা এই তো বিচার।
সামান্য সেবারে দেয় বহু পুরস্কার ॥
যথার্থ পুণ্যাত্মা ঠিক জানে এই কথা।
মানুষে মানুষে নাই কোন বিষমতা ॥
অতএব সাধুজন প্রসন্ন অন্তরে।
অন্যায়ের বিনিময়ে সদাচার করে ॥

বিলাতের ছাত্রজীবনে

বিলাতে ছাত্রজীবনের দ্বিতীয় বর্ষের শেষের দিকে আমার সঙ্গে দু'জন থিয়সফিস্টের পরিচয় হয়। এঁরা ছিলেন দুই ভাই এবং উভয়েই অকৃতদার। তাঁরা আমাকে গীতার কথা বললেন। তাঁরা তখন স্যার এডুইন আর্নল্ড কৃত গীতার অনুবাদ "দি সঙ সেলেস্‌সিয়াল" পড়ছিলেন। আমাকে তাঁদের সঙ্গে এর মূল পড়ার জন্য তাঁরা আমন্ত্রণ জানালেন। প্রস্তাব শুনে আমার খুব লজ্জা হল। কারণ তখন পর্যন্ত আমি সেই স্বর্গীয় কাব্য সংস্কৃত বা গুজরাতী কোন ভাষাতেই পড়িনি। আমি তাঁদের কাছে সসঙ্কোচে নিবেদন করলাম যে যদিও আমি তখনও পর্যন্ত গীতা পড়িনি, তবু তাঁদের সঙ্গে গীতা পাঠ করতে সানন্দে সম্মত আছি এবং এও বললাম যে সংস্কৃতে আমার জ্ঞান অগভীর হওয়া সত্ত্বেও অনুবাদে কোথাও যদি যথাযথভাবে ভাব প্রকাশ না হয়ে থাকে তাহলে আমি চেষ্টা করে মূল থেকে সঠিক অর্থ বার করতে পারব। এইভাবে তাঁদের সঙ্গে গীতাপাঠ শুরু হল। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে :

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

ঐ শ্লোক দুইটির প্রভাব আমার মনে গভীরভাবে পড়ল এবং আজও যেন শ্লোক দুটি আমার কর্ণকুহরে গুঞ্জন করছে। তখনই গীতাকে আমার অমূল্য সম্পদ বলে মনে হল। আর এই ধারণা প্রতি নিয়ত বৃদ্ধি পেতে পেতে আজ আমার মনের অবস্থা এই যে গীতাকে আমি সত্যোপলব্ধির শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থরূপে

বিবেচনা করি। আমার দুঃখ-বিষাদের সময় এর উপদেশ সীমাহীন সাহায্য দিয়েছে।

পূর্বোক্ত ভদ্রলোকদ্বয় আমাকে স্যার এডুইন আর্নল্ড কৃত "দি লাইট অফ এসিয়া" পড়ার পরামর্শ দিলেন। স্যার এডুইনকে এ যাবৎ আমি কেবল "দি সঙ সেলেস্‌সিয়ালে"র লেখক বলেই জানতাম। যাই হক, ভগবদ্গীতার চেয়েও বেশী আগ্রহ নিয়ে আমি বইখানি পড়লাম এবং শুরু করে শেষ না হওয়া পর্যন্ত বইটি রেখে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ওঁদেরই আগ্রহে আমি মাদাম ব্লাভটস্কির "কি টু থিওসফি"ও পড়ি। এই পুস্তকটি পাঠ করার পর আমার মনে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আরও অধ্যয়ন করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় ও আমার মন থেকে দেশের খ্রীস্টান পাদ্রীদের দ্বারা সৃষ্ট সেই ধারণা অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, বিদূরিত হয়।

এই সময় একটি নিরামিষাশীদের বোর্ডিং ঘরে আমার সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আগত জনৈক সৎ খ্রীস্টানের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি আমার সঙ্গে খ্রীস্টীয় ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। আমি তাঁকে আমার রাজকোটের অভিজ্ঞতার কথা বললাম। সেই সব ঘটনার কথা শুনে তিনি হৃদয়ে বেদনা বোধ করতেন। তিনি বললেন, "আমি নিরামিষাশী এবং মদ্যপান করি না। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে অনেক খ্রীস্টানই মাংসাহারী ও মদ্যপ। কিন্তু তা বলে আমাদের ধর্মগ্রন্থ এর কোনটিরই সমর্থন করে না। আপনি বাইবেল পড়ে দেখুন।" আমি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলাম এবং তিনি আমাকে একখণ্ড বাইবেল এনে দিলেন।

বাইবেলের বুক অফ জেনেসিস আমি পড়ে ফেললাম এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলি পড়তে পড়তে ঘুম পাওয়ার যোগাড় হল। সম্পূর্ণ বাইবেল পড়েছি—একথা বলার জন্য কষ্টে-সৃষ্টে অপরাপর অধ্যায়গুলি পড়লাম। এই অংশগুলি পড়তে খুব ভালও লাগেনি আর বুঝতেও পারিনি। বুক অফ নাম্বারস পড়তে তো আমার আগ্রহই হত না।

কিন্তু নিউ টেস্টামেন্ট পড়ার সময় এক ভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতা লাভ করলাম এবং বিশেষ করে 'সারমন অন দি মাউন্ট' তো সোজা গিয়ে আমার হৃদয়ে গেঁথে গেল। আমি গীতার সঙ্গে এর তুলনা করলাম। সারমন অন দি মাউন্টে আছে, "আমি তোমাকে বলছি যে তুমি অন্যায়েরও প্রতিরোধ করবে না ; যে তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করবে, তার দিকে বাম গণ্ড এগিয়ে

দেবে। আর কেউ যদি তোমার জামাটি নিয়ে যায়, তাহলে তাকে কোটটিও দিয়ে দেবে।" সারমন অন দি মাউণ্টের এই উপদেশ আমার মনে অতুলনীয় আনন্দের সঞ্চার করল এবং এগুলি পড়ার সময় শ্যামল ভট্টের "যে তোমারে দিয়াছে তৃষ্ণার জল" ইত্যাদি মনে পড়ে গেল। আমার তরুণ মন গীতা, দি লাইট অফ এসিয়া এবং সারমন অন দি মাউণ্টের উপদেশের মধ্যে একটা সমন্বয় খুঁজে বেড়াতে লাগল। আর ত্যাগই যে সেরা ধর্ম—এই বিশ্বাস আমার মনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করল।

এইসব গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে অন্যান্য ধর্মগুরুদের জীবন-কথা পাঠ করার আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। জনৈক মিত্র কার্লাইলের "হিরোজ এণ্ড হিরো ওয়ার্শিপ" পড়তে বললেন। এর একটি অধ্যায়ে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের বীরত্বের আলোচনা ছিল। সেটি পাঠ করে আমি তাঁর মহত্ত্ব, বীরত্ব এবং অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে পারলাম।

সে সময় ধর্মের সঙ্গে এর চেয়ে বেশী পরিচয় হয়নি। কারণ পরীক্ষার পড়া সামলাবার পর বাইরের বই পড়ার খুব বেশী সময় পাওয়া যেত না। তবে মনে মনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে আরও ধর্মগ্রন্থ পড়তে হবে এবং প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলির সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানার্জন করতে হবে।

কিন্তু নাস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে মোটামুটি জানাবার উপায় কি? সে সময় প্রত্যেকটি শিক্ষিত ভারতবাসী ব্রাডল ও তাঁর তথাকথিত নাস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে জানতেন। এ বিষয়ে আমি কয়েকটি বই পড়েছিলাম; কিন্তু সেগুলির নাম এখন ভুলে গেছি। তবে আমার মনে সে সবের কোন প্রভাব হয়নি। কারণ ইতিপূর্বেই আমি নাস্তিক্যবাদের সাহারা মরু অতিক্রম করে ফেলেছি।

(আত্মকথা, ১৯৪৮ [সং], পৃষ্ঠা ৯০-৯৩)

রায়চাঁদভাই

রায়চাঁদভাই হাজার হাজার টাকার কারবার করতেন। তিনি ছিলেন মণি-মুক্তার জহুরী। ব্যবসার কোন জটিল সমস্যা তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। কারণ ওসব বিষয় তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল না। রায়চাঁদভাই-এর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার। তাঁর গদিতে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একাধিক ধর্মগ্রন্থ এবং তাঁর রোজনামচার খাতাখানি থাকত। ব্যবসার কাজকর্ম শেষ হওয়া মাত্র তিনি কোন ধর্মপুস্তক অথবা

দিনলিপির খাতাখানি খুলে বসতেন। তাঁর যেসব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই ঐ রোজনামচার খাতা থেকে সঙ্কলিত। যে মানুষ হাজার হাজার টাকার ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্ম বিদ্যার গুহ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে লিখতে শুরু করতেন, তাঁকে কিছুতেই ব্যবসায়ী বলা যায় না। তিনি একজন যথার্থ সত্য-সাধক। আর একবার দুবার নয়, প্রায়ই আমি তাঁকে ব্যবসার কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে পারলৌকিক বিষয় নিয়ে মগ্ন থাকতে দেখেছি। তিনি মনের ভারসাম্য হারিয়েছেন—এমন কখনও আমার চোখে পড়েনি। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যবসা বা অন্য কোন রকমের স্বার্থ-সম্বন্ধ না থাকলেও আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। তখন আমি একজন পসারহীন ব্যারিস্টার; কিন্তু তবু যখনই দেখা হয়েছে তিনি আমার সঙ্গে গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করার জন্য সময় দিয়েছেন। আমার অবস্থা তখন অন্ধকারে পথ হাতড়ানোর মত এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে গুরুতর আলোচনা করার উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতিও তখন নেই। তবু তাঁর কথাবার্তা আমার অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হত। তারপর বহু ধর্মীয় পুরুষ ও সাধু-সন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, অনেক ধর্মগুরুর সঙ্গেও দেখা করেছি। কিন্তু এঁরা কেউই আমার মনে রায়চাঁদভাই-এর মত প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হননি। তাঁর কথা যেন একেবারে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করত। নৈতিক স্থৈর্যের মত তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও আমার মনে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করত আর আমার হৃদয়ের গহন কন্দরে এই বিশ্বাস ছিল যে জ্ঞাতসারে তিনি কখনও আমাকে বিপথগামী করবেন না আর তিনি আমাকে তাঁর চিন্তারাজ্যের গূঢ়তম তত্ত্বের ভাগ দেবেন। তাই আমার জীবনের আধ্যাত্মিক সঙ্কটকালে তিনিই আমার সহায় ছিলেন।

তবে তাঁর প্রতি এত শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কোনদিন আমি হৃদয়ে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করে নিতে পারিনি। আমার গুরুর আসন শূন্যই রয়েছে এবং সেই স্থান পূরণের সন্ধান আজও চলেছে।

আধুনিক জগতের তিন জন সমসাময়িক ব্যক্তি ও তাঁদের রচনা আমার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এঁরা হচ্ছেন রায়চাঁদভাই-এর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ; "দি কিংডম অফ্ গড ইজ উইদিন ইউ" নামক পুস্তক দ্বারা টলস্টয়; এবং "আনটু দিস্ লাস্ট"-এর রচয়িতা রাস্কিন।

(আত্মকথা, ১৯৪৮ [সং] পৃষ্ঠা ১১২-১৪

দক্ষিণ আফ্রিকায়

শ্রীযুক্ত বেকার আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করছিলেন। তিনি আমাকে ওয়েলিংটন সম্মেলনে নিয়ে গেলেন। প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীস্টানরা দুই চার বৎসর অন্তর ধর্মের আলো পাবার জন্য বা এক কথায় বলতে গেলে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে এই জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে থাকেন। একে ধর্মীয় পুরুরভ্যুদয়ও বলা যেতে পারে। ওয়েলিংটনে এই রকমের একটি সম্মেলন হচ্ছিল। শ্রীযুক্ত বেকার আশা করেছিলেন যে সম্মেলনের ধর্ম সংস্থানের পরিবেশ এবং প্রতিনিধিদের উদ্দীপনা ও আগ্রহ আমাকে শেষ অবধি খ্রীস্টান করার দিকে নিয়ে যাবে।

সম্মেলনে নিষ্ঠাবান খ্রীস্টানদের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে আমি আনন্দ বোধ করতাম। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে অনেকে আমার জন্য প্রার্থনাও করতেন। কয়েকটি প্রার্থনামন্ত্র খুবই মধুর হওয়ায় আমার বড় ভাল লাগত।

সম্মেলন তিন দিন ধরে চলেছিল। প্রতিনিধিদের ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে আমার তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা হত। তবে এর জন্য আমার নিজের বিশ্বাস বা ধর্মমতের পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজনীয়তা মনে দেখা দেয়নি। কেবল খ্রীস্টান হলেই আমি স্বর্গে যাব বা মুক্তি পাব—এইরকমই বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। উপস্থিত কয়েকজন সৎ খ্রীস্টান বন্ধুকে এ কথা খুলে বলায় তাঁরা অত্যন্ত আঘাত পেলেন। কিন্তু আমার সামনে উপায়ান্তর ছিল না।

আমার অসুবিধার মূল ছিল আরও গভীরে। যীশুই ঈশ্বরের একমাত্র অবতার এবং যাঁরা তাঁর অনুগত তাঁরাই কেবল শাশ্বত জীবনের অধিকারী হবে—একথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হল। ভগবানের যদি সন্তান থাকে, তাহলে আমরা সকলেই তাঁর সন্তান। যীশু যদি ঈশ্বরের মত বা স্বয়ং ঈশ্বর হন, তাহলে সকল মানবই ঈশ্বরবৎ ও ঈশ্বরের প্রতিরূপ হতে পারেন। যীশু তাঁর মৃত্যু ও রক্তমোক্ষণের দ্বারা পৃথিবীর সর্ববিধ পাপ মোচন করেছেন—এ কথা অক্ষরশঃ মেনে নিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। খ্রীস্টানদের পূর্বোক্ত বিশ্বাস রূপক হিসাবে অংশতঃ সত্য হতে পারে। এছাড়া খ্রীস্টধর্ম অনুসারে একমাত্র মানুষেরই আত্মা আছে এবং অন্যান্য জীবিত প্রাণী আত্মাবিহীন ও তাই তাদের মৃত্যুর অর্থ চির অবলুপ্তি। আমি কিন্তু এর বিপরীত কথাই বিশ্বাস

করতাম। যীশুকে আমি মহৎ আদর্শের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ একজন মহাত্মা, আত্মত্যাগের আকর ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসাবে স্বীকার করলেও শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মানবরূপে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ জগতের পক্ষে আদর্শস্থানীয় বিবেচনা করলেও এর মধ্যে রহস্যজনক বা অলৌকিক কোন বৈশিষ্ট্য আছে—একথা স্বীকার করতে আমার মন চাইত না। সৎ খ্রীস্টানদের জীবনযাত্রা থেকে আমি এমন কিছু নূতন জিনিস পাইনি যা অন্যান্য ধর্মের সাধু-সন্তদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যান্য ধর্মের অনুগামীদের ভিতরও খ্রীস্টানদের মত নবজাগরণ আমি দেখেছি। দর্শন বিচারেও খ্রীস্টান ধর্মের ভিতর অসাধারণ কোন কিছু পাইনি। আর কৃচ্ছ্রতা বরণের দিক থেকে মনে হয়েছে যে হিন্দুরা খ্রীস্টানদের ছাড়িয়ে যান। সুতরাং খ্রীস্টধর্মকে আমার শুদ্ধতম বা শ্রেষ্ঠতম ধর্মরূপে স্বীকার করে নেওয়া অসম্ভব মনে হল।

আমার ভিতর এই যে হৃদয় মন্থন চলছিল, খ্রীস্টান বন্ধুদের পেলে তাঁদের সঙ্গেও এর আলোচনা করতাম। কিন্তু তাঁদের উত্তর আমাকে পূর্ণ মাত্রায় সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

আমি তাই খ্রীস্টধর্মকে শুদ্ধতম বা শ্রেষ্ঠতম ধর্মরূপে মেনে নিতে পারলাম না। অবশ্য হিন্দু ধর্ম যে পূর্বোক্ত উভয় প্রকারের গুণবিশিষ্ট—এরকম বিশ্বাসও তখন আমার মনে ছিল না। হিন্দুধর্মের ত্রুটী-বিচ্যুতি তো ভীষণভাবে আমার চোখে পড়ত। অস্পৃশ্যতা যদি হিন্দুধর্মের অঙ্গ হয় তবে নিঃসন্দেহে সে অঙ্গ গলিত, দূষিত অথবা অনাবশ্যক মাংসপিণ্ডস্বরূপ। হিন্দুদের ভিতর যে শতবিধ জাতি ও সম্প্রদায় বিদ্যমান, আমি তার অস্তিত্বের কোন কারণ খুঁজে পেতাম না। আর বেদকে ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী বলারই বা অর্থ কি? এ দাবী যদি সত্য বলে মেনে নিতে হয় তাহলে বাইবেল ও কোরানকে ঈশ্বরের বাণী বলে মানব না কেন?

খ্রীস্টানদের মত মুসলমান বন্ধুরাও আমাকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছিলেন। আবদুল্লা শেঠ আমাকে বরাবরই ইসলাম সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার জন্য অনুপ্রেরণা দিতেন এবং এই ধর্মের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সর্বদাই কিছু না কিছু বলতেন।

আমার অসুবিধার কথা রায়চাঁদভাইকে একটি চিঠিতে লিখে জানালাম। ভারতবর্ষে স্থিত অপরাপর ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকেও এ সম্বন্ধে লিখলাম এবং তাঁরা জবাবও দিলেন। রায়চাঁদভাই-এর চিঠিতে খানিকটা শান্তি পেলাম। তিনি আমাকে ধৈর্যশীল হয়ে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করার

পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পত্রে নিম্নোক্ত মর্মে একটি বাক্য ছিল, "নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করার পর আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অপর কোন ধর্মমতেরই হিন্দু ধর্মের মত সূক্ষ্ম ও গভীর মননশীলতা ও আত্মা সম্বন্ধে এমন বিচক্ষণ দৃষ্টি অথবা ঔদার্য নেই।"

আমার খ্রীস্টান বন্ধুদের ইচ্ছার প্রতিকূল পন্থা গ্রহণ করলেও তাঁরা আমার মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের যে ইচ্ছা জাগ্রত করেছিলেন, তার জন্য আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তাঁদের সাহচর্যের স্মৃতি চিরকাল আমার মনে থাকবে।

(আত্মকথা, ১৯৪৮ [সং], পৃষ্ঠা ১৬৯-৭২

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি গিয়েছিলাম বেড়াতে, উদরান্নের সংস্থান করতে এবং কাথিয়াওয়াড়ের ঘোরপ্যাচের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সেখানে গিয়ে আমি ঈশ্বরানুসন্ধান ও আত্মোপলব্ধির প্রয়াসে মেতে উঠলাম।

খ্রীস্টান বন্ধুরা আমার ভিতর জ্ঞানতৃষ্ণা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং এই পিপাসা একরকম অবিতৃপ্ত হয়ে উঠল আর আমি ঔদাসীন্য প্রকাশ করলেও তাঁরা আমাকে রেহাই দিতেন না।

ধর্মের নানা বিষয় নিয়ে আমার নানা জায়গায় পত্র লেখার পর্ব অব্যাহত রইল। রায়চাঁদভাই আমার পথপ্রদর্শনের কাজ চালিয়ে গেলেন। ম্যাক্স-মূলারের "ইণ্ডিয়া—হোয়াট ক্যান ইট টিচ আস?" বইটি আমি সাগ্রহে পাঠ করলাম। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি প্রকাশিত উপনিষদের অনুবাদও অধ্যয়ন করলাম। এ সব গ্রন্থ হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দিল এবং এই ধর্মের সৌন্দর্য ক্রমশঃ আমার কাছে ধরা পড়তে লাগল। তবে এর জন্য অন্যান্য ধর্মমতের বিরুদ্ধ মনোভাব আমার মধ্যে গড়ে ওঠেনি। ওয়াশিংটন আরউইং লিখিত "লাইফ অফ মহম্মদ এণ্ড হিজ সাকসেসরস্" এবং কার্লাইল রচিত পয়গম্বর প্রশস্তি পাঠ করলাম। এ ছাড়া "জোরাথুস্ত্র বাণী" নামক একটি গ্রন্থও অধ্যয়ন করলাম।

এইভাবে আমি বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানার্জন করতে লাগলাম। এই সব অধ্যয়নের ফলে আমার ভিতর আত্মবিশ্লেষণ বৃত্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং পঠিত গ্রন্থগুলির যে সব কথা ভাল লাগত, তদনুযায়ী আচরণ করার অভ্যাসও পুষ্ট হল। হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করে যোগবিদ্যা ও প্রাণায়াম সম্বন্ধে যতটুকু বুঝতাম,

তার অনুশীলন করা এই ভাবে আরম্ভ করলাম। তবে যোগাভ্যাস নিয়ে খুব বেশী অগ্রসর হতে পারলাম না এবং তাই স্থির করলাম যে ভারতবর্ষে ফিরে গেলে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে আবার এ শুরু করব। কিন্তু আমার এ ইচ্ছা কোন দিনই পূর্ণ হয়নি।

এ ছাড়া আমি টলস্টয়ের গ্রন্থাবলীরও পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করলাম। "দি গসপেল ইন ব্রিফ", "হোয়াট টু ডু" এবং এই জাতীয় অন্যান্য পুস্তক আমার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করল। বিশ্বজনীন প্রেমশক্তির অমিত সম্ভাবনার কথা ক্রমশঃ আমি অধিকাধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে লাগলাম।

(আত্মকথা, ১৯৪৮ [সং], পৃষ্ঠা ১৯৭-৯৮)

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন খ্রীস্টান বন্ধুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলাম, ধর্ম সম্বন্ধে আমি তখন নিছক শিক্ষানবীশ ছাড়া আর কিছু নই। খ্রীস্টান বন্ধুরা আমাকে যীশুর বাণী বোঝাবার জন্য এবং তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করাবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন। আমি কিন্তু কেবল একজন বিনম্র ও শ্রদ্ধাশীল শ্রোতা ছিলাম ও খোলা মনে সব কিছু শুনতাম। সে সময় স্বভাবতই আমি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যথাসাধ্য অধ্যয়ন করতাম এবং অন্যান্য ধর্মমত বোঝারও প্রযত্ন করতাম।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে অবস্থাটা একটু বদলে গেল। থিয়সফিস্ট বন্ধুরা নিঃসন্দেহেই আমাকে তাঁদের সমাজে টানার চেষ্টা করতেন, তবে তার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু হিসাবে আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়া। থিয়সফিস্ট গ্রন্থাবলীতে হিন্দুধর্মের যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং তাই থিয়সফিস্ট বন্ধুরা চাইতেন যে ঐ সব বিষয় বোঝার ব্যাপারে আমি তাঁদের সাহায্য করি। আমি তাঁদের বুঝিয়ে বললাম যে আমার সংস্কৃত জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, আমি মূল হিন্দু শাস্ত্রগুলি পড়ি নি এবং এর যে অনুবাদ পড়েছি তার জ্ঞানও উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁরা কিন্তু জন্মগত সংস্কার ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন বলে ধরে নিয়েছিলেন যে আমি তাঁদের কিছু না কিছু সাহায্য করতে পারব। সুতরাং আমি বাঁশ বনের শিয়াল রাজা হয়ে পড়লাম। এঁদের মধ্যে জন কয়েকের সঙ্গে বসে আমি স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ এবং অপর কয়েক জনের সঙ্গে ম. ন. দ্বিবেদীর রাজযোগ পড়া আরম্ভ করলাম। একজনের সঙ্গে আমাকে পতঞ্জলির যোগসূত্র পড়তে হল এবং কয়েক জনের সঙ্গে গীতা পাঠও চলল। আমরা প্রায় একটা তত্ত্বান্বেষী সমিতি গড়ে তুললাম এবং সেখানে নিয়মিত অধ্যয়ন চলতে লাগল। গীতার উপর আমি পূর্ব হতেই আস্থাশীল ছিলাম ও আমার কাছে এর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। এবার

আমি এর আরও গভীরে অনুপ্রবেশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলাম। দুই একটি অনুবাদের মারফৎ আমি মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতাম। এ ছাড়া এবার থেকে রোজ দুটি একটি করে শ্লোক মুখস্ত করার সিদ্ধান্ত করলাম। এর জন্য সকালের স্নানের সময় প্রশস্ত হবে মনে হল। মুখ ধোয়া ও স্নান-এর জন্য যথাক্রমে পনের ও কুড়ি মিনিট অর্থাৎ মোট পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় লাগত। দাঁত মাজতাম আমি সাহেবদের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সুতরাং দাঁত মাজার জায়গার সামনের দেওয়ালে আমি গীতার শ্লোক লিখে আটকিয়ে দিলাম এবং প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে ঐ লেখা দেখে নিয়ে গীতার শ্লোক মুখস্ত করা আরম্ভ করে দিলাম। রোজ নূতন শ্লোক মুখস্ত করা ও পুরাতন শ্লোকের পুনরাবৃত্তির জন্য এ সময় যথেষ্ট হচ্ছে দেখা গেল। আমার মনে পড়ে আমি এইভাবে গীতার তেরটি অধ্যায় মুখস্ত করেছিলাম।

এইভাবে গীতা পাঠের দ্বারা বন্ধুদের কি উপকার হয়েছিল তা তাঁরাই বলতে পারেন, আমার কাছে কিন্তু এর ফলে গীতা সর্ববিধ আচরণের অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক হয়ে উঠল। গীতাকে আমি অভিধানের মত মনে করতে লাগলাম। অজানা ইংরাজী শব্দের অর্থের জন্য যেমন ইংরাজী অভিধান দেখতাম, তেমন দৈনন্দিন জীবনের সর্ববিধ দুঃখ সমস্যার তৈরী সমাধান পাবার জন্য মানবীয় আচরণ বিধির এই অভিধান আমাকে নিত্য দেখতে হত। গীতার অপরিগ্রহ ও সমভাব ইত্যাদি শব্দ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এই সমানতার অনুশীলন কি ভাবে করা যায় ও কেমন করে একে জীবনে স্থায়ী রূপ দেব—এই হল আমার সামনে প্রশ্ন। যাঁরা চিরকাল সদ্ব্যবহার করেন তাঁদের সঙ্গে অপমান-জনক ব্যবহারকারী, উদ্ধত ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী অথবা নিরর্থক বিরোধিতাকারী ভূতপূর্ব সহকর্মীকে কি করে একাসনে বসিয়ে সমান আচরণ করা যায়? সমস্ত সম্পদ পরিত্যাগ করার উপায় কি? আমাদের দেহই কি একটা সম্পদ নয়? স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে কেন সম্পদ আখ্যা দেব না? সম্পদ ত্যাগ করার মানে কি যত বইপত্র আছে সেগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া? ভগবানের পথে চলার জন্য আমাকে যথাসর্বস্ব বর্জন করতে হবে কি? এর সোজা উত্তর পেলাম: সব কিছু ছাড়তে না পারলে তাঁর অনুগামী হওয়া চলবে না। এ বিষয়ের সম্যক উপলব্ধির জন্য আমার ইংলণ্ডের আইনের জ্ঞান আমাকে সাহায্য করল। সাম্যভাবের নিয়ম সম্বন্ধে স্নেল-এর আলোচনা আমার মনে পড়ল। গীতার উপদেশের আলোকে "ন্যাস-রক্ষক" শব্দটির তাৎপর্য আমি ভাল

করে বুঝতে পারলাম। আইনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বর্ধিত হল, এর ভিতর আমি ধর্ম আবিষ্কার করলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে গীতার অপরিগ্রহের উপদেশের অর্থ হচ্ছে মুক্তিকামীকে ন্যাসরক্ষকের মত আচরণ করতে হবে। তাঁহার অধীনে বিপুল সম্পদ থাকলেও তিনি নিজেকে তার এক ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশেরও মালিক মনে করেন না। অপরিগ্রহ এবং সমভাবের জন্য হৃদয় পরিবর্তন, দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তন যে পূর্ব-স্বীকৃত সত্য—এ কথা আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি তাই রেবাশঙ্কর ভাইকে লিখে দিলাম যে আমার জীবন-বীমাটি যেন তিনি বাতিল করে দেবার বন্দোবস্ত করেন এবং এ যাবৎ যা জমা দিয়েছি তার যতটুকু ফেরত পাওয়া যায় ভাল, না পাওয়া যায় মনে করব যে সবটুকুই লোকসান হয়েছে। কারণ আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল যে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাদেরও জন্ম দিয়েছেন এবং তাই তিনিও ওদের দেখবেন। আর পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সবিস্তারে জানিয়ে দিলাম যে এ যাবৎ আমি যা বাঁচাতে পেরেছি তাঁকে দিয়েছি; কিন্তু ভবিষ্যতে তিনি যেন আমার কাছ থেকে আর কিছু আশা না করেন। কারণ ভবিষ্যতে আমার আয় থেকে কিছু উদ্‌বৃত্ত হলে তা সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হবে।

(আত্মকথা, ১৯৪৮ [সং], পৃষ্ঠা ৩২২-২৪)

আমি নাটালের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। শ্রীযুক্ত পোলকের প্রতি আমার পূর্ণ-মাত্রায় আস্থা ছিল। আমাকে বিদায় দিতে তিনি ষ্টেশনে এসেছিলেন এবং গাড়ী ছাড়ার পূর্বে আমাকে একটি বই দিয়ে তিনি বললেন যে যাত্রাপথে আমি যেন ওটি পড়ি। কারণ তাঁর মনে হয়েছে যে বইটি আমার নিশ্চয় ভাল লাগবে। বইটি হচ্ছে রাস্কিনের "আনটু দিস্ লাস্ট।"

বইটি এমন যে একবার শুরু করার পর মাঝ পথে রেখে দেওয়া অসম্ভব। জোহানস্‌বার্গ থেকে ডারবান চব্বিশ ঘণ্টার রাস্তা। আমি সন্ধ্যা বেলায় ডারবানে পৌঁছালাম। সে রাত্রে আমার আর ঘুম এল না। "আনটু দিস্ লাস্ট" বর্ণিত পন্থায় আমি আমার জীবনকে ঢেলে সাজার সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম।

পরে "সর্বোদয়" নাম দিয়ে বইটির গুজরাতী অনুবাদ করি।

রাস্কিনের এই মহান গ্রন্থে আমি আমার কয়েকটি গভীরমূল প্রত্যয়ের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলাম এবং সেইজন্য পুস্তকটি আমাকে অভিভূত করে ও এর প্রভাবে আমি আমার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সাধন করি। যিনি মানুষের অন্তঃকরণের

সদ্বৃত্তিসমূহকে জাগ্রত করাতে পারেন তিনিই কবি। তবে কবিরা সকলকে সমানভাবে প্রভাবিত করতে পারেন না কারণ সকলের বিকাশ সমমাত্রায় হয়নি।

আমার মতে "আনটু দিস্ লাস্ট" গ্রন্থটির সার বক্তব্য এই:

(১) ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ সর্বসাধারণের কল্যাণের মধ্যেই নিহিত।

(২) আইনজীবী এবং ক্ষৌরকার উভয়ের কাজের মূল্যই সমান। কারণ প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কর্ম দ্বারা জীবিকা অর্জনের সমপরিমাণ অধিকার আছে।

(৩) শ্রমজীবী অর্থাৎ কৃষক ও কারুশিল্পীর জীবনই আদর্শ।

এর প্রথমটি ইতঃপূর্বেই আমি জানতাম। দ্বিতীয়টি আবছাভাবে মনে মনে উপলব্ধি করতাম। আর তৃতীয়টির কথা কখনও মনে উদিত হয়নি। "আনটু দিস্ লাস্ট" পড়ার পর আমার কাছে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি প্রথমটির ভিতরই অন্তর্নিহিত আছে। এই আদর্শগুলিকে জীবনে মূর্ত করার সঙ্কল্প নিয়ে আমি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করলাম।

(আত্মকথা, ১৯৪৮ [সং], পৃষ্ঠা ৩৬৪-৬৫)

সব ধর্মই ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়

আমার হিন্দু সংস্কার আমাকে এই কথাই বলে যে সকল ধর্মমতই কম বেশী সত্য, এক এবং অদ্বিতীয় ভগবান থেকে সব ধর্মের উদ্গম হলেও এর সবগুলিই অপূর্ণ। কারণ অপূর্ণ মানবের মাধ্যমে এই সব ধর্মমত আমাদের কাছে উপস্থিত হয়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৫-১৯২৪, পৃষ্ঠা ১৮০)

ধর্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন পথ ; কিন্তু তারা মিশেছে গিয়ে একই বিন্দুতে। একই লক্ষ্যে যখন পৌঁছাব তখন বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করায় আর ক্ষতি কি? সত্যি কথা বলতে কি এই পৃথিবীতে যত মানুষ তত ধর্ম।

(হিন্দ স্বরাজ, ১৯৩৯ [সং], পৃষ্ঠা ৩৫ ও ৩৬]

ঈশ্বর অদ্বিতীয় বলে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একটি মাত্র ধর্মই থাকা উচিত বলে মনে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমার পরিচিত যে কোন দুটি লোকের মনে ঈশ্বরের অভিন্ন কল্পনা আছে বলে দেখিনি। সেইজন্য সম্ভবত বিভিন্ন মনোভঙ্গী এবং আবহাওয়ার কারণ সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে। (হরিজন, ২-২-১৯৩৪, পৃষ্ঠা ৮]

ীতে একটি মাত্র ধর্মের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব বা একটি মাত্র ধর্ম থাকবে এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি তাই সকল ধর্মমতের অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করছি ও পারস্পরিক সহনশীলতার প্রচার করছি।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩১-৭-১৯২৪, পৃষ্ঠা ২৫৪)

সহনশীলতা শব্দটি খুব বেশী পছন্দ না করলেও আপাততঃ এর চেয়ে ভাল কিছু মনে আসছে না। এই কথাটির ভিতর হয়ত নিজের ধর্মমতের তুলনায় অপরাপর ধর্মকে তুচ্ছ মনে করার একটা অহেতুক ভাব আছে। অহিংসা কিন্তু আমাদের নিজ ধর্মমতের মত অপরাপর ধর্মমতকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। আর এইভাবে আমরা নিজ ধর্মবিশ্বাসের অপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন হব। যে সত্যসন্ধানী প্রেমশক্তির অনুসারী, তিনি অবিলম্বে এ কথা স্বীকার করবেন। সত্যের সম্পূর্ণ দর্শন আমাদের হয়ে গেলে আর আমরা নিছক সত্যসন্ধ থাকব না, তখন আমরা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাব। কারণ সত্যই ঈশ্বর। কিন্তু সত্যের সন্ধানকারী হওয়ায় আমরা আমাদের অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে যাই এবং নিজেদের অপূর্ণতা সম্বন্ধেও আমরা সচেতন থাকি। আর আমরা স্বয়ং যদি অপূর্ণ হই, তাহলে আমাদের মানসলোকে সৃষ্ট ধর্মও অপূর্ণ হবে। যেমন আমরা ভগবানকে পুরোপুরি পাইনি, তেমনি ধর্মেরও পরিপূর্ণ উপলব্ধি করে উঠতে পারিনি। সুতরাং আমাদের মানসলোকে সৃষ্ট ধর্ম এই ভাবে অপূর্ণ বলে জেনে রাখতে হবে যে সর্বদাই এর অধিকতর বিকাশ এবং নবীন ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। আর পূর্বোক্ত প্রকারের বিকাশক্রমের জন্য সত্য এবং ভগবানের অভিমুখে প্রগতি করা সম্ভব হয়। সুতরাং মানব কর্তৃক পরিকল্পিত সকল ধর্মমতই যদি অপূর্ণ হয় তাহলে তুলনামূলক গুণবিচারের কথা আর উঠতেই পারে না। সকল ধর্মমতই সত্যকে প্রকাশ করে; কিন্তু এর সবগুলিই অপূর্ণ বলে সকলের ভিতরই ভ্রান্তির সম্ভাবনাও বিদ্যমান। অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে কিন্তু তা বলে তার ত্রুটি সম্বন্ধে চোখ বুঁজে থাকা অনুচিত। নিজেদের ধর্মমতের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধেও অত্যন্ত সজাগ থাকা উচিত; তবে তার জন্য নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করার কথা ওঠে না। নিজ ধর্মের এই সব অপূর্ণতা অতিক্রম করতে হবে। অপরাপর ধর্মমতের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হবার জন্য তাদের মধ্যে যা কিছু ভাল আছে তা নিজ ধর্মে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা কর্তব্য জ্ঞান করব।

বৃক্ষের কাণ্ড একটি হলেও যেমন শাখা-প্রশাখা অজস্র, তেমনি সত্যকার

এবং পূর্ণ ধর্মও এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু মানবীয় মাধ্যমের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হবার জন্য অদ্বৈত পূর্ণ ধর্ম বহু সংখ্যক হয়ে পড়ে। ঐ যে অদ্বৈত ধর্ম তা বচনাতীত। এই ধর্মকে অপূর্ণ মানব নিজেদের আয়ত্তাধীন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে থাকে এবং এইসব শব্দের ব্যাখ্যা করে সমপরিমাণ অপূর্ণ মানবের দল। সুতরাং কার ব্যাখ্যাকে একমাত্র যথার্থ পরিভাষা বলে স্বীকার করা যায়? নিজ নিজ ভূমিকা থেকে প্রত্যেকেই ঠিক বলেছেন; কিন্তু তাহলেও সকলেরই ভ্রান্ত হওয়াটাও অসম্ভব নয়। এরই জন্য সহনশীলতার প্রয়োজন। তবে সহনশীলতার অর্থ নিজের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি উপেক্ষা নয়, আপন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত এবং শুদ্ধ আকর্ষণ। সহনশীলতার ফলে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হয় এবং এর সঙ্গে ধর্মান্ধতার ব্যবধান দুই মেরুর দূরত্বের মত। ধর্ম সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধ-সীমা ঘুচিয়ে দেয়।

(যারবেদা মন্দির থেকে, ১৯৪৫ [সং], পৃষ্ঠা ৩৮-৪০)

একাধিকবার আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে কোন কাজ আমার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে উচিত মনে হলেও আমার সৎ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা অন্যায়। আমি জানি যে আমরা উভয়েই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্রান্ত। আর এইটুকু জানা থাকার জন্য আমার বিরোধী বা সমালোচকদের প্রতি আমি দুরভিসন্ধি আরোপ করি না। যে সাতটি অন্ধ হাতী দেখার পর সাত রকম বর্ণনা দিয়েছিল, নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সবাই অভ্রান্ত ছিল। কিন্তু পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে তাদের সকলকেই ভ্রান্ত বলতে হবে এবং যে মানুষটি হাতীটিকে চেনে, তার দৃষ্টিকোণ থেকে ওরা যুগপৎ ভ্রান্ত এবং অভ্রান্ত। সত্যের বহুমুখীতা সম্বন্ধীয় এই মতবাদ আমার খুব ভাল লাগে। এই নীতির জন্যই আমি মুসলমানকে মুসলমানের ও খ্রীস্টানকে খ্রীস্টানের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে শিখেছি। পূর্বে বিরুদ্ধপক্ষের অজ্ঞতাদৃষ্টে আমি বিরক্ত হতাম। আজ আমি তাঁদের ভালবাসি; কারণ সৌভাগ্যবশতঃ অপরের চক্ষে নিজেকে দেখার দৃষ্টি আমি পেয়েছি। সমগ্র জগৎসংসারকে আমি আমার ভালবাসার পরিধির মধ্যে জড়িয়ে ধরতে চাই।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১-১৯২৬, পৃষ্ঠা ৩০)

অন্য ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহের প্রতি আমার মনোভাব

অপরাপর ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহের বিরূপ সমালোচনা করা বা তার ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করা আমাদের কর্তব্য হতে পারে না। বরং প্রত্যেক ধর্মের ভিতর যে সত্য আছে তা স্বীকার করে তদনুযায়ী আচরণ করাই আমাদের কর্তব্য। সুতরাং কোরাণ এবং পয়গম্বরের জীবনের যে সব জিনিস আমি বুঝতে পারিনা, তার নিন্দা সমালোচনা করা আমার পক্ষে অনুচিত। পক্ষান্তরে হজরত মহম্মদের জীবনের যে সব কৃতির তাৎপর্য আমি বুঝতে পেরেছি এবং তাঁর জীবনের যে সব কার্যকলাপ আমার কাছে অভিনন্দনযোগ্য মনে হয়েছে, তার প্রশংসা করার প্রতিটি সুযোগ আমি কাজে লাগিয়েছি। আর যে সব জিনিস বুঝতে অসুবিধা, সেগুলিকে শ্রদ্ধাশীল মুসলমান বন্ধুদের চোখে দেখেই আমি তৃপ্তি মেনেছি আর ঐসব বিষয় আমি ইসলামের বিশিষ্ট মুসলমান ব্যাখ্যাকারদের রচনাবলীর মারফৎ বোঝার প্রয়াস পেয়েছি। আমার ধর্মবিশ্বাসের গণ্ডির বহির্ভূত ধর্মমতগুলির প্রতি এই জাতীয় শ্রদ্ধামূলক মনোভাবের কারণই আমি সকল ধর্মমতের অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। তবে হিন্দুধর্মের সংস্কার করা ও একে শুদ্ধ রাখার জন্য এর দোষ-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার অধিকার এবং কর্তব্য। কিন্তু হিন্দুধর্ম বহির্ভূত সমালোচকেরা যখন হিন্দুধর্মের বিরূপ সমালোচনা করেন এবং এর দোষ-ত্রুটির তালিকা রচনা করতে আরম্ভ করেন, তখন বলতে হবে যে তাঁরা নিজ অজ্ঞতারই প্রচার করছেন এবং তাঁরা হিন্দুধর্মকে হিন্দুর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে অক্ষম। এর ফলে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত হয়ে যায় এবং তাঁদের বিচারবুদ্ধিও আবিলতাপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোন অহিন্দু কর্তৃক হিন্দুধর্মের সমালোচনা আমাকে আমার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। এর ফলে আমি ইসলাম বা খ্রীস্টধর্ম ও তার প্রবর্তকদের সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া থেকে দূরে থাকার শিক্ষা লাভ করি।

(হরিজন, ১৩-৩-১৯৩৭, পৃষ্ঠা ৩৪)

আশ্রমে আমরা নিয়মিতভাবে ভগবদ্গীতা পাঠ করি। আমরা এখন এতটা প্রগতি করেছি যে প্রত্যহ সকালে গীতার পূর্ব-নির্ধারিত অধ্যায়সমূহ পাঠ করার জন্য প্রতি সপ্তাহে একবার করে সমগ্র গীতার পাঠ শেষ করে ফেলছি। এ ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধু-সন্ত বিরচিত স্তব ও স্তোত্র পাঠও চলছে এবং এর মধ্যে

খ্রীস্টান স্তবমালা থেকে নির্বাচিত অংশও পাঠ করা হয়। আর খান সাহেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বলে কোরাণ পাঠও চলছে। তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠে আমি সর্বোত্তম সান্ত্বনা পেয়ে থাকি। নিউ টেস্টামেণ্ট এবং কোরাণও আমার কাছে সান্ত্বনার উৎস। সমালোচকের বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে আমি এই সব ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করি না। এই সব শাস্ত্রগ্রন্থ আমার কাছে ভগবদ্গীতার সমতুল্য মহত্ত্বপূর্ণ। ঐ সব ধর্মশাস্ত্রের সব কিছুই আমার গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ সেণ্ট পলের "এপিসল"-এর কথা বলা যেতে পারে, যার সবটুকু আমি স্বীকার করে নিতে পারি না। এই ভাবে তুলসীদাসের সব বচনই গ্রাহ্য বলে আমি মনে করি না। আর তার জন্য এই সব ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্য থেকে যে কোন একটি মাত্রকে বেছে নেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

গীতা সহ প্রতিটি ধর্মগ্রন্থকে আমি আমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখি। কোন ধর্মগ্রন্থের আপ্তবাক্যকেই আমি আমার বিচারবুদ্ধির উপর স্থান দিতে পারি না। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি যে প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি ঈশ্বরের প্রেরণারই অভিব্যক্তি। তবে এই সব শাস্ত্রগ্রন্থকে দু তরফা পরিশুদ্ধির প্রক্রিয়া পার হতে হয়েছে। প্রথমতঃ, এগুলিকে আমরা এমন পয়গম্বরদের মুখ থেকে পাই যাঁরা মানুষ। তারপর বহু টীকা ভাষ্যের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি আমাদের হস্তগত হয়। ধর্মগ্রন্থগুলির কোন উক্তিই সরাসরি ঈশ্বরবাক্য নয়। বাইবেলের একই অংশের ব্যাখ্যা ম্যাথু এক রকম করবেন এবং জন আবার আর এক রকমভাবে তাকে বোঝাবেন। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করলেও আমি আমার বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে পারি না। আর সর্বোপরি শাস্ত্রের "বাচ্যার্থ প্রাণসংশয়কারী, কিন্তু ভাবার্থ জীবন প্রদায়িনী"। আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। যেখানে যুক্তির স্থান নেই, সেখানে বিশ্বাসের কার্মকারিতায় আমি আস্থাশীল।

(হরিজন, ৫-১২-১৯৩৬, পৃষ্ঠা ৩৩৯ ও ৩৪৫)

আমি শব্দশাস্ত্রী নই। আমি তাই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অন্তর্নিহিত মর্মার্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করি। এই সব ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যার জন্য আমি সত্য এবং অহিংসার মানদণ্ড প্রয়োগ করে থাকি। সত্য ও অহিংসার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সব কিছু আমি বর্জন করি এবং এর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত সব কিছুর আমি প্রশংসা করে থাকি।

জ্ঞান কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়-বিশেষের একাধিকারভুক্ত জিনিস নয়। পূর্ব

থেকে শিক্ষা না নিলে যেমন উচ্চ পর্বতচূড়ার লঘু বায়ুতে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না, আর গণিতের প্রাথমিক পর্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে যেমন উচ্চতর জ্যামিতি বা বীজগণিত বোঝা যায় না, তেমনি আমি বিশ্বাস করি যে একটা প্রাথমিক শিক্ষা বা প্রস্তুতি না থাকলে উচ্চতর এবং প্রচ্ছন্ন সত্যোপলব্ধি হয় না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৮-১৯২৫, পৃষ্ঠা ২৯৩)

আমি বিশ্বাস করি সহানুভূতি সহকারে বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করা প্রতিটি সুসংস্কৃত নরনারীর কর্তব্য। আমরা যদি চাই যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা পরস্পরের ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করুক, তাহলে হৃদ্যতা সহকারে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র পাঠ করা এক পবিত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আমি শ্রদ্ধা সহকারে অপরাপর ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি বলে আমার নিজ ধর্মমতের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস্ তিল মাত্র কমেনি। সত্যি কথা বলতে কি এর দ্বারা আমি হিন্দুধর্মের গ্রন্থাবলী বুঝতে সাহায্য পেয়েছি। এর দ্বারা আমার জীবনের দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রের অনেক দুর্বোধ্য অংশ এর ফলে আমার কাছে অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়ে গেছে।

কথাটা একটু স্পষ্ট করেই বলি। বাইবেল এবং কোরাণের আমার নিজস্ব ভাষ্য অনুযায়ী আমার পক্ষে খ্রীস্টান বা মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়া সম্ভব হলে নির্দ্বিধায় আমি তা-ই করতাম। কারণ তাহলে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টান ইত্যাদি শব্দ সমঅর্থবাচক হয়ে পড়ত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পরলোকে হিন্দু খ্রীস্টান বা মুসলমান বলে কোন কিছু নেই। সেখান কোন মানুষকে তার গায়ের ছাপ বা তার মুখের কথা দিয়ে বিচার করা হয় না। ওখানকার বিচারে কর্মই একমাত্র মানদণ্ড। পার্থিব জীবনে অবশ্য একটা না একটা ছাপ থাকবে। সুতরাং যতক্ষণ না আমার বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হচ্ছে এবং যতদিন না অন্যান্য ধর্মের ভাল জিনিস গ্রহণের পক্ষে বাধা দেখা না দিচ্ছে, ততদিন আমি আমার পূর্বপুরুষের ছাপ বজায় রাখাই পছন্দ করি।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৯-১৯২৬, পৃষ্ঠা ৩০৮)

নিজের ধর্ম

উদাহরণটি অত্যন্ত অপূর্ণ হলেও বলব যে ধর্মের সঙ্গে যার গভীরতম সাদৃশ্য আছে তা হচ্ছে বিবাহ। বিবাহবন্ধন অবিচ্ছেদ্য—অন্ততঃ একদা তা-ই ছিল। স্বামী বা স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অনুরক্তির কারণ এই নয় যে স্বামী হিসাবে তাঁর

অন্যান্য পুরুষের তুলনায় বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব আছে, অথবা অন্যান্য নারীদের তুলনায় তাঁর স্ত্রী বিশেষ গুণে গুণান্বিতা। দাম্পত্যপ্রেমের মূলে রয়েছে একটা অব্যক্ত অথচ অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। মানুষের নিজ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বা আনুগত্যও ঠিক এই রকম এবং এইভাবে মানুষ নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অনুরক্ত থেকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি বোধ করে। আর স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসী স্বামীর যেমন সেই বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য অপরাপর নারীদের নিজের স্ত্রীর তুলনায় হেয় জ্ঞান করার প্রয়োজন ঘটে না, তেমনি কোন ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তির অন্যান্য ধর্মমতকে হীন মনে করার কারণ নেই। উদাহরণটি নিয়ে আরও একটু এগোলে বলা যায় যে, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হবার জন্য যেমন তার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধ অন্ধ হবার প্রয়োজন হয় না, তেমনি নিজ ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার অর্থ এর অপূর্ণতা সম্বন্ধে চোখ বুঁজে থাকা নয়। প্রত্যুত অন্ধ আসক্তি বর্জন করে সত্য সত্যই বিশ্বাসী হবার জন্য দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এরই আধারে এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্যক প্রতিবিধান ও নিরাকরণের ব্যবস্থা করার প্রেরণা জাগে। ধর্ম সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তার কারণ হিন্দুধর্মের সৌন্দর্যাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা আমার নেই। পাঠক স্থির ভাবে জেনে রাখুন যে হিন্দুধর্মের বহুবিধ সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমি হিন্দু বলে নিজের পরিচয় দিতাম না। তবে আমার প্রয়োজনের দৃষ্টি থেকে এই সব সৌন্দর্য অন্যনিরপেক্ষ না হলেও চলবে। সুতরাং অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি কদাচ আমি ছিদ্রান্বেষী সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখি না, আমার দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে শ্রদ্ধাশীলের। আমি এই আশা নিয়ে চলি যে অন্যান্য ধর্মে আমার ধর্মের মতই সৌন্দর্যের খোঁজ পাব এবং ঐসব ধর্মে যে সব ভাল জিনিস আছে ও আমার ধর্মে যার অভাব, তাকে নিজ ধর্মে গ্রহণ করব।

(হরিজন, ১২-৮-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪)

আমি নিজে গোঁড়া হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও আমার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে খ্রীস্টান মুসলমান ও জরথুস্ত্রের শিক্ষার কোন বিরোধ দেখি না। এর জন্য আমার হিন্দুয়ানী অনেকের কাছে একটা জগাখিচুড়ি গোছের মনে হয় এবং অনেকে তো আমাকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের সার সঙ্কলকের আখ্যা দিয়েছেন। ভালকথা, কাউকে ধর্মসার সঙ্কলকের আখ্যা দেওয়ার অর্থ তার কোন ধর্মবিশ্বাসের বালাই নেই—এই কথা বলা। কিন্তু আমার ধর্মবিশ্বাস উদার। আমার বিশ্বাসের সঙ্গে খ্রীস্টান—এমন কি প্লাইমাউথ ভ্রাতৃসঙ্ঘের অনুসরণকারী কোন গোঁড়া খ্রীস্টান অথবা একেবারে

ধর্মান্ধ মুসলমানেরও কোন বিরোধ নেই। যথাসম্ভব অধিকতম ঔদার্যের উপর আমার ধর্মবিশ্বাস আধারিত। কোন মানুষকে চরমতম ধর্মান্ধতার জন্যও আমি নিন্দা করতে পারি না; কারণ তাঁকে আমি তাঁরই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করি। এই উদার বিশ্বাসই আমাকে সঞ্জীবিত করে রাখে। আমি বুঝতে পারি যে আমার এই মানসিকতা অনেকের কাছে একটু অস্বস্তিকর; কিন্তু আমার নিজের কাছে এর মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২. ১২. ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪২৫)

খ্রীস্টান ধর্ম

নিউ টেস্টামেণ্ট আমাকে সান্ত্বনা এবং অমিত আনন্দ দিয়েছিল এবং এই হর্ষানুভূতির আস্বাদন করেছিলাম ওল্ড টেস্টামেণ্টের বিরক্তিকর অংশসমূহ পাঠ করার পর। আজ যদি আমার গীতা না থাকে বা যদি এর সব কিছু ভুলেও যাই এবং যদি একখণ্ড "সারমন অন্ দি মাউণ্ট" কেবল পেয়ে যাই, তাহলে এর থেকেও গীতা পাঠেরই মত আনন্দ পাব। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২. ১২. ২৯২৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪২৬)

যীশুখ্রীস্ট অন্য অনেকের চেয়ে ভালভাবে ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত ভাব এবং ইচ্ছাকে ব্যক্ত করেন। এই অর্থেই আমি তাঁকে ঈশ্বরপুত্র বলে বিবেচনা ও স্বীকার করি। আজ যীশুর জীবনে আমার মত অকিঞ্চন ব্যক্তির মনোমত বিশ্বজনীনতার প্রতিবিম্ব ও তাৎপর্য খুঁজে পাই বলে আমি বিশ্বাস করি যে তিনি কেবল খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের এবং সর্বমানবের। এই মানুষ কোন্ পতাকা, নাম বা মতবাদের কাজ করছে তা অকিঞ্চিৎকর। অথবা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কোন্ ধর্মবিশ্বাস, উপাসনা-পদ্ধতি বা ভগবানের বিশেষ রূপ পেয়েছে—তা একটা বড় কথা নয়। (দি মডার্ণ রিভিয়ু, অক্টোবর ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪০৬)

রোমে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটি চিত্র দেখে গান্ধীজী মন্তব্য করলেন, "ভ্যাটিকানে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ঐ সজীব চিত্রটির সম্মুখে মস্তকাবনত করার জন্য আমি কী-ই না দিতে পারি? অত্যন্ত বেদনাসহকারে আমি ঐ জীবন্ত বিয়োগান্তক দৃশ্যের সম্মুখ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসি। তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পারলাম যে ব্যক্তির মত জাতিকেও দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে তৈরী করতে হয়। ক্রুশের দুঃখ ছাড়া নান্যঃ পন্থা। অপরকে দুঃখ দেওয়ায় আনন্দ নেই, স্বেচ্ছায় স্বয়ং নিগ্রহ বরণ করাতেই আনন্দ।"

[দিস ওয়াজ বাপু, লেখক: র. কু. প্রভু, ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ (সং), পৃষ্ঠা ২৯]

বৌদ্ধ ধর্ম

বুদ্ধ যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না একথা আমি বহুবার শুনেছি এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের ভাষ্য ইত্যাদিতেও একথা পড়েছি। কিন্তু আমার বিনম্র অভিমত এই যে পূর্বোক্ত ধারণা বুদ্ধের মূল শিক্ষার বিরোধী। তাঁর যুগে ভগবানের নামে যে সব ব্যাপার চলত তা বুদ্ধদেব বর্জন করার জন্য তাঁর সম্বন্ধে এই ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি নিঃসন্দেহেই একথা অস্বীকার করেন যে ভগবান নামে মানবীয় সত্তার প্রতিরূপ একটা কিছু আছে যা প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষের আকর, নিজের দুষ্কৃতির জন্য তিনি অনুতাপও করেন আর ধরাপৃষ্ঠে রাজত্বকারী রাজন্যবর্গের মত তাঁকেও প্রলোভন ও উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করা যায় ও তাঁর ভিতর স্বজন-পোষণ বৃত্তিও বিদ্যমান। আত্মসন্তুষ্টির জন্য ভগবান স্বসৃষ্ট পশুদের রক্তপিপাসু—এই বিশ্বাসের প্রতি বুদ্ধের অন্তরাত্মা মহান ঘৃণায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব তাই যে ছলনাকারী সাময়িকভাবে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সিংহাসন জবর দখল করে বসেছিল, তাকে আসনচ্যুত করে ঈশ্বরকে স্বস্থানে পুনরধিষ্ঠিত করেন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নৈতিকতার শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় রাজত্বের অস্তিত্বের কথা তিনি আবার জোর দিয়ে ঘোষণা করেন। তিনি নিঃসংশয়ে প্রচার করেন যে এই নৈতিক বিধানই স্বয়ং ঈশ্বর।

ঈশ্বরের বিধান শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়, তাঁর থেকে তাঁর বিধানকে পৃথক করা যায় না। তাঁর পূর্ণতার এ এক অপরিহার্য শর্ত। এরই জন্য এই মহান ভ্রান্তির উদ্রেক হয়েছে যে বুদ্ধ ঈশ্বরে অবিশ্বাস করতেন এবং কেবল নৈতিক বিধান তাঁর স্বীকৃতি পেয়েছিল। আর স্বয়ং ভগবান সম্বন্ধে বিভ্রম থেকে নির্বাণ নামক মহান শব্দটির সম্যক অর্থোপলব্ধির ক্ষেত্রেও ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাণের অর্থ অস্তিত্বের চিরবিলুপ্তি নয়। বুদ্ধের জীবনের মূল প্রেরণার যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি তাতে নির্বাণ বলতে আমার মধ্যে যত অলীক ও অসারত্ব আছে, যত পাপ-তাপ এবং অন্যবিধ অপবৃত্তি আছে তার সমাপ্তি বোঝায়। নির্বাণ বলতে শ্মশানের প্রাণহীন শান্তি বোঝায় না। এর অর্থ হচ্ছে প্রাণবন্ত প্রশান্তি—আত্মবোধে উদ্দীপ্ত আত্মার তুরীয় আনন্দ, সনাতনের অঙ্কে নিজ নিবাসপ্রাপ্তির চেতনার আনন্দ।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-১১-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯৩)

ইসলাম

খ্রীস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্মের মতই ইসলামকেও আমি শান্তির ধর্ম মনে করি। বিভিন্ন ধর্মের ভিতর মাত্রার ন্যূনাধিক্য থাকলেও শান্তিই সব ধর্মের চরম ধ্যেয়। আমি এই অভিমত ব্যক্ত করেছি যে ইসলামের অনুগামীরা তলোয়ার নিয়ে বড় বেশী মাতামাতি করেছেন। তবে এরজন্য কোরাণের শিক্ষা দায়ী নয়। আমার মতে এর মূলে রয়েছে ইসলামের জন্মকালীন পরিবেশ। খ্রীস্টধর্মের ইতিহাসেও এইরকম রক্তস্রোতের অধ্যায় আছে; কিন্তু তারজন্য যীশুকে দায়ী করা চলে না। যে পরিবেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারিত হয়েছিল, তা যীশুর মহান আদর্শের আহ্বানে ঠিকমত সাড়া দেয়নি।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১-১৯২৭, পৃষ্ঠা ২১)

থিয়সফি

গান্ধীজী থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন কিনা এই প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দিলেন যে যদিও তিনি কখনও এর সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন নি তবু বরাবরই তাঁর থিয়সফিক্যাল সোসাইটির বিশ্ব সৌভ্রাত্রের বাণী ও তজ্জনিত সহনশীল মনোবৃত্তির প্রতি সহানুভূতি আছে।

তিনি আরও বললেন: "আমার অনেক থিয়সফিস্ট বন্ধু আছেন এবং তাঁদের কাছে আমি বহুভাবে ঋণী। মাদাম ব্লাভটস্কি কর্ণেল অলকট্ বা ডঃ বেসান্তের বিরুদ্ধে সমালোচকেরা যাই বলুন না কেন, মানবতার প্রতি এঁদের অবদান চিরকালই শীর্ষস্থানীয় বলে পরিগণিত হবে। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির গোপন দিক-এর অলৌকিকত্বের জন্য আমার পক্ষে সোসাইটির সদস্য হওয়া হয়ে ওঠেনি। এই অলৌকিকতা আমাকে কখনও আকৃষ্ট করতে পারেনি।"

(দিস ওয়াজ বাপু, লেখক: র. কু. প্রভু, ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ [সং], পৃষ্ঠা ১৩)

পারলৌকিক তত্ত্ব

মৃতাত্মাদের কাছ থেকে আমি কখনও কোন রকম সমাচার পাইনি। তবে এই জাতীয় পারলৌকিক বাণীতে অবিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণও আমার হাতে নেই। কিন্তু মৃতাত্মাদের সঙ্গে এই জাতীয় বার্তালাপ করার প্রচেষ্টার আমি ভীষণ বিরোধী। প্রায়ই দেখা যায় যে এসব প্রতারণা ও কাল্পনিক ব্যাপার। এই জাতীয় বার্তালাপ সম্ভব—একথা যদি ধরেও নেওয়া যায়,

তাহলেও বলব যে মিডিয়ম এবং আত্মা উভয়ের পক্ষেই এ হানিকর। এইভাবে যে আত্মাকে আনা হয় পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য তার বন্ধন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অথচ পার্থিব বন্ধনমুক্তি এবং উর্ধ্বচারি হওয়াই দেহমুক্ত আত্মার স্বধর্ম হওয়া উচিত। দেহবিযুক্ত হলেই যে আত্মা পবিত্রতর হবে এর কোন মানে নেই। পৃথিবীতে থাকার সময় যে সব ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা দেহধারীদের অবলম্বন থাকে, দেহমুক্ত হলেও তা সঙ্গে থাকে। সুতরাং আত্মা যে খবর দেয় তা সর্বদা সত্য বা যথার্থ না-ও হতে পারে। আত্মা পৃথিবীর লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়—এটা কোন আনন্দের কথা নয়। আত্মাকে বরং এ জাতীয় অসঙ্গত আকর্ষণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা উচিত। আত্মার যে ক্ষতি হয় তার সম্বন্ধে এই পর্যন্ত আলোচনাই যথেষ্ট।

আর মিডিয়মদের সম্বন্ধে এই কথা বলব যে আমার জানাশোনা সবকয়টি ক্ষেত্রে মিডিয়ম বুদ্ধিভ্রষ্ট এবং দুর্বল মস্তিষ্কের হয়ে গেছে বা এই জাতীয় সত্য কিংবা কাল্পনিক বার্তালাপের বাহন হবার ফলে তারা প্রত্যক্ষ কাজের অনুপযুক্ত মানুষে পরিণত হয়ে পড়েছে। এমন কোন পরিচিত ব্যক্তির কথা আমার মনে পড়ছে না, এই জাতীয় বার্তালাপের বাহন হয়ে যাঁর কোন রকম মঙ্গল হয়েছে।

ধর্মের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা

পৃথিবীতে যতদিন বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব আছে ততদিন এর পৃথক পৃথক বাহ্য প্রতীকের প্রয়োজন হবে। কিন্তু এই প্রতীককেই যখন উপাস্যদেবতা ও অপরের ধর্মের তুলনায় নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করার সাধনে পরিণত করা হয়, তখন এইসব ধর্ম বর্জনীয় হয়ে ওঠে।

(আত্মকথা, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ [সং], পৃষ্ঠা ৪৮০)

ভগবান ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকটি ধর্মেরই কিছু না কিছু অনুগামী আছেন। গোপনভাবে হলেও কিভাবে আমি মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করতে পারি যে আমার প্রতিবেশীর ধর্মমত আমার ধর্মের চেয়ে অপকৃষ্ট এবং তাই তিনি যেন নিজ ধর্মমত পরিত্যাগ করে আমার ধর্ম গ্রহণ করেন? তাঁর সত্যকার শুভার্থী বন্ধু হিসাবে আমি কেবল এইটুকু আশা প্রার্থনা করব যে তিনি যেন নিজ ধর্মবিশ্বাসের আদর্শ অনুগামীরূপে নিজেকে গড়ে তোলেন। ঈশ্বরের অট্টালিকায় বহু কামরা আছে এবং এর প্রত্যেকটিই পবিত্র।

(হরিজন, ২০-৪-১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৭৩)

আমার আশঙ্কা হয় যে আজকাল খ্রীস্টান বন্ধুরা হিন্দুধর্ম মিথ্যা—এ কথা প্রকাশ্যে না বললেও তাঁদের মনে মনে এই বিশ্বাস ক্রিয়াশীল যে হিন্দুধর্ম ভ্রান্ত এবং তাঁরা যে ধাঁচের খ্রীস্টান ধর্মে বিশ্বাস করেন, তা-ই একমাত্র সত্যধর্ম। তাঁদের মনোভাব এই জাতীয় না হলে ইংলণ্ডের চার্চ মিশনারী সোসাইটির যে আবেদনটির অংশবিশেষ আমি সম্প্রতি "হরিজন"-এ উদ্ধৃত করেছিলাম, তার সমর্থন তো দূরের কথা আবেদনটির তাৎপর্যই বোঝা যায় না। হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা এবং আর যে সব দোষ-ত্রুটির জন্ম হয়েছে, তার প্রতি আক্রমণের একটা অর্থ বোঝা যায়। আর তাঁরা যদি এইসব সর্বজনস্বীকৃত দোষ-ত্রুটি সংশোধনে আমাদের সাহায্য করে হিন্দুধর্মকে শুদ্ধ করার ব্যাপারে সহায়তা দিতেন, তাহলে স্বীকার করতেই হত যে তাঁরা এমন একটা সহৃদয়তাপূর্ণ গঠনমূলক কাজ করছেন যা সবাই কৃতজ্ঞচিত্তে বরণ করে নেবেন। কিন্তু খ্রীস্টান বন্ধুদের বর্তমান প্রয়াসের যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে হিন্দুধর্মকে একেবারে সমূলে উৎখাত করে এর পরিবর্তে অন্য এক ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারের সঙ্গে একটি পুরাতন ঘরকে ধূলিসাৎ করার প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঘরটির মেরামত করা অপরিহার্য মনে হলেও ঘরের বাসিন্দাদের কাছে এটি মনোরম ও বসবাসের বেশ যোগ্য মনে হচ্ছে। এই ঘরের জীর্ণ-সংস্কার করার প্রক্রিয়া যাঁরা দেখিয়ে দেবেন বা স্বয়ং যাঁরা এ কাজের জন্য এগিয়ে আসবেন, ঘরের বাসিন্দারা তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবেন—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? কিন্তু বসবাসকারীরা যতক্ষণ না এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হচ্ছেন যে এ ঘরের আর মেরামত করার উপায় না থাকায় ঘরটি মনুষ্য বাসোপযোগী নয় ততক্ষণ তাঁরা সর্বশক্তি প্রয়োগে তাঁর পিতৃ-পুরুষ এবং নিজেদের বহু যুগের আবাস ঐ ঘরটিকে ভেঙ্গে ফেলার যাবতীয় প্রচেষ্টার প্রতিরোধ করবেন। খ্রীস্টান-জগৎ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ধারণা পোষণ করলে বলতে হবে যে তাঁদের "ধর্মের পার্লামেণ্ট" ও "আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব" ইত্যাদি শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর মাত্র। কারণ ঐ দুটি কথার মধ্যেই সাধারণ ভিত্তিভূমি হিসাবে সকল ধর্মের সমমর্যাদার স্বীকৃতি অন্তর্নিহিত রয়েছে। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট, আলোকপ্রাপ্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পুনরভ্যুদিত এবং ভূতলশায়ী, উচ্চকুলোদ্ভব এবং নিম্নবংশজাত, সবর্ণ ও অবর্ণ ইত্যাদির ভিতর কোন সাধারণ মিলনভূমি থাকতে পারে না। এই তুলনা ত্রুটিযুক্ত হতে পারে এবং অনেকের কাছে আপত্তিকরও মনে হতে পারে। আমার যুক্তিও নিরাধার হওয়া সম্ভব। কিন্তু আমার বক্তব্যের প্রতিজ্ঞা যুক্তিযুক্ত। (হরিজন, ১৩-৩-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৬)

"ফেলোশিপের" লক্ষ্য হবে হিন্দুকে হিন্দু, মুসলমানকে আরও ভাল মুসলমান এবং খ্রীস্টানকে আরও ভাল খ্রীস্টান হতে সাহায্য করা। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল সহনশীলতার পৃষ্ঠপোষকতা করার মনোভাব যথেষ্ট নয়। আমার মনে যদি এই ধারণা থাকে যে আমার নিজের ধর্মই মোটামুটি সত্য এবং বাকী সব ধর্মমত আমার ধর্মের মতই মোটামুটি সত্য না হয়ে প্রত্যুত মোটামুটি মিথ্যা, তাহলে আর সকলের প্রতি একটা কাজচলা গোছের ভ্রাতৃভাব থাকলেও আন্তর্জাতিক "ফেলোশিপের" উপযুক্ত সৌভ্রাত্রের সৃষ্টি হবে না। আমাদের প্রার্থনা, "ভগবান, আমাকে তুমি যে আলো দিয়েছ ওঁকেও তাই দাও" হবে না, আমরা বলব, "ওঁর সর্বোচ্চ বিকাশের জন্য যে আলো ও সত্য ওঁর প্রয়োজন, তা-ই ওঁকে দাও।"

যাই হোক তোমাদের অভিজ্ঞতা সকলের অলক্ষ্যে যেন ওদের অভিজ্ঞতার অঙ্গীভূত হয়।

(সবরমতী, ফেডারেশন অফ ইণ্টারনেশন্যাল ফেলোশিপের প্রথম বাৎসরিক সম্মেলনের রিপোর্ট, ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৭-১৯)।

ধর্মান্তরকরণ

সি. এফ. এনড্রুজ: বহু চিন্তা ও প্রার্থনার পর যে ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে খ্রীস্টান না হলে সে শান্তি বা মুক্তি পাবে না, তাকে আপনি কি বলবেন?

গান্ধীজী: আমার বক্তব্য এই যে কোন অখ্রীস্টান (ধরুন সে হিন্দু) এসে যদি একজন খ্রীস্টানকে এমন কথা জানান, তাহলে খ্রীস্টান বন্ধুটির কর্তব্য হবে তাঁকে এই কথা বলা যে ধর্মান্তরিত হবার পরিবর্তে তিনি যে আরও ভাল হিন্দু হবার প্রয়াস করেন।

এনড্রুজ: আপনি আমার মনোভাব জানেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারছি না। বহুদিন পূর্বেই আমি এই বিশ্বাস পরিহার করেছি যে যীশুখ্রীস্ট ছাড়া মুক্তি অসম্ভব। কিন্তু ধরুন যদি অক্সফোর্ড গ্রুপ মুভমেণ্টের কর্মীরা আপনার ছেলের জীবনকে পরিবর্তিত করে দেয় এবং সে যদি খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, সে অবস্থায় আপনি কি বলবেন?

গান্ধীজী: আমি বলব যে অক্সফোর্ড গ্রুপ যতজনের ইচ্ছা জীবন পরিবর্তিত করুন, কিন্তু তাঁদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই।

তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠ দিকগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং তদনুযায়ী সকলকে আচরণ করতে বলে তাঁদের জীবনে পরিবর্তন সংসাধনও করতে পারেন। আমার কাছে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব একটি ছেলে এসে বলে যে আপনার রচনাবলী পাঠ করার পর তার খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা হয়েছে। তার পূর্বপুরুষের ধর্মমতকে সে ভ্রমাত্মক মনে করে কিনা এই কথা আমি তার কাছে জানতে চাইলাম। সে জবাব দিল, "না।" তখন আমি বললাম: "বাইবেলকে অন্যতম প্রধান ধর্মপুস্তক এবং যীশুকে পৃথিবীর একজন মহান ধর্মপ্রচারক বলে স্বীকার করতে কি তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে? আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে আপনি আপনার রচনাবলীর মারফৎ কোন ভারতবাসীকে বাইবেলের ভজনা করতে বা খ্রীস্টান হতে বলেননি। আমার মতে সে তাই আপনার বইএর ভুল অর্থ করেছে। অবশ্য আপনি যদি পরলোকগত মহম্মদ আলি সাহেবের মত না হন, তা হলেই পূর্বোক্ত উক্তি আপনার প্রতি প্রযোজ্য হবে। কারণ মহম্মদ আলি সাহেব মনে করতেন, "ইসলাম আশ্রয়ী মুসলমান যত অসৎ জীবন যাপন করুক না কেন, একজন সৎ হিন্দুর চেয়ে সে ভাল।"

এনড্রুজ: মহম্মদ আলি সাহেবের দৃষ্টিকোণ আমি সমর্থন করি না। তবে একথা আমাকে বলতেই হবে যে কোন ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হবার প্রয়োজন বোধ করলে আমি তার পথে বাধা হব না।

গান্ধীজী: কিন্তু আপনি কি এই কথা উপলব্ধি করছেন না যে আপনি তাঁকে একটা সুযোগ পর্যন্ত দিচ্ছেন না? আপনি তাঁকে একবার জেরা করেও দেখছেন না। কোন খ্রীস্টান যদি আমার কাছে এসে বলেন যে তিনি ভগবদ্গীতা পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছেন এবং তাই নিজেকে হিন্দু বলে ঘোষণা করতে চান, আমি তাঁকে বলব, "না, তার প্রয়োজন নেই। কারণ ভগবদ্গীতাতে যা পেয়েছেন, বাইবেলেও তা-ই পাবেন। আপনি এখনও বাইবেল থেকে এটা খুঁজে নেবার চেষ্টা করেন নি। এই প্রচেষ্টায় লেগে পড়ুন এবং আদর্শ খ্রীস্টান হোন।"

এনড্রুজ: আমি বলতে পারছি না। আন্তরিকভাবে যদি কেউ একথা বলেন, তিনি ভাল খ্রীস্টান হতে চান, আমি তার জবাবে বলব, "আপনি যেন তাই-ই হন।" তবে আপনার বোধ হয় জানা আছে যে নিজের জীবনে আমি এ বিষয়ে অতি উৎসাহী যাঁরা আমার কাছে এসেছেন, তাঁদের মানা-ই করেছি। তাঁদের আমি বলেছি, "নিছক আমার খাতিরে আপনারা যেন এরকম না করেন।" কিন্তু মানুষের স্বভাবই এমন যে তার একটা দৃঢ়মূল ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হয়।

গান্ধীজী : কেউ যদি বাইবেলে বিশ্বাসী হতে চান তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু তিনি নিজধর্ম পরিত্যাগ করবেন কেন? এই স্বধর্ম ত্যাগ করার ফলে কখনও পৃথিবীর শান্তি বজায় থাকবে না। ধর্ম একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী আদর্শ জীবন যাপন করে আমরা যেন পরস্পরের ভাল দিকগুলি গ্রহণ করি। এইভাবে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার মানবীয় প্রচেষ্টা পুষ্ট হয়।

গান্ধীজী আরও বললেন, "পারস্পরিক সহনশীলতা না সর্বধর্মে সমভাব—এ দুয়ের কোনটা গ্রহণ করবেন, তা বিবেচনা করে দেখুন। আমার মতে যাবতীয় প্রধান প্রধান ধর্মমত মূলতঃ সমান। তাই অপরাপর ধর্মের প্রতি নিজ ধর্মের মতই গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। স্মরণ রাখবেন পারস্পরিক সহনশীলতা নয়, সমান শ্রদ্ধা।"

(হরিজন, ২৮-১১-১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৩০)

সকলের বিবেক এক পর্যায়ের নয়। সুতরাং ব্যক্তিগত আচরণের পক্ষে নিজ বিবেকের নির্দেশ উত্তম পথপ্রদর্শক হলেও সেই আচরণবিধি আর সকলের উপর চাপিয়ে দেবার অর্থ তাঁদের বিবেক-স্বাতন্ত্রে অসহনীয় হস্তক্ষেপ।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-৯-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৩৪)

শ্রেয়তর পন্থা

সত্য ও অহিংসার প্রচার করতে হলে পুঁথিপত্রের চেয়ে জীবনে ঐ আদর্শগুলির প্রত্যক্ষ রূপায়ণ অনেক বেশী কার্যকরী। আদর্শ জীবন গ্রন্থের চেয়ে অনেক উঁচু দরের জিনিস।

(হরিজন, ১৩-৫-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১২২)

বহু অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার পর আমি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি : (১) সব ধর্মই সত্য ; (২) সব ধর্মেই কিছু না কিছু ভুল আছে ; (৩) সব ধর্মই আমার নিজের ধর্মমত হিন্দুধর্মের মতই আমার কাছে সমান প্রিয়। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতই আমার আপন জন হওয়া উচিত। নিজ ধর্মবিশ্বাসকে আমি যতটা শ্রদ্ধা করি অপরাপর ধর্মের প্রতিও ঠিক ততটা শ্রদ্ধা পোষণ করি।

("সবরমতী", ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৭)

ভগবান আছেন

আমাদের যখন অস্তিত্ব আছে আর যদি আমাদের পিতা বা তাঁরও পিতা থেকে থাকেন, তাহলে সমগ্র সৃষ্টির জনক পরম পিতার অস্তিত্ব বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত ব্যাপার। তিনি না থাকলে আমাদেরও অস্তিত্ব নেই। তিনি এক হয়েও বহু। তিনি একাধারে পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র এবং হিমালয় সদৃশ বিশাল। সমুদ্রের বারি-বিন্দুতেও তিনি আছেন; অথচ সপ্তসাগরের পরিধির মধ্যে তাঁকে বেষ্টন করা যায় না। যুক্তি তাঁকে জানার ব্যাপারে অক্ষম। তিনি যুক্তির আয়ত্তবহির্ভূত। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশী আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে বিশ্বাস অপরিহার্য জিনিস। আমার যুক্তি দিয়ে আমি অসংখ্য সংজ্ঞা উপস্থাপিত বা খণ্ডন করতে পারি। কোন নাস্তিক হয়ত আমাকে তর্কে নিরুত্তর করে দিতে পারেন, কিন্তু আমার যুক্তির চেয়েও বিশ্বাসের প্রভাব এত গভীর যে সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশ্যে আমি চিৎকার করে বলতে পারি, "ভগবান আছেন এবং চিরকালই থাকবেন।"

তবে যাঁরা তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চান, তাঁদের সে স্বাধীনতা রয়েছে। তিনি দয়ালু, তিনি করুণাময়। তিনি কোন পার্থিব সম্রাট নন যে সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে আমাদের আনুগত্য আদায় করবেন। তিনি আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, যদিও তাঁর করুণার কারণ স্বতঃই তাঁর ইচ্ছার অধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। তবুও আমাদের ভিতর কেউ তাঁর অভিপ্রায়ের কাছে নতিস্বীকার করতে না চাইলে তিনি বলেন, "তথাস্তু। এর জন্য আমার সূর্য তোমাকে কম আলোক বা উত্তাপ দেবে না। আমার মেঘপুঞ্জ তোমার উদ্দেশ্যে কম বর্ষণ করবে না। আমার অধীনতা স্বীকার করার জন্য তোমাকে আমি বাধ্য করব না।" অজ্ঞরা এই রকম ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করুন। আমি তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাসী অগণিত জনসাধারণের একজন এবং আমি তাই কখনও তাঁর কাছে নতিস্বীকার করতে ও তাঁর গুণগান করতে ক্লান্ত হই না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩০-৩১)

সর্বত্র এমন একটা রহস্যময় শক্তি রয়েছে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। এই শক্তিকে দেখতে না পেলেও আমি অনুভব করতে পারি। এই অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করলেও এ মোটেই প্রমাণগ্রাহ্য নয়। আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা যে সব জিনিস সম্বন্ধে জানতে পারি এ তার থেকে ভিন্নতর কোন শক্তি। এ শক্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত।

তবে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব। এমন কি দৈনন্দিন কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে জনসাধারণ একথা জানে না যে কে কেন এবং কিভাবে এই জগৎসংসার চালাচ্ছেন। তাহলেও এটুকু কিন্তু তাদের জানা আছে যে এই বিশ্বের নিয়ামক একটা কোন শক্তি আছে। গত বৎসর মহিশূর সফরের সময় আমি এমন বহু দরিদ্র গ্রামবাসীর সংস্পর্শে এসেছিলাম যাঁরা ঐ দেশীয়রাজ্যের শাসক যে কে, তা জানতেন না। তাঁরা কেবল এইটুকু জানালেন যে কোন ভগবান ওখানকার রাজা। মহিশূরের রাজার তুলনায় ঐ গ্রামবাসীদের যা অবস্থা ভগবানের তুলনায় আমার অবস্থা নিঃসন্দেহে তার চেয়ে অনেক হীন। সুতরাং নিজেদের রাজা সম্বন্ধে ওঁদের জ্ঞান যখন অত সীমাবদ্ধ তখন রাজার রাজা ভগবানের অস্তিত্ব আমি উপলব্ধি না করতে পারলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে মহিশূরের দরিদ্র গ্রামবাসীরা তাঁদের রাজ্য সম্বন্ধে যেমন ভাবতেন আমিও তেমনি মনে করি যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটা সুসংবদ্ধ বিধান কাজ করছে, এই পৃথিবীর প্রতিটি জীবিত প্রাণী ও বস্তুকে পরিচালনাকারী একটা অপরিবর্তনীয় নিয়ম এখানে রয়েছে। এ নিয়ম অন্ধ নয়; কারণ কোন অন্ধ বিধান জীবিত প্রাণীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আর স্যার জগদীশ বসুর চমৎকার আবিষ্কারের দৌলতে আজ এ কথা প্রমাণ করা যায় যে জড়বস্তুও প্রাণহীন নয়। সুতরাং সকল প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণকারী সেই নিয়মই হচ্ছে ঈশ্বর। এক্ষেত্রে নিয়ম ও নিয়ামক অভিন্ন। এই নিয়ম ও নিয়ামক সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু জানি না বলে একে অস্বীকার কারতে পারি না। পার্থিব কোন শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা তাকে অস্বীকার করতে যেমন কোন লাভ নেই তেমনি ঈশ্বর বা তাঁর বিধানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করলেও তাঁর ক্রিয়াবৃত্তের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। অথচ পার্থিব নিয়মকে স্বীকার করার ফলে যেমন জীবনযাত্রা সহজতর হয় তেমনি নীরবে বিনম্র চিত্তে ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলে জীবনের যাত্রাপথ অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর হয়ে ওঠে।

আমি ক্ষীণভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ সব কিছু সতত পরিবর্তনীয় ও মরণশীল হলেও এসবের অন্তর্নিহিত একটি জীবন্ত শক্তি আছে যা অক্ষয় অব্যয়। এই শক্তি সব কিছুর সংহতিবিধায়ক, স্রষ্টা, বিনাশকর্তা এবং পুনরায় সৃজনকারী। এই জীবন্ত শক্তির নামই ঈশ্বর। আর নিছক বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমি যা কিছু দেখি তার কোনটিই চিরকাল টিকবে না বা টিকতে পারে না, একমাত্র তিনিই অবিনশ্বর।

আর এই শক্তি করুণাময় না বিদ্বেষ পরায়ণ? আমি তো একে সম্পূর্ণ করুণাময়রূপেই দেখি। কারণ আমি দেখেছি যে মৃত্যুর মধ্যে জীবনের জয়গান ঘোষিত হচ্ছে, অসত্যের মধ্যে সত্যের অস্তিত্ব রয়েছে আর অন্ধকারের মধ্যে আলোকদ্যুতি উদ্ভাসিত। তাই আমি বলি যে ঈশ্বরই প্রাণ, সত্য ও আলোক। তিনিই প্রেম। তিনিই দেবাদিদেব।

তবে যিনি কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে তৃপ্ত করেন (আদৌ যদি তা করেন) তাঁকে ঈশ্বর বলা যায় না। ভগবানকে ভগবান হতে হলে হৃদয়ে অধিষ্ঠান করতে হবে এবং তিনি অন্তরকে বিকশিত করবেন। তাঁর অনুগতজনের ক্ষুদ্রতম ক্রিয়াকলাপেও হবে তাঁর অভিব্যক্তি। পঞ্চেন্দ্রিয়প্রসূত অনুভূতির চেয়েও প্রকটতর অনুভূতির প্রসাদেই কেবল এ সম্ভব। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা যতই বাস্তব মনে হ'ক না কেন, সময় বিশেষে এ মিথ্যা এবং ছলনাকারী বলে প্রতিপন্ন হয়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই অভ্রান্ত। এর কোন বাহ্য প্রমাণ নেই, যাঁরা সত্য সত্যই অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন তাঁদের পরিবর্তিত আচার আচরণ ও চরিত্রে এর প্রতিফলন হবে।

দেশে দেশে অবতার ও সাধু সন্তদের যে অবিচ্ছিন্ন ধারা-প্রবাহ বয়ে চলেছে তাঁদের অভিজ্ঞতায় এই সত্যের নিদর্শন রয়েছে। একে অবিশ্বাস করার অর্থ নিজেকেই অস্বীকার করা।

এই অনুভূতি লাভ করার পূর্বে অবিচল বিশ্বাস-সম্পদ ধারণ করা চাই। যাঁর ভিতর ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস আছে তিনিই কেবল মরদেহধারী হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতে পারেন। আর বিশ্বাস যেহেতু কোন বাহ্য প্রমাণনির্ভর নয়, সেইজন্য সর্বাপেক্ষা নির্ঝঞ্ঝাট পন্থা হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী নৈতিক রাজ্যের উপর আস্থা রাখা। এর অর্থ হচ্ছে নৈতিক বিধানাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব—সত্য এবং প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব। যা কিছু এই সত্য ও প্রেমনীতির বহির্ভূত তাকে অচিরাৎ বাতিল করার দৃঢ় প্রস্তুতি থাকলে এইভাবে বিশ্বাসের শরণ নেওয়া নিরাপদ হয়।

ঈশ্বরের স্বরূপ

ভগবানকে আমি মানবপ্রকল্প জ্ঞান করি না। আমার কাছে সত্যই ঈশ্বর। পার্থিব রাজা এবং তাঁর বিধানের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু ঈশ্বর ও তাঁর বিধানের মধ্যে কোন দ্বৈত নেই—উভয় বস্তু বা তথ্য এক ও অভিন্ন। ভগবান

একটি ধারণা (Idea) বলে স্বয়ং তিনিই বিধান। সুতরাং ঈশ্বর তাঁর নিয়ম ভঙ্গ করছেন এ কথা কল্পনা করা অসম্ভব। তিনি তাই একান্তে অসম্পৃক্ত থেকে আমাদের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেন না। তিনি আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেছেন—এই উক্তি করার সময় বুঝতে হবে আমরা কেবল মানবীয় ভাষা ব্যবহার করছি এবং তাঁকে সীমাবদ্ধ করার প্রযত্ন করছি। নচেৎ তিনি ও তাঁর বিধান সর্বঘটে বিরাজিত ও বিশ্বের তাবৎ বস্তু ও কর্মের নিয়ামক। আমি তাই এ কথা বিশ্বাস করি না যে তিনি আমাদের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি যাজ্ঞা পূর্ণ করেন; তবে তিনি যে আমাদের সর্ববিধ আচরণ নিয়ন্ত্রিত করেন এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আমি তাই অক্ষরে অক্ষরে এই কথা বিশ্বাস করি যে একটি ঘাসের শিষও তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে জন্মাতে বা আন্দোলিত হতে পারে না। আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি জনবহুল জাহাজের একক যাত্রীর ক্ষমতার চেয়েও কম।

"ঈশ্বরসন্নিধি কি আপনার ভিতর স্বাধীনতার অনুভূতি জাগায়?"

জাগায়। যাত্রী বোঝাই কোন নৌকায় উঠলে আমি আড়ষ্টবোধ করলেও ঈশ্বরসন্নিধির অনুভূতি কিন্তু তার থেকে ভিন্নতর। তবে আমি এও জানি যে আমার এই স্বাধীনতা নৌকার আরোহী যে কোন যাত্রীর চেয়েও কম। আর এই স্বতন্ত্রতাকে আমি গীতার অর্থে বরেণ্য জ্ঞান করি। গীতার মূল শিক্ষা হচ্ছে এই যে মানুষ নিজ নিয়তির স্রষ্টা, অর্থাৎ এই স্বাধীনতাকে মানুষ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু ফলের নিয়ন্ত্রণকারী মানুষ নয়। ফলাসক্তি বা পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা এলেই দুঃখ অনিবার্য।

(হরিজন, ২৩-৩-১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৫)

পূর্ণতা ঈশ্বরের বিভূতি; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি সুমহান লোকানুরঞ্জনকারী। আমাদের কারণ তাঁকে কত অন্যায় ও ছলনা সহন করতে হয়। তিনি এমন কি তাঁরই সৃষ্ট আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীবকে একেবারে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় করারও অবকাশ দেন। অথচ আমাদের অণু পরমাণুতে তিনি, আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশে তিনি, আমাদের সত্তার অন্তরস্থলে তিনি। তবে নিজ ইচ্ছানুসারে যাঁকে ইচ্ছা দর্শন দেবার অধিকার তিনি নিজের হাতেই রেখেছেন। তিনি হস্ত পদ ইত্যাদি অঙ্গবিহীন এক সত্তা হলেও যাঁর উপর অনুগ্রহ হয়, তিনি তাঁকে দেখতে পান।

(হরিজন, ১৪-১১-১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১৬)

নিছক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে ঈশ্বর ভাল মন্দ দুয়েরই মূলে আছেন বলতে হবে। শল্য চিকিৎসকের ছুরিকার মত হত্যাকারীর তলোয়ারকেও তিনিই পরিচালিত করেন। তবে মানবকল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাল ও মন্দ পরস্পর অসম্পৃক্ত, এর একটির সঙ্গে অপরটির মিল হতে পারে না। ভাল ও মন্দ তাই আলোক ও অন্ধকারের, ঈশ্বর ও শয়তানের প্রতীক।

(হরিজন, ২০-২-১৯৩৭, পৃষ্ঠা ৯)

প্রকৃতির বিধান অন্তহীন ও অপরিবর্তনীয়। এই বিধান ভঙ্গ করা বা এতে হস্তক্ষেপের ব্যাপারে কোন অলৌকিকত্বের স্থান নেই। কিন্তু আমরা সসীম বলে সব রকম ব্যাপারে কল্পনা করে নিই এবং আমাদের সীমাবদ্ধতা ঈশ্বরের উপর আরোপ করে থাকি।

(হরিজন, ১৭-৪-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৮৭)

আমার কাছে সত্য ও প্রেমই ঈশ্বর ; ঈশ্বর হচ্ছেন নীতিমত্তা ও নৈতিকতা ; ঈশ্বরের অর্থ নির্ভীকতা। ঈশ্বর বিশ্বচরাচরের সমস্ত আলোক ও জীবনের উৎস, অথচ তিনি এ সবের ঊর্ধ্বে—এ সবের অতীত। ঈশ্বর হচ্ছেন বিবেক। তিনি এমনকি নাস্তিকদের নাস্তিক্যবাদ। কারণ তিনি তাঁর অপ্রমেয় প্রেমবৃত্তের মধ্যে নাস্তিকদেরও বসবাস করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি হৃদয়অনুসন্ধানকারী। তিনি বাক্ ও যুক্তির অতীত। তিনি স্বয়ং আমাদেরকে ও আমাদের অন্তরকে আমাদের চেয়েও ভালভাবে জানেন। আমাদের মুখের কথা দিয়ে তিনি আমাদের বিচার করেন না ; কারণ তিনি জানেন যে কখনও জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতে আমরা মনে এক ও কথায় আর এক হয়ে থাকি। যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যকামী তাঁদের কাছে ঈশ্বর মানবপ্রকল্প। তাঁর স্পর্শাকাঙ্ক্ষীদেরও ইচ্ছা পূরিত হয়। তিনিই শুদ্ধতম সত্তা। বিশ্বাসীদের কাছে তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তিনিই সবার সব কিছু। তিনি আমাদের ভিতর থেকেও আমাদের থেকে বহুদূর। ইচ্ছা করলে কেউ 'ঈশ্বর' শব্দটিকে বর্জন করতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারও নেই। আর 'ঈশর'রূপী ছোট্ট অথচ সহজ সরল শব্দটির পরিবর্তে 'বিবেক' নামক শব্দটি ব্যবহার করা অন্যভাবে ভাব প্রকাশের দিক থেকে নিঃসন্দেহে এক ব্যঞ্জনাবিহীন ও কষ্টকল্পিত প্রচেষ্টা। তাঁর নামে ঘৃণ্য দুর্নীতি ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতার আচরণ করা হয় বলেই তাঁর অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায় না। তিনি কৃচ্ছ্রসাধনায় অদ্বিতীয়। তিনি ধৈর্যাবতার, অথচ সময়ে ভয়াল ভয়ঙ্কর। তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান

পুরুষ। আমাদের প্রতিবেশী মানব এবং মানবেতর প্রাণীর প্রতি আমরা যে রকম আচরণ করি, তাঁর কাছ থেকেও তদ্রূপ ব্যবহার পাব। অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি চিরক্ষমাশীল; কারণ তাঁর কাছে অনুতাপ করার দ্বার সর্বদাই খোলা রয়েছে। তিনি এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক পুরুষ; কারণ ভাল মন্দের থেকে ইচ্ছানুযায়ী বেছে নেবার 'স্বাধীনতা' তিনি আমাদের দিয়েছেন। অপর পক্ষে তিনি আবার ভীষণতম স্বৈরাচারী। কারণ সময় সময় তিনি একেবারে আমাদের মুখের কাছে ধরা পানপাত্র দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন ও স্বতন্ত্র ইচ্ছার নামে আমাদের এমন সঙ্কীর্ণ জায়গায় নিয়ে যান যেখানে আমাদের দুঃখ দুর্দশা কেবল তাঁর খুশীর খোরাক জোগায়। এইজন্য হিন্দুধর্মে তাঁর যাবতীয় কার্যকলাপকে লীলা বা মায়া আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমরা সব অ-সৎ, একমাত্র তিনিই সৎ। তাই আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিত্য তাঁর গুণগান করা ও তাঁর আজ্ঞা পালন করা। আমরা যেন তাঁর বাঁশীর সুরে নৃত্য করতে পারি, তাহলেই সব কিছু ঠিক চলবে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৩-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৮১)

[গোল টেবিল বৈঠক থেকে ফেরার পথে সুইজারল্যাণ্ডের একটি সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন :]

আপনাদের প্রশ্ন হল এই যে সত্যকেই আমি ঈশ্বর মনে করি কেন? বাল্যকালে আমি হিন্দু প্রথানুযায়ী ঈশ্বরের সহস্র নাম কণ্ঠস্থ করতে শিখেছিলাম। তবে ঈশ্বরের কেবল ঐ এক সহস্রই নাম নয়। আমি বিশ্বাস করি (আর আমার মতে এ বিশ্বাস সংশয়াতীতভাবে সত্য) যে পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, ঈশ্বরের নামও তত এবং তারই জন্য আমরা ভগবানকে অনামী বলে থাকি। এইভাবে ঈশ্বরের অসংখ্য রূপ আছে বলে তাঁকে বর্ণনাতীত ইত্যাদি মনে করা হয়। অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার সময়ও আমি দেখলাম যে ইসলামেও ঈশ্বরের বহু নাম। সুতরাং ঈশ্বরকে যাঁরা প্রেমরূপ বলেন আমি তাঁদের সঙ্গেও একমত। তবে মনে মনে আমি বলি যে ভগবান প্রেমরূপ হলেও সর্বোপরি তিনি সত্য-স্বরূপ। মানুষের পক্ষে যদি ঈশ্বরের পরিপূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব হয় তাহলে আমার নিজের সম্বন্ধে আমি আর এক পা এগিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে আমি আর এক ধাপ এগিয়ে যাই এবং বলি যে সত্যই ঈশ্বর। ঈশ্বর সত্য এবং সত্যই ঈশ্বর—

এই দুই উক্তির মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে তা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সত্যের জন্য যে অব্যাহত ও দুরূহ অনুসন্ধান শুরু হয়, তার পরিণামস্বরূপ আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। অতঃপর আমি দেখতে পেলাম যে সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি যা, তার নাম হচ্ছে প্রেম। তবে আমি জানি যে প্রেম শব্দটির একাধিক অর্থ হতে পারে এবং কাম আধারিত মানবীয় প্রেম সময় বিশেষে ন্যক্কারজনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি এও দেখতে পেলাম যে অহিংসার অর্থে প্রেমের অনুগামীর সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই কম। 'সত্য' শব্দটি কিন্তু দ্ব্যর্থবাচক নয় এবং এমন কি নাস্তিকরাও সত্যের প্রয়োজনীয়তা ও শক্তি সম্বন্ধে দ্বিমত করেননি। তবে সত্যানুসন্ধানের অতি আগ্রহের কারণ নাস্তিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করতে ইতস্ততঃ করেননি। আর তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে এ রকম করা যথার্থই হয়েছে। এই যুক্তির জন্যই আমি দেখলাম যে ঈশ্বর সত্য বলার চেয়ে বরং সত্যই ঈশ্বর বলা অধিকতর সঙ্গত। এ প্রসঙ্গে নাস্তিকরূপে আত্মপরিচয়দানকারী চার্লস ব্রাডল-এর কথা মনে পড়ছে। তবে আমি তাঁকে কিছুটা জানি বলে তিনি যে নাস্তিক এ কথা স্বীকার করতে আমি কোন মতেই রাজী নই। আমি তাঁকে ঈশ্বরভীরু ব্যক্তি বলব; অবশ্য আমি জানি যে তিনি স্বয়ং এ দাবী অস্বীকার করবেন। তাঁকে যদি আমি বলি, "শ্রীযুক্ত ব্রাডল, আপনি সত্যভীরু বলে ঈশ্বরভীরুও বটেন," তাহলে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু সত্যই ঈশ্বর বলে আমি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তাঁর প্রতিবাদের পথ বন্ধ করে দেব আর সত্য সত্যই এই ভাবে আমি বহু যুবকের বিরূপ সমালোচনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছি। ভগবানের নাম নিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক সেই নামের আড়ালে যে সব অকথ্য অন্যায় আচরণ করেছে তজ্জনিত প্রচণ্ড অসুবিধার কথাও এর সঙ্গে যোগ করুন। বিজ্ঞানীরা সত্যের দোহাই দিয়ে প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের নিষ্ঠুর আচরণ যে করেন না, তা নয়। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদের সময় মানুষ পশুদের উপর সত্য ও বিজ্ঞানের নামে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করে তার কথা আমি জানি। সুতরাং যে দিক থেকেই ভগবানের বর্ণনা করতে যান না কেন, একাধিক অসুবিধা রয়েছে। কিন্তু মানুষের মন সীমাবদ্ধ। তাই মানুষের ধারণাশক্তির বহির্ভূত কোন সত্তার কথা চিন্তা করতে গেলে এই অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা কোন না কোন প্রকারে থেকেই যাবে।

হিন্দু দর্শনে আর একটি জিনিস আছে। হিন্দু দর্শন বলে যে একমাত্র ঈশ্বরই সৎ বা আছেন, আর কোন কিছুই নেই। ইসলামের কলমাতেও ঐ একই

সত্যের প্রতিধ্বনি ও নিদর্শন বিদ্যমান। হিন্দু দর্শন স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে একমাত্র ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব আছে, আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। বস্তুত পক্ষে সংস্কৃতের "সৎ" শব্দটির আভিধানিক অর্থই হল যার অস্তিত্ব আছে। এইসব এবং এই জাতীয় আরও অনেক কারণের জন্য "সত্যই ঈশ্বর" সংজ্ঞাটি আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। সুতরাং সত্যকে ঈশ্বররূপে উপলব্ধি করতে হলে এর একমাত্র পন্থা হচ্ছে প্রেমের পথ। আর যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে শেষ অবধি লক্ষ্য ও উপায় পর্যায়বাচক শব্দ, তাই ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ বলতে আমার কোন সঙ্কোচ হবার কথা নয়।

"তাহলে সত্য কাকে বলে?"

প্রশ্নটি কঠিন। তবে বিবেক যে নির্দেশ দেয়, তা-ই সত্য বলে আমি নিজের জন্য এই প্রশ্নটির একটি সমাধান করে নিয়েছি। কিন্তু আপনারা বলতে পারেন যে তাহলে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের এবং এমন কি অনেক সময় পরস্পরবিরোধী সত্যের কথা বলেন কি করে? এর জবাবে আমি বলব যে মানুষের মন অসংখ্য মাধ্যমের মারফৎ কাজ করে এবং মনের বিকাশের ধারা সকলের পক্ষে একই রকম নয় দেখে এই কথা বলতে হয় যে একজনের পক্ষে যা সত্য অপরজনের পক্ষে তা অসত্য হতেও পারে এবং সেইজন্য যাঁরা এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এই জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কয়েকটি অপরিহার্য শর্ত আছে। বৈজ্ঞানিক বীক্ষণ-কার্যের জন্য যেমন পূর্বে কতকগুলি অপরিহার্য বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা নিতে হয়, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যও তেমনি কিছু কিছু প্রারম্ভিক অনুশীলন প্রয়োজন। সুতরাং নিজ নিজ বিবেক বা অন্তরাত্মার বাণীর কথা বলার পূর্বে প্রত্যেককে এই বিষয়ে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রাখতে হবে। অতএব অভিজ্ঞতার আধারে আমাদের ভিতর এই বিশ্বাস স্থায়ী হয়েছে যে সত্যরূপী ঈশ্বরের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সাধনা করার পূর্বে মানুষকে প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে কয়েকটি ব্রত পালন করতে হবে। এই ব্রতগুলি হচ্ছে সত্য, ব্রহ্মচর্য (কারণ আপনাদের পক্ষে সম্ভবতঃ আর কোন কিছুকে সত্য ও ঈশ্বরপ্রেমের ভাগীদার করা সম্ভবপর নয়), অহিংসা, কৃচ্ছ্রতা ও অপরিগ্রহ। পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ ব্রতে নিপুণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে এই পরীক্ষায় নামাই উচিত হবে না। হিন্দুশাস্ত্রে অবশ্য আরও একাধিক শর্তের কথা আছে; কিন্তু আমি আপনাদের অতসব জটিলতার মধ্যে নিয়ে যাব না। এখানে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে এই

পথের সাধকদের একথা জানা আছে যে প্রত্যেকেরই নির্বিচারে বিবেকের বাণী শ্রবণ করার দাবী করা সমীচীন নয়। এর কারণ এই যে আজ আমরা প্রায় সকলেই বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী চলার অধিকার দাবী করি অথচ এর জন্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক অনুশীলনের পটভূমিকা আমাদের থাকে না। এর ফলে বিমূঢ় বিশ্বের সম্মুখে এত অসত্যাচরণ হয়ে চলেছে। অতএব বিনম্রভাবে আমি যেটুকু আপনাদের বলতে পারি তা এই যে যাঁর ভিতর যথোচিত বিনয়ের অভাব, তিনি কখনও সত্যের আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন না। সত্যসাগরে সন্তরণ করতে হলে নিজেকে শূন্যে পরিণত করতে হবে। আপততঃ এই চিত্তাকর্ষক পন্থায় এর চেয়ে অধিক দূর যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩১-১২-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪২৭-২৮)

ভগবানের অগণিত সংজ্ঞার্থ; কারণ তিনি অসংখ্যরূপে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের এই অসংখ্য প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে আমি সম্ভ্রমের ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ি, কখনও কখনও আবার বিহ্বল হই। তবে আমি ভজনা করি কেবল সত্যরূপী ভগবানকে। এখনও অবশ্য তাঁকে আমি পরিপূর্ণভাবে পাইনি, তবে এর জন্য আমার প্রয়াস চলছে। অন্বেষণের এই অভিযানে আমি আমার সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এবং এর জন্য যদি আত্মবলি দেওয়া প্রয়োজন হয় তার জন্যও আমি যেন তৈরী থাকি। তবে যতদিন পর্যন্ত না আমি সেই শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করছি, ততদিন পর্যন্ত আমার চিত্তলোকে উদ্ভাসিত আপেক্ষিক সত্যকেই আমি আঁকড়ে থাকব। ততদিন পর্যন্ত এই আপেক্ষিক সত্যই হবে আমার ধ্রুবতারা, আমার বর্ম এবং আমার ঢাল। এ পথ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" হলেও আমার কাছে এ-ই সংক্ষিপ্ততম ও সরলতম পন্থা। নিষ্ঠাসহকারে এই পথ আঁকড়ে রয়েছি বলে আমার হিমালয় প্রমাণ ভ্রান্তিও যৎকিঞ্চিৎ প্রতিভাত হয়েছে। কারণ এই পথ আমাকে অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হতে দেয়নি এবং আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী আমি এগিয়ে চলেছি। চলার পথে ক্বচিৎ কখনও শাশ্বত সত্য—ঈশ্বরের অস্পষ্ট আভাস আমি পেয়েছি এবং তারই ফলে প্রতিদিন আমার মধ্যে এই প্রত্যয় দৃঢ়মূল হচ্ছে যে একমাত্র তিনিই সত্য, আর সবই মায়া।

আমার মনে ক্রমশঃ এই বিশ্বাসও জাগছে যে একটি শিশুর পক্ষেও আমার মত অনুভূতি লাভ করা সম্ভব। এ উক্তির পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কারণ সত্যানুসন্ধানের উপায় যত কঠিন, ততই আবার সরল। কোন অহঙ্কারী ব্যক্তির

কাছে এই উপায়ের অনুবর্তন অসম্ভব মনে হলেও নিষ্পাপ শিশুর কাছে এই পন্থাই আবার খুব সহজ মনে হতে পারে। সত্যসন্ধানীকে ধূলিকণার চেয়েও নম্র হতে হবে। বিশ্ববাসী ধূলিকণাদের পদতলে দলিত করে চলে যায় ; কিন্তু সত্যসন্ধানীকে এত বিনম্র হতে হবে যে ধূলিকণাও যেন তাঁকে পদদলিত করতে পারে।

আমার মত শত শত ব্যক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, কিন্তু সত্য জয়ী হোক।

("আত্মকথার" ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৬-৭)

আমার অনুভূতির ঈশ্বর

আপনি ও আমি এই কামরায় বসে আছি—এই তথ্যের চেয়েও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। এ ছাড়া আমি শপথ করে বলতে পারি যে জল ও বায়ু ছাড়া আমার পক্ষে বাঁচা সম্ভব হলেও তাঁর সান্নিধ্য ব্যতীত জীবনধারণ করা অসম্ভব। আপনি আমার চোখ উপড়ে ফেলতে পারেন, তাতে আমার প্রাণ চলে যাবে না ; আমার নাসিকা কর্তিত হলেও আমি জীবিত থাকব। কিন্তু আমার ঈশ্বর-বিশ্বাস বিনষ্ট হওয়ামাত্র আমার মত্যু হয়ে যাবে। আমার এই মনোভাবকে আপনারা কুসংস্কার আখ্যা দিতে পারেন। আপনাদের এ অভিযোগ আমি মেনে নেব। ছেলেবেলায় যেমন কোন কারণে ভয় বা আতঙ্ক হলেই আমি রাম নাম নিতাম, এও হয়ত সেই রকম।

(হরিজন, ১৪-৫-১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১০৯)

আমার বয়স পনের বছর হবার পূর্বেই আমি সজ্ঞানে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে শিখি।

(হরিজন, ১১-৩-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৬)

অস্তাচলগামী সূর্য কিংবা চন্দ্রমার শোভাদৃষ্টে মুগ্ধ হবার সময় আমার আত্মা আমাদের সকলের স্রষ্টার বন্দনায় মগ্ন হয়ে যায়। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই আমি তাঁকে এবং তাঁর করুণাধারা প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস করি।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১১-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৭৮)

আমি যা চাই এবং বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ যার জন্য আমি নিরন্তর প্রয়াস করছি, তা হচ্ছে আত্মজ্ঞান বা আত্মোপলব্ধি। আমি ঈশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার চাই, আমি চাই মোক্ষ। এই লক্ষ্যের পরিপূর্তির জন্যই আমার জীবনধারণ এবং আমি যে সব কাজকর্ম করছি, তার উদ্দেশ্যও এই লক্ষ্যসিদ্ধি।

আমার বক্তৃতা রচনা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে যাবতীয় দুঃসাহসিক প্রয়াস—সে সব কিছুরই অন্তিম লক্ষ্য পূর্বোক্ত আদর্শের পরিপূর্তি।

("আত্মকথার" ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪-৫)

এখনও আমি তাঁর কাছ থেকে এতদূরে বলে আমার মনে বিরামহীন পীড়া। কারণ আমি জানি যে তিনি আমার জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ামক এবং আমি তাঁরই আত্মজ। আমি বুঝতে পারি যে আমার অভ্যন্তরস্থ কুপ্রবৃত্তিসমূহের কারণ আমি তাঁর কাছ থেকে এতদূরে পড়ে রয়েছি; কিন্তু তবু আমি ঐ সব কুপ্রবৃত্তির প্রভাবমুক্ত হতে পারছি না।

("আত্মকথার" ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৮)

ভগবানকে আমার একমাত্র কাণ্ডারী জ্ঞান করে আমি এগিয়ে চলব। তিনি এক ঈর্ষাপরায়ণ প্রভু। আর কেউ তাঁর কর্তৃত্বে ভাগ বসাক, এ তাঁর পক্ষে অসহ্য। মানুষকে তাই তাঁর সামনে শূন্য হস্তে নিজের সব দুর্বলতা নিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দাঁড়াতে হবে। আর তাহলেই তিনি মানুষের ভিতর সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চার করবেন এবং তাকে সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-৯-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৭)

ভবিষ্যৎ দেখার কোন আকাঙ্ক্ষা আমার মনে নেই। আমার কাজ বর্তমান সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। পরবর্তী মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে দেননি। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১২-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৯৭)

আমাকে রক্ষা করার প্রয়াস করবেন না। সর্বোপরি বিরাজিত তিনিই তো আমাদের সকলকে রক্ষা করার জন্য রয়েছেন। আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখুন যে আমার সময় ফুরিয়ে গেলে কারও—এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিরও সাধ্য নাই যে তাঁর এবং আমার মাঝখানে দাঁড়ায়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৪-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৪)

ভগবান যতদিন চাইবেন যে আমি আমার এই শরীরের মধ্যে থাকি, ততদিন তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। যে মুহূর্তে তাঁর প্রয়োজন সমাপ্ত হবে, আমার কোন সাবধানতাই আর তখন আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

("মীরাকে লিখিত বাপুর পত্র", ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯১)

এই বিশ্বে আমার পরিচিত সকল প্রভুর মধ্যে ঈশ্বরই সর্বাপেক্ষা কঠোরভাবে সমর্পিত দায়িত্বের হিসাব নিকাশ করে থাকেন। তিনি মানুষের আগাগোড়া

পরীক্ষা নেন। কিন্তু যখনই দেখবেন যে আপনার বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসছে বা আপনার দেহ নির্ধারিত কাজ করতে সক্ষম না হওয়ায় আপনি পতনোন্মুখ, তখনই তিনি কোন না কোন ভাবে আপনার সহায়তার্থ এগিয়ে আসেন। এইভাবে তিনি প্রমাণ করেন যে মানুষ যেন বিশ্বাস না হারায় এবং ভগবান সদাসর্বদা মানুষের হাতের কাছেই রয়েছেন। তবে তিনি আমাদের শর্তে নয়, তাঁর নিজের শর্তে মানুষকে সাহায্য দিয়ে থাকেন।

("স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী" চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০৬৯)

গীতার অনুগামীর চিত্তে তাবৎ ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া হয় যন্ত্রীর ইঙ্গিতে চালিত যন্ত্রের মত স্বাভাবিক ও স্বয়ংক্রিয়। বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এইভাবে যন্ত্রে পর্যবসিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন কার্য। কিন্তু যাঁর আকাঙ্ক্ষা শূন্যবৎ হওয়া, তাঁকে মহাযন্ত্রীর যন্ত্র হতেই হবে। যন্ত্র ও মানুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে যন্ত্র অচেতন, কিন্তু মানুষ জীবন্ত এবং সেই মহাযন্ত্রীর হাতে সে স্বেচ্ছায় যন্ত্রস্বরূপ হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুবার বলেছেন যে একটি যন্ত্রের অংশের মত ভগবান সব কিছুকে চালিত করেন।

("মীরাকে লিখিত বাপুর পত্র", ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৩)

অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল যাবৎ আমি এই মহা পরাক্রমশালী প্রভুর একান্ত অনুগত কৃতদাস হয়ে আছি। দিনের পর দিন তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমাগত অধিক মাত্রায় আমার শ্রুতিগোচর হয়েছে। আমার চরমতম বিপদের দিনেও তিনি আমাকে পরিত্যাগ করে যাননি। একাধিকবার তিনি আমাকে আমারই হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং আমার তিলমাত্র স্বাধীনতাও অবশিষ্ট রাখেননি। তাঁর কাছে যতই আত্মসমর্পণ করেছি, ততই আমার আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(হরিজন, ৬-৫-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪)

যেন তিনি অনন্যকর্মা—এইভাবে ভগবান আমাদের সঙ্গে থাকেন ও আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কি ভাবে যে এমন হয়, আমি তা জানি না। তবে এইটুকু জানি যে এ হয়। যাঁদের বিশ্বাস আছে, তাঁদের কাঁধের সব বোঝা তিনি তুলে নেন।

("মীরাকে লিখিত বাপুর পত্র", ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৬৭)

পরাজয় আমাকে হতোদ্যম করতে পারে না। এ কেবল আমাকে আরও শুদ্ধ করে তোলে। আমি জানি যে ঈশ্বর আমাকে পথ দেখাবেন।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-৭-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২১৮)

এমন একটা মুহূর্তও নেই, যখন আমি একজন সর্বব্যাপী সাক্ষীর অস্তিত্ব অনুভব না করি। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচর নয় এবং আমি তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলার প্রয়াস করি।

জীবনের এমন কোন মুহূর্তের কথা মনে পড়ে না, যখন মনে হয়েছে যে আমি ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত।

(হরিজন, ২৪-১২-১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯৫)

আমার মধ্যে যদি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে না পারতাম তাহলে নিত্য যে শত সহস্র দুঃখ দুর্দশা ও হতাশার দৃষ্টান্ত দেখছি তা আমাকে একটি প্রলাপোক্তিকারী বাতিকগ্রস্তে পরিণত করত এবং গঙ্গায় ডুবে মরা ছাড়া আমার আর কোন উপায় থাকত না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৮-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৭২)

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমি এই জীবন্ত সত্তার অস্তিত্ব ক্রমশঃ বেশী করে আমার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত প্রতিটি রক্তকণিকায় উপলব্ধি করছি। এ বোধ না থাকলে আমি উন্মাদ হয়ে যাব। নচেৎ আমার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করার জন্য কত রকমের উপকরণই তো রয়েছে! এই পৃথিবীতে এত সব বিরূপ ঘটনা ঘটে যে সেই সত্তার অস্তিত্বের অনুভূতি না থাকলে আমার জীবনের বনিয়াদ পর্যন্ত নড়ে উঠত। কিন্তু ঐ সব ঘটনা আমাকে একরকম অস্পৃষ্ট রেখে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

("মীরাকে লিখিত বাপুর পত্র", ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৬৮)

আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিটি মানুষের পক্ষেই সেই পরম কল্যাণময় ও অবর্ণনীয় নিষ্পাপ স্থিতিতে উপনীত হওয়া সম্ভব, যেখানে সে নিজের ভিতর ঈশ্বরের অনন্য উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-১১-১৯২১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৬৮)

অন্তরাত্মার বাণী

আমি যে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবার দাবী করি, তা কোন অভূতপূর্ব ব্যাপার নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে একমাত্র সেই বাণী অনুসারে চলার পরিণামের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া এর সত্যতার অপর কোন প্রমাণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

(হরিজন, ৬-৫-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪)

সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি অনেককে বিভ্রান্ত করে ফেলে তা হচ্ছে ভগবানের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধীয় বক্তব্য। এ কি? আমি কী শ্রবণ করেছি? আমি কি কোন স্থুল মূর্তিও দেখেছি নাকি? তা যদি না হবে, তাহলে কণ্ঠস্বর কানে এল কি করে? এ সবই সমীচীন প্রশ্ন।

আমার কাছে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর, বিবেক, সত্য বা অন্তরাত্মার বাণী অথবা "সেই ক্ষীণ কণ্ঠ" ইত্যাদি সবই এক ও অদ্বিতীয় জিনিস। আমি কোন মূর্তি বা আকৃতি দেখিনি। আর মূর্তি ইত্যাদি দেখার জন্য আমি কোন চেষ্টাও করিনি; কারণ চিরকালই আমি নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এসেছি। আমি কেবল বহু দূরাগত অথচ সুস্পষ্ট এক কণ্ঠস্বরের মত শ্রবণ করেছি। এ স্বর আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাক্যালাপে রত কোন মনুষ্যের কণ্ঠস্বরের মতই অভ্রান্ত এবং অপ্রতিরোধ্য। ঐ স্বর শ্রবণকালে আমি স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলাম না। আর ঐ কণ্ঠস্বর শোনবার পূর্বে আমার মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন হচ্ছিল। তারপরই অকস্মাৎ সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি কান পেতে শুনলাম, নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলাম যে এ তাঁরই কণ্ঠ এবং তারপর আমার ভিতরকার সেই ঝড় থেমে গেল। আমি প্রশান্তি বোধ করলাম। অতঃপর এতদনুযায়ী মনে মনে সঙ্কল্প করলাম এবং উপবাসের দিনক্ষণও নির্ধারিত হয়ে গেল। আর তারপর নেমে এল আনন্দের রাজত্ব। রাত এগারটা থেকে বারটার মধ্যে এসব ঘটে। আমার শরীর মন বেশ ঝরঝরে মনে হতে লাগল এবং তারপর এ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখলাম। এটি নিশ্চয় পাঠকদের চোখে পড়েছে।

এ যে আমার উত্তেজিত কল্পনার প্রতিধ্বনি নয়, তাঁরই কণ্ঠ—এ সম্বন্ধে আমি কি আর কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারি? অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করানর মত অপর কোন প্রমাণ আমার হাতে নেই। তাঁর অবশ্যই একথা বলার অধিকার আছে যে এসব আত্মপ্রবঞ্চনা বা মতিভ্রম। হয়ত তাঁর কথাই সত্য। এর বিপরীত কোন প্রমাণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে সমগ্র বিশ্বও যদি একমত হয়ে আমার বিরুদ্ধে রায় দেয় তবু আমি যে যথার্থই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনেছি, আমার এই বিশ্বাস শিথিল হবে না।

তবে অনেকে মনে করেন যে স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। এই অভিমত যদি সত্য হয়, তাহলে এ বিশ্বের কোন কিছুই বাস্তব নয়—সবই

আমাদের কল্পনাজাত। যাই হক পূর্বোক্ত অভিমত সত্য বলে মেনে নিলেও বলব যে আমার কল্পনা যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তখন আমার পক্ষে তার প্রভাবাধীন হয়েই কাজকর্ম করা সম্ভব। বাস্তবিক জিনিস কথাটাও তো আপেক্ষিক। আমার পক্ষে সেই কণ্ঠস্বর আমার অস্তিত্বের চেয়েও বেশী বাস্তব। এ কণ্ঠ আমাকে অথবা কাউকে কোন দিন প্রতারিত করেনি।

আর যাঁর ইচ্ছা তিনিই সেই কণ্ঠ শ্রবণ করতে পারেন। সকলের অন্তরেই তিনি রয়েছেন। তবে সব কিছুর মত এর জন্য নিশ্চিত পূর্ব-প্রস্তুতি প্রয়োজন।

(হরিজন, ৮-৭-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪)

অন্তরের সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর"-এর কণ্ঠরোধ করা মাত্র আমি আমার প্রয়োজনীয়তা হারাব। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১২-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪২২)

আমি যতদূর জানি অন্তরাত্মা বা বিবেকের বাণী কেউ কেউ শুনতে পান, এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় প্রকাশ করেননি। আর যাঁরা অন্তরাত্মার নির্দেশানুযায়ী কথা বলছেন বলে দাবী করেন, তাঁদের মধ্যে একজনেরও দাবী যদি সত্য বলে প্রকাশিত হয়, তাহলে তাতে সমগ্র বিশ্বেরই লাভ। অনেকেই হয়ত দাবী করতে পারেন, তবে সবাই নিজ দাবী প্রমাণ করতে পারবেন না। কিন্তু অলীক দাবীর বিরোধিতা করার অজুহাতে মূল জিনিসটির বিরুদ্ধাচরণ করা চলবে না বা করা উচিতও হবে না। একাধিক ব্যক্তি সততা সহকারে অন্তরাত্মার বাণীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারলে তার থেকে কোন বিপদাশঙ্কা নেই। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে ভণ্ডামির প্রতিকার করা সম্ভব নয়। অনেকে এর ভাণ করতে পারে বলে সদগুণাবলীকে অবদমিত করা উচিত নয়। বিশ্বের সর্বত্রই মানুষ অন্তরাত্মার নির্দেশে কথা বলছে বলে শোনা গেছে। কিন্তু তাঁদের অল্পকালীন কার্যকলাপের জন্য বিশ্বের কোন ক্ষতি হয়েছে বলে শোনা যায়নি। সেই কণ্ঠস্বর শ্রবণের যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে মানুষকে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর শিক্ষাকালের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। আর যখন সত্য সত্যই অন্তরাত্মা কথা বলেন, তা অভ্রান্ত হয়ে থাকে। পৃথিবীকে চিরকাল সাফল্য সহকারে প্রতারিত করা যায় না। সুতরাং আমার মত একজন ব্যক্তি যখন অন্তরাত্মার বাণী শুনেছি —এই বিশ্বাসচালিত হয়ে অবদমিত হতে অস্বীকার করে এবং বলে যে সে অন্তরাত্মার ইঙ্গিতে চলছে, তখন এই পৃথিবীতে অরাজকতারূপী মহা বিপদ নেমে আসবে বলে আশঙ্কা করা সমীচীন নয়।

(হরিজন, ১৮-৩-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৮

মানুষ ভ্রান্তিশীল। তার পক্ষে কখনই নিজ পদক্ষেপ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব নয়। প্রার্থনার বিকল্প বলে সে যাকে মনে করে তা হয়ত তার অহং ভাবের প্রতিধ্বনি হতে পারে। অভ্রান্ত পথনির্দেশনার জন্য মানুষের হৃদয় সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হওয়া চাই। আমি এ দাবী করতে পারি না। আমার পূর্ণতাবিহীন আত্মা সর্বদা সংগ্রাম করছে, উপরে ওঠার প্রয়াস করছে আবার ভ্রান্তিতেও পতিত হচ্ছে। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৯-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১৩)

চিত্তশুদ্ধি অর্জন করার অবিরত প্রয়াস করার পর আমার "অন্তরের সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর" যথাযথ ও স্পষ্টভাবে শোনার কিছুটা ক্ষমতা হয়েছে।

(প্যারেলাল লিখিত "দি এপিক ফাস্ট," ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৪)

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে নিত্য প্রতিদিন তিনি নিজেকে প্রতিটি মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। আমরা কিন্তু "সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর"-এর দিকে কান দিই না। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৫-১৯২১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৬২)

প্রেমের ধর্ম

প্রেম যেখানে, ভগবানও সেখানে।

(দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ, ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৬০)

অহিংসা উচ্চতম পর্যায়ের এক সক্রিয় শক্তি। এর অপর নাম আত্মিক বল বা মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশী বিভূতি। যে পরিমাণে আমরা অহিংস আচরণ করতে পারি, সেই পরিমাণে ঈশ্বরতুল্য হয়ে উঠি।

(হরিজন, ১২-১১-১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩২৬)

বিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে আমাদের এই বিশ্বের মূল উপাদান পরমাণু-সমূহের ভিতর একটা পারস্পরিক সংহতি-শক্তি না থাকলে পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত এবং আমাদের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হত। সুতরাং জড় পদার্থের ভিতর যখন একটা সংহতিবিধায়ক শক্তি আছে, তখন চেতন প্রাণীসমূহের ভিতরও নিশ্চয় এই জাতীয় কোন শক্তি ক্রিয়া করছে আর চেতন প্রাণীদের ভিতর সংহতি বিধৃতকারী এই শক্তির নাম হচ্ছে প্রেম। পিতা পুত্র, ভাই ভগ্নী, এবং বন্ধু বন্ধুর ভিতর আমরা এই শক্তিকে ক্রিয়ারত দেখি। কিন্তু তাবৎ জীবনের ক্ষেত্রে এই শক্তি প্রয়োগ করার কলা আমাদের শিখতে হবে আর এই প্রক্রিয়াতেই আমাদের ঈশ্বরানুভূতি অন্তর্নিহিত রয়েছে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৫-১৯২০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৭)

ভগবদন্বেষণ প্রচেষ্টাতেই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস। তাঁকে মনুষ্যসৃষ্ট মন্দির মূর্তি বা ভজনালয়ে পাওয়া যাবে না, অথবা কেবল সংসার বিমুখতা ভগবদ্‌-প্রাপ্তির উপায় নয়। তাঁকে পাওয়া যাবে প্রেমে এবং এ প্রেমও পার্থিব নয়, অপার্থিব।

(হরিজন, ২৩-১১-১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪২৫)

আমার বক্তব্য এই যে এখনই—যদিও বর্তমান সামাজিক সংগঠনের আধার অহিংসার সচেতন স্বীকৃতি নয়—সমগ্র বিশ্বে পারস্পরিক সহনশীলতার জন্যই মানুষ নিজেদের ধন-প্রাণ অক্ষত রাখতে পেরেছে। তা যদি না হত, তাহলে কেবল মুষ্টিমেয় জনকতক এবং দুর্ধর্ষ লোকই টিকে থাকত। কিন্তু তা তো হয়নি। পরিবারসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ-সূত্র হচ্ছে প্রেম এবং রাষ্ট্র নামে আখ্যাত তথাকথিত সভ্য সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতরও এই শক্তির ক্রিয়া চলেছে। তবে অহিংস বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা এর সুপ্রচুর সম্ভাবনা সম্বন্ধে যথোচিত অনুসন্ধান করেননি। এ যাবৎ সম্ভবতঃ নিছক আলস্য ও জড়তার কারণ আমরা ধরে নিয়েছি যে কেবল যাঁরা অপরিগ্রহ ও তৎ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্রত পালন করেন, সেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের পক্ষেই পরিপূর্ণ অহিংস হওয়া সম্ভব। এ কথা সত্য যে একমাত্র নৈষ্ঠিক অনুরাগীরাই অহিংসা নিয়ে নূতন নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে পারেন এবং তাঁদের পক্ষেই কেবল মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণকারী এই মহান ও শাশ্বত বিধানের নব নব সম্ভাবনার কথা সময় সময় ঘোষণা করা সম্ভব।

কিন্তু অহিংসা যদি বিশ্ববিধান হয়, তাহলে এ সকলের পক্ষেই সম পরিমাণে গ্রহণীয় হবে। যে সব অসংখ্য ব্যর্থতা আমাদের চোখে পড়ে, তা অহিংসারূপী বিশ্ববিধানের নয়, এ বিফলতা তার অনুবর্তীদের। অহিংসার এইসব অনুবর্তীদের মধ্যে অনেকেরই আবার জানা নেই যে চান বা না চান, তাঁরা এই বিশ্ববিধানের আওতায় রয়েছেন। শিশুর জন্য মা যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি এই বিধান পালন করছেন। বিগত পঞ্চাশ বছর যাবৎ আমি সকলকে সচেতনভাবে এই বিশ্ববিধানের অনুবর্তী হতে বলছি এবং ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেও সোৎসাহে এই নিয়ম পালন করার পরামর্শ দিচ্ছি। পঞ্চাশ বৎসরের প্রচেষ্টায় চমৎকার ফললাভ হয়েছে এবং আমার বিশ্বাসও পুষ্টিলাভ করেছে।

(হরিজন, ২২-২-১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৮)

ইতঃপূর্বেই আমি মন্তব্য করেছি যে নারীজাতি অহিংসার মূর্ত প্রতীক। অহিংসার অর্থ সীমাহীন প্রেম অর্থাৎ অপরিসীম সহনশক্তি। নারী অর্থাৎ পুরুষের মাতা ছাড়া অপর কে আর এই ক্ষমতার সর্বোচ্চ পরিচয় দিতে সক্ষম? সন্তানকে গর্ভে পালন করার সময়, নিজের রক্তে নয় মাস কাল তাকে পুষ্ট করার সময় নারী এই শক্তির পরিচয় দেয় এবং এর জন্য যে শারীরিক কষ্ট হয়, নারী তাতে আনন্দ বোধ করে। আর জন্ম-যন্ত্রণার চেয়ে দুঃসহ ব্যথা আর কি আছে? কিন্তু সৃষ্টির আনন্দে নারী সে সবই বিস্মৃত হয়। প্রত্যহ শিশু তিলে তিলে বাড়বে—এজন্য প্রতিনিয়ত কে কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করে? নারী যেন তার অন্তরের সেই প্রেমসুষমাকে সমগ্র মানবজাতির উপর ছড়িয়ে দেয়, সে যেন ভুলে যায় যে সে কখনও পুরুষের লালসার সামগ্রী ছিল বা হতে পারে। তাহলেই নারী পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে তার মাতা, স্রষ্টা এবং মৌন নেতারূপে নিজের গৌরবমণ্ডিত পদে অভিষিক্ত হবে। অমৃতপিয়াসী অথচ যুধ্যমান এই বিশ্বকে শান্তি প্রতিষ্ঠার কলা শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নারী জাতির।

(হরিজন, ২৪-২-১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩)

আত্মোৎসর্গকারী সেবার মাধ্যমে অভিব্যক্ত প্রেম

সেবা

ভগবানকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দেখা এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়াই তাঁকে পাবার একমাত্র পন্থা। আর সর্বভূতের সেবার মাধ্যমেই কেবল এই আদর্শের পরিপূর্তি সম্ভব। আমরা সমগ্র সৃষ্টির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সমগ্র সত্তা থেকে নিজেদের আলাদা করে আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। আমাদের দেশবাসীরাই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। তারা এত অসহায় সঙ্গতিবিহীন ও প্রেরণাশূন্য হয়ে পড়েছে যে বর্তমানে তাদের সেবাই আমার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি যদি বিশ্বাস করতাম যে হিমালয়ের কোন গুহায় তাঁকে পাওয়া যাবে, তাহলে অবিলম্বে আমি সেখানে রওনা হতাম। কিন্তু আমি জানি যে মানবতার পরিধির বাইরে আমি তাঁকে কোথাও পাব না।

(হরিজন, ২৯-৮-১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২২৬)

ভগবানই আমার ভাগ্যকে ভারতবাসীর ভাল মন্দের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাই আমি যদি ভারতবাসীর সেবা না করি, তাহলে আমার স্রষ্টার প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া হবে। ভারতবাসীদের সেবা করার উপায়

খুঁজে না পেলে সমগ্র মানবতার সেবা করার পন্থাও আমি কোনদিন জানতে পারব না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-৬-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২১১)

আমি জানি যে সম্পন্ন বা শক্তিশালীদের বদলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভগবানকে তাঁর দীনতম সৃষ্টির মধ্যেই পাওয়া যায়। আর সেইজন্যই আমি দীন দরিদ্রের পর্যায়ে উপনীত হবার জন্য প্রয়াস করছি। তবে তাদের সেবা না করে এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে না। নিপীড়িত শ্রেণীর সেবার জন্য আমার যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, এই হচ্ছে তার মূল কারণ। আর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে আজ এই সেবা করা সম্ভব নয় বলে আমি রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে রয়েছি। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৯-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৯৮)

ভারতবর্ষের দীন দরিদ্রদের দুঃখের সঙ্গে যদি আমাকে একাত্ম হতে হয়, শুধু তা-ই বা কেন, ক্ষমতা থাকলে বিশ্বের তাবৎ উৎপীড়িতদের দুঃখ সুখের সঙ্গে তদ্‌গত হবার ইচ্ছা যদি পোষণ করি, তাহলে যে সব বালক-বালিকা আমার কাছে আছে প্রথমে যেন তাদের অপরাধের অংশীদার হই। অত্যন্ত বিনম্র চিত্তে এই কার্য করতে পারলে কোন না কোন দিন আমি ভগবান অর্থাৎ সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী সাক্ষাৎ করতে পারব।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১২-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪২২)

আপনাকে আমি একটি রক্ষাকবচ বলে দিচ্ছি। যখনই কোন সন্দেহে পড়বেন, অথবা যখনই আপনার ভিতর অহং ভাব প্রবল হয়ে উঠবে, তখন নিম্নোক্ত পন্থার শরণ নেবেন:

আপনার দেখা দরিদ্রতম এবং সব চেয়ে অসহায় লোকটির মুখচ্ছবি মনে করবেন এবং তারপর নিজেকে প্রশ্ন করবেন যে আপনার প্রস্তাবিত পদক্ষেপের দ্বারা কি তার কোন প্রয়োজন সাধিত হবে? এর দ্বারা সে কি কোন প্রকারে লাভান্বিত হবে? এর পরিণামে সে কি তার জীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত কোন কিছু হাতে পাবে? অর্থাৎ প্রস্তাবিত পদক্ষেপ কি কোটি কোটি বুভুক্ষু এবং আধ্যাত্মিকতার সংস্রবহীন ভারতবাসীকে স্বরাজ বা স্বনিয়ন্ত্রণাভিমুখে চালিত করবে?

এর পরই দেখবেন যে আপনার সব সংশয় ও অহংকার অদৃশ্য হচ্ছে।

[জনৈক বন্ধুকে লিখিত পত্র থেকে]

(দিস ওয়াজ বাপু, র. কু. প্রভু, ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৮)

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ নিরত জনৈক তরুণ আমেরিকান পাদ্রী গান্ধীজীর কাছে জানতে চাইলেন যে তিনি (গান্ধীজী) কোন্ ধর্ম আচরণ করেন এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ধর্মের স্বরূপ কেমন হওয়া সম্ভব।

গান্ধীজী অত্যন্ত সংক্ষেপে এর জবাব দিলেন। কামরার ভিতর উপস্থিত দুটি অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি ইশারা করে তিনি বললেন, "সেবা করাই আমার ধর্ম। ভবিষ্যতের কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

(দিস ওয়াজ বাপু, র. কু. প্রভু, পৃষ্ঠা ৪)

আর্তের সেবার নামই ধর্ম। ঈশ্বর অসহায় এবং পীড়িতের রূপে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন।

প্রচলিত ধর্মমতসমূহের আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে নিঃসন্দেহে আমি সূতা কাটাকে মহত্তর মনে করি। তবে এর অর্থ এ নয় যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বর্জন করতে হবে। আমি কেবল এইটুকুই বলছি যে যাবতীয় ধর্মমতাবলম্বীরা যে "ধর্মের" আচরণ করবেন, তা যেন প্রচলিত ধর্মমতসমূহের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। এইজন্যই আমি বলে থাকি যে ব্রাহ্মণ মুসলমান বা বৈষ্ণব যা-ই হন না কেন, তিনি যদি সেবাভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চরখা চালান তাহলে তিনি আরও ভাল ব্রাহ্মণ, মুসলমান বা বৈষ্ণবে পরিণত হবেন।

বিছানায় শায়িত অবস্থায় যদি চরখা চালান সম্ভব হত আর আমার যদি মনে হত যে এই প্রক্রিয়া ঈশ্বরের উপর আমার মনকে নিবদ্ধ করার সহায়ক হবে, নিঃসন্দেহেই তাহলে আমি জপমালা সরিয়ে রেখে চরখা চালাতাম। চরখা চালাবার মত শক্তি যদি আমার শরীরে থাকে আর আমাকে যদি মালা জপ করা এবং চরখা চালাবার মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে বলা হয় তাহলে আমি দ্বিধাশূন্য অন্তরে চরখাকেই বেছে নেব এবং যতদিন দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা এই দেশকে আতঙ্কিত করবে, ততদিন চরখাই হবে আমার জপমালা। আমি সেই দিনের পথ চেয়ে আছি যখন রামনাম জপ করাও বাহুল্য বিবেচিত হবে। রাম বচনাতীত—এই উপলব্ধি আমার ভিতর উদিত হলে আর নাম জপ করার প্রয়োজন হবে না। চরখা, জপমালা এবং রামনাম—এ সবই আমার কাছে অভিন্ন। এগুলি একই লক্ষ্যের সাধনায় নিযুক্ত এবং এরা আমাকে সেবা-ধর্মের শিক্ষা দেয়। সেবা-ধর্ম পালন না করে অহিংসার আচরণ করা সম্ভব নয় এবং অহিংস না হলে আমি সত্য আবিষ্কার করতে পারব না। আর সত্য ছাড়া অপর কোন ধর্মের অস্তিত্বই নেই। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-৮-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৬৭)

চরখায় সুতাকাটা কোন প্রচলিত শিল্পকে স্থানচ্যুত করার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নয় বা এর লক্ষ্যও তা নয়। অন্যবিধ পেশায় নিযুক্ত মধ্য থেকে একজন সক্ষম লোককে সরিয়ে আনাও চরখার আকাঙ্ক্ষিত নয়। চরখার তরফ থেকে উপস্থাপিত একমাত্র দাবী হচ্ছে এই যে একমাত্র এই ছোট্ট যন্ত্রটিই কেবল বর্তমান ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ত্বরিত ও বাস্তব উপায়। বহুল সংখ্যক ভারতবাসীর বছরে ছয় মাসের বাধ্যতামূলক বেকারত্ব হচ্ছে ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ সমস্যা। কৃষির পরিপূরক উপযুক্ত বৃত্তির অভাবে জনসাধারণ একরকম চিরস্থায়ী বুভুক্ষা-ব্যাধি দ্বারা প্রপীড়িত।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১০-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৬৮)

একজন কর্মক্ষম পুরুষ বা নারী যতদিন বেকার বা উপবাসী থাকে ততদিন বিশ্রাম নিতে বা পেট পুরে খেতে আমাদের লজ্জা বোধ করা উচিত।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-২-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৮)

ত্রিশ কোটি লোক বেকার এবং এর মধ্যে কয়েক কোটি আবার নিষ্কর্মা জীবনের জন্য আত্মসম্মান ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে প্রত্যহ ধাপে ধাপে নিম্নগামী হচ্ছে—এ যে কী সাংঘাতিক রকমের সর্বনাশা পরিস্থিতি, তা একবার চিন্তা করে দেখুন। ওদিকের ঐ কুকুরটিকে ভগবানের কথা শোনানো আর এই সব নিষ্প্রভ-চক্ষু ক্ষুধার্ত জনসাধারণ—খাদ্যই যাদের কাছে একমাত্র উপাস্য—তাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী উপস্থাপিত করা একই ব্যাপার। একমাত্র শুদ্ধ কর্মের বাণীর মাধ্যমেই এদের কাছে ঈশ্বরের কথা পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।

যথেষ্ট পরিমাণে জলযোগ করার পর নানাবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত মধ্যাহ্নভোজের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভগবানের কথা আলোচনা করা বেশ ভালই। কিন্তু যে সব কোটি কোটি মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না, তাদের কাছে আমি ভগবানের কথা বলব কি করে? ভগবান তাদের কাছে একমাত্র খাদ্যরূপেই আবির্ভূত হতে পারেন।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১০-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১০)

দরিদ্রতম ব্যক্তিটির সেবা এবং তার সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে আত্মোপলব্ধি সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১০-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৬৪)

ত্যাগ

ভোগের জন্য নয়, সেবার উদ্দেশ্যেই নরদেহ সৃষ্ট। সুখী জীবনের গোপন রহস্য হচ্ছে ত্যাগ। ত্যাগই জীবন। ভোগের পরিণাম মৃত্যু। সুতরাং অনাসক্ত কর্মে রত অবস্থায় প্রত্যেকেরই ১২৫ বৎসর বাঁচার অধিকার আছে এবং এই-ই আমাদের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। এবম্বিধ জীবন পরিপূর্ণভাবে সেবার জন্য উৎসর্গ করে দেওয়া কর্তব্য। এই জাতীয় সেবার জন্য যে ত্যাগ করা হয় তা অনির্বচনীয় আনন্দস্বরূপ এবং এ আনন্দ থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। কারণ জীবন বিধৃতকারী ত্যাগের এই অমৃত হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত হয়। এখানে দুর্ভাবনা বা অধৈর্যের কোন অবকাশ নেই। এই আনন্দ ব্যতিরেকে দীর্ঘজীবন লাভ করা অসম্ভব এবং যদিও বা কোন প্রকারে তা সম্ভব হয় শেষ পর্যন্ত তা অসার প্রতিপাদিত হবে।

(হরিজন, ২৪-২-১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৯)

অতএব এই দেহ আমাদের এইজন্যই দেওয়া হয়েছে যে এর দ্বারা আমরা যেন যাবতীয় প্রাণীর সেবা করি।

ভৃত্য যেমন তার মালিকের কাছ থেকে সেবার বিনিময়ে খাদ্য পরিধেয় ইত্যাদি পায়, আমরাও সেইভাবে সকৃতজ্ঞ অন্তরে এই বিশ্বের প্রভুর কাছ থেকে তাঁর করুণার দান গ্রহণ করব। তাঁর কাছ থেকে আমরা যা পাই তা দানই, কারণ অধমর্ণ হিসাবে আমরা আমাদের কর্তব্য পালনের জন্য এতদতিরিক্ত আর কিছু আশা করতে পারি না। সুতরাং কিছু না পেলেও প্রভুর উপর দোষারোপ করার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের এই দেহ তাঁরই এবং তিনি একে ইচ্ছানুযায়ী রক্ষা বা বিনষ্ট করতে পারেন। এটা কোন অভিযোগ বা করুণা করার বিষয় নয়। পক্ষান্তরে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় আমাদের যথাযথ স্থান কোথায় জেনে নেবার পর আমরা বুঝতে পারব যে এ স্থিতি স্বাভাবিক এবং এমন কি আনন্দজনক ও বাঞ্ছিত। এই পরম সুখ উপলব্ধি করার জন্য আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। সব ধর্মের নির্দেশই এই যে "নিজের জন্য তিলমাত্র চিন্তা কোরো না, সব ভাবনা-চিন্তা ভগবানের উপর ছেড়ে দাও।"

এ কথায় কেউ যেন ভয় না পান। সজ্ঞানে নিজেকে সেবার জন্য উৎসর্গকারী ব্যক্তি প্রতিটি দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োজনীয়তা অধিকতর মাত্রায় উপলব্ধি করবেন এবং প্রতিনিয়ত তিনি বিশ্বাসের বলে সমৃদ্ধ হবেন। যিনি স্বার্থ পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নন ও মনুষ্যজীবন প্রাপ্তির অপরিহার্য

শর্ত হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ, তার পক্ষে সেবার পথ গ্রহণ করা একরকম অসম্ভব। আমাদের প্রত্যেকেই চেতন বা অচেতন—যে কোন ভাবেই হোক, কোন না কোন প্রকারের সেবাকার্য করে থাকে। এই সেবা সজ্ঞানে করার স্বভাবের অনুশীলন করলে আমাদের ভিতর সেবা করার আকাঙ্ক্ষা ক্রমান্বয়ে বলশালী হবে এবং এর পরিণামে কেবল আমাদেরই নয়, সমগ্র জগতের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

*   *   *

এ ছাড়া কেবল সজ্জনরাই নন, আমাদের মধ্যে প্রত্যেককে তার যাবতীয় সম্পদ মানবতার সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। এ-ই যদি বিশ্ববিধান হয় (আর প্রত্যুত তা-ই বটে) তবে জীবনে ভোগের কোন স্থান থাকে না, এর পরিবর্তে ত্যাগ মুখ্য হয়ে ওঠে। এই ত্যাগ-ধর্মই মানবজাতিকে পশু থেকে পৃথক করে।

অনেকে এই বলে আপত্তি করেন যে এইভাবে জীবনের সংস্কার্থ করলে তা নীরস ও কলাস্পর্শবিহীন হয়ে ওঠে এবং এরকম জীবনে গৃহস্থধর্মের কোন স্থান নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ত্যাগ বলতে সংসার পরিত্যাগ করে বনবাসী হওয়া বোঝাচ্ছে না। ত্যাগবৃত্তি জীবনের সমস্ত কর্ম ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করবে। জীবনকে ভোগের বদলে কর্তব্যময় মনে করায় গার্হস্থ্যধর্মের কোন বিচ্যুতি হয় না। ত্যাগবৃত্তিপরায়ণ বণিকের হাত দিয়ে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হবে; কিন্তু তিনি এই বিধানের অনুসরণকারী হলে নিজ ক্ষমতাকে সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করবেন। এইজন্য তিনি কাউকে প্রতারণা করবেন না বা ফটকাবাজীর শরণ নেবেন না, তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবেন, কোন জীবিত প্রাণীকে আঘাত দেবেন না এবং কারও ক্ষতি করার পরিবর্তে বরং লক্ষ টাকার লোকসান বরদাস্ত করবেন। কেউ যেন এ কথা বলে না সরে যান যে এ জাতীয় ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব কেবল আমার কল্পনাতেই আছে। পৃথিবীর সৌভাগ্য যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য—উভয় দেশেই এই রকম ব্যবসায়ী আছেন। একথা সত্য যে এঁদের সংখ্যা আঙুলে গনা যায়; কিন্তু প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন একটি মাত্র জীবন্ত নিদর্শন পাওয়া মাত্র এই ধরনের ব্যবসায়ী আর কল্পনালোকে থাকেন না, বাস্তব হয়ে ওঠেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই জাতীয় ত্যাগীরা নিজেদের কাজের দ্বারাই জীবিকা অর্জন করে থাকেন। তবে জীবিকা তাঁদের মুখ্য লক্ষ্য নয়, এ তাঁদের কাজের একটা আনুষঙ্গিক ফল। সেবাময় জীবন কলার পরাকাষ্ঠা এবং পবিত্র আনন্দে ওতঃপ্রোত।

সেবক নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিল মাত্র চিন্তা করবেন না। এর প্রয়োজন মেটান বা একে উপেক্ষা করার দায়িত্ব তিনি উর্ধ্বলোকে অবস্থিত তাঁর প্রভুর উপর ছেড়ে দেবেন। সুতরাং চলার পথে তিনি যা কিছু পাবেন তা নিয়ে জড়িয়ে পড়বেন না, যতটুকু নেহাৎ না হলে নয় তিনি তা-ই নেবেন এবং বাকীটা বর্জন করবেন। অসুবিধার সম্মুখীন হলেও তিনি শান্ত ক্রোধশূন্য এবং মনে মনে অবিচলিত থাকবেন। পুণ্যের মত তাঁর সেবাও নিজেই নিজের পুরস্কার এবং এইটুকু জেনেই তিনি তৃপ্ত থাকবেন।

অপরকে স্বেচ্ছামূলক সেবা দিতে হলে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী উজাড় করে দিতে হবে। এর জন্য আত্মসেবাকে গৌণ করতে হবে। বস্তুত নৈষ্ঠিক সেবক কোন রকম দ্বিধা না করেই মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দেন।

("যারবেদা মন্দির থেকে", ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৪-৬০)

ত্যাগ বহুবিধ হতে পারে। এর মধ্যে একটি হল উৎপাদক শ্রম দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করা। সকলে যদি নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন পরিশ্রম করে তাহলে সকলের জন্য যথেষ্ট খাদ্য ও বিশ্রামের অপ্রতুলতা হবে না। তখন তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আর্তনাদ শোনা যাবে না এবং কোন ব্যাধি বা চতুর্দিকে আর যে সব দুঃখ দুর্দশা দেখা যায়, তার নিদর্শন থাকবে না। এই জাতীয় শ্রমই হবে শ্রেষ্ঠতম সেবা। মানুষ অবশ্য তার শরীর বা মনকে দিয়ে আরও অনেক রকমের কাজ করবে, তবে সে সব হবে জনসাধারণের হিতকারী প্রেমাধারিত শ্রম। সে অবস্থায় ধনী নির্ধন, উচ্চ নীচ এবং স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের ভেদাভেদ থাকবে না।

এ হয়ত চিরঅলব্ধ আদর্শ হয়েই থেকে যাবে। কিন্তু তা বলে এর জন্য চেষ্টা করায় ক্ষান্তি দিলে চলবে না। আমাদের সত্তা অর্থাৎ ত্যাগের বিধান ষোল আনা পালন করতে না পারলেও আমরা যদি নিজেদের প্রাত্যহিক ক্ষুধা শান্তির উপযুক্ত দৈহিক শ্রম করতে পারি তাহলে এই আদর্শাভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হয়েছি বলতে হবে।

আর এইটুকু করতে পারলে আমাদের প্রয়োজন যথাসম্ভব কম হবে এবং আমাদের আহার্যও সাদাসিধে হবে। আমরা তখন বেঁচে থাকার জন্য খাব, খাবার জন্য জীবনধারণ করব না। এ বক্তব্যের যথার্থতায় যাঁর সন্দেহ আছে তিনি ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের জন্য দৈহিক শ্রম করার একটা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা

করে দেখুন। তিনি দেখবেন যে নিজ পরিশ্রমজাত উৎপাদন তাঁর অত্যুচ্চ তৃপ্তি বিধান করছে, এর ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে এবং তিনি বুঝতে পারবেন যে ইতঃপূর্বে তিনি যে সব উপকরণ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন, তার অনেকগুলিই অপ্রয়োজনীয়।

মানুষ কি বৌদ্ধিক শ্রম করে অন্নোপার্জন করতে পারে না? না। শরীরের প্রয়োজন শরীরকেই সংগ্রহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ "সিজারের যা পাওনা তা সিজারকে দাও"—এই নীতি প্রযোজ্য।

নিছক মানসিক অর্থাৎ বৌদ্ধিক শ্রম আত্মার তৃপ্তির জন্য এবং এ নিজেই নিজের সার্থকতা। এর বিনিময়ে কদাচ অর্থ দাবী করা চলতে পারে না। আদর্শ স্থিতিতে চিকিৎসক, আইনজীবী ও তাঁদের সমগোত্রীয়েরা ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, একান্তভাবে সমাজেরই মঙ্গলের জন্য কাজ করবেন। ক্ষুধার অন্নের জন্য দৈহিক শ্রম করার নীতি পালন করার ফলে সমাজে এক নীরব বিপ্লব ঘটে যাবে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করার পরিবর্তে পারস্পরিক সেবার জন্য সংগ্রাম শুরু হলে মানুষের বিজয় সূচিত হবে। তখন মানবীয় বিধান পাশবিক বিধানের স্থলাভিষিক্ত হবে।

(হরিজন, ২৯-৬-১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৫৬)

ভারতবর্ষে এমন এক ধরণের লোক আছেন যাঁরা প্রয়োজনীয় জিনিসের সংখ্যা হ্রাস করেই আনন্দ পান। তাঁরা তাঁদের গামছাতে এক মুষ্টি আটা যৎকিঞ্চিৎ নুন ও দুই একটি লঙ্কা নিয়ে ঘুরে বেড়ান। তাঁদের কাছে একটি ঘটি ও কুয়া থেকে জল তোলার জন্য একটি দড়ি থাকে। এ ছাড়া তাঁদের আর কিছুই চাই না। রোজ তাঁরা দশ বার মাইল পদব্রজে চলেন। গামছাতেই আটা মেখে নেন তারপর দু' একটা কাঠকুটো জোগাড় করে একটু আগুন জেলে নিয়ে তার আঁচে ঐ আটা সেঁকে নেন। এইভাবে সেঁকা আটার দলার নাম হল বাটি। এই খাদ্যটির স্বাদ তার নিজের মধ্যে নেই, আছে সৎপথে পরিশ্রম করা ও মানসিক তৃপ্তির ভিতর। এই ধরণের মানুষের সাথী ও সখা হচ্ছেন ঈশ্বর এবং এঁরা কোন রাজা বা সম্রাটের চেয়েও নিজেকে সম্পন্ন জ্ঞান করেন। মনে মনে যাঁরা অপরের সম্পদের প্রতি অন্যায় লোভ করেন ভগবান তাঁদের সহায় নন। প্রত্যেকেই পূর্বোক্ত উদাহরণের অনুকরণ করে স্বয়ং স্বর্গীয় শান্তি ও সুখ উপভোগ করতে পারেন এবং এই সুখ শান্তিকে অপরের মধ্যে প্রকীর্ণও করতে পারেন। পক্ষান্তরে যিনি ধনপ্রাপ্তির জন্য

কাঙ্গাল হবেন তাঁকে যে কোন নামেই অভিহিত করা হক না কেন, অপরকে শোষণ করতেই হবে। তা ছাড়া সবাই কোটিপতি হতে পারে না। সুতরাং সত্যকার সুখ কেবল তৃপ্তি ও ঈশ্বর সান্নিধ্যে।

(হরিজন, ২১-৭-১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৩২)

বিনয় বা নম্রতার সত্যকার অর্থ হচ্ছে নিজেকে শূন্যে পরিণত করা। এইভাবে আত্মবিলোপ করাকেই মোক্ষ বলে। বিনয়বিযুক্ত সেবা স্বার্থপরতা ও অহমিকতার নামান্তর মাত্র। (আত্মকথা, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৮৩)

আত্মতুষ্টির ভাব কোন মানুষকে আচ্ছন্ন করলে তার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তাই সে স্বাধীনতার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। বিনয় ও ধর্মীয় ভাবনা চালিত হয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ সেবাকার্য করে সে-ই অনতিবিলম্বে পূর্বোক্ত মনোভাবের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করতে পারে। একবার ত্যাগের পথের পথিক হলে নিজেদের স্বার্থপরতার যথার্থ পরিমাপ করা সম্ভব হয় এবং তারপরই ক্রমাগত অধিক মাত্রায় ত্যাগ করার ইচ্ছা মনে জাগে। অবশেষে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত মন সন্তুষ্ট হয় না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৯-১৯২১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩০৬)

নিজেদের শূন্যে পর্যবসিত না করা পর্যন্ত আমাদের ভিতরকার পাপকে আমরা জয় করতে পারব না। মানুষের প্রেয় যথার্থ স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ ভগবান পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতিরেকে আর কিছুতে তুষ্ট হবেন না। মানুষ এইভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলা মাত্র সকল জীবিত প্রাণীর সেবায় আবার নিজেকে খুঁজে পায়। জীবসেবা তখন তার আনন্দ ও মনোরঞ্জনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। সে তখন এক নূতন মানুষ, ঈশ্বরের সৃষ্টির সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে কখনও সে উৎকণ্ঠা বোধ করে না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১২-১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪২০)

প্রেম বনাম অন্যায়

ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রেম বিধান

তলোয়ারকে একপাশে সরিয়ে রেখে দেবার পর আমার বিরুদ্ধাচরণকারীদের সামনে প্রেমে পূর্ণ পেয়ালা এগিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। এই পেয়ালা তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেই আমি তাঁদেরকে আমার অন্তরঙ্গ করে নিতে চাই। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৪-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৪)

মিত্রের প্রতি মিত্রতাভাবাপন্ন হওয়া সহজ। কিন্তু যিনি নিজেকে আপনার শত্রু মনে করেন তাঁর সঙ্গে সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই যথার্থ ধর্মের সার।

(হরিজন, ১১-৫-১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪৬)

যাঁরা আমাদের ভালবাসেন, তাঁদের ভালবাসার মধ্যে কোন অহিংসা নেই। আমাদের ঘৃণাকারী ব্যক্তিদের ভালবাসতে পারার নামই অহিংসা।

(একটি ব্যক্তিগত পত্র থেকে, ৩১-১২-১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ)

অহিংসার গঠনমূলক রূপ হচ্ছে চূড়ান্ত প্রেম, সর্বোচ্চ করুণা। আমি অহিংসার অনুগামী হলে আমাকে আমার শত্রুকে ভালবাসতেই হবে। আমার পিতা বা সন্তান দুষ্কৃতকারী হলে তাঁদের প্রতি যেমন আচরণ করব, আমার শত্রু বা কোন অপরিচিত ব্যক্তি অন্যায় করলেও তাঁদের প্রতি সেই রকম ব্যবহার করা উচিত।

(স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, জি. এ. নটেশন কোম্পানী, মাদ্রাজ, ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৪৬)

আপনাদের কাছে আমার নিবেদন এই যে আপনারা নিজ নিজ হৃদয় শুদ্ধ করে সেখানে করুণার রাজ্য স্থাপন করুন। আপনাদের অন্তঃকরণ সমুদ্রের মত বিশাল হক।……অপরের কাজের বিচার করবেন না, কারণ আপনার কাজেরও তো বিচার হতে পারে। সেই যে পরম বিচারক আছেন তিনি তো ইচ্ছা করলে আপনাকে ফাঁসি দিতে পারেন; কিন্তু তা না করে তিনি আপনাকে জীবিত রেখেছেন। আপনার ভিতরে এবং বাইরে চতুর্দিকে কত শত বৈরী রয়েছে। কিন্তু তিনি আপনাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করছেন এবং সদাসর্বদা আপনাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে আগলে আছেন।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-১-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৮)

দুর্বল মানুষ কখনও ক্ষমা করতে পারে না। ক্ষমা বলবানের লক্ষণ।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৪-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৯)

অনেকে বলেন, 'উপায় নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি আছে? উপায় উপায়ই।' আমি বলি, 'উপায়ই সব কিছু।' উপায় যেমন হবে লক্ষ্যও তদনুরূপ হতে বাধ্য। উপায় ও লক্ষ্যকে পৃথককারী কোন দেওয়ালের অস্তিত্ব নেই। বস্তুতপক্ষে এই বিশ্ববিধানের স্রষ্টা উপায়ের উপরই আমাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণাধিকার দিয়েছেন (তাও অবশ্য খুবই সীমিত); কিন্তু লক্ষ্যের ব্যাপারে

আমাদের কোন হাত নেই। উপায়কে যতটা মূর্ত করব লক্ষ্যও সেই অনুপাতে সাকার হবে। এই বিধানের কোন ব্যতিক্রম নেই।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৭-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৩৬)

আমি তাই মূলতঃ উপায়ের শুদ্ধতা বজায় রাখা ও তার ক্রমাগত অধিক মাত্রায় রূপায়ণের মধ্যে নিজেকে সীমিত রেখেছি। আমি জানি যে আমরা যদি এই দিকটি সামলাতে পারি তাহলে লক্ষ্যসাধন অবধারিত। আমি এও অনুভব করি যে লক্ষ্যাভিমুখে আমাদের প্রগতির আনুপাতিক হার গৃহীত উপায়ের শুদ্ধতার অনুরূপ হবে।

এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ মনে হতে পারে, এ হয়ত দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এই-ই হচ্ছে সংক্ষিপ্ততম পন্থা।

(অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭-৯-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ)

এই ভেবে ভীত হবেন না যে অহিংস প্রক্রিয়া শম্বুকগতিবিশিষ্ট দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা। অহিংসাই বিশ্বের দ্রুততম পন্থা, কারণ এই হচ্ছে একমাত্র নিশ্চিত মার্গ। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৪-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ)

প্রেমের পথে প্রতিরোধ এমন একটি শক্তি যাকে ব্যক্তি বা সমাজ সবাই সমানভাবে কাজে লাগাতে পারে। একে রাজনৈতিক এবং পারিবারিক—উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। এর এই বিশ্বজনীন প্রয়োগ ক্ষমতা এর স্থায়িত্ব ও অজেয় চারিত্র-ধর্মের লক্ষণ। পুরুষ রমণী ও শিশু নির্বিশেষে সবাই এর প্রয়োগ করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না হিংসা দিয়ে হিংসার জবাব দেবার উপযুক্ত হয়ে উঠছে কেবল ততক্ষণেরই জন্য এ দুর্বল ব্যক্তির শাস্ত্র—একথা বলা নিছক সত্যের অপলাপ।…অন্ধকারের সঙ্গে আলোর যে সম্বন্ধ, হিংসা এবং সেই কারণে সর্ববিধ অত্যাচার ও অবিচারের উপর এই শক্তি অর্থাৎ অহিংসারও সেই সম্বন্ধ।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১১-১৯২৭, পৃষ্ঠা ৩৬৯)

অহিংস উপায় প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমাদের এই কথা বিশ্বাস করতে হবে যে যতই দুশ্চরিত্র হক না কেন, প্রতিটি ব্যক্তিকে মানবীয় এবং সুদক্ষ চিকিৎসার দ্বারা সংশোধন করা সম্ভব।

(হরিজন, ২২-২-১৯৪২, পৃষ্ঠা ৪৯)

খুনী চোর বা ডাকাতকেও শাস্তি দেওয়া আমার নীতি বহির্ভূত।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৪-১৯৩১, পৃষ্ঠা ৫৫)

মানুষ নিজেকে অহিংস বলে যখন দাবী করে তখন আঘাতকারীর প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া তার সাজে না। অহিংস ব্যক্তি এমন কি আঘাতকারীরও অশুভ কামনা করবেন না; তিনি তার মঙ্গল চাইবেন। অহিংস ব্যক্তি আঘাতকারীকে অভিশাপ বা দৈহিক আঘাত দেবেন না। অন্যায়কারী তাঁকে যতই আঘাত করুক না কেন, তিনি সে সবই সহ্য করবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পরিপূর্ণ নিষ্পাপ আচরণের নামই অহিংসা। পরিপূর্ণ অহিংসার অর্থ হল তাবৎ জীবিত প্রাণীর প্রতি আচরণে সর্বপ্রকার বিরাগ ও বিরূপতার উর্ধ্বে ওঠা। অহিংসা তাই মানবেতর প্রাণী—এমন কি হিংস্র কীট পতঙ্গ ও পশুকেও প্রেমভরে কণ্ঠলগ্ন করে। আমাদের ধ্বংসাত্মক বৃত্তিগুলিকে পরিতৃপ্ত করার জন্য ওদের জন্ম হয়নি। বিশ্বস্রষ্টার সঠিক মনোভাব আমরা জানতে পারলে তাঁর সৃষ্টিতে ঐ সব মানবেতর প্রাণীর যথাযোগ্য স্থান আমরা দেখতে পাব। অতএব সকল প্রাণীর প্রতি শুভেচ্ছাকে অহিংসার সক্রিয় রূপ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এ হল শুদ্ধ প্রেম। হিন্দু শাস্ত্র বাইবেল কোরাণ—সর্বত্রই আমি এর কথা পড়েছি।

অহিংসাই শুদ্ধতম—পূর্ণ স্থিতি। সমগ্র মানবতা স্বাভাবিকভাবেই এই লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে চলেছে, যদিচ সচেতনভাবে নয়। স্বয়ং পূর্ণমাত্রায় নিরপরাধ হয়ে উঠলেও মানুষ ঐশীশক্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠে না। ঐ অবস্থায় তাকে কেবল যথার্থ মানব আখ্যা দেওয়া চলে। আমাদের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই যে আমরা অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক পশু। আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত করার সময় এবং এই প্রত্যাঘাত করার মনোবৃত্তির সহায়ক ক্রোধাগ্নি নিজেদের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করার সময় আমাদের অজ্ঞতা এবং এমন কি অহমিকার জন্য আমরা বলে থাকি যে এইভাবে আমরা মানব প্রজাতির কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছি। আমরা এই কথা বিশ্বাস করার ভান করি যে প্রতিশোধ নেওয়াই আমাদের স্বধর্ম। অথচ কোন ধর্মগ্রন্থেই প্রতিশোধ গ্রহণকে অবশ্যকরণীয় বলা হয়নি, বড় বেশী হলে অনন্যোপায় হয়ে এর সমর্থন করা হয়েছে। যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ যে জিনিসকে অবশ্য আচরণীয় বলে বর্ণনা করেছে, তা হল সংযম। প্রতিশোধ গ্রহণ এমন একটা কুকর্ম যার জন্য বিস্তারিত বিধিনিষেধ থাকা দরকার। সংযমই আমাদের স্বধর্ম। কারণ উচ্চ পর্যায়ের সংযম ব্যতিরেকে শুদ্ধতম—পরিপূর্ণ স্থিতি লাভ করা অসম্ভব। এইজন্য কষ্টবরণ মনুষ্যজাতির স্বভাবধর্ম।

লক্ষ্য চিরকালই আমাদের কাছে থেকে দূরে সরে চলে যায়। যতই আমরা নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হই, ততই নিজেদের অযোগ্যতা বেশী করে ধরা পড়ে। তাই লক্ষ্যপ্রাপ্তি নয়, লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য প্রয়াস করার মধ্যেই তৃপ্তি অন্তর্নিহিত। পূর্ণ প্রয়াসের নামই পরিপূর্ণ বিজয়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৩-১৯২২ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪১)

ইতিহাসের উষাকাল থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এই যে দীর্ঘ অবধি, এর প্রতি দৃষ্টি দিলেই আমরা দেখতে পাব যে মানুষ ক্রমাগত অহিংসার অভিমুখেই নিশ্চিত গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা নরমাংসভোজী ছিলেন। তারপর এমন একটা সময় এল যখন তাঁদের নরমাংস গ্রহণে রুচি চলে গেল এবং এরপর তাঁরা শিকারীর জীবন যাপন করতে লাগলেন। অতঃপর আবার এমন একটা অবস্থা এল যখন যাযাবর শিকারীর জীবন তাঁদের লজ্জা দিতে লাগল। তখন তাঁরা কৃষিকার্য শুরু করলেন এবং তারপর থেকে খাদ্যের জন্য তাঁরা মূলতঃ ধরিত্রী মাতার উপরই নির্ভরশীল হলেন। এইভাবে যাযাবর থেকে তাঁরা নিশ্চিত ও সভ্য জীবনযাত্রা গ্রহণ করলেন। এইভাবে গ্রাম ও শহরের পত্তন হল এবং যারা একটা কেবল বিশেষ একটি পরিবারের সদস্য ছিলেন, তাঁরা সমাজ গোষ্ঠী এবং জাতির অঙ্গীভূত হলেন। এ সবই অহিংসার ক্রমবিকাশ এবং হিংসার ক্রমাপহ্নবের নিদর্শন। এর অন্যথা হলে বহু নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর মত মানবজাতিও এত দিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

পয়গম্বর ও অবতাররাও মোটামুটি অহিংসারই শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউই হিংসার প্রচার করেননি। আর কেনই বা এর ব্যতিক্রম হবে? হিংসা তো কাউকে শেখাতে হয় না। প্রাণী হিসাবে মানুষ হিংসই কিন্তু তার আত্মা অহিংস। অন্তরাত্মার আলোকে জেগে ওঠা মাত্র তার পক্ষে আর হিংসাশ্রয়ী থাকা সম্ভব হয় না। মানুষ হয় অহিংসার অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখবে আর নচেৎ ত্বরিৎ পদে নিজ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। এইজন্যই পয়গম্বর ও অবতাররা সত্য, সৌহার্দ্য, সৌভ্রাত্র, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি অহিংসার বিভিন্ন অভিব্যক্তির শিক্ষা দিয়েছেন।

এসব সত্ত্বেও হিংসা রয়েই গেছে এবং এমন কি অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিও একে অন্তিম শরণ বলে মনে করেন। কিন্তু পূর্বেই আমি দেখিয়েছি যে ইতিহাস এবং মানুষের অভিজ্ঞতা পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে।

আমরা যদি বিশ্বাস করি যে মানবজাতি ক্রমাগত অধিক মাত্রায় অহিংসার অভিমুখে প্রগতি করেছে, তাহলে তার স্বতঃসিদ্ধ পরিণাম এই যে মানবজাতিকে অহিংসার দিকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। এ জগতে কোন কিছুই অনড় নয়, সব কিছুই গতিশীল। অগ্রগতি না হলে পশ্চাৎগতি হবেই। ঈশ্বর ছাড়া অপর কেউ এই চিরন্তন কালচক্রের বাইরে থাকতে পারে না।

(হরিজন, ১১-৮-১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৫)

ধ্বংসের মধ্যেও আমি জীবনের জয়গান লক্ষ্য করেছি। তাই মনে হয় ধ্বংসের চেয়েও মহত্তর কোন বিধান এই পৃথিবীতে আছে। একমাত্র সেই বিধানের পরিপ্রেক্ষিতেই কোন সুশৃঙ্খল সমাজের কার্যবিধি বোধগম্য হয় এবং জীবনের তাৎপর্যও খুঁজে পাওয়া যায়। আর জীবন সম্বন্ধে এই বিধান যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়ও একে রূপায়িত করা উচিত। কোন বাদ-বিসম্বাদ বা বিরোধের সম্মুখীন হলে প্রেম দিয়ে তাকে জয় কর— এইভাবে পূর্বোক্ত বিধানকে আমি আমার জীবনে সাকার করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে আমার যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আমি কেবল এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে ধ্বংসের বিধান কখনও যে কার্য সাধন করতে পারে না, প্রেমের বিধান তা সংসাধিত করেছে। যতই আমি এই বিধানকে প্রয়োগ করছি ততই জীবনে রস খুঁজে পাচ্ছি—এই সৃষ্টি ব্যাপারে আনন্দ পাচ্ছি। এর ফলে আমি অবর্ণনীয় শান্তি পাচ্ছি এবং প্রকৃতির রহস্যের অর্থও যেন হৃদয়ঙ্গম করছি।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, :-১০-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৮৬-৮৭)

জীবনের এই মহান বিধানের অনুগামী হওয়া যে কত কঠিন তা আমার জানা আছে। কিন্তু যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয় বিষয়ই কি দুরূহ নয়? ঘৃণাকারীকে ভালবাসা সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। কিন্তু আমরা চাইলে ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই কঠিনতম বিষয়ও সহজ সরল হয়ে যায়।

(একটি ব্যক্তিগত পত্র থেকে, ৩১-১২-১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ)

নিত্য নব বিস্ময়ের যুগে এ কথা নিশ্চয় কেউ বলবেন না যে কোন জিনিস বা বিচারধারা নূতন বলেই মূল্যহীন। আর কঠিন বলে অসম্ভব আখ্যা দেওয়াও যুগোপযোগী মনোবৃত্তি নয়। স্বপ্নাতীত জিনিস আমরা নিত্য বাস্তবে প্রত্যক্ষ করছি, অসম্ভব রোজ সম্ভব হচ্ছে। হিংসার ক্ষেত্রে যে সব নব নব আশ্চর্যজনক আবিষ্কার হচ্ছে তা দেখে আমরা আজকাল প্রতিনিয়ত বিস্ময়াভিভূত

হচ্ছি। কিন্তু আমার ধারণা এই যে অহিংসার ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী অকল্পনীয় এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব আবিষ্কার সংঘটিত হবে।

(হরিজন, ২৫-৮-১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৬০)

আমি চিরঅদম্য আশাবাদী। মানুষের ভিতর অহিংসার বিকাশ করার অমিত সম্ভাবনা আছে—এই বিশ্বাস আমার আশাবাদের আধার। নিজের ভিতর আপনি এর যতটা বিকাশ করতে পারবেন, ততই এ সংক্রামক হয়ে উঠবে। এই ভাবে অহিংসা ক্রমশঃ আপনার পরিবেশকে প্রভাবিত করবে এবং এমন কি শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বকে পরিপ্লাবিত করে দিতে পারে।

(হরিজন, ২৮-১-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৪৩)

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নিষ্ক্রিয়তা নয়

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ব্যতীত এ পৃথিবীতে কোন দিনই কিছু করা সম্ভব হয়নি। 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' শব্দটি যথার্থ ভাব প্রকাশে অনুপযুক্ত এবং এর থেকে লোকের মনে ধারণা জন্মাতে পারে যে আমি আমার সংগ্রামপদ্ধতিকে বুঝি দুর্বলের অস্ত্র হিসাবে উপস্থাপিত করেছি। সুতরাং ঐ শব্দটি আমি বর্জন করেছি।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৫-১৯২০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩)

আমার লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। আর আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে চরমতম প্রতিবাদের সঙ্গে উচ্চগ্রামের ভালবাসার সমন্বয় সাধন করতে পারি।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-৩-১৯২০ খ্রীস্টাব্দ পৃষ্ঠা ৫)

অহিংসার অর্থ 'শঠতার বিরুদ্ধে সত্যকার সংগ্রাম করা থেকে প্রতিনিবৃত্তি' নয়। পক্ষান্তরে আমার অহিংসা চিরাচরিত প্রতিশোধ গ্রহণের পদ্ধতির তুলনায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনেক বেশী কার্যকুশল ও এক যথার্থ সংগ্রাম। কারণ প্রতিশোধ গ্রহণের পদ্ধতির স্বভাব-ধর্মই এই যে এর ফলে শঠতার প্রাবল্য ঘটে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি মানসিক এবং সেই কারণে নৈতিক বিরোধের পরিকল্পনা করেছি। অত্যাচারীর খড়্গের ধার আমি একেবারে নষ্ট করে দিতে চাই। আর একাজ আমি করতে চাই তার চেয়েও কোন শাণিত-মুখ অস্ত্র উত্তোলন করে নয়, আমি তার দৈহিক প্রতিরোধ করব—তার এই আশাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আমি আমার লক্ষ্য সিদ্ধ করার প্রয়াসী। আমার আত্মিক প্রতিরোধের কারণ সে ব্যর্থমনোরথ হবে। এই প্রক্রিয়া প্রথমে

তাকে হতচকিত করে দেবে এবং অবশেষে তাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করবে। তবে এই স্বীকৃতি দান তার পক্ষে অপমানসূচক না হয়ে তার উত্থানের কারণ হবে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১০-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৪৬)

অহিংসার সজীব অবস্থার অর্থ হল সজ্ঞানে কষ্ট বরণ করা। অন্যায়কারীর ইচ্ছার সামনে দুর্বলভাবে নতি স্বীকার করার নাম জীবন্ত অহিংসা নয়, অত্যাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মার সমস্ত শক্তিকে সংগ্রামে নিয়োগ করার নামই সজীব অহিংসা। আমাদের সত্তার এই বিধান অনুযায়ী কাজ করলে এককভাবে যে কোন ব্যক্তি অবিচারকারী একটি গোটা সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে উপেক্ষা করে নিজ সম্মান, ধর্ম ও আত্মাকে রক্ষা করতে পারে এবং সেই সাম্রাজ্যের পতন বা নবজন্মের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-১৯২০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩)

ভীরুতার স্থান নেই

আমার অহিংসা-নীতি অতীব দুর্ধর্ষ শক্তি। এতে ভীরুতা বা এমন কি দুর্বলতার কোন স্থান নেই। হিংসাশ্রয়ী ব্যক্তি হয়ত কোন দিন অহিংস হতে পারে; কিন্তু ভীরু সম্বন্ধে এমন আশা পোষণ করা যায় না। সেইজন্য আমি একাধিকবার বলেছি যে কষ্টবরণের শক্তি অর্থাৎ অহিংসার দ্বারা কিভাবে আমাদের নিজেদের এবং ঘরের নারী ও দেবস্থান রক্ষা করতে হয়, তা যদি আমরা না জানি, তবে আমরা মানুষ হলে লড়াই করে এ সব রক্ষা করব।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-৬-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৯৬)

অহিংসা ও ভীরুতা এক সঙ্গে চলতে পারে না। আপাদমস্তক অস্ত্রে সজ্জিত কোন মানুষ মনে মনে ভীরু হতে পারে। অস্ত্র রাখার অর্থ নেহাৎ ভীরুতা না হলেও ভয় তো বটেই। কিন্তু নির্ভেজাল নির্ভীকতা ছাড়া সত্যকার অহিংস স্থিতি লাভ করা অসম্ভব।

(হরিজন, ১৫-৭-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২০১)

শক্তির উৎস শারীরিক বল নয়। এর জন্ম অদম্য ইচ্ছাশক্তি থেকে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-১৯২০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩)

আপন আদর্শের প্রতি অবিচল বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত মুষ্টিমেয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিও ইতিহাসের গতির পরিবর্তন করতে পারে।

(হরিজন, ১৯-১১-১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৪৩)

ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য অহিংসাপ্রেমীকে অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর আত্মোৎসর্গের ক্ষমতার অনুশীলন করতে হবে। নিজ জমি, ধন সম্পত্তি বা এমন কি জীবন চলে যাওয়াকেও তিনি গ্রাহ্য করবেন না। যিনি সর্বপ্রকারের ভয় জয় করেননি, তিনি শুদ্ধতম অহিংসার আচরণ করতে পারবেন না। অহিংসার অনুগামীর ভয়ের জায়গা মাত্র একটি এবং তা হচ্ছে ঈশ্বর।

(হরিজন, ১-৯-১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৬৮)

যেখানে ভয় সেখানে ধর্মের অস্তিত্ব নেই।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৯-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩০৮)

এ জগতের কোন কিছুই আমাদের নয়। এমন কি আমরা নিজেরাও তাঁরই। তবে কিসের জন্য মনে ভয় রাখব?

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৯-১৯২০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২)

অমরা যেন ভগবানকে ভয় করি। তাহলে আর মানুষকে ভয় করব না।

(স্পিচেস্ এণ্ড রাইটিংস্ অফ মহাত্মা গান্ধী, ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৩০)

আধ্যাত্মিকতার অর্থ শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দার্শনিক আলোচনা করা নয়। এর জন্য অন্তরে অমিত শক্তির অনুশীলন চাই। আধ্যাত্মিকতার জন্য সর্বাগ্রে নির্ভীকতা দরকার। ভীরুরা কখনও নীতিপরায়ণ হতে পারে না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-১৯২১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩২৩)

সত্যাগ্রহী ভয় বর্জন করেন। এইজন্য তিনি তাঁর বিরোধীকে বিশ্বাস করতে ভয় পান না। বিরোধী যদি তাঁকে বিশবার প্রতারিত করেন, সত্যাগ্রহী তবুও একুশবারের বার আবার তাঁকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত থাকবেন। কারণ মানব-চরিত্রের উপর পরম নির্ভরশীলতা সত্যাগ্রহীর আদর্শের নির্যাসস্বরূপ।

(দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ, ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৪৬)

প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করার পর সারা দিনের জন্য নিম্নোক্ত মর্মে সঙ্কল্প গ্রহণ করাকে আমরা যেন প্রথম কার্যস্বরূপ বিবেচনা করি: "এ পৃথিবীর কাউকেই আমি ভয় করব না। আমার ভয় কেবল ঈশ্বরে; কারও বিরুদ্ধে আমার মনে আক্রোশ থাকবে না। কারও কোন অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করব না। অসত্যকে আমি সত্য দিয়ে জয় করব এবং অসত্যের প্রতিরোধ-কালে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করব।"

(সত্যাগ্রহ পুস্তিকা, ৪-৫-১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪)

"একলা চলো রে"

আমার ভিতরকার সেই একটা কিছু, যা কখনও আমাকে প্রতারিত করে না, এখন আমাকে বলছে: "একেবারে একা পড়লেও তোমাকে সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। সমগ্র পৃথিবী তোমার দিকে রক্ত-চক্ষুতে তাকালেও তোমার দৃষ্টি প্রশান্ত থাকুক। ভয় পেয়ো না। তোমার অন্তরে বিরাজিত সেই ক্ষুদ্র জিনিসটুকুর উপর ভরসা রাখ। সে বলছে: দারা সুত মিত্র সবাই ছেড়ে যায় যাক, কিন্তু যে আদর্শ নিয়ে বেঁচে আছ এবং যার জন্য জীবনপাত করতে হবে, তার প্রতি আনুগত্য বজায় থাক।"

(দি বম্বে ক্রনিকাল, ৯-৮-১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ)

সংখ্যাশক্তি ভীরুর উল্লাসের কারণ। কিন্তু আত্মার শক্তিতে দুর্ধর্ষ ব্যক্তি সংগ্রামেই গৌরব বোধ করে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৬-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ পৃষ্ঠা ২১১)

মহামানবদের চিরকালই একলা দাঁড়াতে হয়েছে। জোরাস্ত্র বুদ্ধ যীশু মহম্মদ ইত্যাদি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ আরও অনেক মহাপুরুষের মত একাই দাঁড়িয়েছিলেন। তবে নিজের এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল। আর ঈশ্বর তাঁদের পক্ষে আছেন—এই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে থাকার জন্য তাঁরা কদাচ নিঃসঙ্গতা বোধ করেননি।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-১০-১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩০০)

ভগবৎ নির্ভরতা

ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস থাকলেই কেবল অহিংসা সফল হয়।

(হরিজন, ২৮-১-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৪৩)

ধর্মযুদ্ধে ঈশ্বর স্বয়ং অভিযান-পরিকল্পনা ও যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ধর্মযুদ্ধ চলবেও তাঁরই নামে। আর সত্যাগ্রহী যখন একান্ত অসহায় বোধ করবে, বাহ্যতঃ যখন মনে হবে যে এবার সত্যাগ্রহীর শেষ দশা উপস্থিত এবং তার চতুর্দিকে অমানিশার অন্ধকার ছেয়ে এসেছে, তখনই কেবল ভগবান তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন।

(দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫)

আমি যে একটি জিনিস জেনেছি তা হচ্ছে এই যে মানুষের কাছে যা অসম্ভব, ঈশ্বরের কাছে তা ছেলেখেলা। আর যে ঐশী-শক্তি নিজ সৃষ্টির

তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবের বিধিলিপি নিয়ন্ত্রিত করে, তার উপরে আস্থা থাকলে সবই যে সম্ভব—এবিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। হৃদয়কন্দরে এই বিশ্বাস সযত্নে লালন করেই আমি বেঁচে আছি এবং কালাতিপাত করছি। এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি তাঁর ইচ্ছা পালন করার প্রয়াস করে চলেছি।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-১১-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৬১)

পথ আমি জানি। এ পথ সরল কিন্তু সঙ্কীর্ণ। এ হচ্ছে তলোয়ারের ধারের মত। এর উপর দিয়ে চলায় আমি আনন্দ বোধ করি। আর পদস্খলন আমার চক্ষে অশ্রু এনে দেয়। গীতায় ভগবান বলেছেন: "প্রযত্নকারী কদাচ নিশ্চিহ্ন হয় না।" ঐ প্রতিশ্রুতিতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তাই আমার দুর্বলতার জন্য সহস্রবার ব্যর্থ হলেও আমি বিশ্বাস হারাব না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৬-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২২৫)

সত্যাগ্রহীকে এ কথা জেনে নিতে হবে যে আশার স্রোত একেবারে ক্ষীণ হয়ে যাবার পরই সাহায্য আসবে। কারণ নিষ্ঠুর, করুণাময়ের এ-ই রীতি। তিনি তাঁর ভক্তকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চান এবং তাকে ধুলার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়াতেই তার আনন্দ।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৬-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৮৯)

আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে আবেদন

প্রেম কখনও কিছু দাবী করে না, উজাড় করে দিয়েই তার তৃপ্তি। প্রেম চিরকাল নিগ্রহ বরণ করে, প্রতিশোধের কথা কখনও চিন্তা করে না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৭-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪০)

আমি এই মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে সত্যকার মহত্ত্ববিশিষ্ট কোন কিছু করা যদি আপনার কাম্য হয়, তাহলে কেবল যুক্তি-পিপাসা মেটালেই হবে না, হৃদয়কেও স্পর্শ করতে হবে। যুক্তির আবেদন মস্তিষ্কের কাছে কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনাই কেবল হৃদয়ে প্রবেশলাভ করতে পারে। নিগ্রহই মানুষের অন্তর্নিহিত বোধকে জাগ্রত করতে সক্ষম।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া. ৫-১১-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৪১)

আমার মনে ক্রমশঃ এই ধারণা দৃঢ়মূল হচ্ছে জনসাধারণের পক্ষে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কেবল যুক্তি দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। দুঃখ বরণের মাধ্যমে এ পেতে হবে। নিগ্রহ বরণ মানুষের ধর্ম; আর যুদ্ধ হল

জঙ্গলের বিধান। কিন্তু বিরোধীর হৃদয় পরিবর্তন করতে এবং ন্যায়ের বাণী তার শ্রবণগোচর করতে জঙ্গলের বিধানের চেয়েও নিগ্রহ বরণ করা নিঃসন্দেহে অধিকতর শক্তিশালী উপায়। অন্য উপায়ে বিরোধীর কানে যুক্তির বাণীর অনুপ্রবেশ ঘটান সম্ভব নয়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১১-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৪১)

অহিংসা-ধর্ম এমন কি প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলেও নিজের চূড়ান্ত অসুবিধা ঘটিয়ে অপরকে চূড়ান্ত সুবিধা করে দেয়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-১২-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪২২)

ক্রোধ এবং বিদ্বেষরহিত আত্মনিগ্রহরূপী সূর্য কিরণের সম্মুখে কঠিনতম হৃদয় ও পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা নিশ্চয় অদৃশ্য হবে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-২-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৬১)

বিরোধীর হৃদয় পরিবর্তনই লক্ষ্য

অনেক সময় আমরা ভুলে যাই যে অন্যায়কারীকে বিব্রত করা সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য নয়। সত্যাগ্রহী তার মনে ভয় সৃষ্টি করতে চায় না; সত্যাগ্রহীর আবেদন হবে অন্যায়কারীর হৃদয়ের কাছে। সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য অন্যায়কারীকে চাপ দিয়ে বাধ্য করা নয়, তার হৃদয় পরিবর্তন করা।

(হরিজন, ১৮-৩-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৩)

সত্যাগ্রহী তার বিরোধীকে কেবল চারিত্রবল ও নিগ্রহ বরণ করার শক্তি দিয়ে পরিবর্তিত করার অভিলাষী। সত্যাগ্রহী যত শুদ্ধ হবে এবং যত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবে ততই শীঘ্র তার লক্ষ্য সিদ্ধ হবে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-৯-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩০৬)

হৃদয় পরিবর্তন করাই অহিংস কর্মীর সব সময়কার লক্ষ্য হবে। তবে তাঁকে অনন্ত কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। সুতরাং চরম সীমায় উপনীত হবার পর তিনি বিপদের ঝুঁকি নেবেন এবং সক্রিয় সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা রচনা করবেন। সক্রিয় সত্যাগ্রহ ব্যাপক আইন অমান্য বা ঐ জাতীয় অপর কোন কর্মসূচীর রূপ নিতে পারে। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-২-১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৪)

সত্যাগ্রহ

সত্যাগ্রহ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অত্যন্ত শক্তিশালী উপায়ের অন্যতম বলে আর সব পন্থা বিফল হবার পরই সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহের শরণ নেবেন। তিনি তাই

সদা সর্বদা নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করবেন, তিনি জনমতের কাছেও আবেদন করবেন এবং নিজ দাবীর সপক্ষে জনমত গড়ে তুলবেন। যে কেউ তাঁর বক্তব্য শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করবে তার কাছেই তিনি ধীর স্থিরভাবে নিজের কথা বলবেন এবং এইসব প্রক্রিয়ায় কোন রকম ফল না হলেই কেবল তিনি সত্যাগ্রহ করতে পারেন। তবে বিবেকের বাণী শুনে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার পর জেনে নিতে হবে যে আর পিছু ফেরার পথ নেই।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১০-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৫৩)

উপবাস ও প্রার্থনা

উপবাস ও প্রার্থনা অতীব প্রাচীন প্রথা। যথার্থ উপবাস দেহ মন ও আত্মাকে শুদ্ধ করে। এর জন্য আমাদের জৈব সত্তা নিগৃহীত এবং আত্মা সমপরিমাণে মুক্ত হয়। নিষ্ঠাযুক্ত প্রার্থনার পরিণাম অলৌকিক। এ হল অধিকতর পবিত্রতার জন্য আত্মার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। এইভাবে অধিগত পবিত্রতা মহদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হলে প্রার্থনার রূপ পরিগ্রহ করে। উপবাস ও প্রার্থনা তাই শুদ্ধিকরণের অতীব শক্তিশালী সাধন। আর স্বভাবতঃই যা আমাদের শুদ্ধ করে তা-ই আমাদের কর্তব্য পালনে ও লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে অধিকতর কার্যকুশল। সুতরাং কখনও যদি মনে হয় যে উপবাস ও প্রার্থনায় ঠিকমত কাজ হচ্ছে না তাহলে জানতে হবে যে ত্রুটি উপবাস বা প্রার্থনার নয়, এর অন্তর্নিহিত মনোভাবে কোন দোষ ছিল।

সমুচিত উপবাসের সময় শুদ্ধ বিচার ধারা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং শয়তানের যাবতীয় প্রলোভনের প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি থাকবে। শুদ্ধ প্রার্থনাও এইভাবে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হবে। মানুষকে প্রার্থনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হয়। একদিকে আল্লার নাম জপ করে মালা গুনছি এবং অন্যদিকে মন যত্র তত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে—এ ব্যাপার নিরর্থকের চেয়েও খারাপ।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৩-১৯২০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১)

আমার ধর্ম আমাকে এই কথা শিখিয়েছে যে অনপনেয় দুঃখ দুর্দৈবের সম্মুখীন হলে মানুষকে উপবাস ও প্রার্থনা করিতে হয়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৯-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১৯)

উপবাস

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে রক্ত মাংসের শরীরকে যতটা নিগৃহীত করা যাবে, আত্মার শক্তিও সেই অনুপাতে বাড়বে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১০-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৫৪)

ঈশ্বরভীরু সত্যসন্ধানী ব্যক্তি, যিনি তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে চান, তাঁর পক্ষে চিন্তা ও বাক্ সংযমের মতই আহার্যের পরিমাণ ও প্রকরণের বিষয়েও সংযমী হওয়া অপরিহার্য।

(আত্মকথা, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৩৪)

উপবাসের চারিত্রধর্ম যথাসম্ভব বিস্তৃত হবে। দেহের উপবাসের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় রিপুকেও উপবাসী রাখা প্রয়োজন। গীতায় যে অল্পাহারের কথা বলা হয়েছে তা উপবাসেরই নামান্তর। গীতা আহার্যের ব্যাপারে মিতাচারের কথা বলে না, বলে 'কৃচ্ছ্রসাধন' করতে। আর এই কৃচ্ছ্রতা নিত্য উপবাস ছাড়া আর কিছু নয়। ভোজনকৃচ্ছ্রতার অর্থ দেহধারণ করার জন্য যতটুকু না হলে একেবারে নয়, ততটুকু গ্রহণ করা। আর এই দেহধারণ করার পিছনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকবে এবং তা হচ্ছে একে মানবসেবার উপযুক্ত সাধন হিসাবে কার্যশীল রাখা। ঔষধেরই মত পরিমিত মাত্রায় ও নির্দিষ্ট সময়ে আহার করা উচিত। স্বাদ নয়, শরীর রক্ষা করাই হবে আহার করার প্রেরণা। ভোজন-কৃচ্ছ্রতা শব্দটির সঠিক পরিভাষা বোধ হয় ধরাবাঁধা খাবার। সুতরাং 'ভরপেট' খাওয়া ভগবান এবং মানুষ—উভয়ের কাছেই অপরাধ। মানুষের প্রতি অপরাধ এইজন্য বলা হচ্ছে যে প্রয়োজনাতিরিক্ত খেলে কোন না কোন প্রতিবেশীকে তার খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। ঈশ্বরের অর্থব্যবস্থা সকলের জন্য প্রত্যহ ঠিক যতটুকু না হলে নয়, অর্থাৎ ঔষধের মত মাত্রা মেপে খাদ্যের বন্দোবস্ত করে থাকে। অথচ আমরা সবাই পেটভরে খাবার দলে। অবশ্য আহার্যের পরিমিত মাত্রা কতটুকু—একথা জানা কঠিন ব্যাপার। কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমরা পিতামাতার শিক্ষার জন্য ঔদরিক হয়ে পড়ি। তারপর প্রায় জীবনসায়াহ্নে আমাদের কারও কারও খেয়াল হয় যে খাদ্য রসনাবিলাসের উপকরণ নয়, শরীরকে আমাদের দাসরূপে টিকিয়ে রাখার জন্যই এর প্রয়োজনীয়তা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বংশপরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত ও পরিবেশের কারণ আত্মীকৃত রসনা পরি-তৃপ্তির জন্য খাওয়ার অভ্যাসের সঙ্গে এক বিকট লড়াই শুরু হয়ে যায়। এই কারণে

মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ উপবাস ও নিয়মিতভাবে আংশিক উপবাসের প্রয়োজনীয়তা পড়ে। এই আংশিক উপবাসই গীতায় উক্ত কৃচ্ছ্র বা পরিমিত ভোজন।

(মীরাকে লিখিত বাপুর পত্র, ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৪১-৪২)

"পরিমিত আহার" শব্দটি বেশ ভাল। "অল্প" কথাটির অর্থ পর্যাপ্তের চেয়েও কম। কার কতটুকুতে পর্যাপ্ত হবে তা অবশ্য অনুমানের বিষয়—এটা প্রত্যেককে স্বয়ং ঠিক করে নিতে হবে। সত্যসন্ধানী ব্যক্তি জানতেন যে মানুষ সচরাচর জৈব কামনার প্রশ্রয় দিয়ে থাকে এবং তাই দেহের দাবীকে প্রশ্রয় দেবার অভ্যাসের হাত এড়ানর জন্য এই কথা বলে গেছেন যে মানুষের পক্ষে পর্যাপ্তের চেয়েও কম আহার্য গ্রহণ করা উচিত। কারণ এই রকম বিধান থাকলেই প্রকৃতপক্ষে মানুষের পক্ষে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাদ্য গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সময় সময় আমরা যে খাদ্যকে পরিমিত বা অল্প মনে করি তা এমন কি পর্যাপ্তের অতিরিক্ত হতে পারে। কম খাবার তুলনায় বরং মাত্রাতিরিক্ত ও কুখাদ্য গ্রহণের জন্য বেশী লোকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। একথা ভাবতেও আশ্চর্য বোধ হয় যে যদি আমরা সঠিক খাদ্য নির্বাচন করি তাহলে অতি অল্প পরিমাণ খাদ্যেও সুন্দর ভাবে কাজ চলে যায়।

(মীরাকে লিখিত বাপুর পত্র, ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৫৪)

কিন্তু কেবল শরীরকে উপবাসী রাখার কোন অর্থ হয় না। অনশন হবে আভ্যন্তরীণ উপবাসের সম্যক স্বীকৃতি। এর পিছনে থাকবে সত্য—একমাত্র সত্য প্রকাশের অদম্য আকুতি।

(হরিজন, ৬-৫-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ)

আমি জানি যে আমার কৃচ্ছ্রসাধন, উপবাস এবং প্রার্থনা ইত্যাদিকে যদি আমি আমার সংস্কারের উপায় স্বরূপ মনে করি তাহলে তাদের কোনই মূল্য নেই। কিন্তু ওসব যদি সান্ত্বনা লাভের জন্য ব্যাকুল একটি শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের নিজ স্রষ্টার কোলে মাথা গোঁজার প্রয়াসের প্রতীক হয়—এবং আমার বিশ্বাস আমার প্রচেষ্টা এই প্রতীকেরই দ্যোতক—তাহলে তার অপরিমেয় মূল্য আছে।

(হরিজন, ১৮-৪-১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৭৭)

রক্ত মাংসের দেহ যতক্ষণ মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ততক্ষণ তার নিগ্রহ বা নিয়মন প্রয়োজন। কিন্তু রক্ত মাংস নিজ আয়ত্তাধীন হয়ে গেলে এবং দেহকে সেবার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়ে উঠলে শরীর-

নিগ্রহ করা ঠিক নয় অর্থাৎ নিছক দেহনিগ্রহ করার মধ্যে কোন রকম বিশেষ গুণপনা নেই।

(হরিজন, ২-১১-১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৯৯)

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহ উপবাসের উদাহরণে পরিপূর্ণ এবং আজও নামমাত্র অজুহাতেই সহস্র সহস্র হিন্দু উপবাস করে থাকেন। এর ফলে অবশ্য কারও ক্ষতি হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সব ভাল প্রথার মত উপবাসেরও দুরুপয়োগ হয়ে থাকে। এ রকম হওয়া অপরিহার্য। কখনও কখনও ভালর আবরণে মন্দও হয়ে থাকে বলে মানুষ ভাল কাজ করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে না।

পৃথিবীর সর্বত্রই ইন্দ্রিয় নিগ্রহকে আধ্যাত্মিক বিকাশের উপায় স্বরূপ বিবেচনা করা হয়। পূর্ণ উপবাসের অর্থ পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ। এ হল শুদ্ধতম প্রার্থনা। "আমার এ জীবনের অঞ্জলি গ্রহণ কর, এ জীবন যেন সর্বদা তোমাতেই উৎসর্গীকৃত থাকে।"—এ উক্তি যেন নিছক কথার কথা না হয়। তিলমাত্র কুণ্ঠা না করে নিজেকে একেবারে নিঃশেষে লুটিয়ে দিতে হবে এবং এ দেওয়া হবে আনন্দের। খাদ্য এবং এমন কি পেয় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা এর সূত্রপাত মাত্র—আত্মোৎসর্গের কেবল প্রারম্ভিক পর্যায়।

ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন—সব রকমের উপবাসের উপরই আমার গভীর বিশ্বাস আছে।

(হরিজন, ১৫-৪-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪)

পূর্বের তুলনায় আমি বেশ ভাল করেই জানি যে উপবাস পরিমাণে যতই অল্প হক না কেন, তাকে বাদ দিয়ে প্রার্থনা হয় না। আর এ উপবাস কেবল জিহ্বার নয়, প্রতিটি ইন্দ্রিয় ও রিপুর নিয়মন চাই। প্রার্থনা যতক্ষণ না আমাদের সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করছে এবং যতক্ষণ না আমরা যাবতীয় দৈহিক কর্মচাঞ্চল্যের ঊর্ধ্বে উঠে সে সবের সঙ্গে অসম্পৃক্ত হচ্ছি, ততক্ষণ সমস্ত রকমের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বর্জন করার নাম প্রার্থনায় পরিপূর্ণভাবে লীন হয়ে যাওয়া। স্বেচ্ছায় নিয়মিতভাবে ইন্দ্রিয় নিয়মন করার দ্বারাই কেবল এই স্থিতিতে উপনীত হওয়া সম্ভব। সুতরাং আধ্যাত্মিক প্রেরণা দ্বারা চালিত প্রতিটি উপবাসই গভীর প্রার্থনা বা তার প্রস্তুতি। এ হল জীবাত্মার পরমাত্মায় বিলীন হবার আকুতি।

(হরিজন, ৮-৭-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪)

প্রার্থনা

প্রার্থনা হল ধর্মের সারাৎসার এবং সেইজন্য মানবজীবনের কেন্দ্রবিন্দু হবে প্রার্থনা। কারণ ধর্ম ব্যতিরেকে কোন মানুষই বাঁচতে পারে না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১-১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৫)

ঈশ্বরের নাম অসংখ্য, অথবা তাঁকে অনামা বলাই ভাল। আমরা আমাদের খুশীমত যে কোন নামে তাঁর উপাসনা বা প্রার্থনা করতে পারি। কেউ তাঁকে রাম বলে কেউ বলে কৃষ্ণ। কেউ বা আবার তাঁর রহিম নাম দিয়েছে, কেউ আবার গড্ বলে তাঁকে ডাকে। সবাই একই পরম সত্তার আরাধনা করছে। তবে একই খাবার যেমন সকলের ভাল লাগে না তেমনি একই নাম সকলের পছন্দ হয় না। প্রত্যেকে নিজ নিজ পূর্ব-সংস্কার অনুযায়ী তাঁর এক একটি নাম বেছে নেয়। অন্তরাত্মা সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। আমাদের অন্তরতম ভাব-ভাবনা তাঁর কাছে গোপন থাকে না সেই জন্য তিনি আমাদের সাধনা অনুসারে সাড়া দেন।

সুতরাং প্রার্থনা উপাসনা কেবল মুখে উচ্চারণ করার জিনিস নয়, অন্তরের নৈবেদ্য। আর সেইজন্যই বোবা তোতলা, অজ্ঞ মূর্খ সবাই প্রার্থনা করতে পারে। একই কারণে মুখে মিষ্টি কিন্তু হৃদয়ে গরল—এমন লোকের প্রার্থনা ভগবান শোনেন না। সুতরাং যিনি ঈশ্বরের আরাধনা করবেন, তাঁকে তাঁর হৃদয় নির্মল করতে হবে। বিশ্বাসই আমাদের বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগর পার করে দেয়; বিশ্বাস পাহাড় টলায়, সমুদ্র লঙ্ঘন করায়। এই বিশ্বাস হৃদয়স্থ ঈশ্বর সম্বন্ধে সজাগ সচেতনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিশ্বাস যার ভিতর আছে সে আর কোন কিছুই চায় না। দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হলেও তার আত্মা সুস্থ। তাই তার শরীর পবিত্র এবং সে আধ্যাত্মিক সম্পদে গরীয়ান।

তবে অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, "হৃদয়কে কিভাবে এতটা শুদ্ধ করা যায়?" মুখনিঃসৃত ভাষা সহজেই শেখান যায়; কিন্তু হৃদয়ের ভাষা কে শেখাতে পারেন? কেবল সত্যকার ভক্তই এ ভাষা জানেন এবং তাই তিনিই শুধু এর শিক্ষা দিতে সক্ষম। গীতা তিন জায়গায় ভক্তের বর্ণনা দিয়েছে এবং সাধারণভাবে সর্বত্রই ভক্তের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছে। তবে ভক্তের সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে জানাই যথেষ্ট নয়। সত্যিকারের ভক্ত এ পৃথিবীতে সুদুর্লভ। আমি তাই সেবাধর্মকে হৃদয় শুদ্ধ করার সাধন বলে থাকি। প্রতিবেশীর সেবাকারীর হৃদয়ে ঈশ্বর স্বতঃপ্রেরিতভাবে স্থান করে নেন।

প্রার্থনানিষ্ঠ হৃদয় ঈশ্বরোপাসনার মাধ্যম আর জনসেবা হৃদয়কে প্রার্থনানিষ্ঠ করে তোলে। আজকের যুগে যে সব হিন্দু প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে 'অস্পৃশ্যদের' সেবা করেন, তাঁরা যথার্থ প্রার্থনা করছেন। যাঁরা দীন ও দরিদ্রের জন্য সুতা কাটেন, তাঁরাও সত্যকার প্রার্থনা করছেন।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৯-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৩১-৩২)

স্রষ্টার গুণগান করার জন্য সংরক্ষিত সময়ে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ইহুদী এবং আর সকলে কি করেন? আমার মনে হয় তাঁদের একাজ স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য নিজেদের হৃদয়ের আকুতির দ্যোতক, সেই পরম পিতার আশীর্বাদ লাভের প্রার্থনা। এক্ষেত্রে বড় কথা হল মনোভাব, উচ্চারিত বাক্যের খুব একটা মহত্ত্ব নেই। আর কখনও কখনও দেখা যায় যে যুগপরম্পরায় যে ভাবগর্ভ শব্দটি চলে আসছে, মাতৃভাষায় অনুবাদ করলে তার ব্যঞ্জনা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে গুজরাতীতে গায়ত্রী মন্ত্রের অনুবাদ করে উচ্চারণ করলে মূলের প্রভাব পড়বে না। রাম শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্র লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রভাবিত হবে, কিন্তু 'গড' শব্দের অর্থ তারা বুঝতে পারলেও তা তাদের প্রাণে সাড়া জাগাবে না। বহুদিনের ব্যবহার এবং এই ব্যবহারের সঙ্গে সম্বন্ধিত মহৎ ভাবনার জন্য শব্দে একটা বিশেষ শক্তির সঞ্চার হয়ে থাকে। সুতরাং পুরাকালের সংস্কৃত মন্ত্রের প্রচলন অব্যাহত রাখার সপক্ষে অনেক বক্তব্য আছে। তবে বলাই বাহুল্য যে ঐসব মন্ত্রের যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

প্রার্থনার জন্য কতটুকু সময় লাগবে, তার কোন ধরা বাঁধা নিয়ম হয় না। এটা নির্ভর করে ব্যক্তিগত প্রবণতার উপর, প্রার্থনায় নিয়োজিত সময় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অমূল্য মুহূর্তের সমষ্টি। উপাসনাক্রমের উদ্দেশ্য আমাদের ধীর ও নম্র করে তোলা। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে যে কোন কিছুই ঘটে না এবং আমরা "কুম্ভকারের হস্তধৃত মৃত্তিকাপিণ্ড" ছাড়া আর কিছুই নই—এই উপলব্ধি আসে প্রার্থনা থেকে। প্রার্থনাকাল এমন একটা মুহূর্ত যখন মানুষ অতীত আচরণের পর্যালোচনা করে, নিজ দুর্বলতা স্বীকার করে আর আরও ভাল হবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে মার্জনাভিক্ষা ও শক্তি যাচ্ঞা করে। এর জন্য কারও পক্ষে এক মিনিট সময়ই যথেষ্ট, কারও আবার চব্বিশ ঘণ্টাও খুব কম বলে মনে হতে পারে। যাঁরা নিজেদের ভিতর ঈশ্বরের উপলব্ধি করেন, তাঁদের পক্ষে শরীরশ্রমই প্রার্থনা। তাঁদের জীবন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা বা

উপাসনার প্রক্রিয়া। আর যাঁদের কাজের অর্থই পাপাচরণ, যাঁরা ষড় রিপুকে প্রশ্রয় দেন ও স্বার্থমগ্ন থাকেন, তাঁরা প্রার্থনার জন্য যতটা সময়ই ব্যয় করুন না কেন, তা বেশী নয়। তাঁদের ভিতর যদি পবিত্র হবার ধৈর্য বিশ্বাস এবং ইচ্ছা থাকে তাহলে অন্তরে ঈশ্বরের সর্বকলুষহারী সান্নিধ্য স্পষ্টভাবে অনুভব না করা পর্যন্ত তাঁরা প্রার্থনা করবেন। আমাদের মত নশ্বর জীবের অবশ্য এই দুই চরম স্থিতির মাঝামাঝি একটা মধ্যপন্থা চাই। আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ উপাসনাময় বলার মত মহৎ আমরা নই, আবার নিছক স্বার্থচালিত হয়ে জীবন-ধারণ করার মত নীচও নই। এইজন্য সব ধর্মেই সাধারণ প্রার্থনার জন্য পৃথক সময় নির্দিষ্ট করার বিধান আছে। বর্তমানে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নির্দিষ্ট সময়ে পূজা-অর্চনা করার এই প্রথা প্রবঞ্চনামূলক না হলেও নিছক যান্ত্রিক ও লৌকিক ক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়ে পড়েছে। তাই এই সব উপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনোভাবের পরিশুদ্ধি প্রয়োজন।

ভগবানের কাছে কোন কিছু চাওয়ারূপী নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত প্রার্থনা অবশ্যই জিহ্বায় উচ্চারিত হবে। বিশ্বচরাচরের তাবৎ জীবিত প্রাণীর প্রতি ন্যায়ানুকূল আচরণ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার চেয়ে শ্রেয়তর আর কি হতে পারে? (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-৬-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২১১)

মানুষের বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য হচ্ছে পুরাতন অভ্যাসকে জয় করা এবং নিজের ভিতরকার পাপের উপর বিজয়ী হয়ে শিবত্বকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। আর ধর্ম যদি আমাদের এই অভিযানে বিজয়ী হবার শিক্ষা না দেয়, তাহলে কিছুই শেখাল না বলতে হবে। কিন্তু জীবনের এই যথার্থতম প্রয়াসের কোন বাঁধাধরা রাজমার্গ নেই। আমরা যেসব পাপে ভুগি সম্ভবতঃ ভীরুতাই তাদের মধ্যে প্রচণ্ডতম আর এ-ই বোধহয় চরমতম হিংসা। রক্তপাত এবং আর যেসব কার্যকলাপ এ পৃথিবীতে হিংসা নামে পরিচিত, ভীরুতা নিঃসন্দেহে তাদের চেয়ে অনেক উচ্চগ্রামের হিংসা। কারণ ঈশ্বরবিশ্বাসের অভাব এবং তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে অজ্ঞতা থেকে এর জন্ম। নিজের উদাহরণ দিয়ে আমি একথা বলতে পারি যে ভীরুতা এবং অপরাপর পুরাতন দুর্গুণকে পরাভূত করার জন্য হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনাই নিঃসন্দেহে মানুষের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাধন। আর অন্তরস্থ ভগবানের প্রতি জলন্ত বিশ্বাস না থাকলে প্রার্থনা করা অসম্ভব!

আমরা পাপ না পুণ্য—কোন্ পক্ষে যোগ দেব তা আমাদের বেছে নিতে হবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পবিত্র

মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ফলে মানুষ অন্ধকারের রাজার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। তবে মন্ত্রোচ্চারণ আর আন্তরিক প্রার্থনা এক জিনিস নয়। যথার্থ প্রার্থনা হৃদয়ের আকুতির অভিব্যক্তি, মানুষের প্রতিটি কথা কাজ এমনকি চিন্তাতেও এর ছাপ পড়ে। কোন কুচিন্তা তাকে পরাভূত করে ফেললে বুঝতে হবে যে তার প্রার্থনায় আন্তরিকতার অভাব ছিল। মুখ দিয়ে কুবাক্য বেরিয়ে যাওয়া বা কুকাজ করে ফেলার সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এই ত্রিবিধ পাপের বিরুদ্ধে সত্যকার প্রার্থনাই হল একমাত্র বর্ম ও আত্মরক্ষার অনন্য উপায়। এই জাতীয় যথার্থ সজীব প্রার্থনায় হয়ত প্রথম প্রচেষ্টাতেই সফলকাম হওয়া যাবে না। নিজের সঙ্গে নিজেকে লড়াই করে যেতে হবে, নিজের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাস হারালে চলবে না। এই প্রয়াসে মাসগুলিকে বৎসরের মত দীর্ঘ মনে হলেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। প্রার্থনার কার্যকারিতা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে অসীম ধৈর্য চাই। চতুর্দিক ঘিরে হয়ত অন্ধকার হতাশা এবং এমনকি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর বিপত্তি ঘনিয়ে আসতে পারে; কিন্তু ভীরুতার কাছে নতিস্বীকার না করে এসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত সাহস আমাদের থাকা চাই। প্রার্থনানিষ্ঠ মানুষের অভিধানে পিছু হটা বলে কোন কথা নেই।

আমি যা বলছি, তা কোন রূপকথা নয়। আর আমি কোন কাল্পনিক চিত্রও অঙ্কন করিনি। ঊর্ধ্বমুখী অভিযান করার পথে যারা প্রার্থনার সহায়তায় সর্ববিধ বিপদ ও অসুবিধাকে জয় করেছেন, আমি তাঁদের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বিবৃত করেছি। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখছি যে যত দিন যাচ্ছে ততই আমি আমার জীবনে বিশ্বাস ও প্রার্থনার অবদান সম্বন্ধে অবহিত হচ্ছি। আমার কাছে অবশ্য বিশ্বাস ও প্রার্থনা সমার্থজ্ঞাপক শব্দ। আর আমার অভিজ্ঞতা দুই চার ঘণ্টা, এক আধ দিন বা সপ্তাহের নয়—দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা এ। ব্যর্থতা, চরম অন্ধকার, হতাশা, অহঙ্কারের প্রচ্ছন্ন আঘাত ইত্যাদি বহুবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এযাবৎ আমার বিশ্বাসের বলে ঐসব অসুবিধাকে শেষ অবধি জয় করতে সমর্থ হয়েছি। অথচ আমার বিশ্বাস-শক্তি এখনও দুর্বল —অন্ততঃ আমি যতটা শক্তিশালী করতে চাই, ততটা তো নয়ই। আমাদের ভিতর বিশ্বাস-শক্তির অস্তিত্ব থাকলে, আমাদের হৃদয় প্রার্থনাময় হলে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে দরদস্তুর করব না বা তাঁকে প্রলোভন দেখানর প্রয়াস করব না। আমরা নিজেদের শূন্যে পরিণত করব। নিজেদের শূন্যে পরিণত না করা

পর্যন্ত আমরা আমাদের ভিতরকার পাপের উপর বিজয়ী হতে পারব না। সত্যকার স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা পাবার মত, তার মূল্যস্বরূপ সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের কম কোন কিছু ঈশ্বর স্বীকার করেন না। আর এইভাবে আত্মবিস্মৃত হওয়া মাত্র মানুষ নিজেকে সর্বজীবের সেবায় নিয়োজিত দেখে। সেবা তখন তার কাছে আনন্দ ও মনোরঞ্জনস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সে তখন এক নূতন মানুষ, ঈশ্বরসৃষ্ট জীবকুলের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে তার মনে কোন-রকম দ্বিধা সঙ্কোচ থাকে না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১২-১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪২০)

অহঙ্কারী ব্যক্তি অথবা দরদস্তুরকারী মনোবৃত্তিসম্পন্নদের প্রার্থনায় ঈশ্বর সাড়া দেন না।······তাঁর সাহায্য পেতে ইচ্ছুক হলে আপনাকে নিরুপাধি হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হতে হবে। কোনরকম সঙ্কোচ না করে, আপনার মত পতিত প্রাণীকে তিনি কি করে সহায়তা দেবেন এ সম্বন্ধে মনে কোনরকম ভয় বা আশঙ্কা না রেখে তাঁর চরণে প্রার্থনা নিবেদন করতে হবে। যিনি লক্ষ লক্ষ প্রার্থীকে সাহায্য করেছেন, তিনি কি আর আপনাকে বিমুখ করবেন? করুণা করার ব্যাপারে তিনি কোনরকম বাছ-বিচার করেন না। আপনি তাই দেখবেন যে আপনার প্রতিটি প্রার্থনায় সাড়া মিলছে। একেবারে অধম ব্যক্তির প্রার্থনারও ফল ফলবে। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলছি। আমি স্বয়ং যাবতীয় নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি। প্রথমে ঈশ্বরের রাজত্ব কামনা করুন, তারপর সবকিছু পেয়ে যাবেন।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৪-১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১১১)

জীবনের সব পরীক্ষায় তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র, ব্যবহারজীবীর পেশা, প্রতিষ্ঠান সঞ্চালন অথবা রাজনীতি—সর্বক্ষেত্রের পরীক্ষাতেই ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন, একথা আমি বলতে পারি। যখন সব আশা চলে যায়, যখন সাহায্যকারীরা বিফল হয় ও আনন্দ অদৃশ্য হয়, তখন দেখেছি কি জানি কোথা থেকে যেমন করে হোক সাহায্য এসে পড়ে। ঈশ্বরের করুণাভিক্ষা, আরাধনা, প্রার্থনা ইত্যাদি কুসংস্কার নয়—এসব খাওয়া বসা বা চলার চেয়েও অধিকতর বাস্তব কার্য। একথা বলা অত্যুক্তি নয় যে একমাত্র ঈশ্বরের করুণাভিক্ষা আরাধনা ও প্রার্থনা ইত্যাদিই বাস্তব আর সব কাজ অবাস্তব।

এ জাতীয় প্রার্থনা বাক্চাতুর্য নয়; এ কোন মৌখিক আনুগত্যও নয়। এ হল হৃদয়ের স্বতোৎসারিত প্রার্থনা। সুতরাং আমরা যদি হৃদয়কে এতটা পবিত্র

করতে পারি যখন হৃদয়ে 'প্রেম ছাড়া অপর কিছুর অস্তিত্ব থাকে না', হৃদয়-তন্ত্রীগুলিকে যদি ঠিক সুরে বাঁধা যায় তাহলে 'হৃদয় থেকে যে সুর নির্গত হয় তার গতি হয় ঊর্ধ্বমুখী'। প্রার্থনার জন্য বাক্যের প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রার্থনা স্বয়ং যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রয়াসের ঊর্ধ্বে। আমার মনে এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে হৃদয়কে রিপুর প্রভাবমুক্ত করার কার্যে প্রার্থনা এক অব্যর্থ সাধনা। তবে প্রার্থনার সঙ্গে চূড়ান্ত নম্রতার সমন্বয় হওয়া চাই।

(আত্মকথা, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৬)

" প্রার্থনা আমার জীবন-রক্ষকের কাজ করেছে। প্রার্থনা ব্যতিরেকে বহুদিন পূর্বেই আমি উন্মাদ হয়ে যেতাম। আমার আত্মকথা পাঠে জানতে পারবেন যে সার্বজনীন ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত জীবনে আমি যথেষ্ট মাত্রায় তিক্ততম অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছি। সেই সব অভিজ্ঞতা আমাকে সাময়িকভাবে হতাশাগ্রস্ত করেছে। প্রার্থনার বলেই আমি সেই হতাশার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। তবে আমাকে স্বীকার করতে হবে যে সত্যের মত প্রার্থনা আমার জীবনের অঙ্গীভূত ছিল না। নিছক প্রয়োজনের তাগিদে আমি প্রার্থনানিষ্ঠ হয়েছি। নিজেকে যখন বিপদ পরিবৃত মনে হয়েছে, তখন প্রার্থনা ছাড়া আমার পক্ষে অপর কিছুতেই আশ্বস্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। আর আমার ভিতর ঈশ্বরবিশ্বাস যতই প্রবল হয়েছে, প্রার্থনার আকর্ষণ ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। প্রার্থনা ব্যতিরেকে জীবন শূন্য ও রসবিহীন লেগেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন আমি খ্রীস্টীয় উপাসনায় যোগ দিয়েছি; কিন্তু তা আমার হৃদয়কে অভিভূত করতে পারেনি। আমি তাঁদের প্রার্থনার সঙ্গে সহমত হতে পারিনি। তাঁরা ভগবানের কাছে কেবল করুণা যাচ্ঞা করতেন। আমি কিন্তু তা পারিনি, আমি ভীষণ-ভাবে ব্যর্থ হয়েছি। ঈশ্বর এবং প্রার্থনায় অবিশ্বাস নিয়েই আমার জীবন-যাত্রা শুরু হয় আর বেশ কিছুটা বয়স না হওয়া পর্যন্ত জীবনের শূন্যতা আমার কাছে ধরা পড়েনি। কিন্তু একটু বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে দেহধারণ করার জন্য যেমন খাদ্য গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক তেমনি প্রার্থনাও মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। বরং বলা চলে আত্মার পক্ষে প্রার্থনার যতটা প্রয়োজন, শরীরের পক্ষে খাদ্যের প্রয়োজন তার চেয়ে কম। কারণ শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য মাঝে মাঝে উপবাস করার প্রয়োজন হয়; কিন্তু প্রার্থনা বন্ধ রাখার কথা উঠতেই পারে না।... [illegible] দিগন্তে সুস্পষ্ট হতাশার অন্ধকার দেখা দিলেও আমি তাই কখনও শান্তি হারাইনি। সত্যি কথা বলতে কি আমি এমন বহু ব্যক্তিকে

দেখেছি যাঁরা আমার এই মানসিক প্রশান্তির ঈর্ষা করেন। আমি আপনাদের জানাতে চাই যে এ শান্তির উদ্গম প্রার্থনা থেকে। আমি বিদগ্ধ ব্যক্তি নই; কিন্তু নিজেকে আমি সবিনয়ে প্রার্থনা-পরায়ণ ব্যক্তিরূপে দাবী করি। প্রার্থনার পদ্ধতি নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। এ ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। তবে প্রার্থনার কতিপয় পুরাতন পন্থা বিদ্যমান এবং প্রাচীন কালের ধর্মগুরুরা যে সব পথে চলেছেন সেই রকম কোন পরিচিত পথ ধরে এগোনই নিরাপদ।......আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উদাহরণ দাখিল করলাম। এবার প্রত্যেকে যেন এই সত্য আবিষ্কারের প্রয়াস করেন যে নিয়মিত প্রার্থনার দ্বারা তিনি প্রত্যহ নিজ জীবনে কিছু না কিছু নবীন তত্ত্বের সংযুক্তি সাধন করেন যার সঙ্গে অপর কিছুর তুলনা চলে না। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৯-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৭৪)

[সবরমতীতে গুজরাতের কিছু সংখ্যক ছাত্রের সম্মুখে গান্ধীজী গুজরাতীতে যে বক্তৃতা দেন নীচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।]

তোমরা আমাকে প্রার্থনার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে বলায় আমি আনন্দিত হয়েছি।

প্রার্থনা মানবজীবনের মূল; কারণ এই হচ্ছে ধর্মের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রার্থনা হয় আবেদনমূলক নচেৎ ব্যাপকার্থে অন্তর্লোকের মিলন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত লক্ষ্য অভিন্ন। প্রার্থনা যখন আবেদনমূলক হয়, সে আবেদন হওয়া উচিত আত্মার পরিশুদ্ধি ও চতুর্দিকস্থ অজ্ঞান নাশ ও তিমিরজাল থেকে আত্মাকে মুক্ত করার জন্য। অতএব নিজের ভিতর ঈশ্বরের জাগরণ যার কাম্য, তাকে প্রার্থনার শরণ নিতেই হবে। কিন্তু প্রার্থনা তো স্বরযন্ত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুশীলন মাত্র নয় বা এ শুধু নিষ্প্রাণ শ্লোকের পুনরাবৃত্তি নয়। হৃদয় আলোড়িত করতে না পারলে যতই রাম নাম করা যাক না কেন, তার মূল্য নেই। প্রার্থনায় হৃদয়বিহীন শব্দমালার চেয়ে শব্দবিহীন হৃদয় অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যে ক্ষুধার কারণে প্রার্থনার জন্ম, প্রার্থনা দ্বারা তার পরিতৃপ্তি বিধান করতে হবে। ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশিত ভোজ্যে তৃপ্তি বোধ করে, উপবাসী আত্মাও তেমনি হৃদয়ে অনুরণন সৃষ্টিকারী প্রার্থনায় সন্তুষ্টি বোধ করবে। নিজের এবং আমার সঙ্গী-সাথীদের অভিজ্ঞতা থেকে আমি তোমাদের বলছি যে প্রার্থনার চমৎকারী শক্তির পরিচয় যে ব্যক্তি পেয়েছে, সে খাদ্য ব্যতিরেকে একাদিক্রমে একাধিক দিন থাকতে পারে কিন্তু প্রার্থনা ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচবে না। কারণ প্রার্থনা ছাড়া অন্তর্লোকের সোয়াস্তি নেই।

কেউ হয়ত বলবে যে যদি তাই হয় তাহলে তো আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই প্রার্থনা করছি। এ সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই; কিন্তু আমরা নিত্য ভ্রান্তিকারী মরণশীল মানুষ বলে এমন কি তিলেকের জন্যও অন্তর্লোকচারী হতে পারি না। এমতাবস্থায় সেই অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে চিরমিলন অসম্ভব। এইজন্য আমরা এমন কিছুটা সময় নির্দিষ্ট ক'রে নিই, যখন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমরা ভববন্ধন ছিন্ন করার প্রচেষ্টায় ব্রতী হই এবং সেই সময়টুকুর জন্য এই রক্ত-মাংসের পিণ্ডের ঊর্ধ্বে থাকার চেষ্টা করি। সুরদাসের নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি তোমরা শুনে থাকবে:

মো সম কৌন কুটিল খল কামী।
জিন তন দিয়ো তাহি বিসরায়ো,
এইসো নিমকহরামী॥

(অর্থাৎ আমার মত কুটিল খল ও কামুক আর কে আছে? যিনি এই শরীর দিয়েছেন তাঁকেই ভুলে গেছি, এতই কৃতঘ্ন আমি।)

এ হচ্ছে সেই স্বর্গীয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য হৃদয়ের আকুল আকুতি। আমাদের বিচারে সুরদাস ছিলেন মহাপুরুষ; কিন্তু নিজেকে তিনি পাপীর অধম মনে করতেন। আধ্যাত্মিক জগতে তিনি আমাদের বহু যোজন অগ্রগামী ছিলেন কিন্তু সেই পুরুষোত্তমের কাছ থেকে তিনি নিজেকে এতটা বিচ্ছিন্ন মনে করতেন যে হতাশা ও আত্মগ্লানিতে তিনি ঐ কাতর আর্তনাদ তুলেছিলেন।

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বলেছি এবং আলোচনা প্রসঙ্গে প্রার্থনার মূল তত্ত্বের কথাও আমি চর্চা করেছি। আমাদের জন্ম অপরের সেবার জন্য এবং সকলে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ না হলে এ কর্তব্য সুসম্পাদিত হওয়া কঠিন। মানব-হৃদয়ে নিরন্তর সুরাসুরের সংগ্রাম চলেছে এবং যে ব্যক্তি নিজ জীবনের ভরসাস্থল প্রার্থনারূপী নোঙরের আশ্রয় পায়নি, তার অসুর শক্তির কবলে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। প্রার্থনাকারী মানব নিজেকে এবং সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে শান্তিতে থাকবে এবং এই দুনিয়ায় যে প্রার্থনাশীল হৃদয় ছাড়াই বিচরণ করে, সে মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হবে এবং বিশ্বজগতকেও দয়ার পাত্র করে তুলবে। সুতরাং মৃত্যুর পর মানবের উপর প্রভাব বিস্তারের কথা বাদ দিলেও ইহলোকেই প্রার্থনা মানুষের অমূল্য সম্পদ। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে শৃঙ্খলা শান্তি এবং ধৈর্য আনার একমাত্র সাধন হচ্ছে প্রার্থনা। আশ্রমের

আমরা যে সব বাসিন্দা এখানে সত্যের সন্ধানে আসি ও যারা সত্যানুভূতির জন্য প্রার্থনার অপরিহার্যতার কথায় বিশ্বাস করি, তারাও এখনও প্রার্থনাকে অত্যাবশ্যক ব্যাপার বলে গণ্য করি না। এর প্রতি আমরা অন্যান্য বিষয়ের মত নজর দিই না। অকস্মাৎ আমি একদিন এই মহাসুপ্ত থেকে জেগে উঠলাম এবং বুঝতে পারলাম যে আমার এই কর্তব্যের প্রতি আমি গুরুতর অবহেলা করেছি। এইজন্য আমি কঠোর অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করলাম এবং এর ফল খারাপ হবার পরিবর্তে ভালই হয়েছে। এর কারণ অতীব স্পষ্ট। অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি নজর দিলে অন্যান্য বিষয় আপনিই ঠিক হয়ে যায়। চতুর্ভুজের একটি কোণ ঠিক করে ফেল, তাহলে বাকী কোণগুলি আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।

সুতরাং তোমাদের দিনের সূচনা হক প্রার্থনা দিয়ে এবং সে প্রার্থনাকে এমন প্রাণবন্ত কর যে তা যেন সায়ংকাল পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে থাকে। প্রার্থনার দ্বারা সমগ্র দিবসের কর্মসূচীর উপর সমাপ্তির যবনিকা টেনে দাও এবং তাহলে দেখবে যে তোমাদের রাত্রি হবে শান্তিপূর্ণ—স্বপ্নমুক্ত। প্রার্থনার পদ্ধতি নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। এর রূপ যাই হক না কেন এ যেন আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগ সাধন করতে পারে। শুধু এইটুকু স্মরণ রেখো যে এর পদ্ধতি যে রকমই হক না কেন, প্রার্থনামন্ত্র যখন কণ্ঠে উচ্চারিত হবে আমাদের মন যেন সেই সময় ইতস্তত ছুটাছুটি না করে।

আমার বক্তব্য যদি তোমরা প্রণিধান করে থাক, তাহলে তোমাদের ছাত্রাবাসাধ্যক্ষকে উপাসনায় অনুপ্রাণিত না করা পর্যন্ত তোমরা শান্তি পাবে না এবং একে বাধ্যতামূলক করে ছাড়বে। স্বতঃআরোপিত সংযম বাধ্য-বাধকতা নয়। যে সংযম বন্ধন থেকে মুক্ত অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারের পথ গ্রহণ করবে, সে হবে ইন্দ্রিয়ের দাস এবং যে নিজেকে নিয়ম-কানুন ও সংযমের বাঁধনে বাঁধবে সে তার আত্মার বন্ধন মোচন করবে। সূর্য চন্দ্র এবং গ্রহ-নক্ষত্র সহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি পদার্থ একটি নিয়মবন্ধনে চলে। এই নিয়মের বাঁধন ছাড়া পৃথিবী এক মুহূর্তও চলতে পারে না। তোমাদের মত যাদের জীবনের লক্ষ্য হল নিজ সাথীদের সেবা করা, তারা যদি কোনও অনুশাসনের বাঁধন স্বীকার না করে, তাহলে তোমরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। প্রার্থনা হচ্ছে একটি অতীব প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক অনুশাসন। আমাদের সঙ্গে পশুকুলের পার্থক্য হচ্ছে শৃঙ্খলা ও সংযমে। আমরা যদি চতুষ্পদ হয়ে চলার পরিবর্তে উন্নতশির হয়ে

বিচরণ করতে চাই তাহলে আমাদের অনুশাসন ও সংযমের মহত্ব বুঝে স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনে এর প্রয়োগ করতে হবে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১-১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৫-২৬)

প্রার্থনা করার আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কি? ভগবান বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব যদি থাকে তাহলে পৃথিবীতে কি ঘটছে তা তিনি জানেন। তাঁকে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রার্থনার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?

না, ঈশ্বরকে কোন কিছু মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই। তিনি সকলের অন্তরেই বিরাজিত। তাঁর আজ্ঞা ব্যতীত কোন কিছুই ঘটতে পারে না। আমাদের প্রার্থনা হল হৃদয়ানুসন্ধান। প্রার্থনা আমাদের এই কথা মনে করিয়ে দেয় যে তাঁর সাহায্য বিনা আমরা কত অসহায়। প্রার্থনা, অর্থাৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট না হলে মানুষের সর্বোচ্চ প্রয়াসও যে নিষ্ফল—এর সুস্পষ্ট অনুভূতি হৃদয়ে না জাগলে যাবতীয় মানবীয় প্রচেষ্টাই অসম্পূর্ণ। প্রার্থনা নম্রতার অনুপ্রেরক। এ হল চিত্তশুদ্ধি ও অন্তর্লোক সমীক্ষার আবেদন।

(হরিজন, ৮-৬-১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩২)

ধর্ম জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত থাকবে

মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম একটি সমগ্রতার অংশ। সামাজিক আর্থিক রাজনৈতিক এবং নিছক ধর্মীয় কার্যকলাপকে আপনি পরস্পর সম্বন্ধরহিত প্রকোষ্ঠে বিভাজিত করতে পারেন না। মানব কল্যাণ মূলক কার্যকলাপরহিত কোন ধর্মের কথা আমি জানি না। এইসব মানবীয় কার্যকলাপ অপর সকল কার্যেরই নৈতিক আধারস্বরূপ। এ না হলে জীবন শূন্যতায় পর্যবসিত হত এবং শব্দসমষ্টিও উন্মত্ততার আকর এক গোলকধাঁধায় পরিণত হত।

(হরিজন, ২৪-১২-১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯৩)

সত্য এবং অহিংসাকে কেবল ব্যক্তিমানবের আচরণীয় করলেই চলবে না। এই নীতিদ্বয়কে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এবং সকল জাতির পক্ষে আচরণীয়ের মর্যাদা দিতে হবে। অন্ততঃ এই হল আমার জীবনের স্বপ্ন। এই আদর্শের পরিপূর্তির জন্য আমি জীবনধারণ করছি এবং এরই জন্য আমি প্রাণপাত করব। আমার এই বিশ্বাস আমাকে নিত্য নব নব আবিষ্কারে সাহায্য করে। অহিংসা আত্মার

বিভূতি এবং সেইজন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকলের দ্বারা আচরণীয়। আর এ যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আচরণ করা সম্ভবপর না হয় এর কোন বাস্তব মূল্য নেই।

(হরিজন, ২-৩-১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৩)

সামাজিক ক্ষেত্রে

সকল মানুষই সমান

আমার মতে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত অথবা পরিবেশের প্রভাবে অর্জিত শ্রেষ্ঠত্ব বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমি অদ্বৈত নীতির মূল তত্ত্বে বিশ্বাস করি এবং আমার মতে অদ্বৈতের সকল পর্যায়েই শ্রেষ্ঠত্বের যে কোন রকম ভাবনা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে সকল মানুষই সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ড আমেরিকা বা অপর যে কোন পরিবেশেই জন্ম হক না কেন, সকলের আত্মাই এক এবং অভিন্ন। আর আমি সকল মানুষের এই স্বাভাবিক সমানতায় বিশ্বাস করি বলেই আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের অনেকে যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন, আমি তার বিরোধিতা করে থাকি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি পদে পদে এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি আর আমার স্বভাবে ওতঃপ্রোত এই বিশ্বাসের কারণ আমি ঝাড়ুদার কাটুনী তাঁতী চাষী ও মজুর বলে নিজের পরিচয় দিতে আনন্দ বোধ করি। জন্মের কারণ অথবা পরবর্তীকালে অধিগত জ্ঞানের জন্য যে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছি। আমার মতে কোন মানুষের তুলনায় কারও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। যিনি এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন তিনি মনুষ্য নামে অভিহিত হবার অধিকার হারান। এই হল আমার অভিমত।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৯-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ পৃষ্ঠা, ৩২৯)

রূপ বহু কিন্তু রূপাতীত মূল তত্ত্ব একই। যেখানে বাহ্য বিভিন্নতার অন্তরালে এই সর্বব্যাপী ঐক্য বিদ্যমান, সেখানে উচ্চ নীচের ভেদভাবের অবকাশ কোথায়? দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এই সত্যের সম্মুখীন হতে হয়। প্রত্যেক ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য হল এই মূলভূত ঐক্যের উপলব্ধি।

(হরিজন, ১৫-১২-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩)

ব্যক্তিগত বনাম সামাজিক দায়িত্ব

আমি ব্যক্তিস্বাধীনতার খুবই মূল্য দিই, তবে আপনাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে মানুষ মূলতঃ সামাজিক প্রাণী। সামাজিক প্রগতির প্রয়োজনের

সঙ্গে ব্যক্তিবাদের সুসামঞ্জস্য বিধানের দ্বারাই মানুষ তার বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিবাদ পশুদের ধর্ম—জঙ্গলের বিধান। তাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ—এতদুভয়ের মাঝামাঝি একটা রাস্তা বার করতে হবে। সমগ্র সমাজের কল্যাণার্থ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাছে স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করলে ব্যক্তি এবং ব্যক্তি যার অঙ্গ সেই সমাজ, অর্থাৎ উভয়েরই সমৃদ্ধি হয়।

(হরিজন, ২৭-৫-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪৪)

এমন কোন পুণ্যকর্ম নেই যার লক্ষ্য নিছক ব্যক্তি-মানবের কল্যাণ বা যা ব্যক্তির হিতসাধন করেই সমাপ্ত হয়। আবার এমন কোন নৈতিক অপরাধ নেই যা পরোক্ষভাবে মূল অপরাধী ছাড়া আরও অনেককে জড়িত না করে। অতএব কোন ব্যক্তি ভাল কি মন্দ—এ কেবল তারই সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয় নয়। এর সঙ্গে সমগ্র সমাজ, না কেবল তাই বা কেন, সারা জগতের সম্বন্ধ বিজড়িত।

(এথিক্যাল রিলিজিয়ান, মো. ক. গান্ধী, পৃষ্ঠা ৫৫)

আমি সমগ্র মানবসমাজ তথা যাবতীয় জীব-জগতের মৌলিক একতায় বিশ্বাসী। সেইজন্য আমি বিশ্বাস করি যে একটিমাত্র ব্যক্তিও আধ্যাত্মিক বিভূতি লাভ করলে তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজ লাভবান হয় আর একজনের পতন হলে সমগ্র বিশ্বেরও সেই অনুপাতে পতন হয়ে থাকে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-১২-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯৮)

আর্থিক ক্ষেত্রে

প্রেমই এর ভিত্তিভূমি হবে

মানুষ যেমন একটি ইঞ্জিন এবং আত্মা হল তার চালকশক্তি। অর্থে বশীভূত করে কিংবা চাপ দিয়ে এই বিচিত্র ইঞ্জিনটির কাছ থেকে অধিকাধিক কাজ হাসিল করা সম্ভব নয়। এই ইঞ্জিনের চালকশক্তি অর্থাৎ মানুষটির ইচ্ছা বা অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে স্নেহরূপী তার প্রকৃষ্ট ইন্ধন দ্বারা যৎপরোনাস্তি বেগবান করে তোলার পর মানুষের কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণে কাজ পাওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রের বিশ্বজনীন বিধান হল এই যে মালিক ও কর্মচারীর ভিতর যদি একটা নির্ধারিত পরিমাণের কর্মশক্তি ও চেতনা থাকে তাহলে পারস্পরিক বিরোধিতার দ্বারা নয়, সম্প্রীতির আধারেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাস্তবিক ফল লাভ করা সম্ভবপর হবে। স্বার্থরহিত আচরণ সর্বাধিক কার্যকরী

পরিণাম সৃষ্টি করবে। কর্মচারীর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করুন যাতে তার ভিতর কৃতজ্ঞতাবোধ সজীব হয়ে ওঠে এবং তাহলেই আপনার যথোচিত প্রাপ্য আপনি পেতে থাকবেন। অবশ্য দয়া বা করুণাকে ব্যবসায়ের পণ্যে রূপান্তরিত করতে বলা হচ্ছে না। আর্থিক স্বার্থনিরপেক্ষ হয়ে মানুষের সঙ্গে করুণামূলক আচরণ করুন; পরিণামে দেখতে পাবেন যে আপনার যাবতীয় আর্থিক উদ্দেশ্যও আপনা আপনিই সংসাধিত হয়ে যাচ্ছে। অন্য ক্ষেত্রের মত এখানেই সেই অমর উক্তি প্রযোজ্য—যে নিজ প্রাণ রক্ষা করতে চাইবে, সে তা হারাবে এবং যে প্রাণ দেবে সে প্রাণ ফিরে পাবে।

অনেক সময় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যুবকেরা গৃহ-পরিবেশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। সে অবস্থায় তাঁদের নিয়োগকর্তাই পিতার স্থান নেবেন; কারণ ঐ সব ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা এই রকম হয় যে তাঁদের পক্ষে সদা-সর্বদা পিতার সাহচর্য জনিত সহায়তা পাওয়া সম্ভব হয় না। অতএব নিয়োগকর্তা নিজ কর্মচারীদের প্রতি ন্যায়বিচার করছেন কিনা বোঝার একটি মাত্র উপায় আছে এবং সেটি হল নিজেকে সরাসরি এই প্রশ্ন করা যে ঘটনাচক্রে তাঁর নিজ সন্তান যদি তাঁর কর্মচারী হত তাহলে তিনি তার উপর অনুরূপ আচরণ করতেন কি-না।

আর জাহাজডুবির সময় কাপ্তেন যেমন সবার শেষে জাহাজ ছাড়েন এবং জাহাজে খাদ্যাভাব ঘটলে তিনি যেমন তাঁর শেষ দানা নাবিকদের সঙ্গে ভাগ করে খান, তেমনি কোন আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিলে ব্যবসার মালিক স্বয়ং তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে সমান হারে দুঃখ বণ্টন করে নেবেন। না, শুধু তাই নয় কর্মচারীদের তুলনায় তাঁর ঘাড়ে বেশী বোঝা পড়বে। দুর্ভিক্ষ জাহাজডুবি অথবা যুদ্ধের সময় পিতা যেমন স্বয়ং সমস্ত দুর্বিপাকের সম্মুখীন হয়ে সন্তানদের গায়ে আঁচটি পর্যন্ত লাগতে দেন না, মালিকও তেমনি সর্বদা নিজ কর্মচারীদের রক্ষা করবেন।

এ সব কথা হয়ত খুব বিচিত্র মনে হতে পারে; তবে এর বৈচিত্র্য কেবল ততটুকুই যে এমন একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা আমাদের কাছে অভিনব মনে হতে পারে। কারণ এ সব প্রস্তাব বাস্তব এবং শাশ্বত সত্য।

(রাস্কিনের "আনটু দিস্ লাস্ট"—এর গান্ধীজী কৃত মর্মানুবাদ। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮-১১ ও ২১-২৩)

ন্যায়বিচারের অর্থশাস্ত্র

সত্যকার অর্থশাস্ত্র কখনও উচ্চকোটির নৈতিক মানের বিরোধী হতে পারে না। যেমন যাবতীয় যথার্থ নীতিশাস্ত্রকে নিজ নামের যোগ্য হতে হলে যুগপৎ আদর্শ অর্থশাস্ত্রও হতে হবে। যে অর্থব্যবস্থা অর্থোপাসনার প্রসার ঘটায় এবং দুর্বলকে শোষণ করে শক্তিমানদের অর্থ পুঞ্জিভূত করতে প্ররোচিত করে, তা মিথ্যা ও ভয়াবহ বিজ্ঞান। এর শেষ পরিণাম মৃত্যু। পক্ষান্তরে সত্যিকার অর্থশাস্ত্র সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক। দুর্বলতমের সহিত সমানভাবে সকলের কল্যাণ সাধন করা এর লক্ষ্য এবং তাই সুন্দর জীবনের পক্ষে যথার্থ অর্থশাস্ত্র অপরিহার্য।

(হরিজন, ৯-১০-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৯২)

নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আমরা যতটা সম্ভব নিজেদের জন্য পাবার কথা চিন্তা করব না; সর্বসাধারণের পক্ষে যা পাওয়া সম্ভব নয় তা নিতে আমরা অস্বীকার করব।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-৯-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩০৪)

আমি যদি কাউকে তার ন্যায্য মজুরী দিই তাহলে আমার পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ জড় করা সম্ভবপর হবে না এবং বিলাস-ব্যসনের পিছনে অর্থের অপচয় করে পৃথিবীর দারিদ্রভার বৃদ্ধি করাও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর যে শ্রমিক আমার কাছ থেকে নিজের ন্যায্য মজুরী পাবে সে তার অধস্তনদের প্রতিও ন্যায়বিচার করবে। এইভাবে ন্যায়বিচারের স্রোতধারা অব্যাহত থাকবে এবং সম্মুখপানে অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে এই স্রোতধারা ক্রমশঃ পুষ্ট হতে থাকবে। আর এই জাতীয় ন্যায়বিচার-বোধে ওতপ্রোত জাতিও সুখী এবং সমৃদ্ধ হবে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থশাস্ত্রীগণ কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে মানুষের পক্ষে কল্যাণকর আখ্যা দেওয়া ভ্রান্তিমূলক। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ক্রেতা হয়ত শ্রমিকের শ্রম অন্যায় রকমের সস্তায় পায় কিন্তু এর ফলে ধনী আরও ধনবান হয় ও দরিদ্ররা হয়ে পড়ে দরিদ্রতর। কালক্রমে এর পরিণামে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। শ্রমিকের নিজ যোগ্যতানুযায়ী ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত। এ অবস্থাতেও অবশ্য এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে; কিন্তু এর ফলে দেশবাসী সুখী ও কর্মকুশল হবে। কারণ আর তাদের নিজেদের মজুরী হ্রাস করতে হবে না; কাজ পাবার জন্য তখন নব নব দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সরকারী ক্ষেত্রেও এই নিয়ম চলে। সেখানে পদের গুরুত্ব

অনুসারে বেতনমান নির্ধারিত হয়। সেখানে কোন কর্মপ্রার্থীকে অপরাপর প্রার্থীর চেয়ে কম বেতনে কাজ করার কথা বলতে হয় না—তাঁকে এক দাবী সপ্রমাণ করতে হয় যে তিনি আর সকলের তুলনায় যোগ্যতম। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এবং এর ফলে প্রতারণা চাতুরী ও চৌর্যবৃত্তি প্রোৎসাহিত হয়। খেলো মাল উৎপাদন করা হয়। উৎপাদক শ্রমিক ও উপভোক্তা—সবাই নিজ নিজ স্বার্থের চিন্তাতেই মসগুল। এর ফলে যাবতীয় মানবীয় সম্বন্ধ দূষিত হয়ে পড়ে! শ্রমিকরা উপবাসী থাকে ও অবশেষে হরতাল করে। উৎপাদকরা দুরাত্মাতে পরিণত হয় এবং উপভোক্তারাও নিজ আচরণের নৈতিক ভূমিকা বিস্মৃত হয়। একটি অন্যায় থেকে একাধিক অন্যায়ের সূত্রপাত হয় এবং শেষ অবধি মালিক শ্রমিক ও গ্রাহক সবাই অসন্তুষ্ট হয় ও অবশেষে সকলেই উৎসন্নে যায়। সম্পদই তাদের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হয়ে ওঠে।

যথার্থ অর্থশাস্ত্র হল ন্যায়বিচারের অর্থশাস্ত্র। জনসাধারণ যে পরিমাণে ন্যায়-বিচার করতে শিখবে ও ধর্মপথে চলবে, সেই পরিমাণে সুখী হবে। আর সব কেবলই যে বৃথা তা-ই নয়, তাদের গতি ধ্বংসাভিমুখী। জনসাধারণকে যে কোন উপায়ে ধনী হবার শিক্ষা দেওয়া তাদের অপূরণীয় ক্ষতি করা।

(রাস্কিনের "আনটু দিস্ লাস্ট"-এর গান্ধীজী কৃত মর্মানুবাদ। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫০-৫৩)

আর্থিক সাম্য

সমাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা নিম্নরূপ: আমরা সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের সমান সুযোগ পাবার অধিকার থাকলেও সবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা সমান নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে সবারই দৈহিক উচ্চতা গায়ের রং বা বুদ্ধি ইত্যাদি এক রকম হয় না। সুতরাং স্বভাবতই কারও বেশী রোজগার করার ক্ষমতা থাকবে এবং কেউ বা কম রোজগার করবেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা বেশী উপার্জন করবেন এবং তাঁরা নিজেদের প্রতিভাকে এদিকে খাটাবেনও। তবে তাঁরা যদি করুণাচালিত হয়ে নিজ প্রতিভার সদ্ব্যবহার করেন তাহলে তাঁরা রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পাদন করবেন। এই জাতীয় মানুষেরা সমাজের অছি হন, অপর কিছু নয়। বুদ্ধিমান মানুষ বেশী রোজগার করুন—এতে আমার আপত্তি নেই। তাঁর প্রতিভার বিকাশে

আমি বাধা দেব না। তবে কোন পিতার সব কয়টি পুত্রের রোজগার যেমন সেই সংসারের সার্বজনীন কোষে যায়, তেমনি প্রতিভাবানদের অধিকতর উপার্জনের অধিকাংশ রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১১-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৬৮)

সমবণ্টনের সত্যকার অর্থ হল এই যে প্রত্যেকের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন পূর্তির ব্যবস্থা হবে এবং তদতিরিক্ত কেউই কিছু পাবেন না। উদাহরণ স্বরূপ দুর্বল পাকযন্ত্র-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যদি আধ পোয়া চাল দরকার হয় এবং অপর একজনের যদি আধ সের চালে পেট ভরে তাহলে উভয়েরই প্রয়োজন পূর্তির ব্যবস্থা থাকবে। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হবে। অহিংসা আধারিত সমাজ-ব্যবস্থার অপর কোন লক্ষ্য হতে পারে না। সম্ভবতঃ কোন দিনই এ লক্ষ্য পূর্ণ মাত্রায় সফল হবে না। কিন্তু এই আদর্শকে হৃদয়ে জাগরুক রেখে এর নিকটবর্তী হবার জন্য আমাদের অবিরত চেষ্টা করতে হবে। আমরা যতটা এই আদর্শের সমীপবর্তী হব ততই সুখ ও তৃপ্তি বোধ করব। আর অহিংস সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারেও আমরা ততটা সফলকাম হব।

এবার দেখা যাক অহিংসার মাধ্যমে কি ভাবে সমবণ্টনের আদর্শকে কার্যকরী করা যায়। যিনি এই আদর্শকে নিজ সত্তার অঙ্গীভূত করেছেন তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করবেন—এই হল এই আদর্শাভিমুখী প্রথম পদক্ষেপ। ভারতবর্ষের দারিদ্রের কথা স্মরণ রেখে তিনি তাঁর প্রয়োজনকে ন্যূনতম করে ফেলবেন। তাঁর রোজগার অসৎ পন্থার সম্পর্করহিত হবে। ফাটকাবাজীর প্রবৃত্তি বর্জন করতে হবে। তাঁর আচার ব্যবহার হবে জীবনযাত্রার নবীন মূল্যবোধের অনুরূপ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংযমের ছাপ পড়বে। নিজ জীবনে যতখানি পরিবর্তন সংসাধন করা সম্ভব তা করার পরই কেবল তিনি নিজ প্রতিবেশী এবং সঙ্গী সাথীদের ভিতর এই আদর্শ প্রচার করার অধিকারী হবেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে সমবণ্টনের আদর্শের মূলে থাকবে অছিবাদের বিচার। ধনীরা নিজেদেরকে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের অছিতে রূপান্তরিত করবেন। কারণ সমবণ্টনের আদর্শানুযায়ী তাঁদের নিজ প্রতিবেশীর চেয়ে একটি টাকাও বেশী রাখার অধিকার নেই। কি ভাবে এই লক্ষ্য সাধিত হবে? অহিংস উপায়ে, না ধনীদের ধন সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে? কেড়ে নেবার প্রক্রিয়া গ্রহণ

করলে আমাদের স্বভাবতই হিংসার শরণাপন্ন হতে হবে। আর এই হিংসা আধারিত কর্মসূচী সমাজের হিতসাধন করতে অসমর্থ। হিংস-সমবণ্টনের প্রক্রিয়ায় সমাজ দীনতর হয়ে পড়বে। কারণ সমাজ এমন একজন ব্যক্তির সেবা থেকে বঞ্চিত হবে যে সম্পত্তি উপার্জন করতে জানে। এই কারণে অহিংস পন্থা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পদ আহরণকারীর হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে। এর থেকে তিনি নিজের জন্য ততটুকুই মাত্র নেবেন যতটুকু তাঁর ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রয়োজন এবং বাদবাকী অর্থের তিনি অছি হবেন যা সমাজের হিতার্থে ব্যয়িত হবে। অবশ্য এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে অছি সততার সঙ্গে কাজ-কর্ম চালাবেন।

অমিত প্রয়াস সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে ধনীরা অছি শব্দটির সত্যকার সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী দরিদ্রদের অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করছেন না এবং দরিদ্ররা যদি উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে নিপীড়িত হন ও অনশন• কালগ্রাসে পতিত হন তাহলে সেই রকম পরিস্থিতির হাত থেকে ত্রাণ পাবার উপায় কি? এ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অহিংস অসহযোগ ও সবিনয় আইন অমান্যের কর্মসূচীই• একমাত্র সমীচীন ও অভ্রান্ত পন্থা। সমাজে দরিদ্রদের সহযোগীতা ব্যতীত ধনীদের পক্ষে ধন আহরণ করা সম্ভব নয়। এই সত্য যদি দরিদ্ররা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন ও তাঁদের ভিতর যদি এই জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তাঁরা শক্তিশালী হয়ে উঠবেন এবং এর ফলে যে মারাত্মক অসাম্য তাঁদের অনশনের মুখোমুখী এনে দাঁড় করিয়েছে, তার হাত থেকে অহিংস পন্থায় মুক্তি পাবার প্রক্রিয়া তাঁরা শিখতে পারবেন। (হরিজন, ২৫-৮-১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৬০-৬১)

অহিংস অর্থব্যবস্থা

আমি এই কথা নিবেদন করতে চাই যে ভারতবর্ষকে যদি অহিংসার পথে বিকাশ লাভ করতে হয় তাহলে দেশের বহু ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিত করতে হবে। যথেষ্ট বল প্রয়োগ ব্যতীত কেন্দ্রীত ব্যবস্থাকে কায়েম করা যায় না বা তা রক্ষা করা যায় না।

(হরিজন, ৩০-১২-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯১)

কারখানা-সভ্যতার ভিত্তিতে অহিংসার বিকাশ সাধন করা সম্ভবপর হয় না, এর আধার হবে স্বয়ং-ব্যবস্থিত গ্রামগোষ্ঠী। আমার কল্পনার গ্রামীণ অর্থনীতি শোষণকে

একেবারেই পরিহার করে এবং শোষণই হিংসার মূল। সুতরাং অহিংস হবার পূর্বে আপনাদের গ্রামীণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হতে হবে।

(হরিজন, ৪-১১-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৩১)

ব্যাপকভাবে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সহায়তায় শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গেই যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উৎপন্ন পণ্যের বাজার খোঁজার সমস্যা দেখা দেবে সেইজন্য এর পরিণামে গ্রামের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শোষণ হতে বাধ্য। এইজন্য গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ মূলতঃ নিজ ব্যবহারের জন্য উৎপাদনকারীতে পরিণত করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। গ্রামীণ শিল্পের এই চারিত্রধর্ম বজায় রেখে গ্রামবাসীদের সঙ্গতির মধ্যে লভ্য আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করায় আমি কোন দোষ দেখি না, কেবল এইটুকু নজর রাখতে হবে যে ঐসব যন্ত্রপাতিকে যেন অপরের শোষণের জন্য ব্যবহার করা না হয়।

(হরিজন, ২৯-৮-১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২২৬)

শিল্পায়ন ও বৃহৎ যন্ত্রশিল্প আধারিত উৎপাদন ব্যবস্থা সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। আমাদের সুখ বৃদ্ধির ব্যাপারে এর দ্বারা কতটা সুরাহা হয়েছে বলা মুস্কিল। কিন্তু আমরা এইটুকু জানি যে এর দরুণ (কাঁচা মাল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ও উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করার বাজার প্রাপ্তির জন্য)* সাম্প্রতিক কালের বিশ্বযুদ্ধসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড, ৬-১২-১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ)

আমাদের লক্ষ্য সর্বোদয়

অহিংসাপ্রেমী ব্যক্তি ইউটিলিটেরিয়ান সূত্রের (অধিকতম সংখ্যকের অধিকতম কল্যাণ) সঙ্গে সহমত হতে পারেন না। তিনি সকলের সর্বাধিক পরিমাণ কল্যাণের জন্য প্রয়াস করবেন এবং এই আদর্শের পরিপূর্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন। অপর সকলকে জীবিত রাখার জন্য তিনি তাই মরণ বরণ করতে প্রস্তুত থাকবেন। স্বয়ং মৃত্যু বরণ করে তিনি আর সকলের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও সেবা করবেন। সকলের সর্বাধিক পরিমাণ কল্যাণ অর্থাৎ সর্বোদয়ের ভিতর অধিকতম সংখ্যকের কল্যাণও অবিসম্বাদীরূপে নিহিত আছে বলে জীবনের চলার পথে অহিংসার অনুবর্তী ও ইউটিলিটেরিয়ানপন্থী বহুবার একত্র মিলিত হবেন। কিন্তু এমন একটা সময় আসতে বাধ্য যখন তাঁরা আর এক সঙ্গে

* বন্ধনীর মধ্যস্থিত শব্দগুলি সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত : সম্পাদক

চলতে পারবেন না এবং হয়ত তাঁদের পরস্পরবিরোধী দিশায় কাজ করতে হবে। ইউটিলিটেরিয়ানপন্থী তাঁর আদর্শে একনিষ্ঠ হলেও নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন না। অহিংসায় একান্তভাবে বিশ্বাসী মানুষ কিন্তু প্রয়োজন-বিধায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবেন।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-১২-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৩২)

আমরা যদি "ঈশ্বরের প্রতিকৃতির অনুকরণে নির্মিত" হয়ে থাকি তাহলে অল্প কয়েকজনের মঙ্গল বা এমন কি অনেকের মঙ্গল ও আমাদের কাম্য হবে না— সর্বমানবের উদয় বা সর্বোদয়ই হবে আমাদের লক্ষ্য।

(স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৫০)

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

প্রেম ভিত্তিক স্বাধীনতা

আমার কল্পনার গণতন্ত্র অর্থাৎ যে গণতন্ত্র অহিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে সকলেরই সমান স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রভু হবে।

(গান্ধী-গভর্ণমেণ্ট পত্র বিনিময়, ১৯৪২-৪৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৭৩)

সত্যকার গণতন্ত্র বা জনগণের স্বরাজ অসত্য বা হিংসার পথে আসতে পারে না। এর সোজা কারণ হল এই যে এইরূপ পন্থা গ্রহণ করার যুক্তি-সঙ্গত পরিণতি হচ্ছে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের কণ্ঠরোধ বা এমন কি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সর্বপ্রকারের বিরোধিতার অবসান ঘটান। ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথ এ নয়। একমাত্র নির্ভেজাল অহিংসার পরিবেশেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব।

(হরিজন, ২৭-৫-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪৩)

সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র চাই না

রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ হল জাতির প্রতিনিধিদের দ্বারা জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করা। জাতীয় জীবন যদি স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত হবার মত আদর্শ স্থিতিতে উপনীত হতে পারে তাহলে আর এই প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকে না। রাষ্ট্র সে অবস্থায় এক আলোকপ্রাপ্ত বা চৈতন্যসম্পন্ন নৈরাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। সে রাষ্ট্রে সকলেই নিজ নিজ শাসক। প্রত্যেকেই নিজেকে

এমনভাবে শাসন করেন যাতে তিনি যেন আপন প্রতিবেশীর পথের বাধা না হন। আদর্শ রাষ্ট্রে তাই প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্র নামক কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না বলে রাজনৈতিক ক্ষমতার চিহ্ন থাকবে না। বাস্তব জীবনে কিন্তু কোন দিনই চূড়ান্ত আদর্শ সম্পূর্ণরূপে রূপ লাভ করা যায় না। এইজন্যই থোরোর সেই চিরায়ত উক্তির সার্থকতা—সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যা ন্যূনতম শাসন করে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৭-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৬২)

রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতিটি প্রয়াস আমার মনে প্রচণ্ড শঙ্কা সৃষ্টি করে। কারণ এর দ্বারা বাহ্যতঃ শোষণ হ্রাস পাবার দরুণ মঙ্গল হচ্ছে বলে মনে হলেও সকল প্রগতির মূল ব্যক্তিসত্তা এর দ্বারা বিনষ্ট হয়। সেইজন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি মানব-সমাজের ভীষণতম ক্ষতি সাধন করে।

(মডার্ণ রিভিউ, ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪১৩)

এই কারণে কথায় এবং কাজে আমি এই ব্যাপার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, রাজনৈতিক স্বরাজ অর্থাৎ বহুসংখ্যক নর-নারীর জন্য স্বরাজও ব্যক্তিগত স্বরাজের থেকে কোন পৃথক বস্তু নয়। অতএব রাজনৈতিক স্বরাজও ব্যক্তিগত স্বরাজ প্রাপ্তির পথেই অর্থাৎ আত্মসংযমের দ্বারা অর্জন করতে হবে।

(গান্ধীজীর সহিত সিংহলে, মহাদেব দেশাই প্রণীত, ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৩)

অহিংস রাজনৈতিক কাঠামো

জন কুড়ি ব্যক্তি কেন্দ্রে বসে কাজ করছেন—সত্যকার গণতন্ত্র স্থাপনার পথ এ নয়। প্রতিটি গ্রামের জনসাধারণকে নীচের থেকে এর জন্য কাজ করতে হবে।

(হরিজন, ১৮-১-১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৫১৯)

অসংখ্য গ্রাম দ্বারা রচিত এই কাঠামো নিয়ত পরিবর্ধনশীল গ্রামগোষ্ঠী নিয়ে রচিত হবে। জীবন এখানে পিরামিডের মত হবে না, যার চূড়া দাঁড়িয়ে থাকে তলদেশের শক্তিতে। এ হবে এক সামুদ্রিক বেষ্টনীর মত, যার কেন্দ্র হবে প্রত্যেকটি ব্যক্তি। এই সব ব্যক্তি গ্রামের জন্য এবং এই গ্রামগুলি গ্রামগোষ্ঠীর জন্য আত্মত্যাগে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে। ব্যক্তি-সমষ্টি দ্বারা গঠিত এই কাঠামো এইভাবে শেষে একটি মাত্র সত্তায় পরিণত হবে। উদ্ধত হয়ে এরা কখনও অপরের উপর চড়াও হবে না বরং মহাসাগররূপ গ্রামগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়ায় সর্বদাই তারা হবে বিনয়ী।

সুতরাং সর্ববহিঃস্থ বেষ্টনীরেখা আভ্যন্তরীণ বেষ্টনীকে চূর্ণ করার জন্য তার শক্তি প্রয়োগ করবে না। বরং ভিতরের মণ্ডলীগুলিতে শক্তি সঞ্চার করবে এবং নিজে কেন্দ্র থেকে শক্তি পাবে। এসব আকাশকুসুম এবং চিন্তার অযোগ্য বিষয় বলে আমাকে হয়ত বিদ্রূপ করা যেতে পারে; মনুষ্য কর্তৃক অঙ্কিত হওয়া সম্ভব না হলেও ইউক্লিড-বর্ণিত বিন্দুর যেমন চিরস্থায়ী মূল্য আছে, তেমনি মনুষ্য জাতির অস্তিত্বের জন্যই আমার এই চিত্রেরও স্বকীয় মূল্য বর্তমান। পরিপূর্ণরূপে অনুসরণে সমর্থ না হলেও ভারত যেন এই বাস্তব চিত্র অনুযায়ী নিজ জীবন পরিচালিত করে। আদর্শের কাছে পৌছানর জন্য প্রযত্ন করার আগে আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভারতের গ্রাম-সমূহে কোনদিন যদি এক একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আমার আলেখ্যকেই আমি যথার্থ বলে দাবী করব; কারণ আমার পরিকল্পনায় সর্ব শেষেরটি হবে সর্ব প্রথমের সমান অর্থাৎ এক কথায় এতে বড় ছোটর বাছ বিচার থাকবে না।

(হরিজন, ২৮-৭-১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৩৬)

অহিংসা আধারিত স্বরাজ-এ কেউ কারও শত্রু হবে না। সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য সবাই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবে। অহিংস স্বরাজের আওতায় সবাই লিখতে-পড়তে পারবে এবং তাদের জ্ঞান নিত্য বর্ধিত হবে। অসুস্থতা এবং রোগের সম্ভাবনা কমিয়ে দেবে। এখানে কেউ নিঃস্ব থাকবে না এবং শ্রমিকরা ইচ্ছামাত্র কাজ পেতে পারবে। জুয়া মদ্যপান বা অন্যবিধ দুর্নীতি কিংবা শ্রেণী বিদ্বেষের স্থান এই রকম সরকারের আওতায় থাকবে না।

(হরিজন, ২৫-৩-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ)

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

আমার স্বদেশপ্রেম কাউকে বর্জন করে না। কোন জাতিকে আঘাত না করাই কেবল এর উদ্দেশ্য নয়, সত্যকার অর্থে সকলের হিতসাধনই এর লক্ষ্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা আমার মনে রয়েছে, তা কখনই বিশ্বের পক্ষে বিপদ স্বরূপ হতে পারে না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-৪-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১০৯)

স্বদেশভক্তির ধর্ম আজ যেমন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পরিবারের জন্য ব্যক্তিকে, গ্রামের জন্য পরিবারকে, জেলার জন্য গ্রামকে, প্রদেশের জন্য জেলাকে

এবং সমস্ত দেশের জন্য প্রদেশকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে, সেই ভাবে কোন দেশের এইজন্য মুক্তি পাওয়া দরকার যেন প্রয়োজন হলে সে দেশ সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারে। জাতিগত ঈর্ষার স্থান এখানে নেই।

(ভারতের গ্রামে গান্ধীজী, মহাদেব দেশাই প্রণীত, ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৭০)

রাষ্ট্রীয় সীমার বাইরে আমাদের যে সব প্রতিবেশী রয়েছেন তাঁদের সেবা করার ব্যাপারে কোন রকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা চলে না। কারণ ঐ সব সীমা বা সীমান্ত ঈশ্বরসৃষ্ট নয়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩১-১২-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪২৭)

আমি ঈশ্বরের পরিপূর্ণ একত্বে বিশ্বাস করি এবং তাই মানবতার অখণ্ডতায়ও বিশ্বাসী। শরীর বহু হলেও ক্ষতি কি? আমাদের আত্মা তো একই। সৌর কিরণও পরাবৃত্তির কারণ একাধিক প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাদের উৎস তো একই।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৯-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১৩)

আমার ধর্ম এবং এই ধর্মসঞ্জাত স্বদেশপ্রেমবৃত্তের ভিতর যাবতীয় জীবিত প্রাণীই বিধৃত রয়েছে। আমি কেবল মানুষের সঙ্গেই ভ্রাতৃত্ব বা সাযুজ্য উপলব্ধি করেই সন্তুষ্ট হব না: সমস্ত জীবিত প্রাণী এবং কীট পতঙ্গের মত যারা এই ধরাতলে বুকে হেঁটে বেড়ায়, তাদের সঙ্গেও আমি অভেদত্ব অনুভব করতে চাই। আশা করি আমার এই কথায় আপনারা কেউ বিস্মিত হবেন না। আমরা সবাই নিজেদের একই ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে থাকি এবং এইজন্যই আমি কীট পতঙ্গের সঙ্গেও একত্ব বোধ করতে চাই। কারণ যে রূপেই অভিব্যক্ত হক না কেন, মূলতঃ প্রাণতত্ত্ব একই।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৪-১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১০৭)

আমার হিন্দুধর্ম

ত্যাগ এবং বৈরাগ্যই এর সার

[কুইলনের এক জনসভায় গান্ধীজী সর্বপ্রথম হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের সারতত্ত্বকে সূত্রাকারে উপনিষদের একটি মন্ত্রে ব্যক্ত করেন। তারপর প্রতিটি জনসভায় তিনি এই সর্বব্যাপক মন্ত্রটির অসংখ্য তাৎপর্য সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণনা করেন। খুব

একটা বেশী রকমের ভাষ্য বিবর্জিত সহজ ব্যাখ্যাটুকু কাল আবার কুইলনে তাঁর মুখ থেকে শোনা যায়। এখানে সেটি পুনরুদ্ধৃত করা হল :]

একটি মাত্র মন্ত্রকে আমি হিন্দুধর্মের সারাৎসার স্বরূপ বিবেচনা করি এবং সেটি আমি আপনাদের কাছে আবৃত্তি করব। আপনাদের মধ্যে অনেকেই মনে হয় ঈশোপনিষৎ-এর কথা জানেন। বহু বৎসর পূর্বে ভাষ্যযুক্ত এর অনুবাদ পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। যারবেদা জেলে আমি এর শ্লোকগুলি মুখস্থ করি। এই শ্লোকগুলি বিশেষ করে গত কয়েক মাস যাবৎ আমাকে যেমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তখন কিন্তু অতটা প্রভাবিত করতে পারেনি। এখন আমার চূড়ান্ত অভিমত এই যে যদি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় সবগুলি উপনিষৎ এবং হিন্দুধর্মের অন্যান্য সব গ্রন্থ ভস্মে পরিণত হয়ে যায় এবং ঈশোপনিষৎ-এর প্রথম শ্লোকটি কেবল হিন্দুদের যদি স্মরণ থাকে তাহলেই হিন্দুধর্ম অমরত্ব লাভ করবে।

এ মন্ত্রটিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশ হল : ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। যৎ কিং চ জগত্যাং জগৎ। এর অর্থ এই যে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা যা কিছু দেখি সবই ঈশ্বরময়। শ্লোকটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশকে সম্মিলিতভাবে আবৃত্তি করা যেতে পারে : তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। অনুবাদ করার সময় এই অংশটিকে আমি আবার দুই ভাগে বিভক্ত করব : ত্যাগ করে ভোগ কর। এর আর একটি অনুবাদও হয়, তবে উভয়েরই অর্থ এক : তিনি যেটুকু দেন সেইটুকু ভোগ কর। এর পর আসে শেষ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ : মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্। এর অর্থ হল অপর কারও ধনসম্পত্তিতে লোভ করো না। ঈশোপনিষৎ-এর অপর সব মন্ত্রগুলি ঐ প্রথম মন্ত্রটির ভাষ্য অথবা ঐ মন্ত্রটির সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার প্রয়াস।

উপনিষৎ-এর এই শ্লোকটি সমাজবাদী ও সাম্যবাদী দার্শনিক ও অর্থশাস্ত্রী— সবাইকেই সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হবে বলে মনে হয়। যাঁরা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁদেরও আমি সবিনয়ে এই কথা নিবেদন করতে চাই যে এ শ্লোকটি তাঁদের অন্তরের আকুতিকেও তৃপ্ত করবে। আর এ কথা যদি সত্য হয় (আমার বিশ্বাস যে একথা সত্য) তাহলে আমি বলব যে এই মন্ত্রের পরিপন্থী বা এর সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন কোন কিছু যদি হিন্দুধর্মে থেকে থাকে তবে আপনারা তা গ্রহণ করবেন না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বর, স্রষ্টা বা প্রভুময়—এর অধিক আর কোন্ জ্ঞান সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ? মন্ত্রটির বাকী তিনটি অংশ

প্রথমটিরই প্রত্যক্ষ পরিণতি। আপনি যদি এই কথা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত, তাহলে আপনাকে এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি না দিলে কোন কিছুই আপনি উপভোগ করতে পারেন না। আর তিনিই যখন তাঁর অসংখ্য সন্তানের জনক তখন কারও কোন সম্পত্তির উপর আপনার অন্যায় আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি তাঁর অগণিত সৃষ্টির মধ্যে একটি তাহলে আপনার যোগ্য কাজ হল নিজের সব কিছুর উপর অধিকার বর্জন করে সব কিছু তাঁর চরণে সমর্পণ করা। এর অর্থ এই যে এই সমর্পণ-ক্রিয়া কোন স্থূল ব্যাপার নয়, এ হল এক দ্বিতীয় বা নবজন্মের প্রতীক। এ কাজ সজ্ঞানে সচেতনভাবে করতে হবে, চোখ বুজে কোন কিছু করার স্থান এখানে নেই। তাই একে পুনর্জন্ম আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দেহধারণ করতে হলেই যখন আহার্য পানীয় এবং পরিধেয় ইত্যাদি চাই সেইজন্য তাকে স্বভাবতঃই নিজ প্রয়োজনপূর্তির জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতে হবে এবং সমর্পণ-এর স্বাভাবিক পুরস্কার হিসাবে তিনি এসব পানও। কিন্তু সম্ভবতঃ এহো বাহ্য, মন্ত্রটি তাই বুঝি উপসংহারে নিম্নোক্ত বিচারধারা প্রকাশ করে: কারও সম্পদে লোভ কোরো না। এই উপদেশ পালন করা মাত্র আপনারা বুদ্ধিমান বিশ্বনাগরিকে রূপান্তরিত হবেন। যার সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিটি জীবিত প্রাণীর সদ্ভাব বিদ্যমান। ইহজগত এবং এর পরও মানুষ যা কিছু কামনা করতে পারে তার পরিপূর্তির পন্থা এই।

[অপর একটি সভায় গান্ধীজী এই মন্ত্রটিকেই অন্তরের যাবতীয় সংশয় ও পীড়া মোচনের স্বর্ণ-কুঞ্চিকা আখ্যা দিয়েছিলেন।]

ঈশোপনিষৎ-এর ঐ একটি শ্লোককে মনে রেখে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কথা একেবারে ভুলে যান। অবশ্য ইচ্ছা হলে আপনি নিজেকে ধর্মগ্রন্থের মহাসমুদ্রে ডুবিয়ে হাবুডুবু খেতে পারেন। তাতে পণ্ডিত ব্যক্তিদের লাভ হতে পারে যদি অবশ্য তাঁরা বিনয়ী ও জ্ঞানী হন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে দুস্তর সমুদ্র পার হবার জন্য নিম্নোক্ত মন্ত্রটিই যথেষ্ট:

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

(হরিজন, ৩০-১-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪০৫)

গতরাত্রে কুইলন-এ হিন্দুধর্মের মর্মবাণী সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলাম সে সম্বন্ধে

একটুক্ষণ এই সভায় * আলোচনা করার জন্য আমি আপনাদের আরও কিছু সময় আটকে রাখব।

দ্রষ্টা ঋষি এই শ্লোকে তাঁর আরাধ্যকে সম্রাট ছাড়া অপর কোন অভিধায় ভূষিত করতে পারেননি এবং সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর রাজত্বের বাইরে বিবেচনা করেননি। ঋষি বলছেন যে আমরা এই ধরাতলে যা কিছু দেখতে পাই সবই সেই আরাধ্য দেবতাময় এবং মন্ত্রটির বাকী অংশ এই প্রাথমিক প্রতিজ্ঞার পরিণতি। এইজন্য তিনি বলেছেন "সব কিছু ত্যাগ কর।" অর্থাৎ কেবল আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীর জিনিস নয়, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু এবং এমন কি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকেই ত্যাগ করার কথা এতে বলা হচ্ছে। ত্যাগের কথা এইজন্য বলা হচ্ছে যে এই বিশ্ব-প্রবাহে আমরা অতি নগণ্য পরমাণু ছাড়া আর কিছুই নই এবং এইজন্য আমাদের অহং বোধ থাকা হাস্যকর ব্যাপার। এরপর ঋষি বলেছেন যে এই ত্যাগ করার পুরস্কার হল "ভুঞ্জীথাঃ" অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী উপভোগ। কিন্তু "ভুঞ্জীথাঃ" শব্দটির অর্থ কেবল ভোগ নয়, এর অর্থ 'ব্যবহার' এবং এমন কি 'আহার'ও হতে পারে। সুতরাং এখানে "ভুঞ্জীথাঃ" শব্দটি প্রয়োগ করার তাৎপর্য হল যে আপনার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন তার বেশী নেবেন না। এইজন্য এই উপভোগ বা ব্যবহার দ্বিবিধ শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এর একটি হল ত্যাগবৃত্তি অর্থাৎ গীতায় যাকে "কৃষ্ণার্পণমস্তু সর্ব্বম্" (অর্থাৎ সব কিছু ঈশ্বরকে সমর্পণ করার) বৃত্তি বলা হয়েছে। ভাগবদ্ধর্মে বিশ্বাসী প্রত্যেককে প্রতিদিন প্রত্যুষে নিজ চিন্তা বাক্য ও কর্ম কৃষ্ণকে অর্পণ করতে হয় এবং এই সমর্পণ-যজ্ঞ সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু এমন কি এক গ্লাস জল স্পর্শ করার অধিকার তাঁর থাকে না। এই ত্যাগ বা সমর্পণ-যজ্ঞ নিষ্পন্ন হবার পর দৈনন্দিন জীবন-ধারণের জন্য তাঁর প্রয়োজনীয় খাদ্য পানীয় ও বস্ত্র ইত্যাদি গ্রহণ করার অধিকার জন্মে। সুতরাং উপভোগ ত্যাগের পুরস্কার অথবা উপভোগের শর্ত হল ত্যাগ—যেদিক থেকেই বিচার করুন না কেন, আমাদের নিছক অস্তিত্ব আমাদের আত্মার প্রয়োজনের খাতিরে ত্যাগবৃত্তি অপরিহার্য। মন্ত্রটির এই শর্তও যেন যথেষ্ট নয় এই কথা ভেবে সমগ্র বিচারধারা সম্পূর্ণ করার জন্য ঋষি তাড়াতাড়ি বলছেন: "অপরের সম্পত্তিতে লোভ কোরো না।" এখন আমি

* ১৭-১-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরের হরিপাদ-এ গান্ধীজী প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে।

আপনাদের বলব যে পৃথিবীর যে কোন অংশে প্রাপ্ত যে কোন দর্শন বা ধর্মের সবটুকু এই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

এই মন্ত্রটিকে এবার আমি বর্তমান পরিস্থিতির উপর প্রয়োগ করব। বিশ্বের সব কিছুই যদি ঈশ্বরময় হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ভাঙ্গী, পণ্ডিত ও ঝাড়ুদার, —জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সবার ভিতরই যদি সেই পরম প্রভুর অংশ থাকে, তাহলে এই মন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিশ্বের কেউ উচ্চ বা কেউ নীচ হতে পারে না। পৃথিবীর সকলেই সমান এবং এইজন্যই সমান যে এরা সবাই একই স্রষ্টার সৃষ্টি।

এই মন্ত্রটি দেশের প্রতিটি নর-নারী ও শিশুর হৃদয়ে অঙ্কিত হক—এই আমার কাম্য। আর এই মন্ত্রে যদি হিন্দুধর্মের সার থেকে থাকে (আছে বলেই আমার বিশ্বাস) তাহলে দেশের প্রতিটি মন্দিরে প্রবেশ-পথের উপরও এই মন্ত্রটি খোদিত হক।

(হরিজন, ৩০-১-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪০৭-৮)

এই মন্ত্র বা শ্লোকটি যে ঋষির দিব্যদৃষ্টিতে প্রকট হয়েছিল চিত্তচমৎকারী হলেও তিনি এই উক্তিতে সন্তুষ্ট হননি যে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তিনি আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন: "ঈশ্বর যখন সর্বব্যাপক তখন এই পৃথিবীর কোন কিছু আপনার নয়—এমন কি আপনার দেহও। আপনার আয়ত্তাধীন সব কিছুর অদ্বিতীয় এবং অবিসম্বাদী প্রভু হলেন ঈশ্বর।" এইজন্য হিন্দু আখ্যাত কোন ব্যক্তি যখন খ্রীস্টানদের পরিভাষা অনুযায়ী পুনর্জন্ম লাভ করে অর্থাৎ দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হয়, তখন তাকে সেই সমস্ত জিনিসই ত্যাগ বা উৎসর্গ করে দিতে হয়, যাদের সে এ যাবৎ নিজের সম্পত্তি ভেবে এসেছে। আর এইভাবে ত্যাগ বা উৎসর্গ করে দেবার পর হিন্দুর সন্তানকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে এর প্রতিদানে ঈশ্বর তার খাদ্য বস্ত্র ও বাসগৃহের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নেবেন। সুতরাং নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের উপভোগ বা ব্যবহারের শর্ত হল সেই সব ত্যাগ বা উৎসর্গ করা। আর এই ত্যাগ বা উৎসর্গ এক নিত্য করণীয় কার্য। কারণ তা না হলে এই ব্যস্ত দুনিয়ায় আমরা জীবনের মূল তত্ত্বই ভুলে যেতে পারি। সর্বোপরি ঋষি বলছেন: "কারও সম্পত্তির উপর লোভ কোরো না।" আমি বলতে চাই যে এই ছোট্ট মন্ত্রটিতে যে সত্য নিহিত রয়েছে, তা প্রতিটি মানুষের ইহলৌকিক পারলৌকিক নির্বিশেষে সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করতে সক্ষম। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অনুসন্ধান করেও আমি এর অতিরিক্ত কোন সত্য খুঁজে পাইনি। বিভিন্ন ধর্মের যে কয়টি মূল্যবান

গ্রন্থ আমি অধ্যয়ন করেছি (বেশ কয়েকটি—এ কথা আমি স্বীকার করছি) তাদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে আমি বুঝতে পেরেছি যে প্রতিটি ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপাদানাবলীর সূত্র এই মন্ত্র। বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা ধরুন—কেবল মানুষে মানুষে সৌভ্রাত্র নয়, সর্বজীবের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ—এই মন্ত্রে তার বীজ বিদ্যমান। পরমপিতা প্রভু বা আর কোন অভিধায় তাঁকে ভূষিত করতে চান, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাসের কথা যদি বিবেচনা করেন তবে তা-ও এই মন্ত্রে রয়েছে। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ এবং তিনিই আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করবেন—এই বিচারধারার কথা যদি ধরেন, তাহলেও বলব যে তা এই মন্ত্রে রয়েছে। আমার ও আপনাদের সবার অস্তিত্বের প্রতিটি কণিকায় তিনিই বিরাজিত বলে আমি এর থেকে এই ধরাপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রতিটি জীবের সমত্ববোধের আদর্শ গ্রহণ করেছি এবং আমার তাই মনে হয় যে এ মন্ত্র তাবৎ দার্শনিক সাম্যবাদীদের সন্তুষ্টিবিধানে সক্ষম। এই মন্ত্র আমাকে এই শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের মালিকানাভুক্ত কোন জিনিসকেই আমি আমার বলে দাবী করতে পারি না। এইজন্য আমার এবং আর যাঁরা এই মন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁদেরও জীবন জীবসেবার আদর্শে নিদর্শন হবে।

আমি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি যে এ-ই আমার ধর্মবিশ্বাস এবং যাঁরা হিন্দু বলে নিজেদের পরিচয় দেন তাঁদেরও অনুরূপ বিশ্বাস দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। এবং আমার খ্রীস্টান ও মুসলমান বন্ধুদেরও আমি সাহস করে এই কথা বলছি যে তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থ খুঁজে দেখলে তাঁরা এতদতিরিক্ত অন্য কিছু পাবেন না।

হিন্দুধর্মের নামে যে সব অসংখ্য কুসংস্কার প্রচলিত, তার কথা আমি আপনাদের কাছ থেকে গোপন করতে চাই না। হিন্দুধর্মের ছদ্মবেশে যেসব কুসংস্কার আমাদের মধ্যে ছেয়ে রয়েছে সে সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে সচেতন। অন্যায়কে অন্যায় বলে স্বীকার করতে আমার সঙ্কোচ নেই। অস্পৃশ্যতাকে এইসব কুসংস্কারের শিরোমণি আখ্যা দিতে আমি দ্বিধা বোধ করিনি। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আমি হিন্দু। কারণ আমি একথা বিশ্বাস করি না যে এসব কুসংস্কার হিন্দুধর্মের অঙ্গ। ভাষ্য ও ব্যাখ্যার সত্যতা যাচাই করার হিন্দুধর্ম-সম্মত পদ্ধতি আমাকে এই কথা শিক্ষা দেয় যে আপনাদের কাছে ইতঃপূর্বে উপস্থাপিত সত্যের পরিপন্থী এবং পূর্বোক্ত মন্ত্রের মূল সুরের বিরোধী সকল কিছুকে হিন্দুধর্ম বহির্ভূত বলে ঘোষণা করে বাতিল করতে হবে।

(হরিজন, ৩০-১-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪১০)

গীতা-ধর্মের অনুসরণকারী ব্যক্তি বহু কিছু ছাড়াই আনন্দসহকারে জীবন চালিয়ে নেবার শিক্ষা নিয়ে থাকেন। এই আনন্দকে গীতায় চিত্তের সমভাব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ গীতোক্ত আনন্দ ঠিক নিরানন্দের বিপরীত অর্থব্যঞ্জক শব্দ নয়। গীতার আনন্দ এতদপেক্ষা উচ্চলোকের বস্তু। গীতা অনুসরণকারী ব্যক্তি উৎফুল্ল বা বিষণ্ণ কিছুই হন না। মনকে আনন্দ নিরানন্দের ঊর্ধ্বে উঠাতে পারলে সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় বা বঞ্চনা-স্বামীত্ব ইত্যাদি বোধ আর থাকে না।

(মীরাকে লিখিত বাপুর পত্র, ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৫০)

মৃত্যুর ছায়া যখন যার উপরই পড়ুক না কেন, তার জন্য আমাদের দুঃখ না করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমার মনে হয় তখনই আমরা এই স্থিতিতে উপনীত হতে পারব যখন আমরা সত্য সত্যই নিজেদের জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার হব। আর এই নির্বিকারত্ব লাভ করার পন্থা হল প্রতি মুহূর্তে আপন কর্তব্য সম্পাদন করতে থাকা।

(মীরাকে লিখিত বাপুর পত্র, ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩০১)

মন্দির ও পৌত্তলিকতা

দেবমূর্তি আমার ভিতর বিশেষ একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করে না। এ সত্ত্বেও মূর্তিপূজাকে আমি মনুষ্য-প্রকৃতির অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করি। প্রতীকস্বরূপের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করে থাকি। অন্য জায়গার তুলনায় মানুষ কেন মন্দির-মসজিদে অধিকতর প্রশান্তি বোধ করে? প্রতিমা সাধন-ভজনের সহায়ক। কোন হিন্দুই প্রতিমাকে ঈশ্বর জ্ঞান করেন না। আমি তাই মূর্তিপূজাকে দোষের মনে করি না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-১৯২১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১৮)

আমি আক্ষরিক অর্থে একাধারে মূর্তিপূজক এবং পৌত্তলিকতাবিরোধী। প্রতিমা পূজার অন্তর্নিহিত মনোভাবকে আমি শ্রদ্ধা করি। মানব প্রজাতির উত্থানে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান। আর যেসব শতসহস্র দেব-দেউলের কারণ আমাদের দেশ পুণ্যভূমি, সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের মধ্যে জীবনোৎসর্গ করার শক্তি জাগুক—এই আমি চাই।

আমি পৌত্তলিকতাবিরোধী—এর অর্থ হল ছদ্মবেশধারী যে ধর্মান্ধতা নিজেদের বিশেষ দেবমূর্তিটির মাধ্যমে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ঈশ্বরের আরাধনা সম্ভব

বলে বিশ্বাস করে না, আমি সেই অন্ধ পৌত্তলিকতার নিন্দা করি। পৌত্তলিকতার যে স্থূল ও প্রত্যক্ষ রূপ ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরখণ্ড অথবা কোন স্বর্ণবিগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরকে একাত্ম করে থাকে তার তুলনায় এই জাতীয় মূর্তিপূজা বহুগুণ মারাত্মক।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৮-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৮৪)

মন্দিরে দেববিগ্রহ থাকবে কি না, এটা হল রুচি ও সংস্কারের কথা। আমি এ কথা মনে করি না যে মূর্তি থাকার জন্য হিন্দু দেবমন্দির বা রোমান ক্যাথলিকদের ভজনালয় নিন্দনীয় এবং কুসংস্কারের প্রতীক। অথবা নিছক মূর্তির অনস্তিত্বের কারণ মসজিদ কিংবা প্রোটেস্ট্যান্টদের গীর্জা ভাল অথবা কুসংস্কার বর্জিত—এমন কথাও বলা চলে না। ক্রুশ অথবা কোন একটি গ্রন্থরূপ প্রতীকও অতি সহজে পৌত্তলিকতার আধার এবং সেই কারণে কুসংস্কারাত্মক হয়ে পড়তে পারে এবং বাল গোপাল ও কুমারী মেরীর মূর্তি-পূজাও পবিত্র ও সর্ববিধ কুসংস্কার বর্জিত হতে পারে। এ সবই নির্ভর করে ভজনাকারীর হৃদয়ের গতি-প্রকৃতির উপর।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১১-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৭৮)

জনৈক খ্রীস্টীয় ধর্মযাজক বললেন, "হিন্দুধর্ম যদি একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠে তাহলে খ্রীস্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম সম্মিলিতভাবে ভারতবর্ষের সেবা করতে পারে।"

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "উভয় ধর্মমতের ভিতর এই জাতীয় সহযোগীতার দৃশ্য দেখে আমি খুবই খুশী হব। তবে এ বিষয়ে আমার একটি নিজস্ব নিদান আছে। কিন্তু তার আগে আমি এই কথার প্রতিবাদ করতে চাই যে হিন্দুরা একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ও তারা পৌত্তলিক। আমি স্বয়ং একজন গোঁড়া হিন্দু কিন্তু তা বলে আমি কখনও একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। এমন কি আমার ছেলেবেলাতেও আমি বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলাম না এবং কেউ কোনদিন আমাকে এমন কথা বিশ্বাস করতে বলেওনি।"

"অবশ্য মূর্তিপূজার কথা উঠলে বলতে হবে যে কোন না কোন ধরণের মূর্তি-পূজা ছাড়া কারও চলে না। মুসলমান কেন মসজিদকে ঈশ্বরের আবাস আখ্যা দিয়ে তার পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন পড়লে জীবন আহুতি দেন? আর খ্রীস্টানই বা কেন গীর্জায় যান ও তাঁকে শপথ গ্রহণ করতে হলে বাইবেলের নামে শপথ গ্রহণ করেন? এতে অবশ্য আমি আপত্তির কোন কিছু দেখি না। যাই হক, মসজিদ ও মকবরা নির্মাণ করার জন্য অজস্র ধন সম্পদ ব্যয় করা কি

এক ধরণের পৌত্তলিকতা নয়? রোমান ক্যাথলিকরা যখন কুমারী মেরী অথবা ভিন্ন ভিন্ন খ্রীস্টীয় সন্তপুরুষদের একেবারে কাল্পনিক প্রস্তরমূর্তি অথবা কাঁচ কিংবা পটে আঁকা ছবির সামনে নতজানু হন তখনও কি একই ব্যাপার হয় না?"

ক্যাথলিক যাজক মহাশয় প্রতিবাদের সুরে বললেন, "আমি কিন্তু আমার মায়ের ফটো রাখি ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সেই ছবিতে চুম্বন করি। মায়ের এই ফটোর অথবা কোন সন্ত পুরুষেরই আমি ভজনা করি না। অবশ্য ঈশ্বরোপাসনার সময় তাঁকে আমি সমগ্র বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টা ও যে কোন মানুষের চেয়ে মহৎ বলে স্বীকার করে নিয়ে এ কাজ করে থাকি।"

"আমরাও তেমনি প্রস্তর পূজা করি না, যত স্থূলই হক না কেন প্রস্তর বা ধাতু-মূর্তির অন্তরস্থিত যে ঈশ্বর তিনিই আমাদের উপাস্য।"

"গ্রামবাসীরা কিন্তু মূর্তিকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করে।"

"না, আমি বলছি যে তারা ঈশ্বরের চেয়ে কম কোন কিছুর উপাসনা করেন না: কুমারী মেরী মাতার সম্মুখে নতজানু হয়ে আপনারা যখন তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন কি হয়? তাঁর মাধ্যমে আপনারা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। হিন্দুরাও এইভাবে শীলামূর্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াসী। আপনাদের মেরী মাতার মাধ্যমে প্রার্থনা করার পিছনে যে মনোভাব ক্রিয়াশীল, আমি তা বুঝতে পারি এবং তার বিরোধী নই। মসজিদে প্রবেশ করার সময় মুসলমানদের মন কেন সম্ভ্রম ও পরম পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই কেন তাঁরা একটি মসজিদ বলে বিবেচনা করতে পারেন না? আর আমাদের শিরোপরি যে আকাশের ঐ চমৎকার চন্দ্রাতপ ছাওয়া রয়েছে সে সম্বন্ধে কি বলেন? ঐ চন্দ্রাতপ কি কোন অংশে মসজিদের চেয়ে ন্যূন? এতদসত্বেও আমি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে পারি এবং তার সমর্থনও করি। এ হল তাঁদের ঈশ্বরসন্নিধির প্রক্রিয়া। হিন্দুদেরও সেই অদ্বিতীয় সনাতনের সন্নিধি লাভ করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। আমাদের সন্নিধি লাভের মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তার জন্য ঈশ্বর পৃথক হয়ে যান না।"

(হরিজন, ১৩-৩-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০)

মূর্তিপূজা অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাধ্যমের মারফৎ আদর্শের উপলব্ধি মানুষের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাব আর পূজা ও উপাসনার পক্ষে এ সহায়কও

বটে। এইভাবে আমরা যখন আমাদের দৃষ্টিতে পবিত্র কোন গ্রন্থের সম্মুখে শ্রদ্ধা নিবেদন করি তখন মূর্তি পূজা করছি বলতে হবে। পবিত্র ও শ্রদ্ধামণ্ডিত হৃদয়ে আমরা যখন কোন মন্দির বা মসজিদ দর্শনে যাই তখনও এক প্রকারের মূর্তিপূজা করা হয়। আর এতে কোন অন্যায় আছে বলে আমি মনে করি না। পক্ষান্তরে আমার ধারণা এই যে মানুষের অনুভূতি-শক্তি সসীম ও গণ্ডিবদ্ধ বলে এ ছাড়া তার পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভবও নয়।

ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য গীর্জা মসজিদ মন্দির অথবা বৃক্ষ স্তূপ ইত্যাদি যেখানেই হক না কেন পূজা বা উপাসনা করাকে প্রোৎসাহিত করা যেতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা বা পূজা দেওয়াকে মূর্তিপূজার কারণ আখ্যা দিতে হবে। মূর্তি অথবা অদৃশ্য ঈশ্বর যাঁর কাছেই নিবেদন করা হক না কেন, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রার্থনা ভাল জিনিস নয়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৯-১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩২০)

মন্দিরে পূজা করা

শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি পূজার জন্য কোন হিন্দুর মন্দিরে যাবার প্রয়োজন নেই। মন্দিরে যাওয়ার দরকার তাঁরই হয় যিনি মন্দিরের দেববিগ্রহ ছাড়া রামের ধ্যান করতে পারেন না। এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে তাঁর রামের আবাস আর কোথাও নয়, ঐ মন্দিরে। ঐ সরল বিশ্বাসে আমি বাধা সৃষ্টি করতে চাই না।

হিন্দুদের দেবতা কৃষ্ণ পুরুষোত্তম। সমালোচকদের কটু সমালোচনার প্রতি তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। ঈশ্বরকে এই সব নামের মাধ্যমে ধ্যান করে রাম ও কৃষ্ণের লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁদের জীবনকে উন্নত করেছেন। কি করে যে এমন হয় তা আমি জানি না। এ যেন এক রহস্য। এর প্রমাণ আবিষ্কার করার জন্য আমি প্রয়াস করিনি। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম বিভূতি ও নাম হল সত্য—এ উপলব্ধি বহু দিন পূর্বেই আমার যুক্তিবৃত্তি ও হৃদয়ে জাগরিত হলেও সত্যকে আমি "রাম" নামেও জানি। আমার জীবনের ঘনঘোর দুর্যোগের দিনে ঐ একটি নামই আমাকে রক্ষা করেছে এবং আজও করছে। হয়ত এর মূলে আছে শৈশবের অভ্যাস, হয়ত বা তুলসীদাসের মোহিনী প্রভাব এর পিছনে ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই মহাবলশালী বাস্তব তথ্যের কোন ইতর-বিশেষ তাতে হয় না। এই ছত্রগুলি লেখার সময় আমার মন শৈশবে ফিরে যাচ্ছে—আমাদের পৈত্রিক ভবন সংলগ্ন

রামজী মন্দিরে নিত্য যাবার কথা মনে পড়ছে। সে সময় আমার রামের বাসস্থান ঐ মন্দির ছিল। তিনি আমাকে বহু ভয় ও পাপের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমার কাছে তখন এসব কুসংস্কার বলে মনে হত না। মন্দিরের পূজারী হয়ত বদ লোক হতে পারেন, তবে আমি তাঁর কোন বদনামের কথা জানি না। মন্দিরে হয়ত অনেক দুষ্কার্য চলত। এ সম্বন্ধেও আমার কিছু জানা ছিল না। এইজন্য পূজারী বা মন্দিরের নিন্দা আমাকে প্রভাবিত করেনি। আমার পক্ষে তখন যা সত্য ছিল এবং এখনও যা সত্য, লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের কাছেও তা-ই সত্য। মন্দিরে গিয়ে পূজা করা মানবজাতির আধ্যাত্মিক পিপাসা শান্ত করার সহায়ক। এ ক্ষেত্রে সংস্কারই প্রধান। কিন্তু মানুষ যতদিন থাকবে এই প্রথাও ততদিন চলবে।

(হরিজন, ১৮-৩-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৬)

খ্রীস্টানের কাছে গীর্জা যা হিন্দুদের কাছে মন্দিরও তাই। সরল বিশ্বাসী খ্রীস্টানরা গীর্জায় গিয়ে যে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি পান, মন্দির দর্শনকারী সরল বিশ্বাসী হিন্দুরাও সেই আনন্দ পেয়ে থাকেন। হিন্দুর মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করুন, তাহলে তার জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে। এ কথা খুবই সত্য যে বহু হিন্দু মন্দিরের চতুর্দিকে কুসংস্কার এবং এমন কি দুর্নীতির বেড়াজালের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এ কথা মন্দিরের সংস্কারের সপক্ষে যুক্তি স্বরূপ উপস্থাপিত করা যেতে পারে, মন্দিরের মূল্য হ্রাস করার জন্য নজির হিসাবে পেশ করা চলে না।

(হরিজন, ১১-২-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২)

এমন কোন ধর্মমত অথবা ধর্মসম্প্রদায়ের কথা আমার জানা নেই যাঁরা নিজস্ব কোন ঈশ্বরের আবাস ছাড়া কাজ চালিয়েছেন অথবা চালাচ্ছেন। ঈশ্বরের এই আবাসকে মন্দির মসজিদ গীর্জা সিনাগগ (ইহুদী দেবস্থান) অথবা আগিয়ারী (পার্শীদের উপাসনাস্থল) ইত্যাদি যে কোন নাম দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া যীশু সহ কোন মহান ধর্মসংস্কারক যে মন্দির সমূহকে একেবারে বর্জন বা ধ্বংস করেছিলেন এরও কোন প্রমাণ নেই। এঁদের সকলেই মন্দির এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। সবাই না হলেও এঁদের মধ্যে অনেকে মন্দির থেকেই নিজের কথা প্রচার করেছিলেন। বহু বছর হয়ে গেল আমি আর মন্দিরে যাই না; কিন্তু তার কারণ আমি মানুষ হিসাবে পূর্বের তুলনায় ভাল হয়েছি বলে মনে হয় না।

আমার মার শরীর যতদিন সমর্থ ছিল তিনি মন্দিরে যাবার কোন সুযোগই ছাড়তেন না। আমি যদিও মন্দির দর্শন করি না তবু সম্ভবতঃ তাঁর বিশ্বাসের জোর আমার চেয়ে বহুগুণ বেশী ছিল। এই সব মন্দির মসজিদ ও গীর্জার দ্বারা পৃথিবীর কোটি কোটি ব্যক্তির বিশ্বাস বজায় থাকে। এরা সকলেই কোন কুসংস্কারের অন্ধ অনুগামী বা ধর্মান্ধ ব্যক্তি নন। কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা তাঁদেরই একচেটিয়া জিনিস নয়। আমাদের হৃদয় ও মনেও এই সব পাপের শিকড় রয়েছে।

মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করার অর্থ ঈশ্বর ধর্ম এবং ইহজাগতিক অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা।

(হরিজন, ১১-৩-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৫)

বাহ্য কাঠামোর পরিবর্তে আভ্যন্তরীণ মূল তত্ত্বের আমূল পরিবর্তনই হল সংস্কারকের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সিদ্ধ হলে বাহ্য কাঠামো আপনিই পরিবর্তিত হবে। যদি আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন না হয় তাহলে বাহ্য কাঠামোতে যতই পরিবর্তন করা হক না কেন, তা শেষ অবধি প্রাণের সম্পর্করহিত সমাধিস্তূপে পরিণত হতে বাধ্য। কবর যতই শোভনদর্শন হক না কেন তা মৃত ব্যক্তির সমাধি ছাড়া আর কিছু নয়—মসজিদের গুণ তাতে দর্শাতে পারে না। কিন্তু কেবল একখণ্ড পবিত্র ভূমিই ঈশ্বরের সত্যকার আবাস হতে পারে।

(হরিজন, ২৯-৪-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৬)

তিনি (মিস মেয়ো তাঁর "মাদার ইণ্ডিয়া" পুস্তকে) বলেছেন যে বৈষ্ণবরা যে তিলকচিহ্ন ধারণ করে তার একটি অশ্লীল অর্থ আছে. আমি একেবারে জাত বৈষ্ণব। বৈষ্ণব মন্দিরে যতবার গেছি তার কথা আমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে আছে। আমাদের বাড়ির সকলেও গোঁড়া বৈষ্ণব। ছেলেবেলায় আমি তিলক কাটতাম; কিন্তু আমি বা আমাদের পরিবারের কেউ-ই এ কথা জানত না যে এই নির্দোষ এবং এমন কি রমনীয়-দর্শন ছাপের কোন আপত্তিকর গূঢ়ার্থ আছে। মাদ্রাজে বসে এই প্রবন্ধটি লিখছি বলে এখানকার জন কয়েক বৈষ্ণবকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরাও এই তথাকথিত অশ্লীল গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে কিছু জানেন না। তবে এর ভিত্তিতে আমি অবশ্য এ কথা বলতে চাই না যে কোন দিনই তিলকের এ জাতীয় কোন তাৎপর্য থাকতে পারে না। তবে আমাকে এ কথা বলতেই হবে যে লক্ষ লক্ষ লোক নির্দোষভাবে যে সব প্রথা পালন করে আসছে তার মূলে কোন অশ্লীলতা থেকে থাকলেও সে সম্বন্ধে

তারা অনবহিত। খ্রীস্টীয় মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত একটি গ্রন্থ পাঠেই আমি সর্বপ্রথম জানতে পারি যে শিবলিঙ্গ নাকি অশালীনতার দ্যোতক। কিন্তু আজও যখন আমি কোন শিবলিঙ্গ দর্শন করি তখন তার আকৃতি অথবা পরিবেশ—কোন কিছু থেকেই অশালীনতার ইঙ্গিত পাই না। আবার ঐ মিশনারীদের দ্বারাই প্রকাশিত অপর একটি পুস্তক পাঠ করে আমি জানতে পারি যে উড়িষ্যার মন্দিরসমূহ অশ্লীল মূর্তি দ্বারা কলুষিত করা হয়েছে। কিন্তু পুরী গিয়ে বেশ খানিকটা চেষ্টা করার পরই ঐ সব মূর্তি আমি দেখতে পাই। তবে আমি ভালভাবেই এ কথা জানি যে পুরীর মন্দিরে যে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সমাবেশ হয়, তাঁরা ঐ সব মূর্তির অশ্লীলতা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। জনসাধারণ ঐ সব মূর্তি দেখার মন নিয়ে যান না তাই ওগুলি তাঁদের দৃষ্টির উপর চেপে বসে না। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-৯-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১১

অবতার-তত্ত্ব

আমার কৃষ্ণের সঙ্গে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির সম্পর্ক নেই। আত্মাভিমানে আহত হবার জন্য যে কৃষ্ণ নরহত্যা করেন আমি তাঁর কাছে মস্তক নত করব না অথবা যে কৃষ্ণকে অহিন্দুরা একটি ইন্দ্রিয়পরায়ণ যুবক হিসাবে চিত্রিত করেন, তিনিও আমার আরাধ্য নন। আমার কল্পনার শ্রীকৃষ্ণ অপাপবিদ্ধ অবতারপুরুষ, তিনি যথার্থ নিষ্কলঙ্ক পুরুষোত্তম। তিনিই গীতার মূল প্রেরণা এবং লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন উদ্বুদ্ধকারী। তবে আমি যদি এ কথার প্রমাণ পাই যে মহাভারত আধুনিক অর্থে একটি ইতিহাস গ্রন্থ এবং মহাভারতের প্রতিটি শব্দ প্রামাণ্য ও মহাভারতোক্ত কৃষ্ণ সত্য সত্যই মহাভারতে বর্ণিত অনেকগুলি ঘটনার নায়ক, তাহলে হিন্দু সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হবার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমি ঐ কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতাররূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করব। আমার কাছে মহাভারত কিন্তু মূলতঃ ধর্মগ্রন্থ। এর অধিকাংশ বর্ণনা রূপকাত্মক—ঐতিহাসিক দলিল নয়। আমাদের অন্তরের শাশ্বত দ্বন্দ্ব মহাভারতের উপজীব্য। এই দ্বন্দ্বকে মহাভারতে এমন বাস্তবভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে মহাভারত পাঠের সময় মনে হয় যেন ঐ সব ঘটনা সত্য সত্যই রক্ত-মাংসের মানুষদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর আজকের মহাভারতকে আমি মূলের বিশুদ্ধ প্রতিরূপ বলেও মনে করি না। পক্ষান্তরে আমার ধারণা মূল মহাভারতের বহু পরিমার্জন ঘটেছে। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-১০-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৩৬)

হিন্দুধর্মে অবতার বলে তাঁকেই স্বীকার করা হয় যিনি মানব-সমাজের কোন অসাধারণ সেবা করেছেন। বস্তুতপক্ষে প্রতিটি জীবিত প্রাণীই ঈশ্বরের অবতার; কিন্তু তাই বলে সবাইকে অবতার বলে বিবেচনা করা হয় না। নিজ সময়ে যাঁর আচরণ অলোকসামান্য ধর্মীয় বিভায় মণ্ডিত হয়, উত্তরকাল তাঁকেই অবতার-রূপে পূজা করে। এই পদ্ধতিতে কোন রকম অন্যায় আছে বলে আমার মনে হয় না; কারণ এর দ্বারা ঈশ্বরের মহত্ত্বের তিলমাত্র হানি হয় না আর সত্যও কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় না। উর্দুতে বলে:

আদম কো খোদা মৎ কহো
আদম খোদা নহী হ্যায়,
লেকিন খোদা কে নূর সে
আদম জুদা নহীঁ হ্যায়।

অর্থাৎ আদম স্বয়ং ভগবান নন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরীয় বিভূতি হইতে পৃথকও নন। এই জন্য যিনি অত্যধিক মাত্রায় ধর্মাচারী তাঁর ভিতর ঐশ্বরিক বিভূতির অত্যধিক অংশ বিদ্যমান। এই বিচার-ধারা অনুযায়ী হিন্দুধর্মে শ্রীকৃষ্ণ অপাপবিদ্ধ পুরুষোত্তম-এর মার্যাদা লাভ করেছেন।

অবতার-তত্ত্বে এই বিশ্বাস মানুষের সুমহান আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক। ঈশ্বরের সমপর্যায়ে উন্নীত না হওয়া অবধি মানুষের মনে শান্তি নেই। এই পর্যায়ে উন্নীত হবার প্রচেষ্টাই হল মানুষের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা এবং একমাত্র প্রার্থিতব্য কাম্য। আর এরই নাম হল আত্মোপলব্ধি।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৮-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২০৫-৬)

ভগবান কোন ব্যক্তি নন। মনুষ্যাকৃতিতে কখনও কখনও এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন—এ কথা বলা আংশিক সত্য মাত্র এবং পূর্বোক্ত উক্তির যথার্থ তাৎপর্য হল এই যে ঐ জাতীয় ব্যক্তিরা অধিকতর মাত্রায় ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করেছেন। যেহেতু ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান, তিনি প্রতিটি মানুষের ভিতরই রয়েছেন এবং তাই সবাইকেই ঈশ্বরের অবতার বলা চলে। তবে এ জাতীয় যুক্তিজাল বিস্তার করার কোন অর্থ হয় না। রাম ও কৃষ্ণ ইত্যাদিকে এইজন্য অবতাররূপে বর্ণনা করা হয় যে আমরা তাঁদের উপর ঐশী বিভূতি আরোপ করি। বাস্তবপক্ষে এ সবই মানুষের কল্পনাসৃষ্ট। তাঁরা সত্য সত্যই কোন দিন এই ধরণীতলে বিচরণ করতেন কিনা—এ তথ্য মানুষের মনে তাঁদের আসনকে কোন মতে বিচলিত করতে পারবে না। ঐতিহাসিক রাম ও কৃষ্ণ

বরং অনেক সময় বহুবিধ সমস্যার করেন এবং অনেক যুক্তি তর্ক দ্বারা মানুষকে তাঁদের সমর্থন করতে হয়।

(হরিজন, ২২-৬-১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২০০)

বর্ণ ও জাতি

বর্ণের বিধান

বর্ণের অর্থ হল মানুষের উপজীবিকা নির্বাচন ব্যাপারে পূর্ব ব্যবস্থা। বর্ণের বিধান অনুযায়ী মানুষকে জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে তার পূর্বপুরুষের উপজীবিকার অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং এক দিক থেকে দেখতে গেলে বর্ণ-ব্যবস্থা হল উত্তরাধিকার-তত্ত্ব। বর্ণ-ব্যবস্থা হিন্দুদের ঘাড়ে উপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোন ব্যবস্থা নয়। হিন্দুদের শুভাশুভের ব্যাপারে যাঁরা অছি ছিলেন, তাঁরা এই বিধান হিন্দুদের জন্য আবিষ্কার করেন। এ প্রথা মানুষের আবিষ্কার নয়, এ হল অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক বিধান—নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মত সতত ক্রিয়াশীল ও সদা জাগ্রত এক তত্ত্ব। আবিষ্কার করার পূর্বেও যেমন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের অস্তিত্ব ছিল, বর্ণ-ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা প্রযোজ্য। হিন্দুদের কপালে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করার সৌভাগ্যপ্রাপ্তি লেখা ছিল। প্রকৃতির কোন কোন বিধান আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ দ্বারা পশ্চিমের লোকেরা অতি সহজে নিজেদের পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। অনুরূপ-ভাবে হিন্দুরা এই অপ্রতিরোধ্য সামাজিক প্রবণতা আবিষ্কার করে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এমন এক সম্পদের অধিকারী হয়েছেন, বিশ্বে যার তুলনা নেই।

বর্ণের সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার কোন সম্বন্ধ নেই। যে জাতিভেদ প্রথা বর্ণ-ব্যবস্থার ছদ্মাবরণে বিরাজিত, তার ধ্বংস হক। বর্ণ-ব্যবস্থার এই বিকৃতি হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ। আমাদের আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রের বিনষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হল এই বর্ণ ধর্মানুযায়ী আচরণ করার অক্ষমতা। একদিকে বেকার সমস্যা দারিদ্র এবং অন্যদিকে অস্পৃশ্যতারূপী অপরাধ ও আমাদের ক্ষয়িষ্ণু ধর্মবিশ্বাসের অদ্বিতীয় কারণ হল এই অক্ষমতা।

নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর ঋষিরা এই চতুর্বর্ণের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন: একটি বর্ণের লোক শিক্ষাদান করবে, অপরটি দেশরক্ষা করবে, তৃতীয়টি করবে সম্পদ সৃষ্টি এবং চতুর্থ বর্ণ শরীরশ্রম মূলক সেবার দায়িত্ব নেবে।

প্রাচীন কালে স্বাভাবিক ব্যবসায়ী বা শিল্পী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল এবং একই পেশায় রত পরস্পরকে সাহায্য করার একটি অলিখিত বিধান কার্যকরী ছিল। একশত বৎসর পূর্বে কোন সূত্রধরের পুত্র উকিল হবার ইচ্ছা মনে পোষণ করতেন না। আজ তাঁর মনে সে ইচ্ছা জেগেছে; কারণ এই পেশা দ্বারা সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থায় অর্থ উপার্জন করা যায়—এ তিনি দেখেছেন।

সে যুগে অপরের পেশার ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে অনুপ্রবেশ করার বা অর্থ পুঞ্জীভূত করার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ রোমান বাগ্মী রাজনীতিবিদ ও আইনজীবি সিসেরো-এর যুগে আইনজীবির পেশা ছিল অবৈতনিক এবং কোন মেধাবী সূত্রধর পয়সার জন্য নয়, সেবার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই ব্যবহারজীবি হতে পারতেন। ক্রমশঃ যশ এবং অর্থের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হল। চিকিৎসকেরা সমাজের সেবা করতেন এবং এর বিনিময়ে সমাজ তাঁদের যা দিত, তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতেন। আজ কিন্তু তাঁরা ব্যবসায়ী এবং এমন কি সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছেন। চিকিৎসা এবং ব্যবহারজীবির পেশার উদ্দেশ্য যত দিন পর্যন্ত মানবসেবা-মূলক ছিল ততদিন অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই সেগুলি মহান ও উদার আখ্যা পেয়েছে।

পিতৃপিতামহের উপজীবিকা গ্রহণ করলে সেই বিদ্যা শেখার জন্য আমাকে এমন কি কোন বিদ্যালয়ে যেতে হবে না, আমার মানসিক শক্তি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সাধনের পূর্ণ অবকাশ পাবে। কারণ আমার প্রয়োজনীয় অর্থ—যাকে জীবিকার সংস্থান বলাই সমীচীন—প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত থাকব। সত্যকার সুখ ও যথার্থ ধর্মীয় লক্ষ্যসাধনের পথে বর্ণ-ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠতম বীমাস্বরূপ। অপর কোন লক্ষ্য সাধনের জন্য নিজ শক্তি কেন্দ্রিত করলে তা আত্মোপলব্ধির ক্ষমতা বিকিয়ে দেবার মত অথবা এক মুষ্টি অন্নের বিনিময়ে আত্মাকে বিক্রি করে দেবার মত হবে।

বর্ণ সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা কথা বলে থাকি। বর্ণ-ব্যবস্থা যখন যথার্থভাবে পালিত হত তখন আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য আমাদের যথেষ্ট অবসর থাকত। আজও আপনারা দূর পল্লীতে গেলে দেখতে পাবেন যে শহরবাসীদের তুলনায় তাঁদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি কত উন্নত। শহরবাসী আত্মসংযমের ধার ধারেন না।

ভৌতিক সম্পদপ্রাপ্তির নব নব পন্থা আবিষ্কার করার প্রয়োজন নেই এবং করা উচিতও নয়। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উপজীবিকার যে পন্থা উত্তরাধিকার

সূত্রে আমরা পেয়েছি তা যতক্ষণ শুদ্ধ ও পবিত্র বলে মনে হচ্ছে ততক্ষণ তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমার পিতা যদি ব্যবসায়ী হন এবং আমার ভিতর যদি সৈনিকোচিত গুণাবলী থাকে, তবে কোন প্রতিদান না নিয়েই আমি সৈনিক-রূপে আমার স্বদেশের সেবা করব; কিন্তু জীবিকা নির্বাহের জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যবসার শরণ নেব।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-১১-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা, ৩৯০, ৩৯১ ও ৩৯৫)

বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা মানব সম্প্রদায়ের ধার্মিক সামাজিক ও আর্থিক প্রয়োজনপূর্তি করে। এই নীতির অনুসরণকারী সমগ্র সমাজ আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের প্রয়াস করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ পায় বলে এ সমাজের ধার্মিক প্রয়োজন-পূর্তি করে। এই বিধান পালন করলে সামাজিক পাপ বিদূরিত হয় এবং আর্থিক ক্ষেত্রের মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নিবারিত হয়ে থাকে। আর একে যদি সমাজের সদস্যদের অধিকার বা তাদের প্রাপ্তব্য সুযোগ সুবিধার ঘোষণাপত্ররূপে বিবেচনা না করে তাদের কর্তব্যের নির্দেশক জ্ঞান করা যায়, তাহলে এর ফলস্বরূপ সমাজে সম্পদের বণ্টন হবে। এ বণ্টন একেবারে আদর্শ অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রায় সাম্য আধারিত না হলেও যথাসম্ভব ন্যায়োচিত হবে। অতএব মানুষ যখন এই বিধান উপেক্ষা করে ভ্রমবশতঃ কর্তব্যকে সুযোগ সুবিধা জ্ঞান করে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যখন উপজীবিকা নিয়ে বাছাবাছি করে, তখন তার ফলে বর্ণ-ব্যবস্থা ওলট পালট হতে বাধ্য এবং এইভাবে শেষ পর্যন্ত সমাজের সংহতি বিনষ্ট হয়। এই বিধান অনুসারে কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বংশগত পেশা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করার কথা উঠতে পারে না। অর্থাৎ বাইরে থেকে কারও উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেবার প্রশ্ন নেই। কারণ অতীতে যখন সুদীর্ঘ কাল একাদিক্রমে বর্ণাশ্রমের বিধান পালিত হয়েছিল, তখন এর প্রয়োজন পড়েনি। অভ্যাস ও শিক্ষার ফলে মানুষ নিজ কর্তব্য ও এই বিধানের যথার্থতা উপলব্ধি করত এবং স্বেচ্ছায় তারা এই নিয়ম মেনে চলত। আজ সকল জাতিই এই বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং পদে পদে তারা এই বিধানকে উল্লঙ্ঘন করছে আর এর ফলে তাদের নানা দুর্ভোগও ভুগতে হচ্ছে। তথাকথিত সভ্য জাতিসমূহ কোনক্রমেই এমন পর্যায়ে উন্নীত হননি যাকে তাঁরা মানসিক স্থৈর্য ও সন্তুষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশংসা করতে পারেন। (হরিজন, ৪-৩-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৫)

বর্ণ-ধর্ম বলতে আমি যা বুঝি তাতে উচ্চতম মানসিক বিকাশ লাভ করার পথে কোন প্রকারের বাধা নেই। অবশ্য পার্থিব অবস্থার উন্নতির জন্য বংশগত

পেশা ছেড়ে দেবার পথে ন্যায়সঙ্গত বাধা আছে। কারণ এইভাবে ভৌতিক সমৃদ্ধির জন্য বংশগত জীবিকা বর্জন করার ফলে অস্বাস্থ্যকর ও সর্বনাশা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয় এবং এই জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ জীবনকে সর্ববিধ আনন্দ ও সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করছে।

(হরিজন, ২৯-৭-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ পৃষ্ঠা ৮)

বর্ণ অবশ্য জন্মগত তবে একে বজায় রাখার আধার হল নির্দিষ্ট বর্ণের নির্ধারিত কর্তব্য পালন। ব্রাহ্মণ মাতা-পিতার সন্তানকে ব্রাহ্মণ আখ্যা দেওয়া হবে; কিন্তু বয়সকালে তাঁর জীবনে যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর বিকাশ না হয় তাহলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলা চলবে না। তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে পতিত হয়েছেন বলতে হবে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম না হলেও কারও আচরণে যদি ব্রাহ্মণসুলভ গুণাবলী প্রকাশ পায় তবে তাঁকে ব্রাহ্মণ জ্ঞান করা হবে। তিনি অবশ্য স্বয়ং এই অভিধায় ভূষিত হতে চাইবেন না।

এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে বর্ণ-ব্যবস্থা মনুষ্যকৃত কোন প্রথা নয়। এ হল সমগ্র মানব-পরিবারকে নিয়ন্ত্রণকারী এক স্বাভাবিক জীবন-বিধি। এই বিধান পালন করলে জীবন বেঁচে থাকার মত হবে, শান্তি ও পরিতৃপ্তির প্রসার ঘটবে। সর্ববিধ সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের অবসান হবে; বুভুক্ষা ও দারিদ্র বিদূরিত হয়ে যাবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং এমন কি আধি ব্যাধি ও শোক-সন্তাপরূপী সমস্যাবলীরও সমাধান হবে।

তবে বর্ণ-ব্যবস্থা যদি মানুষের সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয় এবং এ যদি তার কর্তব্যের নিরীখ হয়ে থাকে তাহলে জানতে হবে যে বর্ণের তারতম্যের কারণে কারও কোন বিশেষ অধিকার জন্মায় না। সুতরাং উচ্চ-নীচ ভাবনার সঙ্গে এর তিলমাত্র সম্বন্ধ নেই। আজ বর্ণ বলতে উচ্চ-নীচ পর্যায় বোঝায়। এ অবস্থা মূল স্থিতির জঘন্য বিকৃতি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে বর্ণ-ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের প্রয়াস ছিল যথাসাধ্য এই বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা। আজ আমরা এর বিকৃতিসাধন করার জন্য সমগ্র বিশ্বের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছি।

বর্ণ-ব্যবস্থা কতিপয় হিন্দু দ্রষ্টার বিশেষ আবিষ্কার হলেও এর বিশ্বজনীন প্রয়োগ হতে পারে। প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু কিছু বিশিষ্ট চারিত্র-ধর্ম থাকে। তবে কোন ধর্ম যখন কোন মূল নীতি বা বিধান ব্যক্ত করে তখন তার সার্বত্রিক প্রয়োগ সম্ভবনা থাকবেই। বর্ণ-ব্যবস্থাকে আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে

থাকি। আজ পৃথিবী একে অগ্রাহ্য করতে পারে কিন্তু আগামী কাল একে গ্রহণ করতেই হবে। বর্ণ-ধর্মের বিধান হল এই যে প্রত্যেকে কর্তব্য জ্ঞানে নিজ জন্মগত বৃত্তির অনুশীলন করে তার সত্তার স্বধর্ম পালন করবে।

(হরিজন, ২৮-৯-১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৬১- ৬২)

জনৈক আমেরিকান ধর্মযাজকের সঙ্গে

গান্ধীজী: "আমি যদি ঝাড়ুদার হই তবে আমার ছেলেও কেন তা হবে না?"

"তাই নাকি? আপনি তাহলে অতদূর যাবেন?"

"অবশ্যই। কারণ আমার মতে ঝাড়ুদারের পেশা ধর্মযাজকের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়।"

"আমিও সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট না হয়ে কাঠুরে হলে কি ভাল হত?"

"কিন্তু একজন কাঠুরে কেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হতে পারবেন না? গ্লাডস্টোন তো সখের কাঠুরিয়া ছিলেন।"

"তিনি কিন্তু এটাকে তাঁর পেশা হিসাবে গ্রহণ করেননি।"

"করলেও তাতে তাঁর অবস্থা খারাপ হত না। আমার বক্তব্য এই যে ঝাড়ুদারের বংশে যাঁর জন্ম, তিনি ঐ বৃত্তি দ্বারাই নিজ জীবিকা অর্জন করবেন এবং এর পর তিনি যা খুশী করতে পারেন। কারণ একজন ঝাড়ুদার তাঁর পরিশ্রমের জন্য কোন আইনজীবি এবং এমন কি আপনাদের প্রেসিডেণ্টের সমান পারিশ্রমিক পাবার অধিকারী। আমার মতে এরই নাম বর্ণধর্ম। এর চেয়ে ভাল সাম্যবাদ পৃথিবীতে আর নেই। বর্ণ-ধর্ম মাধ্যাকর্ষণের মতই শাশ্বত বিধান। উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে লম্ফন করেও আমরা মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে বাতিল করার প্রয়াস করতে পারি না। কারণ এ প্রচেষ্টা নিরর্থক। অনুরূপ-ভাবে পরস্পরের ঊর্ধ্বে উলম্ফন করার চেষ্টাও অর্থহীন। বর্ণের বিধান মৃত্যুর দ্যোতক প্রতিদ্বন্দ্বিতাবৃত্তির একেবারে বিপরীত জিনিস। অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে বিনাশ সাধন করে পারস্পরিক সহযোগীতার দ্যোতক বলে বর্ণ-ধর্ম সেখানে বাঁচার পথ করে দেয়। (হরিজন, ৬-৩-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৭)

বর্ণ বনাম শ্রেণী

মানুষ সামাজিক প্রাণী বলে তাকে সামাজিক সংগঠনের কোন না কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়। ভারতবর্ষে আমরা বর্ণ-ব্যবস্থার পত্তন করেছি এবং

ইউরোপের ওঁরা শ্রেণী-ব্যবস্থার সংগঠন করেছেন। এর কোনটির মধ্যেই অবশ্য পরিবার প্রথার মত স্বাভাবিকতা বা সংহতি নেই। পরিবার প্রথা সম্ভবতঃ ঈশ্বর নির্দিষ্ট। বর্ণ-ব্যবস্থার দরুণ যদি কতিপয় অন্যায়ের সূত্রপাত হয়ে থাকে শ্রেণী-ব্যবস্থাও তাহলে কম যায় না।

শ্রেণী-ব্যবস্থার ফলে যদি কিছু কিছু সমাজিক গুণাবলীর সংরক্ষণে সহায়তা হয়ে থাকে বর্ণ-ব্যবস্থাও তাহলে তার চেয়ে বেশী মাত্রায় না হলেও অন্ততঃ সমপরিমাণে সে কাজ করেছে। বর্ণ-ব্যবস্থার গুণ হল এই যে সম্পদের মালিকানার তারতম্যের উপর এর ভিত্তি নয়। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য যে, অর্থই হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিভেদকারী শক্তি। শঙ্করাচার্য বলেছেন যে অর্থের কুপ্রভাবের কাছে এমন কি পারিবারিক বন্ধনের পবিত্রতাও যথেষ্ট শক্তিশালী রক্ষাকবচ নয়। বর্ণ পরিবার প্রথারই বিস্তার। উভয় ব্যবস্থার মূলে রয়েছে রক্ত-সম্বন্ধ ও বংশানুক্রমতা। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা এই কথা প্রমাণ করার জন্য তৎপর যে বংশানুক্রমতা নিছক মায়া এবং পরিবেশই সব কিছু। বহু দেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের এই সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। কিন্তু তাঁদের পরিবেশ-তত্ত্ব মেনে নিলেও এ কথা প্রমাণ করা সহজ যে শ্রেণী-ব্যবস্থার তুলনায় বর্ণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশের অধিকতর বিকাশ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব।

বর্ণ-ব্যবস্থার পিছনে কোন উদ্ধত শ্রেয়মন্যতার ভাব নেই। এ হল আত্মোন্নতির বিভিন্ন পন্থার সমীকরণ। সামাজিক স্থায়িত্ব ও প্রগতির শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থার নিদর্শন হল বর্ণ-ব্যবস্থা। পরিবার-ভাবনা যেমন পরস্পরের প্রতি প্রেমভাবযুক্ত এবং রক্ত-বন্ধন ও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ প্রত্যেককে কোল দিয়ে থাকে, বর্ণ-ব্যবস্থাও তেমনি একটি বিশেষ ধরনের পবিত্রতায় বিশ্বাসী (জীবন-মান কথাটি এখানে জ্ঞাতসারে পরিহার করা হল; কারণ এর আসল অর্থ হল আর্থিক মানদণ্ড) পরিবারদের সমসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করে। বর্ণ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে কোন বিশেষ পরিবার কোন বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হবে কিনা এ কথা স্থির করার দায়িত্ব জনকয়েকের বাতিক অথবা তাদের স্বার্থদুষ্ট সিদ্ধান্তের উপর অর্পণ করা হয় না। বর্ণ-ব্যবস্থা বংশানুক্রমিকতার তত্ত্বে বিশ্বাসী। নিছক একটি সাংস্কৃতিক পদ্ধতি হবার জন্য বর্ণ-ব্যবস্থা এ কথা মনে করে না যে উন্নততর জীবনযাত্রা পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য কোন ব্যক্তি অথবা পরিবার প্রচলিত উপজীবিকা ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিশেষ একটি গোষ্ঠীর মধ্যে

রেখে দিলে তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়। আমরা সকলেই জানি যে সামাজিক জীবনে পরিবর্তন অত্যন্ত ধীর গতিতে আসে এবং বস্তুতঃ এই কারণে বর্ণ-ব্যবস্থা পরিবর্তিত কালের উপযোগী নূতন নূতন উপগোষ্ঠী রচনার সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু এইসব পরিবর্তন হয়েছে অতীব ধীরভাবে ও মেঘের আকৃতি পরিবর্তনের মত সহজ ছন্দে। এর চেয়ে অধিকতর সুসঙ্গতিপূর্ণ মানবীয় ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা কঠিন।

বর্ণ-ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চনীচের প্রশ্ন নেই। এ কেবল বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও তদনুযায়ী জীবনযাত্রা পদ্ধতির স্বীকৃতির দ্যোতক। তবে এ সত্য অস্বীকার করা উচিত নয় যে বর্ণ-ব্যবস্থার ফলে এক জাতীয় জাতিতত্ত্ব গড়ে উঠেছে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-১২-১৯২০ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩)

আমি এ কথা বহুবার বলেছি যে আজকাল যে ধরনের জাতিভেদ প্রথা চলছে তার উপর আমার কোন শ্রদ্ধা নেই। এ প্রথা অনাবশ্যক বাহুল্য ও প্রগতির পক্ষে বাধক। অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেয় বিবেচনা করা মানবতা ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ। এইজন্য যে বর্ণভেদ ব্যবস্থা মানুষের মান-মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য করে তা পাপমণ্ডিত।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৩-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩)

ধর্মের চক্ষে সকল মানুষই সমান। বিদ্যা বুদ্ধি বা ধনের জন্য এই সব হতে বঞ্চিত ব্যক্তিদের উপর কারও প্রাধান্য হতে পারে না।

(দি হিন্দু, ১৯-৯-১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ)

অস্পৃশ্যতা

মানুষকে ভালবাসার দরুণ জীবনের প্রথম ভাগেই আমাকে অস্পৃশ্যতারূপী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমার মা একবার আমাকে বলেছিলেন, "এ ছেলেটিকে তুমি ছোঁবে না, এ অস্পৃশ্য।" আমি উল্টো প্রশ্ন করলাম, "কেন ছোঁব না" ; এবং সেই থেকে আমার বিদ্রোহ শুরু হল।

(হরিজন, ২৪-১২-১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯৩)

অস্পৃশ্যতার পিছনে ধর্মের সমর্থন নেই এ হল শয়তানের আবিষ্কার। আর শয়তান বরাবরই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকে। কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থ তো যুক্তি ও সত্যের উর্দ্ধে উঠতে পারে না।

বেদ-এর মূল তত্ত্ব হল পবিত্রতা, সত্য, নিষ্কলুষতা, শুদ্ধতা, নম্রতা, সারল্য, ক্ষমা, ঐশীভাবনা এবং এই জাতীয় আর যা কিছু কোন পুরুষ বা রমণীকে মহৎ ও সাহসী করতে পারে। দেশের মহান ও মূক ...কে মেথর সম্প্রদায়কে কুকুরের চেয়ে অধমজ্ঞানে হীন ও ধিক্কারের পাত্র মনে করার পিছনে কোন মহত্ত্ব বা গৌরবের কিছু নেই।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-১-১৯২১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২২)

ছুৎমার্গ প্রথাকে বরদাস্ত করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভবপর হয়নি। এ প্রথাকে চিরকালই আমার অনাবশ্যক বলে মনে হয়েছে। এ কথা সত্য যে এ প্রথা বহু পুরাতন; কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত আরও বহু কুপ্রথাই তো এইরকম প্রাচীনত্বের দোহাই দিতে পারে। মেয়েদের দিয়ে এক রকম বেশ্যাবৃত্তি চালান যে হিন্দুধর্মের অঙ্গ—এ কথা ভাবতেও আমার লজ্জা বোধ হয়। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে এই (দেবদাসী) প্রথা হিন্দুদের মধ্যে বিদ্যমান। কালীমায়ের সামনে ছাগ বলি দেওয়া আমার মতে প্রত্যক্ষ অধর্মাচরণের নিদর্শন এবং পশুবলি দেওয়ার প্রথাকে আমি তাই হিন্দুধর্মের অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করি না। হিন্দুধর্ম বহু যুগ ধরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম—এই নামটিই বিদেশীদের দেওয়া। হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের ধর্মমতকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এ কথা যথার্থ যে একদা ধর্মের নামে পশুবলি দেওয়া হত। কিন্তু এ ধর্মাচরণ নয়, হিন্দুধর্ম তো নয়ই। এইভাবে আমার মনে হয় যে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে গোরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ধর্মবিশ্বাসের পর্যায়ে পরিণত হবার পরও যাঁরা গোমাংস আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করতেন, তাঁদের সমাজচ্যুত করা হয়। সে সময়কার আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ নিশ্চয় ভীষণাকার ধারণ করেছিল। কেবল বিরোধীদেরই প্রতি সামাজিক বয়কটের আয়ুধ প্রয়োগ করা হয়নি, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরও পিতৃপুরুষের পাপের দায়ভাগী করা হয়। যে প্রথার জন্মের মূলে একদা হয়ত কোন সদভিপ্রায় ছিল, কালক্রমে তা নির্মমরূপ পরিগ্রহ করল। এর ফলে আমাদের ধর্মশাস্ত্রসমূহে এমন সব শ্লোকের অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল যার বলে এই কুপ্রথাকে স্থায়ী স্বীকৃতি দেওয়া হল। অথচ এ প্রথা একেবারেই অবাঞ্ছনীয় এবং তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে এর মূলে কোন যৌক্তিকতা নেই। অস্পৃশ্যতা-প্রথার জন্ম সম্বন্ধে আমার এই মতবাদ যথার্থ হক বা না-ই হক, ছুৎমার্গ যুক্তিবাদের বিরোধী এবং করুণা ও প্রেমবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্করহিত। যে ধর্মে গোপূজার স্থান রয়েছে সে ধর্ম নিশ্চয়ই মানুষকে নিষ্ঠুর এবং অমানুষিক-

ভাবে বয়কট করার প্রথাকে সমর্থন করতে পারে না। আর এই সব চিরকালের উপেক্ষিত মানুষদের সঙ্গ বর্জন করার পরিবর্তে আমি বরং নিজের দেহকে শতখণ্ডে খণ্ডিত করাকে অধিকতর কাম্য মনে করব। হিন্দুধর্মকে আমি নিজ জীবনাপেক্ষা প্রিয় বিবেচনা করি বলে তার এই কলঙ্ক আমার কাছে অসহনীয় বোঝার মত মনে হয়।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-১৯২১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১৮-১৯)

আমরা সকলে একই রঙে রঞ্জিত এবং সেই এক এবং অদ্বিতীয় স্রষ্টার সন্তান। এই কারণে আমাদের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তিও অসীম। তাই একটি মাত্র মানুষকে তুচ্ছ করার অর্থ ঐশী শক্তির অপমান। এতে সেই ব্যক্তির অন্তরস্থিত ঐশী সত্তাকেই কেবল আঘাত করা হয় না, তাবৎ বিশ্ব চরাচরের ঐশী সত্তার অবমাননা হয়।

(আত্মকথা, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৩৭)

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে হিন্দুদের হৃদয় যদি সম্পূর্ণরূপে অস্পৃশ্যতা প্রথা-রূপী কলঙ্কের প্রভাবমুক্ত হয় তাহলে সেই ঘটনার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া কেবল ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপরই হবে না, এ পদক্ষেপ সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করবে। এ বিশ্বাস দিনে দিনে আমার মনে দৃঢ়তর হচ্ছে। কয়েক লক্ষ মানুষের প্রতি অস্পৃশ্যতাবোধকে হৃদয় থেকে বিসর্জন দিয়ে অপর কয়েক লক্ষ সম্বন্ধে সেই ভাবনা কায়েম রাখা সম্ভব নয়। হিন্দুদের হৃদয় উচ্চনীচের ভেদ-ভাবনা বিরহিত হওয়া মাত্র অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রতি ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের ভাবও আমাদের মন থেকে বিদূরিত হওয়া উচিত। এই কারণেই আমি অস্পৃশ্যতা সমস্যার পিছনে জীবন পণ করেছি। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম শুরু করে আমি কেবল হিন্দুদের মধ্যে "স্পৃশ্য" ও "অস্পৃশ্যদের" মধ্যে মিলন আনার চেষ্টা করছি না, আমার লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান এবং অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও ঐক্য স্থাপন করা।

(হরিজন, ১৭-১১-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪)

কেবল হিন্দু-হিন্দুর মধ্যে অস্পৃশ্যতাবোধের অপনোদনই যথেষ্ট নয়, হিন্দু-খ্রীস্টান-মুসলমান-পার্শী ও অপরাপর সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যেও অস্পৃশ্যতা থাকা উচিত নয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে হৃদয় পরিবর্তনের এই বিরাট পরিকল্পনাকে যদি কার্যকরী করা যায়, তাহলে ভারতবর্ষে আমরা এক মহাজাতি হিসাবে বাস করতে পারব। আমাদের মধ্যে তখন পারস্পরিক

বিশ্বাস থাকবে, অবিশ্বাস বা সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। অস্পৃশ্যতা ও তার যাবতীয় প্রচ্ছন্ন রূপই আমাদের পরস্পর থেকে পৃথক করে রাখে এবং এর দরুণ জীবন প্রেমশূন্য ও দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

(হরিজন, ২৬-১-১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪)

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের অর্থ হল সমগ্র বিশ্বের প্রতি প্রেম ও সৃষ্টির সব কিছুকে সেবা করার বৃত্তি। শেষ অবধি অস্পৃশ্যতা নিবারণ তাই অহিংসায় পর্যবসিত হয়। অস্পৃশ্যতা নিবারিত হলে যে বিভেদ-প্রাচীর মানুষে মানুষে ও সৃষ্টির অন্যান্য জীবের মধ্যে পার্থক্য করে, তা অদৃশ্য হবে। পৃথিবীর সর্বত্র আজ এই জাতীয় বিভেদের অস্তিত্ব রয়েছে।

(যারবেদা মন্দির হইতে, ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪)

গোরক্ষা

গোরক্ষা হিন্দু-হৃদয়ের পরম কাম্য সম্পদ। গোরক্ষায় অবিশ্বাসী কোন কারও পক্ষে বোধহয় হিন্দু হওয়া অসম্ভব। এ বিশ্বাস মহৎও বটে। আমার মতে গোপূজার অর্থ নিরীহের আরাধনা। গরু আমার কাছে নিরীহতার অবতার। গোরক্ষার অর্থ দুর্বল ও অসহায়ের সংরক্ষণ। অধ্যাপক বাসওয়ানী যথার্থই বলেছেন যে গোরক্ষার অর্থ মনুষ্য এবং পশুর মধ্যে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা। এই মহৎ হৃদয়বৃত্তি ধৈর্যযুক্ত পরিশ্রম ও তপস্যার দ্বারা বর্ধিত হবে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৬-১৯২১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৮২)

আমার মতে গোরক্ষা মানব প্রজাতির বিবর্তনধারার এক বিস্ময়কর অবদান। মানুষ এখানে তার প্রজাতির পরিধির বাইরে উত্তরণ করেছে। গরু আমার কাছে সমগ্র মানবেতর বিশ্বের প্রতিনিধি। গরুর মাধ্যমে মানুষ তাবৎ জীবিত প্রাণীর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করবে—এই হল বিশ্ববিধান। গরুর উপর কেন যে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি। ভারতবর্ষে গরুই ছিল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী, গৃহস্থের ঘরের প্রাচুর্যের মূলে গরু। গরু কেবল দুধই দেয় না, কৃষিরও সহায়ক। গরু করুণার প্রতিমূর্তি। শান্ত জীবটির সর্বাবয়বে কারুণ্য। গরু ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মাতৃস্বরূপা। গোরক্ষার অর্থ হল ঈশ্বরের সমগ্র মূক সৃষ্টির সংরক্ষণ। পুরাকালের যে কোন ঋষি গোসেবা থেকেই তাঁর মহৎ জীবনের সূত্রপাত করতেন। বাকৃশক্তি রহিত হবার দরুণ নিম্ন পর্যায়ের জীবদের আবেদন অধিকতর শক্তিশালী। গোসেবা

বিশ্বসংস্কৃতিতে হিন্দুধর্মের অবদান। আর যতদিন গোরক্ষায় নিরত হিন্দুদের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন হিন্দুধর্মও টিকে থাকবে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-১৯২১, খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১৮)

আমাদের ঋষিরা এই চমকপ্রদ সত্য আবিষ্কার করেছিলেন যে (আর প্রতিদিনই এই সত্যের প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে) অহিংসা ও সত্যের আচরণের অভিমুখে আমরা যে পরিমাণ অগ্রসর হই, সেই পরিমাণে পবিত্র শাস্ত্র-গ্রন্থ ও ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রেরিত রচনাবলীর অন্তর্নিহিত সত্য আমাদের কাছে ভাস্বর হয়ে ওঠে। সত্য এবং অহিংসার উপলব্ধি যত বেশী হবে চিত্তাকাশও ততই আলোকিত হয়ে উঠবে। এই জাতীয় ঋষিরাই একথা ঘোষণা করেছিলেন যে গোরক্ষা হিন্দুদের পরম কর্তব্য এবং এ কর্তব্য পালন করলে মোক্ষলাভ হয়। আমি অবশ্য একথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই যে নিছক গরু নামক একটি জীবকে রক্ষা করলেই মানুষের মোক্ষলাভ হয়। মোক্ষলাভ করতে হলে মানুষকে আসক্তি বিদ্বেষ ক্রোধ ঈর্ষা ইত্যাদি নিম্নগামী বৃত্তি-সমূহকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মোক্ষলাভের পরিভাষায় গোরক্ষার অর্থ প্রচলিত ধারণার তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক ও আরও সুদূরপ্রসারী। যে গোরক্ষা মানুষের মুক্তির সহায়ক হতে পারে তার স্বধর্মই হল এই যে তার পরিধির মধ্যে যাবৎ অনুভূতিসম্পন্ন জীবকে রক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত হবে। এইজন্য আমার মতে কোন পুরুষ রমণী বা শিশুর প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে তাকে আহত করা ও ধরাতলে বিচরণকারী দুর্বলতম এবং তুচ্ছতম জীবটিকেও কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি অহিংসা নীতির প্রতিটি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র উল্লঙ্ঘনও গোরক্ষার আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে করতে হবে। ঐসব কাজ গোমাংস ভক্ষণের সমতুল্য অপরাধ। উভয়বিধ পাপের মধ্যে মাত্রায় পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু কোন গুণগত প্রভেদ নেই।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-১-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯)

যে হিন্দু গরুকে রক্ষা করে, প্রতিটি জীবকে রক্ষা করাও তার কর্তব্য। তবে সব অবস্থা বিবেচনা করলে অন্য জীবকে রক্ষা না করে কেবল গোরক্ষার উপর জোর দিচ্ছে বলে হিন্দুদের দোষী করা চলে না। সুতরাং একমাত্র বিবেচ্য প্রশ্ন হল এই যে হিন্দুদের গোরক্ষার কার্যক্রম ন্যায়সঙ্গত কিনা। সাধারণভাবে জীবহত্যা না করা যদি অহিংসায় বিশ্বাসীদের কর্তব্য হয় তাহলে গোরক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা তার পক্ষে অন্যায় নয়। আর প্রতিটি হিন্দু—শুধু

তাই বা কেন, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিই অহিংসায় বিশ্বাসী। অতএব সাধারণ-ভাবে জীবহত্যা না করার কর্তব্য অর্থাৎ তাদের রক্ষা করার দায়িত্বকে অবিসম্বাদী সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। সেইজন্য হিন্দুরা গোরক্ষাকে কর্তব্যস্বরূপ মনে করে বলে হিন্দুধর্ম বরং প্রশংসার্হ। কিন্তু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে হিন্দু গোরক্ষার পর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকেন, অন্যান্য জীবের রক্ষার্থ বাহু বিস্তার করেন না, তাঁকে আদর্শ হিন্দু বলা চলে না। এক্ষেত্রে গরু একটি প্রতীক মাত্র এবং গোরক্ষা তাই ন্যূনতম কর্তব্য।

গোরক্ষার পিছনে স্বার্থভাবনা থাকলেও তা "নিছক স্বার্থবুদ্ধি" নয়। কারণ এর পশ্চাতে কেবল স্বার্থবুদ্ধি থাকলে অন্যান্য দেশের মত আমরাও গরুর কাছ থেকে যতটা পাওয়ার পেয়ে যাবার পর তাকে হত্যা করতাম। কিন্তু একে ভারী বোঝা স্বরূপ মনে হলেও কোন হিন্দু গোহত্যা করতে চাইবেন না। অক্ষম ও অকেজো গরুদের পালন করার জন্য দানশীল ব্যক্তিদের দ্বারা যে সব গোশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি এতদাভিমুখী প্রচেষ্টার জলন্ত নিদর্শন। প্রয়োজনের তুলনায় অবশ্য এইসব প্রতিষ্ঠানের অবদান যৎকিঞ্চিৎ; কিন্তু তা বলে এই প্রচেষ্টার পিছনে যে মনোবৃত্তি কাজ করছে তার মূল্য কমে যায় না।

এইজন্য আমার মতে গোরক্ষার তত্ত্বদর্শন অতীব মহান। বাঁচার অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই দর্শন পশু সমাজকে মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-১১-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯১-৯২)

হিন্দুধর্মের কোন্ অংশকে আমি মূল্যবান জ্ঞান করি

পশ্চিমের ওরা যেমন ভৌতিক বস্তুসমূহ সম্বন্ধে বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন হিন্দুধর্মও সেইরকম ধর্ম আত্মা ও অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রে তার চেয়েও চমকপ্রদ আবিষ্কার করেছে। কিন্তু ঐসব মহান ও চমৎকার আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করার মত চোখ আমাদের নেই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকৃত যান্ত্রিক প্রগতির চমক আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। আমি ঐ প্রগতির মোহাসক্ত নই। বস্তুতঃ আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষ যাতে জড়বাদের অগ্রগতি রোধ করার বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারে সেইজন্য ভগবানই বুদ্ধি করে ভারতবর্ষকে ঐ পথে প্রগতি

করতে দেননি। হিন্দুধর্মে এমন একটা শক্তি আছে যার বলে এ এতদিন টিকে আছে। এর চোখের সামনে ব্যাবিলন সিরিয়া পারস্য ও মিশরের সভ্যতার পতন ঘটেছে। আপনাদের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখুন। রোম ও গ্রীস কোথায় গেল? আজ কোথাও গীবনের ইটালী অর্থাৎ প্রাচীন রোম-এর (কারণ রোমই ইটালী ছিল) অস্তিত্ব আছে কি? গ্রীসে গিয়ে দেখুন বিশ্ববিখ্যাত আট্টিক সভ্যতার চিহ্নমাত্র নাই। এরপর ভারতবর্ষে এসে প্রথমে তার সভ্যতার প্রাচীন বিবরণসমূহ অধ্যয়ন করুন এবং তারপর চতুর্দিকে চেয়ে দেখুন। আপনি বলতে বাধ্য হবেন, "হ্যাঁ, প্রাচীন ভারতবর্ষ দেখছি এখনও জীবিত রয়েছে।" একথা ঠিক যে এদেশের এখানে ওখানে গোময়স্তূপও আছে; কিন্তু তাদের নীচে অমূল্য সম্পদ চাপা পড়ে আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের বেঁচে থাকার কারণ হল এই যে বস্তুতান্ত্রিক পথে প্রগতি নয়, আধ্যাত্মিক প্রগতিই ছিল হিন্দুধর্মের লক্ষ্য।

হিন্দুধর্মের অনেক অবদানের মধ্যে মূক জীবজগতের সঙ্গে মানুষের একাত্মতার বিচার-ধারা অনবদ্য। আমার মতে গোপূজা একটি মহৎ বিচার-ধারা এবং এর মধ্যে বিস্তারের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হিন্দুধর্ম যে আধুনিক ধর্মান্তরিতকরণের প্রথা থেকে মুক্ত, এও আমার কাছে একটি মূল্যবান বিষয় বলে মনে হয়। হিন্দুধর্মের জন্য কোন প্রচারের প্রয়োজনীয়তা নেই। হিন্দুধর্ম বলে, "আদর্শ জীবন যাপন কর।" আপনার আমার কর্তব্য হচ্ছে হিন্দুধর্মানুযায়ী আদর্শ জীবন যাপন করা এবং তাহলেই আমরা যুগের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাবের ছাপ রেখে যেতে পারব। এছাড়া হিন্দুধর্মের অবদান স্বরূপ রামানুজ চৈতন্য এবং রামকৃষ্ণ প্রমুখ মহাপুরুষদের কথাও বিবেচনা করুন। হিন্দুধর্মের পতাকাবহনকারী অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাপুরুষদের কথা না হয় না-ই তুললাম। হিন্দুধর্ম কোন মতেই শক্তিশূন্য অথবা মৃত ধর্ম নয়।

এরপর আসে চতুর্বিধ আশ্রমের* অবদানের কথা। এ অবদানও অতুলনীয়। পৃথিবীতে এর তুল্য আর কিছুই নেই। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যেও অবশ্য ব্রহ্মচর্যের সমগোত্রীয় ইন্দ্রিয় নিবৃত্তির একটি পর্যায় আছে। কিন্তু তাঁদের ভিতর ইন্দ্রিয় নিবৃত্তি একটি সামাজিক প্রথা নয়। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের প্রতিটি বালকের পক্ষে প্রথম আশ্রমবিধি পালন করা অপরিহার্য ছিল। কী চমৎকার ব্যবস্থা। আজ আমরা হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করেছি বলে আমাদের চক্ষু

*চতুর্বিধ আশ্রম হল: ব্রহ্মচর্য (ছাত্রাবস্থা), গার্হস্থ্য (সংসার জীবন), বাণপ্রস্থ (সংসার সম্বন্ধে অনাসক্তি) ও সর্বশেষে সন্ন্যাস (ভ্রাম্যমান জন-শিক্ষক)।—অনু:

কলুষিত, চিন্তা-ভাবনা আরও কলুষিত এবং দেহ তো সর্বাপেক্ষা অধিক কলুষিত।

আর একটি বিষয়ের কথা আমি এখনও উল্লেখ করিনি। চল্লিশ বৎসর পূর্বে ম্যাক্সমূলার বলেন যে ইউরোপ ক্রমশঃ বুঝতে পারছে যে পুনর্জন্মবাদ কোন তত্ত্ব নয়, এ এক বাস্তব সত্য। এ বিচার-ধারাও একমাত্র হিন্দুধর্মেরই অবদান।

আজ বর্ণাশ্রম ধর্ম ও হিন্দুধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয় সেইজন্য এমনকি হিন্দুধর্মের অনুগামীরা পর্যন্ত নিজেদের হিন্দু বলে স্বীকার করতে চান না। এ অবস্থার প্রতিকার হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করে হবে না, এর জন্য হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন করতে হবে। আমরা যেন নিজেদের ভিতর যথার্থ হিন্দুবৃত্তিকে রূপায়িত করি এবং তারপর যেন এই প্রশ্ন তুলি যে হিন্দুধর্ম আত্মার পরিতৃপ্তি বিধানে সক্ষম কিনা।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪--১১-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯৬)

ধর্মের তুলনাত্মক গবেষণায় নিরত জনৈকা আমেরিকান অধ্যাপিকা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে ভারতবর্ষের ধর্মসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করছিলেন। হিন্দুধর্মের মুখ্য মুখ্য মূল্যবোধ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলার জন্য তিনি গান্ধীজীকে অনুরোধ করেন।

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন: "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য হল এই প্রত্যক্ষ বিশ্বাস যে সব প্রাণীই (কেবল মানুষই নয়, তাবৎ চেতনাবিশিষ্ট জীবই) এক অর্থাৎ সকল প্রাণীরই উৎস হল সেই এক এবং অদ্বিতীয় বিশ্বজনীন আধার।

"সকল জীবের মধ্যে এই একত্বভাবনা হিন্দুধর্মের এক বৈশিষ্ট্য। এর কারণ হিন্দুধর্ম মনে করে যে মুক্তি কেবল মনুষ্যজাতি কর্তৃক উপলভ্য নয়, ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিই মুক্তি পাবার অধিকারী। হতে পারে যে মনুষ্যাকৃতি গ্রহণ করার পূর্বে মুক্তিলাভ করা সম্ভবপর হয় না; কিন্তু তাই বলে এর কারণ মানুষ সমগ্র সৃষ্টির প্রভু হতে পারে না। মানুষ বরং ভগবানের সৃষ্টির সেবক। মানুষের পারস্পরিক সৌভ্রাত্রের কথা বলার সময় আমরা এইখানেই অর্থাৎ মানবসমাজের গণ্ডির মধ্যেই থেমে যাই। আমরা মনে করি অপরাপর জীবের অস্তিত্ব এইজন্য রয়েছে যে মানুষ তাদের শোষণ করবে, যদৃচ্ছা নিজের কাজে লাগাবে। হিন্দুধর্মে কিন্তু শোষণের কোন স্থান নেই। সকল প্রাণীর সঙ্গে এই একত্ব অনুভব করার জন্য মানুষ সীমাহীন ত্যাগ বরণ করতে পারে; তবে এই আদর্শের বিশালতা আপনার

ব্যক্তিগত চাহিদার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা সীমারেখা টেনে দেবে। আপনি বুঝতেই পারছেন যে সে অবস্থা বর্তমান সভ্যতার (যার বক্তব্য হল : 'আপনার প্রয়োজন আরও বাড়ান') একেবারে বিপরীতমুখী প্রবণতা। আরও প্রয়োজন বাড়ানর তত্ত্বে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে প্রয়োজন বৃদ্ধি পাবার অর্থ জ্ঞানের সমৃদ্ধি এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পেলে অসীমকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে হিন্দুধর্ম সর্ববিধ ভোগাসক্তি ও প্রয়োজনীয়তা বাড়ানর বৃত্তিকে বর্জনীয় জ্ঞান করে। কারণ এর ফলে বিশ্বজনীন সত্তার সঙ্গে একাত্ম হবার অভিমুখে বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি হয়।"

(হরিজন, ২৬-১২-১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৬৫)

শুদ্ধতম হিন্দুধর্মের নিকট ব্রাহ্মণ পিপীলিকা হস্তী অথবা একজন শ্বপচ (অর্থাৎ চণ্ডাল)—সবার মর্যাদাই সমান। আর আমাদের জীবনদর্শন এত উচ্চ পর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও আমরা তদনুযায়ী আচরণ করতে পারিনি বলে ঐ উচ্চ দর্শনই আজ পূতিগন্ধময় হয়ে পড়েছে। হিন্দুধর্ম কেবল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাবের কথা বলে না, প্রাণী মাত্রের মধ্যেই সৌভ্রাত্র প্রচার করে। বিশ্বজনীন সৌভ্রাত্রের এই সুউচ্চ কল্পনা অবশ্য মানুষকে একটু বিভ্রান্ত করতে পারে ; কিন্তু আমাদের এই আদর্শই সম্মুখে রেখে কাজ করতে হবে। যে মুহূর্তে আমরা মানুষে মানুষে যথার্থ সমভাবনা সৃষ্টি করতে পারব, সেই মুহূর্তে মানুষ এবং সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গেই একাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। সেই দিনটির আবির্ভাব ঘটলে পৃথিবীতে শান্তি এবং মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

(হরিজন, ২৮-৩-১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৫১)

সনাতন হিন্দুধর্ম

আমি নিজেকে একজন সনাতনী হিন্দু বলি। কারণ :

(১) আমি বেদ উপনিষদ্ পুরাণ এবং অন্যান্য সব হিন্দু ধর্মগ্রন্থের উপর বিশ্বাস রাখি। এইজন্য অবতার ও পুনর্জন্ম তত্ত্বের প্রতিও আমার আস্থা আছে।

(২) প্রচলিত জনপ্রিয় এবং স্থূল অর্থে নয়, আমার মতে শুদ্ধ বৈদিক অর্থে আমি বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাসী।

(৩) প্রচলিত অর্থের অনেকটা সম্প্রসারণ করে আমি গোরক্ষার কর্মসূচিতে আস্থাশীল।

(৪) মূর্তিপূজায় আমি অবিশ্বাস করি না।

পাঠক লক্ষ্য করবেন যে বেদ বা অপর কোন ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে উল্লেখ করার সময় সে সব যে ঈশ্বর রচিত এ জাতীয় উক্তি আমি ইচ্ছা করেই পরিহার করেছি। কারণ আমি একথা বিশ্বাস করি না যে বেদই একমাত্র স্বর্গীয় গ্রন্থ। আমার মতে বাইবেল কোরাণ জেন্দ-আবেস্তাও বেদেরই মত স্বর্গীয় প্রেরণায় সমৃদ্ধ। আমি হিন্দুশাস্ত্রসমূহে বিশ্বাস করি বলে যে তার প্রতিটি শব্দ বা শ্লোকই ঈশ্বর রচিত—এ কথা মনে করি না। আর আমি এ দাবীও করতে পারি না যে ঐ চমৎকার গ্রন্থের সবগুলি সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। তবে এ কথা আমি অবশ্যই বলব যে ঐ সব শাস্ত্রগ্রন্থের মূল শিক্ষার অন্তর্নিহিত সত্য আমার জানা আছে এবং সে সত্য আমি অনুভবও করি। যুক্তি বা নীতিবোধের বিরোধী হলে ঐ সব শাস্ত্রগ্রন্থের যে কোন মহামহোপাধ্যায়কৃত ব্যাখ্যা বা ভাষ্য মানতে আমি রাজী নই।

হিন্দুশাস্ত্রের এই বচনে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে অহিংসা সত্য ও ব্রহ্মচর্যের আচরণে কুশলী না হলে এবং সকল প্রকার ধন সম্পদের উপর থেকে কর্তৃত্ব ছেড়ে না দিলে কারও পক্ষে সঠিকভাবে শাস্ত্রসমূহের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। আমি গুরুবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু এ যুগে লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যে গুরু জুটবে না। কারণ একাধারে এইরূপ আদর্শ পবিত্রতা ও শুদ্ধতম জ্ঞানের নিদর্শন পাওয়া বর্তমান সময়ে খুব সহজসাধ্য নয়। তবে নিজ ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে কোন না কোন দিন জানতে পারার সম্ভাবনার ব্যাপারে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। কারণ অপর আর সব ধর্মের মত হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব সমূহও অপরিবর্তনীয় ও সহজবোধ্য। প্রতিটি হিন্দুই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁর একত্বে বিশ্বাস করে, পুনর্জন্ম ও মোক্ষেও সকলের আস্থা আছে।

হিন্দুধর্মের প্রতি আমার যথার্থ মনোভাব ব্যক্ত করতে হলে এর সঙ্গে আমার জীবনসঙ্গিনীর তুলনা করতে হবে। পৃথিবীর যে কোন নারীর তুলনায় তিনিই আমার হৃদয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দোলা সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাঁর যে কোন দোষ ত্রুটি নেই তা নয়। আমি বলতে পারি যে তাঁর যে সব দোষ আমার চোখে পড়ে তার চেয়েও বেশী দোষে তিনি দোষী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে আমি এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা আছি—এ মনোভাব আমার নিকট সতত ক্রিয়াশীল। হিন্দুধর্মের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এর সম্বন্ধে আমার মনোভাব পূর্বের অনুরূপ। গীতা ও তুলসী রামায়ণ—হিন্দুধর্মের যে দুটি গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি জানি বলে বলা চলতে পারে, তাদের শ্লোকগুলি আমাকে অন্য

সব কিছুর তুলনায় অধিক মাত্রায় উৎফুল্ল করে। কিছুদিন পূর্বে যখন আমার মনে হয়েছিল যে আমার শেষ নিঃশ্বাস ফেলার কাল সমুপস্থিত, তখন গীতা-ই আমার সান্ত্বনা ছিল। সকল বড় বড হিন্দু দেবমন্দিরে আজ যে দুর্নীতি চলেছে সে সম্বন্ধে আমি খবর রাখি, কিন্তু মন্দিরগুলির বর্ণনাতীত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ঐগুলিকে আমি ভালবাসি। মন্দিরগুলি সম্বন্ধে আমার মনে এমন একটা আগ্রহ আছে যা অপর কোন বিষয়ের প্রতি নেই। আগাগোড়া আমি একজন সংস্কারক, কিন্তু আমার এই সংস্কারের আতিশয্য এতটা নয় যে হিন্দুধর্মের বুনিয়াদী সত্যসমূহকে অস্বীকার করব।

হিন্দুধর্ম বর্জনশীল নয়। এর আঙিনায় বিশ্বের প্রতিটি ধর্মগুরুর উপাসনার সুযোগ রয়েছে। হিন্দুধর্মকে প্রচলিত অর্থে মিশনারী অর্থাৎ ধর্মান্তরিতকরণের আদর্শযুক্ত বলা চলে না। এ কথা সত্য যে হিন্দুধর্ম বহু জাতি ও উপজাতিকে নিজ পরিধির মধ্যে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এই আত্মীকরণ বিবর্তনমূলক ও সূক্ষ্মধর্মী। হিন্দুধর্ম সকলকে নিজ নিজ বিশ্বাস বা ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বরের আরাধনা করার পরামর্শ দেয় এবং সেইজন্য সকল ধর্মমতের সঙ্গে এর সদ্ভাব রয়েছে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-১৯২১ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১৭-১৮)

হিন্দুধর্ম নিত্যবিকাশশীল

হিন্দুধর্ম গঙ্গার মত। এর উৎস নির্মল ও অকলঙ্ক, কিন্তু এর অগ্রগতির পথে ময়লা সঞ্চিত হয়েছে। তবে সামগ্রিক প্রভাবের বিচারে গঙ্গার মত হিন্দুধর্মও কল্যাণকারী। প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিক রূপ থাকলেও এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বের অস্তিত্ব সর্বত্রই বিদ্যমান। প্রথাকে ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায় না। প্রথার পরিবর্তন হতে পারে; কিন্তু ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না।

ধর্মের পবিত্রতা নির্ভর করে তার অনুগামীদের আচরণের উপর। নিজেদের ধর্মমতের সম্মুখে যখনই কোন বিপদ সমুপস্থিত হয়েছে, হিন্দুরা তখনই কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করেছে—বিপদের কারণ খুঁজে বার করে তার প্রতিবিধানের উপায়ও আবিষ্কার করেছে। শাস্ত্রসমূহ নিয়ত বিকাশশীল। বেদ উপনিষদ্ স্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাস ইত্যাদি একই সঙ্গে আবির্ভূত হয়নি। এর প্রতিটিরই উদ্ভব হয়েছিল বিশেষ বিশেষ যুগের প্রয়োজনানুযায়ী এবং তাই মনে হয় যে এদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ বিদ্যমান। এই সব গ্রন্থে হিন্দুধর্মের শাশ্বত সত্যসমূহকে

নূতন করে ব্যক্ত করা হয়নি। ঐ সব গ্রন্থ যে যুগে রচিত তখন হিন্দুধর্মের শাশ্বত সত্যসমূহ কোন্ পদ্ধতিতে আচরিত হত, তারই নিদর্শন হল ঐ গ্রন্থগুলি। কোন বিশেষ কালে যে প্রথা প্রশংসনীয় ছিল তাকেই যদি আবার অন্য যুগে অন্ধভাবে অনুসরণ করা হয় তাহলে তার পরিণামে জনসাধারণ "নৈরাশ্যের পঙ্ককুণ্ডে" নিপতিত হয়। একদা পশুবলির প্রথা সমাজের স্বীকৃতি লাভ করলেও আজ কি আমরা তার পুনঃপ্রবর্তন করতে পারি? কোন সময় আমরা গোমাংস ভক্ষণ করতাম বলে কি এখনও তাই করব? এক সময় আমরা চোরের হাত পা কেটে ফেলতাম বলে কি এখনও সেই বর্বর প্রথার অনুসরণ করব? আমরা কি আবার বহু বিবাহ বা বাল্য বিবাহ প্রথা চালু করব? মনুষ্য সমাজের একাংশকে এক সময় আমরা বহিষ্কৃত করেছিলাম বলে কি তাদের বংশধরদের এখন পর্যন্ত জাতিচ্যুত বলে মনে করতে হবে?

হিন্দুধর্মে স্থাণুত্বের স্থান নেই। জ্ঞানের পরিধি যেমন সীমাহীন তেমনি সত্যকে প্রয়োগ করার পদ্ধতিও অগণিত। আত্মার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রত্যহ বেড়ে চলেছে আর অনন্ত কাল ধরে বাড়তে থাকবে। নব নব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নূতন নূতন কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করব; কিন্তু সত্য চিরকালই অপরিবর্তনীয় থাকবে। সম্পূর্ণ সত্যকে কে কোন্ দিন জানতে পেরেছে?

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৪-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩১-৩২)

অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিদ্বারা চালিত হয়ে আমি বিশ্বের অন্যান্য ধর্মমতের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এর চেয়েও বড় কথা হল এই যে গীতায় যে-ভাবে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী আমি তদনুযায়ী জীবন যাপন করার চেষ্টা করেছি। সঙ্কীর্ণ নয়, আমি হিন্দুধর্মের উদার অর্থ আবিষ্কার করার প্রযত্ন করেছি। আমার হিন্দুধর্ম বিপুল পরিমাণ শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে প্রোথিত নয়। পীড়িত সন্তানের সঙ্গে মায়ের কথা বলার মতই এ সজীব ও প্রাণবন্ত। আমি যা করছি তা সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসসম্মত। আমি আমার পূর্ব পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। একদা তাঁরা ক্রুদ্ধ দেব-দেবীর তুষ্টি বিধানের জন্য পশু বলি দিতেন। তাঁদের বংশধরেরা (যাঁরা আবার আমাদের অপেক্ষাকৃত কাছের পূর্বপুরুষ) 'বলি' শব্দটির একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা করলেন। তাঁরা বললেন,—এ বলি আমাদের অবগুণাবলীর বলিদান। আর ক্রুদ্ধ দেব-দেবীর সন্তুষ্টির জন্য নয়, আমাদের অন্তরস্থ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই বলি নিবেদন করতে হবে।

(হরিজন, ৩-১০-১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৬৬)

আমাকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলা ভুল। আমার জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী আদর্শ-সমূহ সমগ্র মানবজাতি কর্তৃক গৃহীত হক এই উদ্দেশ্যে তাদের সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। ক্রমবিবর্তনের দ্বারা আমি এই সব আদর্শে উপনীত হয়েছি। এতদাভিমুখী প্রতিটি পদক্ষেপ যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা ও বিবেচনার পর গৃহীত হয়েছে, এর পিছনে যথা সম্ভব অধিক দূরদর্শিতা বিদ্যমান। আমি যে ইন্দ্রিয় সংযম ও অহিংসার কথা বলি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে আমি ঐ দুই সত্যে উপনীত হয়েছি এবং জনসেবার কর্তব্য সম্পাদনে এতদুভয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় গৃহস্থ আইনজীবি সমাজ-সংস্কারক অথবা রাজনীতিবিদ যে কোন ভূমিকায়ই আমাকে অবতীর্ণ হতে হক না কেন, এই সব দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য আমাকে যৌন জীবনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে এবং স্বদেশবাসী হক অথবা ইউরোপীয়, সবার সঙ্গে সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আমাকে অহিংসা ও সত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আচরণ করতে হয়েছে। নিজেকে আমি গড়পড়তা (সাধারণ) মানুষের চেয়ে বড় বলে মনে করি না এবং আমার যোগ্যতাও গড়পড়তার চেয়ে বেশী নয়। আর বহু পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার পর অহিংসা ও ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধে আমি যে অবস্থায় উপনীত হয়েছি তার কারণ আমি নিজেকে বিশেষ কোন প্রতিভার অধিকারী বলে মনে করি না। আমার এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে আমার মত চেষ্টা করলে এবং সমপরিমাণ আশা ও বিশ্বাসের অনুশীলন করলে আমি যা করেছি যে কোন পুরুষ বা রমণীই তা করতে পারবেন।

(হরিজন, ৩-১০-১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৬৮)

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত